বঙ্গীয়

1232

সাহিত্য-সম্মিলনের

সম্পূর্ণ বিবরণী।

সন ১৩১৪ সাল।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY RAJARAMMOHUNPUR

কাশিমবাজার।

R

80.06
কাশী / বিব

কাশীমবাজার, সত্যরত্নযন্ত্র।
শ্রীললিতমোহন চৌধুরী প্রিণ্টার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

STOCK TAKING-2011

ST - VERF

22264
8 FEB 1963

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
ভূমিকা ...	১
সূচনা ...	১
নামকরণ ...	৩
উদ্দেশ্য ...	৩
নিয়মাবলী ...	৩
পৃষ্ঠপোষক ...	৪
অধ্যক্ষসভা ...	৪
সভাপতি ...	৫
আমন্ত্রণ ...	৫
সভাস্থল ...	৫
সমাগম ...	৬
আদর আপ্যায়ন ...	৬
আয়ব্যয় ...	৭
প্রবন্ধ ...	৭
প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন	
প্রথম দিন ...	৯
উদ্বোধন ...	১০
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ...	১১
অভ্যর্থনা-সঙ্গীত ...	১৫
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ মহাশয়ের প্রবন্ধ—"সাহিত্য-সম্মিলন"	২॥/০
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ—"ভাষা-সংস্কার"	১।১/০
প্রথম প্রস্তাব ...	১৬
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ—"বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান" ...	১/০
শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়েয় বক্তৃতা ...	১৬
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের বক্তৃতা ...	৫৯
শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের বক্তৃতা ...	১৯
দ্বিতীয় দিন ...	২০
বাণীস্তুতি ...	২৩
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ—"বাঙ্গলা ভাষা"	৩।১/০
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা	২১
" লালমোহন বিদ্যানিধি " "	২৪
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের বক্তৃতা ...	২৫
" মোহিনীমোহন রায় এম, এ, মহাশয়ের বক্তৃতা	২৭
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ,বি,এল মহাশয়ের বক্তৃতা ...	২৯। ৫৩
" হরিমোহন মৈত্র মহাশয়ের বক্তৃতা	৩০
সারস্বত ভবন ...	৩২
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বক্তৃতা ...	৩৩

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়ের বক্তৃতা ... ৩৪
" সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা ৩৮
" বসন্তকুমার বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বক্তৃতা ... ৩৯
" অন্নদাচরণ বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা ... ৪০
" হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা ৪১
" গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী " " ৪২। ৫১
" শশধর রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বক্তৃতা ... ৪৯
" রায় কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের বক্তৃতা ... ৫০
শোকপ্রকাশ প্রস্তাব ... ৫৩
ধন্যবাদ " ... ৫৫
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতা ... ৫৬
বিদায়-সঙ্গীত ... ৫৭

পরিশিষ্ট

মুর্শিদাবাদের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য ... ৩৸৶০

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা ৫৴০
বৈষ্ণব সাহিত্য ... ৩৷৴০
বাঙ্গালাভাষা সংস্কার ... ১৩৷৴০
বাঙ্গালা ভাষা ও আয়ুর্ব্বেদ ... ১৪৸০
অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের নাম ১৫৴০
কার্য্যকরী সভা ... ১৫৸/০
বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের জমা খরচ ১৬৷৶০
মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র ... ১৬৷৴০
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র ... ১৬৷০
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস্, মহাশয়ের পত্র ... ১৬৷০
রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয়ের পত্র ... ১৬৷০
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, মহাশয়ের পত্র ... ১৬৷/০
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র ... ১৬৷/০
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পত্র ... ১৬৷৶০

প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনের
সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভূমিকা।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালাসাহিত্য যেরূপ দ্রুতবেগে পুষ্টি ও উন্নতিলাভ করিয়াছে, জগতের আর কোন সাহিত্যের পক্ষে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল বলিতে হইবে। সাহিত্যের এই শ্রীবৃদ্ধি যে কেবল তাহার অনুপম সারবত্তায় সূচিত, তাহা নহে; সাহিত্যসেবীর বিবর্দ্ধমান সংখ্যাও তাহার একটী বলবৎ নিদর্শন। সভ্যজগতে সাহিত্যসেবা ত্রিধারায় বহমানা:—সেই তিনটী ধারা রচনা, অধ্যয়ন ও উৎসাহ-দান। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা অঙ্গুলি দ্বারা গণনীয় ছিল; কিন্তু আজি তাহা সহস্র-সান্নিধ্যে সমুপস্থিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাঠকের সংখ্যা সুবিপুল; এবং উৎসাহদাতা পরিমিত হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। এই ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গসাহিত্য আজি উদ্দামবেগে ধাবমান হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার আবিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আক্ষেপ বা নৈরাশ্যের বিষয় নহে।

পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জাতীয় জীবনের ন্যায় জাতীয় সাহিত্যের প্লুত, বিপ্লুত ও মন্থরাদিভাব পরিলক্ষিত হয়; ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। সর্ব্বত্রই ইহার প্রকৃতি সমভাবাপন্ন এবং সকল স্থলেই ইহার পরিণতি কালসাপেক্ষ। বাঙ্গালা-সাহিত্যের বা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সেই পরিণতি আসন্নপ্রায়, কি সুদূরপরাহত, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে কালের ইঙ্গিত যে, কালেই সহস্র তূর্য্যদ্বারা নিনাদিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জাতীয় জীবন যেমন শ্রান্ত বা উদ্ভ্রান্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া একটী দৃঢ় অবয়ব ধারণ করে, জাতীয় সাহিত্যও সেইরূপ আবিলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জ্জন করিয়া স্বচ্ছ অথচ প্রগাঢ় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যের অবস্থা-পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত সময়ে সময়ে যেমন নাড়ীপরীক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সাহিত্যের অবস্থা কালে কালে পরিদর্শন করা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়াতেই বিদ্যমান সম্মিলনের উদ্ভব তাহার অভিব্যক্তি।

সূচনা।

বিগত দশ বৎসর হইতে এই প্রয়োজনবোধ বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীর অন্তঃকরণে অল্পে অল্পে কল্পিত জল্পিত হইতেছিল। মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবে বাঙ্গালার

সাহিত্য-সংসারে একটা অনির্ব্বচনীয় অভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। সেই অভাবের আলোচনাকল্পে যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা-নিরূপণ তাহার অন্যতম। দেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রে এবং সভাস্থলে মধ্যে মধ্যে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও এতদিন পরে তাহা প্রকৃত প্রকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবর্ষের রাজধানীতে ও বঙ্গের অনেক স্থানে অনেকগুলি সাহিত্যসমিতি আছে। সেই সকল সভাস্থলে অনেক সময় সাহিত্যের সমালোচনা হইলেও তাহা প্রয়োজনানুরূপ বলিয়া প্রতীত হয় না; কারণ সে সকল স্থলে বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যসেবীর সমবেত মতধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। আবার স্থলবিশেষে তন্ত্রমন্ত্রের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য সেই সকল সমিতির অভিমতও সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বঙ্গের প্রধান অপ্রধান সমুদায় সাহিত্য-সেবীকে একস্থানে একত্র সম্মেলিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে পারিলে বোধ হয় প্রকৃত তথ্যের নিরূপণ হইতে পারে; এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া ক্রমে প্রতীত হইলে রাজধানীর কোন কোন সাহিত্যকেন্দ্রে তাহার আলোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে বৃটীশ ভারতের রাজধানী ত্যাগ করিয়া প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদের বিশ্রুতক্ষেত্রে তাহার প্রথম অঙ্কুরোদ্গমের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু পোষণোপযোগী আনুকূল্যের অভাবে উষরভূমিতে বীজবপনের ন্যায় উদ্যোগকর্ত্তাদের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। নবীন সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কোমল হৃদয়তন্ত্রীতে ভারতীর যে "সুধা"-নিস্যন্দি ঝঙ্কার জাগিয়াছিল, তাহার বিলয় হইতে না হইতেই বঙ্গের অপর প্রান্তে বরিশালের বক্ষে অন্য যুবক সাহিত্যিক ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরীর উদার প্রাণ তাহার প্রতিধ্বনিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় জন্মভূমিতে বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের একটী সম্মিলন-সাধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে ১৩১২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে উক্ত নগরে বঙ্গের প্রাদেশিক সম্মিলনের সহিত সখ্যসূত্র বন্ধনে বঙ্গের প্রথম সাহিত্যসম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাদেশিক সম্মিলনের বোধন হইতে না হইতেই বিসর্জ্জন হইয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন-সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে সাহিত্যসেবিগণের আশাভরসা সহসা অগাধ জলে নিপতিত হইলে কয়েক মাস তাহার দগ্ধস্মৃতির প্রীণন ও পরিতর্পণে অবসিত হয়। অবশেষে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং কাশীমবাজারের স্বনামধন্য সাহিত্যসেবক শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অনুপম উৎসাহগুণে সেই অতল-নিহিত আশাতরণী উদ্ধৃত হইয়া তিতীর্ষু সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে হর্ষোদয় সাধন করিল। কিন্তু দারুণ দৈব-দুর্ব্বিপাকে সেই উৎপৎস্যমান সাহিত্যসম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র অকস্মাৎ ইহলোক হইতে অন্তরিত হওয়াতে বিড়ম্বিত সাহিত্যসম্মিলনের অধিবাসন-চেষ্টা দ্বিতীয়বার কোরকে দলিত হইল। কিন্তু ধন্য মণীন্দ্রচন্দ্রের অদম্য অধ্যবসায় ও কঠোর

মহিমচন্দ্রের শোক-স্মৃতি-তমিস্রা-বিজড়িত স্বীয় প্রাসাদেই তিনি সেই সঙ্কল্পিত সাহিত্যসম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

নামকরণ।—অধিবেশনের অধিবাস-বাসরে সমিতির নামকরণ লইয়া বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে অল্পবিস্তর বাদপ্রতিবাদ হইয়া অবশেষে সকলের ঐকমত্যে ইহার নাম "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন" নির্দ্দিষ্ট হইল। অতঃপর এই নামেই ইহা সর্ব্বত্র পরিচিত হইবে।

উদ্দেশ্য।—সাহিত্যসম্মিলন অরিষ্টশয্যায় শয়ান থাকিলেও বিদগ্ধ স্মৃতির প্রতি-প্রীণনের ঔৎসুক্যে সুদীর্ঘ প্রস্তাবমালা গলদেশে ধারণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। দুইদিনে সর্ব্বসমেত একাদশটী প্রস্তাবের উত্থাপন ও সমর্থন হয়। তৎসমুদায়ের সার সঙ্কলিত হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত হইতে পারে:—ভাষা-সংস্কার, ইতিহাস-সঙ্কলন, ভৌগলিক তত্ত্বসংগ্রহ, দর্শনবিজ্ঞানাদি বিষয়ে গ্রন্থসঙ্কলন ও সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠা। সভায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা ও পঠিত প্রবন্ধে অতি প্রয়োজনীয় উক্ত পঞ্চবিধ বিষয়ের উপযুক্ত সমালোচনা হইলে তৎসমুদায়ের পর্য্যাপ্ত প্রচার নিমিত্ত বঙ্গের জেলায় জেলায় সমস্ত সাহিত্য-সমিতিকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব হয়।* এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এবং অনুরোধের উপযুক্ত সম্মাননা হইলে কালে সুফললাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

নিয়মাবলী।—কি ধর্ম্ম্য, কি সাহিত্যিক, সামাজিক বা রাজনীতিক যে কোন সভাসমিতির শৈশব-দোলায় কতকগুলি নিয়মের বজ্রবন্ধনী নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান

---

* দ্বিতীয় দিবসে সাহিত্যসম্মিলনের এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, "এই সারস্বত-ভবনে নিম্নোক্তরূপ দ্রব্যজাত সংগৃহীত হউক এবং পুরাবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের মাসিক উপদেশ প্রদত্ত হউক।

(ক) প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথি।

(খ) প্রাচীন মুদ্রিত ও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক।

(গ) বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত তাম্র-শাসন, খোদিতলিপি, মুদ্রা প্রভৃতি।

(ঘ) জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাসাদি প্রাচীন কবিগণের স্মৃতিচিহ্নাদি।

(ঙ) আধুনিক সাহিত্যিক—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র প্রভৃতির প্রস্তরমূর্ত্তি, চিত্র, এবং তাঁহাদের হস্তাক্ষর ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি।

(চ) বঙ্গের সাধারণ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ঐরূপ স্মৃতিচিহ্ন।

(ছ) বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যার যন্ত্রাদির নমুনা। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন দুর্গ, অট্টালিকা, দেবমন্দিরাদির চিত্র। প্রাচীন কালের ব্যবহৃত বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজস, অস্ত্রশস্ত্রাদির নমুনা।

(জ) অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, (ফলিত ও গণিত), বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, প্রাণিবৃত্তান্ত, শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদ, যন্ত্রতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

(ঝ) পূর্ব্বোক্ত বিদ্যানিচয়ের রীতিমত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ।

(ঞ) গ্রন্থালয়ের পুস্তকসংগ্রহ।"

ক্ষেত্রে সেই প্রাজ্ঞবুদ্ধিরই অনুসরণ পূর্ব্বক বিশেষ কোন নিয়মের সৃষ্টি করা হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অন্নাশন সংস্কার সম্পাদিত হইলে চূড়াকরণকালে তাহার ভবিষ্য জীবনের অনাময় নিমিত্ত উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার আস্থাপন করা যাইবে। দ্বিতীয় সংবৎসরে সম্মিলনীর যাহাতে পুনরধিবেশন হয়, সভাস্থলে তাহারই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সর্ব্বজনীন সভা। উচ্চ নীচ সকল সাহিত্যসেবীর ইহাতে সমানাধিকার। বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তত্তৎস্থানীয় সমর্থ সাহিত্যানুরাগীর আনুকূল্যে ইহার অধিবেশন হইবে। ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত কোন বেগপ্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। পরে কি প্রণালী অবলম্বিত হইবে, অনুমান সাহায্যে এখন তাহার আংশিক অবধারণও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারুণ্যের কোমল কল্যাণ-কামনা ও দাক্ষিণ্যের দয়িত দানই এক্ষণে ইহার প্রধান পোষণ।

পৃষ্ঠপোষক।—অধ্যক্ষ সভা ও সদস্যগণের সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। যে প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ, প্রবল উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে মহারাজ সম্মিলনের উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার তুলনা অতি বিরল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিম্নলিখিত মন্তব্য এস্থলে সম্পূর্ণ অন্বর্থ বলিয়া উদ্ধৃত হইতে পারে :—

"বঙ্গ-সাহিত্যের কল্যাণসাধন করা এবং স্বদেশের কল্যাণসাধন করা এক কথা। বরং বলিতে পারি ইহাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধন-চেষ্টার প্রথম চেষ্টা—মূল চেষ্টা ;—ইহার তুলনায় অন্যান্য চেষ্টা সাধুবাদ লাভ করিতে পারে না। ইহাকে কেবল কল্যাণসাধন-চেষ্টা বলিয়াই নিরস্ত হইতে পারি। ইহা পুণ্য—ইহাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। মহারাজ বাহাদুর এই পুণ্যের অনুষ্ঠানে যেরূপ অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন,—স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া অভ্যাগতগণের পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—তিনি শ্রেষ্ঠপুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন। কারণ কবি বলিয়াছেন :—

সন্ধ্যাভ্র-বিভ্রম-নিভা বিভবা ভবেঽস্মিন্
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দু-চলস্বভাবাঃ
পুণ্যং নৃণামিহ পরত্র চ বন্ধুরেকো
নোচ্চৈঃ স্বদেশহিতসাধনতোঽস্তি পুণ্যম্ ॥"

অধ্যক্ষ-সভা।—সকল প্রকার সম্মিলনের অধ্যক্ষ-সভা বা কর্ম্মকর্ত্তৃগণই জীবনস্বরূপ। সমিতির গঠনার্থ উপাদান-সংগ্রহ হইতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পোষণ এবং ভবিষ্য পরিস্ফুরণ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই অধ্যক্ষ-সভার সাহায্যসাপেক্ষ। যে রীতি সকল সভাসমিতিরই প্রযুজ্য, সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে তাহা যে অপরিহার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা সাহিত্য-সম্মিলনের সৌষ্ঠব-কল্পনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বরিশালে উপস্থিত হইয়াছিলেন ;

এবং পরবর্ষেও যাঁহাদের মুখরিত সমস্ত আয়োজন বিধাতার কঠোর ভবিতব্যতায় বিফল হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কাশীমবাজার-সাহিত্য-সম্মিলনের গঠন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণের এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্মিলনসাধন সহজ ব্যাপার নহে। যে কয়েকটী সদস্য এই সম্মিলনের অধ্যক্ষসভার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সভাপতি।—সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি-মনোনয়ন লইয়া অধ্যক্ষদিগকে কিয়ৎ-পরিমাণে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১২ সালের সঙ্কল্পিত সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষের ধর্ষণায় অনেকের অমর্ষের উদয় হওয়াতে কাশীমবাজারের অধিবেশনে সভাপতিত্ব গ্রহণে একটা সর্ব্বজনীন অনাদর প্রকাশ পাইয়াছিল। তথাপি অধ্যক্ষগণ বয়স ও বিজ্ঞতার সমাদর করিতে ত্রুটী করেন নাই। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই সকল মহাত্মাদিগকে সভাপতির আসন-গ্রহণের নিমিত্ত ঐকান্তিক অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অস্বাস্থ্য, সামর্থ্যাভাব বা অপ্রতি-বিধেয় অনবসর জন্য তাঁহাদের মধ্যে কেহই সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইতে অগ্রসর হয়েন নাই। অবশেষে অধ্যক্ষগণের ঐকমত্যানুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই মনোনীত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম সভাপতিত্ব-স্বীকারে তিনি কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার কন্যার পীড়া নিবন্ধন তাঁহাকে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছিল। ভগবৎ-কৃপায় দুহিতা আরোগ্যলাভ করিলে রবীন্দ্র বাবু কাশীমবাজারে আগমন করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমন্ত্রণ।—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ঐকান্তিক উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী মাত্রেরই আমন্ত্রণ হইয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা, সাময়িক ও সংবাদপত্রের সম্পাদক, সকলপ্রকার সম্ভ্রান্ত সভাসমিতির অধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি, ব্যবহারাজীব, শিক্ষাবিভাগের বহু প্রতিনিধি প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি স্বতঃ পরতঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ৩০০০ পত্র নানা প্রণালী দ্বারা দেশের নানাস্থানে পরিচালিত হইয়াছিল। বীণাপাণির এই আবাহনে যে সকল মাতৃভক্ত সন্তান কাশীমবাজারের সভাস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা কিন্তু আশানুরূপ নহে।

সভাস্থল।—শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশাল প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভাগৃহ গঠিত হইয়াছিল। সেই প্রকাণ্ড সভামণ্ডপের প্রায় প্রত্যেক অংশই ইতি-হাসের আমগন্ধে মোদিত। কাশীমবাজার বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী :—ভাগীরথীর প্রচণ্ড তরঙ্গ-ভঙ্গের রঙ্গাবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্ধর্ষ মোগল-গৌরবের যবনিকা এইখানেই পতিত হইয়াছে :—এইখানেই একটী সামান্য পণ্যবাটিকায় সঙ্কীর্ণ পরিসরের অভ্যন্তরে ইংরাজের ঐশ্বর্য্য ক্রমে ক্রমে

স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। বলিতে কি কাশীমবাজারের প্রত্যেক পরমাণু অশ্বত্থবীজের ন্যায় স্বীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলেবরে বিরাট ঐতিহাসিক তত্ত্ব আহিত রাখিয়া উপেক্ষা ও অনাদরের অন্ধকারে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। নিরাশ স্মৃতির অন্ধতমিস্রাগুণ্ঠিত, ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাসে বিশোচিত এই কাশীমবাজার-প্রাসাদ বীণাপাণির আমন্ত্রণে যেন বিষাদ ও জড়তার অন্ধকার দূরে ফেলিয়া সঙ্কল্পিত সাহিত্যযজ্ঞের জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল। দুই দিন যে মহোৎসবে অতিবাহিত হইয়াছিল, প্রায় সংবৎসর উপনীত হইলেও আজিও তাহার মধুর প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে।

সমাগম।—সকল সম্প্রদায়ের অবাধ গতির সম্প্রসার নিমিত্ত শারদীয় পূজাবকাশই সাহিত্যযজ্ঞের উপযুক্ত অবসর বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত কার্য্যকালে তাহার বিপরীত ফলোদয় দেখা যায়। হেমন্তের অস্বাস্থ্যকর প্রভাবে অনেকের যজ্ঞদর্শন-সঙ্কল্প সফল হয় নাই। অনেকে আবার ভ্রমণ ও পরিক্রমণের রোগাক্রমণে অভিভূত হইয়া মাতৃপূজায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ সামান্য সামান্য—স্থলবিশেষে আবার অতি সামান্য কারণে সমাগমের প্রকর্ষ অনেক পরিমাণে লঘুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা বঙ্গবাসী মাত্রেরই আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় হইলেও প্রাথমিক প্রত্যূহ বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। তথাপি যজ্ঞস্থল ভক্তগণের প্রগাঢ় নিবিড়তায় সূচীভেদ্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। পরন্তু কতিপয় মুসলমান সাহিত্যিকও এই মহতী মাতৃপূজায় হিন্দুর সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়া মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আদর আপ্যায়ন।—১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক উভয় দিনই সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু ১৬ই কার্ত্তিক শনিবার প্রাতঃকাল হইতেই মুরশিদাবাদের বাহিরের সাহিত্যিক ও প্রতিনিধিবর্গ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহারাজের সুবিশাল প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের আটটি বাড়ীতে তাঁহাদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। অতিথি অভ্যাগতের জন্য মহারাজ পরিচর্য্যার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শয্যার আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে জলযোগের স্বতন্ত্র ভাণ্ডার ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে স্নানশৌচাদির সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক অতিথি অভ্যাগতের বিন্দুমাত্র আদেশ-পালনের নিমিত্ত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিনয়ী, মধুরালাপী স্বেচ্ছাসেবক বালক ও যুবকদল সর্ব্বদা উপস্থিত ছিল; আর ছিল ঘোড়ার গাড়ী,—যিনি যখনই যেখানে যাইতে চাহিয়াছিলেন—কি গঙ্গাস্নানে, কি নবাবাড়ী-দর্শনে, কি খাগড়া, বহরমপুর, সৈদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যিনি যখন যেখানে যাইতে চাহিয়াছিলেন, স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বিনা ভাড়ায় তিনি সেইখানেই যাইতে পারিয়াছিলেন। বিদেশিবর্গের সুবিধার জন্য মহারাজ স্বীয় প্রাসাদের সিংহদ্বার পার্শ্বে খাগড়াই বাসনের এবং বালুচরে শাড়ী, বহরমপুরী গরদ এবং মটকার বিবিধ ধুতি চাদর ও থানের দোকান বসাইয়া দিয়াছিলেন। কি সাহিত্যিক, কি সাহিত্যানুরাগী, কি অতিথি, অভ্যাগত প্রত্যেকের প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি ব্যাপারে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বহু ভৃত্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। সেবার জন্য প্রত্যূষে চা ও বিস্কুট এবং প্রাতে

বহুবিধ ফল মূল, ডাব, সরবত, এবং বহুবিধ ছানায় এবং ক্ষীরের মিষ্টান্নের বিপুল আয়োজন ছিল। মধ্যাহ্নে ৫০।৬০ প্রকার ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন, সন্ধ্যায় চা বিস্কুট ও জলযোগের আয়োজন এবং রাত্রিতে প্রথম দিন লুচি ও অপর দুই দিন পলান্নের ব্যবস্থা ছিল। ভুরি রাজভোগের প্রাচুর্য্যে অতিথি অভ্যাগত মাত্রই অতিমাত্র পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতে ৯টার মধ্যে দশ ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন আহার করাইয়া মহারাজ সকলকে বিদায় দিয়াছিলেন।

আয়ব্যয়।—সাহিত্যসম্মিলন একটী স্থানীয় অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তদনুসারে ইহার অধিবেশনের সর্ব্ববিষয়ক আয়োজন-কল্পে যে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহার নির্ব্বাহার্থ মুর্শিদাবাদ জেলা হইতেই অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তিন দিনে সর্ব্বসমেত ৯৬০৬৸৶১০ নয় হাজার ছয় শত ছয় টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা ব্যয় হইয়া যায়; তন্মধ্যে মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ৯০৫৫৶১০ সাহায্য করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট ৫৫১৷৷০ পাঁচ শত একান্ন টাকা বার আনা ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যানুরাগী ধনী ব্যক্তিগণের নিকট সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সকল দাতৃবর্গের—বিশেষতঃ মহারাজ বাহাদুরের এই বিপুল বদান্যতা জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ ঋণী হইয়াছেন। আয়ব্যয়ের তালিকা কার্য্য বিবরণীর যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ।—সাহিত্যসম্মিলনের জন্য দশটী প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সময়াভাবপ্রযুক্ত কেবল চারিটী প্রবন্ধ পঠিত হয়; অবশিষ্টগুলি পঠিত বলিয়া সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। "নদীয়ার ঐতিহাসিক তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়াতে ঐটী ভিন্ন অপর সমুদায়ই যথাস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে। অনবসরপ্রযুক্ত প্রবন্ধগুলির পরিদর্শনে ও নির্ব্বাচনে চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই; সেই জন্য সমপ্রকৃতি প্রবন্ধ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক সমতায় পরিণামে অবস্থার বৈষম্য অনিবার্য্য; সেই জন্য দোষদৃষ্টির সম্মুখে নানা ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যসম্মিলনের জন্ম-সময়ে অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন-বিড়ম্বনাদির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে উক্তপ্রকার ত্রুটী উপেক্ষণীয়।

প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলন।

প্রথম অধিবেশন—রবিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩১৪ সাল।

১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটী প্রধান স্মরণীয় দিবস। উক্ত দিনে কাশীমবাজার রাজবাটীর ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বীণাপাণির এই বিরাট্ যজ্ঞে মাতৃভাষার সেবা করিবার নিমিত্ত বঙ্গের নানাস্থান হইতে প্রায় চারিশত সাহিত্যসেবী সমাগত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার, সাময়িক ও সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক বা অন্য কোন প্রতিনিধি, বক্তা, বিবিধ ধর্ম্ম ও সাহিত্যসভার সম্পাদক ও সভাপতি, শিক্ষাবিভাগের সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি, ব্যবহারাজীব, মহারাজ হইতে রাজা ও সামান্য ভূম্যধিকারী, চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ ও শাস্ত্রানুশীলন-কার্য্যে ধৃতব্রত বুধগণ স্বদেশীয় সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের স্বতঃ ও পরতঃ এবং প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে, তাঁহারা সকলেই এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটীর নাম উল্লিখিত হইল।—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্তমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি), শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলাধিপ), শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান), শ্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেন, (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত নফরদাস রায় (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীযুক্ত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষাল, শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ রায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (২৪ পরগণা), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলি), শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্নতত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত শশধর রায় (রাজসাহী), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া), শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত হরিমোহন মৈত্র, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফি, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বাগচি, শ্রীযুক্ত

শশিভূষণ চৌধুরী. শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষাল, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত আহম্মদ হোষেণ মিঞা, শ্রীযুক্ত ঠাকুর প্রজাপতি সরকার (কাশ্মীর), শ্রীযুক্ত অবিনাশ কুমার সেন, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যানিধি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ঢাকা), শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ ঘোষ (দিনাজপুর), শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক (রাণাঘাট), শ্রীযুক্ত মহম্মদ রৌসন আলি চৌধুরী (ফরিদপুর), শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ সিংহ (বর্দ্ধমান), শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় (বীরভূম), শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় (ভাগলপুর), শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ (মুর্শিদাবাদ), শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু (রংপুর) প্রভৃতি।

কাশীমবাজার রাজবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থল নানাবর্ণের পতাকায় ও বিচিত্র চিত্রব্যূহে সুসজ্জিত হইয়াছিল। প্রাঙ্গণের শিরোভাগে চারুচিত্র-শোভিত বিশাল নীলচন্দ্রাতপ ত্রিতলছাদের সমতলে বিস্তৃত হইয়া যেন মর্ত্তে নিরাকার আকাশকে সাকার করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চ অলিন্দবক্ষে পাষাণস্তম্ভরাজি নানাবর্ণের চারুচীরখণ্ডনিচয়ে বিমণ্ডিত এবং বিবিধ চিত্রশিল্পে খচিত হইয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নে যেন সৌন্দর্য্যের বীথিকা বিস্তার করিয়াছিল। সভাস্থলের শীর্ষস্থানে রমণীয় বিশাল মঞ্চ, তদুপরি মহারাজা, রাজা, সভাপতি ও সাহিত্যরথিগণের আসন; সম্মুখে উভয়পার্শ্বে, চতুঃপার্শ্বস্থ অলিন্দের উপরিভাগে অসংখ্য কাষ্ঠাসন সমুৎসুক সাহিত্যিক দ্বারা প্রায় সর্ব্বথা অধিকৃত; এই মহাসভায় মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র কৃত্রিম প্রস্রবণ পঞ্চমুখে সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি গোলাপ-বারির শীত-শীকর বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নন্দনের আনন্দরাশির বিস্তার করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত উদ্বোধন-গীতি গীত হইয়াছিল।

উদ্বোধন—(মঙ্গলাচরণ-গীত)।

কবি-মনো-বিনোদিনি বাণি বরদে!
জ্যোৎস্না-জাল-বিকাশিনি শতদল-বাসিনি সারদে!
কজ্জল-উজ্জ্বল বিলোল-লোচনা,
উরোজ-সরোজে নীরজ রচনা,
নিবরা বরাননা শোভনা পীবর কবরী-নীরদে।
শুনাও শুনাও দেবি সে বীণা ঝঙ্কার,
যে ঝঙ্কার সেই প্রথম ওঙ্কার,
যে ঝঙ্কার অঙ্কে কাব্য অলঙ্কার,
যে ঝঙ্কারে অঙ্কুর অঙ্কের সংখ্যার,
যে ঝঙ্কারে জ্ঞান নাশে অহঙ্কার হৃদি ভাসে সুধাহ্রদে॥

যে ঝঙ্কারে কাল-ধনুকে টঙ্কার,
যে ঝঙ্কারে তাল বিজয় ডঙ্কার,
গাজে যে ঝঙ্কারে শঙ্খ হুহুঙ্কার,
যে ঝঙ্কারে পুন শান্তি আশঙ্কার,
উঠে সঙ্গীত-তরঙ্গ হাস্য-লীলা-রঙ্গ বিনোদ প্রমোদে;
কলা-শিল্প-তরু কল্প-তরু বীণা বাজাও বাজাও শুভ শুভদে॥

তাহার পর শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা একতারা বাজাইয়া নিম্নলিখিত স্বরচিত গানটী গাহিলেন :—

দেশ মল্লার—একতালা।

মা, জ্ঞানদে, বরদে, শুভদে সচ্চিদানন্দরূপিণী।
দেবী মহাবিদ্যে, পরম আরাধ্যে, আদ্যেশক্তি বাগ্বাদিনী॥

প্রতিভাদায়িনী, মধুরভাষিণী, বেদমাতা বিদ্বজ্জনপ্রসবিনী; সঙ্গীত সাহিত্য, কবিত্ব নিরুক্ত, কাব্যকলা-প্রণোদিনী।

নীরব আকাশে, তোমার নিশ্বাসে, জাগিল গম্ভীর রবে দৈববাণী; ছুটিল পবনে, ভুবনে ভুবনে, উঠিল গগনে তার প্রতিধ্বনি; রচে তাহে কত বেদবিধিমন্ত্র, কণ্ঠে কণ্ঠে বাজে শত বীণা যন্ত্র, ধায় দ্রুতগতি, যথা স্রোতস্বতী, (বিজলী যেমতি) রসনা লেখনী।

অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—

শুভাগত মহোদয়গণ,

আনন্দপরিপ্লুত চিত্তে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আজি আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে মুর্শিদাবাদবাসিগণের পক্ষ হইতে এবং আমার দীন গৃহে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইল বলিয়া নিজ পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিতেছি। মাতৃভাষার ও জাতীয় সাহিত্যের সেবা উপলক্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সুধীগণের এই শুভাগমনে মুর্শিদাবাদ ধন্য হইল, আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমি কৃতার্থ হইলাম। মুর্শিদাবাদবাসী আমাদিগের যে আজি কি গৌরব ও আনন্দের দিন, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সুকঠিন। মাতৃসেবায় কাহার না আনন্দ হয়? এই ভাবে—এই সেবার প্রথম অনুষ্ঠান মুর্শিদাবাদে হওয়ায় আমরা মুর্শিদাবাদ-বাসী যে, প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাসে উল্লসিত, এ কথা বলা বাহুল্য। শুভাগত ও সমবেত মহাপ্রাণ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ নিজের মন দিয়া আমাদিগের চিত্তভাবের পরিচয় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

এই হেমন্তকালের দূর ভ্রমণের অনেক ক্লেশ নিশ্চয়ই আপনাদিগের অনেককে ভোগ করিতে হইয়াছে এবং এই স্থানে অবস্থান কালেও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আন্তরিক যত্নের ত্রুটি না থাকিলেও কার্য্যের ত্রুটি অনেক সময়ে হয়। আমাদিগের কত যে ত্রুটি হইবে, তাহা এখন হইতে অনুমেয় নহে। আমাদিগের সকল ত্রুটি আপনারা নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন। আজি এখানে বঙ্গদেশের বিভিন্ন নগরের, বিভিন্ন গ্রামের বিবুধ-মণ্ডলের সম্মিলন। আজি সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগিগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এখানে সমবেত হইয়াছেন। আপনারা এখানে বৃথা উৎসব করিতে আসেন নাই, একটি মহাব্রত গ্রহণে আসিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি ও উন্নতি সাধন-জন্য একত্র সমবেত হইয়াছেন। মানুষের জীবনে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর লক্ষ্য বোধ হয় আর কিছু হইতে পারে না। যাহাতে দেশের হিত, জাতির হিত, সমাজের হিত, তাহার মত পুণ্য কর্ম্ম আর কি আছে? আজিকার সাহিত্য-সম্মিলনের যে আয়োজন, প্রকৃত পক্ষে তাহা ত মাতার জন্য মন্দির-প্রতিষ্ঠার আয়োজন। যদি আমরা মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদি মাতার নিত্যসেবা ও বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে শুধু আজি বলিয়া নহে, অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধরিয়া অসংখ্য ভক্ত মাতৃপদে অঞ্জলি দিবার জন্য, যাহার যাহা আছে, সাধ্যানুসারে সে তাহাই লইয়া, এই মহাপবিত্র মন্দির-দ্বারে উপনীত হইবে। এই মন্দির বুঝি বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা মহনীয় ও পবিত্র! এত বড় পুণ্যানুষ্ঠানে অসুবিধা ও ক্লেশ অপরিহার্য্য। তীর্থদর্শনে অনেক অসুবিধা ও ক্লেশ আছে, কিন্তু কোন্ তীর্থযাত্রী, কোন্ ভক্ত সেই অসুবিধা ও ক্লেশকে মনে স্থান দেয়? আপনারা লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া, ভরসা করি, সকল অসুবিধা, সকল ক্লেশ উপেক্ষা করিবেন। আমাদিগের অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটি উদার ও প্রফুল্লচিত্তে মার্জ্জনা করিবেন।

বাঙ্গলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদের শাখা স্থাপন ও প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জেলার পরিষদের বাৎসরিক মিলনোৎসব-অনুষ্ঠানের প্রস্তাব আমাদিগের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই ইচ্ছার সার্থকতার জন্য দুই স্থানে অনুষ্ঠানের উদ্যোগও হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীভগবানের অবাঙ্মনোগোচরীয় কারণে সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই। শাস্ত্রে বলে—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'। মাতৃভাষার জন্য আমাদিগের এই অনুষ্ঠান যাহাতে স্থায়ী ও সফল হয়, তজ্জন্য, আসুন, মঙ্গলময় ভগবানকে সাক্ষী করিয়া আমরা সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। সুখে, দুঃখে; সম্পদে, বিপদে; সুদিনে, দুর্দ্দিনে সকল অবস্থাতেই আমরা আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও গৌরবের জন্য আত্মোৎসৃষ্ট হইয়া থাকিব। যদি অন্তর দিয়া সেবা করি, তাহা হইলে আমরা সাফল্য লাভ করিবই করিব।

বাঙ্গালীর সকল কার্য্যই হুজুগে পরিণত হইতে দেখা যায় এবং হুজুগ বলিয়াই এদেশে কোন একটি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। কয়েক বৎসর হইল এদেশবাসীর মনে একটা নূতন

আবেগ আসিয়াছে। সেই আবেগটা হুজুগে পরিণত হয় নাই বলিয়া বাঙ্গালী যেন একটী নূতন জীবন লাভ করিয়াছে এবং তাহা হইতে বাঙ্গালী আপনাকে ভাল বাসিতে শিখিতেছে এবং সেই কারণে বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির ইচ্ছা অল্প অল্প করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে আসিতেছে। এই জন্যই বাঙ্গলা ভাষার ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে একটীর স্থানে আর একটী আসিয়া থাকে এবং একটীর বিনাশে অন্যটীর অভ্যুদয় নৈসর্গিক ধর্ম্ম। বহুকাল হইতে আমাদের বঙ্গভাষারও সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আকারের পার্থক্য বঙ্গভাষার উৎপত্তির কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখন কুম্ভকারের চাক ঘুরিতেছে—বঙ্গভাষা সেই চাকে। এই ঘুর্ণ্যমান্ অবস্থায় সাময়িক অনুষ্ঠানাদি দ্বারা কুম্ভকাররূপী উদ্যমশীল ও ভক্ত সাহিত্যসেবীদিগের যত্ন ও নিষ্ঠা অধিকতররূপে সঞ্জীবিত করিতে পারিলে ভাষা সম্পূর্ণাকার ধারণ করিতে পারে।

নিজের কাজ নিজে না করিলে কখন সফলতা-লাভ হয় না। জাগতিক এই নীতির অনুসরণ করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা নিজের কাজ নিজে করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়া সকল কার্য্যেই আমাদিগের নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, হইতেছে এবং চিরদিনই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের একটি দোষ দেখিতে পাইতেছি। আমরা সকল কার্য্যে উপদেশক হই, সকলকেই আমরা পরামর্শ দিই, কিন্তু কেহই ঐ কার্য্য নিজে অনুষ্ঠান করি না, কাহাকেও করিতে সাহায্য করি না, কিংবা করিতেও প্রস্তুত হই না। কোন একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে অনুষ্ঠাতাকে কোনরূপে উৎসাহ দান করি না, ক্রটী হইলে আমরা তাঁহার নিন্দা প্রচার করি। কোন দৈব প্রতিবন্ধকে ঐ সদনুষ্ঠানে বাধা ঘটিলে আস্ফালন করিয়া থাকি। আমাদের দেশের এই অবস্থা দূর না হইলে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও আমরা সম্পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট করিতে পারিব না। এইজন্য আমার প্রার্থনা, আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত দোষ গুলি পরিহার করিয়া নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে জাগ্রৎ করিয়া সমবেত চেষ্টায় মাতৃভাষাকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদিগের অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের নাম আমরা "সাহিত্য সম্মিলন" দিয়াছি। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য বলিলে যাহা বুঝায়, আজ বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য বলিলে তদপেক্ষা অধিক বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য বলিতে কাব্যাদি বা অলঙ্কার-শাস্ত্র বুঝায়। যাহা কিছুরই সহিত ব্যবহার হয়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাই সাহিত্য। আমরা কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজী "লিটারেচার" (Literature) শব্দের হিসাবে সাহিত্য শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।

বিদেশীয়েরা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য অল্পকালের মধ্যে বিশেষ উন্নত হইয়াছে, কিন্তু যেরূপ পুষ্টি, যেরূপ উন্নতি হইলে আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই স্পর্দ্ধার কথা হয়, তাহা হইতে আমরা এখনও বহুদূরে রহিয়াছি। সাহিত্যের অনেক পথে, অনেক বিভাগে, আমাদিগকে আরও বহুদূরে অগ্রসর হইতে হইবে, তবে "আমাদের সাহিত্য" বলিয়া আমাদের স্পর্দ্ধা করিবার অধিকার হইলেও

হইতে পারে। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অনেক দীনতা আছে; তাহা আমাদিগকে পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। আমাদের সাহিত্য পূর্ণ করিবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিঘ্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থাঘটিত; আর কতকগুলি আমাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিজনিত। যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা অতিক্রম করিবার সাধ্য আপাততঃ আমাদের নাই। যে সকল আভ্যন্তরিক বাধা আছে, তাহা ত আমরা অন্তরের সহিত ইচ্ছা করিলেই অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের আলস্য, ঔদাসীন্য, জড়তা ও বৃথা স্পর্দ্ধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, উৎসাহ, উদ্যম, আন্তরিকতা ও যতটুকু মনুষ্যত্ব আমাদের আছে, তাহা লইয়া মাতৃসেবার জন্য মাতার মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলে সম্ভবতঃ আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমাদের সাহিত্যিকগণ এখন যাহা করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় উদাসীন ভাবে। তাঁহাদিগকে ব্রতধারী করিতে হইবে। এই মহৎ ভার সাহিত্য পরিষদের গ্রহণ করা উচিত এবং ভরসা করা যাউক যে তাঁহারাই গ্রহণ করিবেন।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে অনেক অভাব আছে। অনেক কথা বলিবার সময় আমরা নিজের ভাষায় কথা খুঁজিয়া পাই না; অনেক ভাব ব্যক্ত করিবার উপযোগী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় নাই। এরূপ স্থলে পরাশ্রয় ব্যতীত আর আমাদের গত্যন্তর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিলে মর্য্যাদার হানি হয়, তাঁহাদের ত ইহাও মনে করা উচিত যে, আমরা ত অনেক ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবী নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, বিজ্ঞান অনুদিন উন্নত হইতেছে ও হইবে; যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি করিতেছেন, তাঁহাদের ভাষা হইতে কতকগুলি শব্দ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবেই। ভাষার পুষ্টির জন্য ইহা আবশ্যক। ইহাতে আমাদের লজ্জার কারণ কিছু নাই। যাহা নিজের জোরে লইতে পারি, তাহা ভিক্ষা নহে। অন্য ভাষা হইতে যাহা কিছু লইব, তাহা নিজের অধিকার বলিয়া লইব—ভিক্ষাস্বরূপ নহে। সকল ভাষাই ত ইহা করিয়াছে। এরূপ ঋণ-গ্রহণে কোন লজ্জা নাই; এরূপ না করিলে কোন ভাষারই পুষ্টি হয় না। সকল ভাষাই এইরূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে। আজ যে ইংরেজী ভাষা হইতে আমরা এখন শব্দ গ্রহণ করিতেছি, সেই ইংরেজী ভাষাও আমাদের শব্দ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে।

আর এক কথা। বিদেশীয় সাহিত্যে এমন সকল উপাদেয় গ্রন্থ আছে, যাহার অনুবাদ আমাদের ভাষায় হওয়া উচিত। আপনাকে বড় করিতে হইলে গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। আমরা কবে কি ছিলাম, সে অহঙ্কার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। পরের কাছে গ্রহণ করিতে পারিলে যে লাভ আছে, তাহার প্রমাণ আধুনিক জাপানী। জ্ঞান যেখানে পাইবে, সেইখান হইতেই গ্রহণ করিবে; আমাদের শাস্ত্রেরও সেই নির্দ্দেশ আছে। অতএব বিদেশীয় সাহিত্যের উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সকলের আমাদের ভাষায় অনুবাদ হওয়া প্রয়োজনীয়। বিদেশীয় উচ্চ সাহিত্যের অনুবাদ হইবার কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। ভরসা করা যাউক যে, সাহিত্য পরিষৎ এই ভার গ্রহণ করিবেন।

আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য আমাদের সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণে সাধনা করিতে হইবে। সিদ্ধি সাধকের, সৌখিনের নহে। কথাটা বলিতে একটু কুণ্ঠিত হইতে হইতেছে, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যসেবী সৌখিন। সাধকের সংখ্যা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু সৌভাগ্য আনয়ন করাও ত আমাদের নিজের হস্তেই রহিয়াছে। ইংরেজী ভাষায় একটা প্রবচন প্রচলিত আছে যে, নিজের কার্য্য যে নিজে করিতে চেষ্টা করে, ভগবান তাহার সহায় হইয়া থাকেন। ইহা সত্য কথা। আমরা যখন নিজের কার্য্য নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিতেছি, তখন ভগবান্ যে আমাদের সহায় হইবেন, ইহা নিশ্চয়। বৎসরে একবার আমরা সম্মিলিত হইয়া যে আমাদের উচ্চ লক্ষ্য আয়ত্ত করিতে পারিব, এরূপ মনে করা যায় না। এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার প্রধানতঃ সাহিত্য-পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং সাধারণভাবে আমাদের সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, তাহা আমাদিগের এই সম্মিলনে আলোচিত হইয়া স্থির করা হউক। আমাদের এই উদ্যম যাহাতে সফলতা লাভ করে, তৎপক্ষে আপনারা সকলেই যত্নশীল হউন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। এক্ষণে সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আপনারা কার্য্য আরম্ভ করুন।

মহারাজ বাহাদুরের বক্তৃতার সম্পূর্ণ সমর্থনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত অভ্যর্থনা সঙ্গীতটী গীত হয়ঃ—

অভ্যর্থনা-সঙ্গীত।

স্বাগত স্বাগত সমাগত সুধীগণ।
বাণী সুত-পূত পরশে সভা হরষে মগন॥
সাহিত্য-সঙ্গত-সারঙ্গ বঙ্গে,
সাধ সুধাপান সুধীজন সঙ্গে,
অঙ্গ-রস-রঙ্গ-ভঙ্গে বাসর যুগ যাপন॥
কুন্দেন্দু তুষার-বরণা-চরণে,
অন্ধ, আনন্দ-মকরন্দ হরণে,
যারে হারে ইন্দিরা নিজ মন্দিরে করিতে বন্ধন;—
বিনা আদর মধুর আর তারে কিবা করি নিবেদন॥

অনন্তর শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাদেশিক সাহিত-সম্মিলনের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া সমবেত ব্যক্তিগণের উদ্বেল আনন্দধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উদ্বোধনে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,

22264
18 FEB 1968
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY RAJA RAMMOHUNPUR

মহোদয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটী যথাস্থানে (পরিশিষ্ট ২॥/০ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর পর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ভাষা-সংস্কার" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্ট ১।১/০ পৃঃ)।

অনন্তর ক্রমান্বয়ে দ্বাদশটী প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব।—বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান দ্বারা বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের ও ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাউক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্নতত্ত্বনিধি উক্ত প্রস্তাবের উত্থাপনপূর্ব্বক "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ (পরিশিষ্ট /০ পৃঃ) পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিলেন :—

মহারাজ বাহাদুর! মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সভ্যমহোদয়গণ! আমি বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হই নাই; মদীয় প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আপনাদিগের সম্মুখে যে প্রস্তাবটীর উত্থাপন করিলেন, তাহার সমর্থন করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। সেই প্রস্তাবটী এই,—"বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান দ্বারা বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের ও ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা হউক।" প্রস্তাবটী অতি প্রয়োজনীয়, অতীব গুরুতর,—অশেষ যত্নব্যয় ও আয়াসসাধ্য। এক দিনে, এক মাসে বা এক বর্ষে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে না; দুই চারিজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বা দুই চারিশতমেয় রজতমুদ্রার বিনিয়োগে, এই প্রস্তাব কার্য্যকর হইবে না। সত্যানুসন্ধিৎসু সত্যসন্ধ শতশত ঐতিহাসিকের সমবেত ঐকান্তিক সুদীর্ঘ যত্ন ও চেষ্টা এবং অদম্য অধ্যবসায়ে,—বিপুল অর্থব্যয়ে ইহার সার্থকতা সম্ভবপর হইতে পারে;—ইহার অনভিভবনীয় বিশাল গুরুত্ব সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ থাকিতে পারে। তাহা হইলেই এই প্রস্তাব অক্ষরে অক্ষরে অন্বর্থ হইবে। নতুবা সিদ্ধি সুদূরপরাহত,—সঙ্কল্প অলীক কল্পনা জল্পনায় পর্য্যবসিত হইবে। নগেন্দ্র বাবু সুদীর্ঘ প্রবন্ধে সমালোচ্য প্রস্তাবের গুরুত্ব ও সমীচীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সুতরাং সেজন্য আমাকে কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না।

মহোদয়গণ! বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত; ভাবিয়া দেখুন, কোথায় সুদূর অতীতের কোন্ অতল নিখাতে তাহা নিহিত;—লীয়মান, ক্ষীয়মান, অনন্তধ্বংসের ভঙ্গুর স্তূপে লোপ পাইতে উন্মুখ! কিরূপে তাহার উদ্ধার হইবে? কি উপায়ে তাহার বিচ্ছিন্ন—বিভিন্ন—ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত কঙ্কালমালার যথাযথ সমাধানে পুরাতত্ত্বের জরাজীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপযুক্ত সমাবেশ হইবে! কে তাহার রক্তমাংস, পেশী মজ্জা প্রভৃতি তন্তু, কলা ও ধাতুনিবহের বিন্যাসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে!—এযে ভয়াবহ কঠোর সমস্যা! মহোদয়গণ! "বঙ্গ"—একবার ভাবিয়া দেখুন, এই নাম কোথা হইতে আসিল। বর্ত্তমান ভুলিয়া দূর—সুদূর—অতিদূরাতিদূর অতীতের বিশাল রঙ্গভূমে একবার দৃষ্টিপাত করুন। দেখুন, সেই পুরাকালের কোন্ অজ্ঞাত পূর্ব্বস্মিন্ যুগে—

নাম নাই, সংখ্যা নাই—সীমা নাই—সেই চন্দ্রবংশীয় মহারাজা বলির পঞ্চপুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র—পিতার আদেশে পাঁচটী স্বতন্ত্র রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থল ছাড়িয়া ক্রমাগত পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে নিবিড় অরণ্যানী,—অগণ্য নদী-সঙ্কুলা,—ক্বচিৎ অভ্রংলিহ বা অনুচ্চ গিরিব্রজে মণ্ডিত;—ক্বচিৎ দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর ও বীজগর্ভ রেখাঙ্কিত—অসীমাবদ্ধ ভূমিখণ্ড বা শাদ্বলসমূহে পরিব্যাপ্ত। অনেক স্থানেই দৈত্যদানব ও অযাজ্ঞিক দস্যুগণের পিনদ্ধপর্ণায়তনে সমাচ্ছন্ন। উত্তরে হিমাচলের উত্তুঙ্গ পাষাণ-প্রাচীর;—দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে তোয়নিধির মেঘমন্দ্রবৎ গভীর গর্জ্জন ও নিবিড় তাল-নারিকেল-শাল-মালিনী বেলাভূমির সফেন সিত হাস্যলীলা। পঞ্চভ্রাতা স্ব স্ব শৌর্য্য সাহায্যে সেই অতি বিশাল প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে,—নদ নদীর প্রকীর্ণ ব্যবধানে, দৈত্যদানবগণের নিধন-বিধানে পাঁচটী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই পঞ্চরাজ্যের রাজন্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন যুগের বিভিন্ন কালে বেদ-বিহিত বিধিপ্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়া সেই অযজ্ঞীয় দেশকে কিরূপে পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেন।—অমূর্ত্তরজার অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, মহাযশা রোমপাদের পবিত্র যজ্ঞভূমি ও মহাবীর কর্ণের সাধনক্ষেত্র অঙ্গদেশ, দর্পী বাসুদেবের সমাধি-মন্দির পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, মহাতেজা মহৌজা ও সমুদ্রসেনের লীলানিকেতন কৌশিকীকচ্ছ ও বঙ্গ, বীরাগ্রগণ্য ত্রিলোচনের ত্রিপুরা ও কমলাঙ্ক,ক্রমে ক্রমে কিরূপে আর্য্যসভ্যতার এক একটী বিশাল কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল;—একদিন যে দেশের সীমামধ্যে পা রাখিলে দ্বিজ মাত্রকেই প্রায়-শ্চিত্ত করিতে হইত, সেই অপবিত্র দেশ পবিত্রতার পুণ্যময় প্রথানে ত্রিলোকপাবনী ভাগীরথীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কিরূপে ত্রিজগতের পাবনধর্ম্মের স্পর্দ্ধা করিতে পারিল;—কিরূপে সেই এককালের ম্লেচ্ছনিষেবিত অযাজ্য দেশ অশেষধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণের হোমধূমে পবিত্রীকৃত হইল;—তাহা দেখিতে হইবে,—দেখাইতে হইবে। ইহাই পৌরাণিকের কার্য্য, পুরাতত্ত্বের পরম প্রশস্ত পবিত্র লক্ষণ।

তাহার পর কুরুক্ষেত্রের প্রলয় সংগ্রামে আর্য্য-বীরত্বের দিগ্দাহি তেজে ক্ষত্রিয়ের প্রচণ্ড তেজোবীর্য্য ও গৌরবগরিমা ভস্মীভূত হইলে, যেদিন আভীর, দস্যু ও নীচ শূদ্রগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল;—যেদিন আর্য্যের রাজলক্ষ্মী বন্ধকীতনয়ের অঙ্কশায়িনী হইলেন,—যেদিন রাজহত্যা ভারতে প্রায় নিত্য হইয়া পড়িল;—প্রজাবর্গের রাজভক্তিলোপে, রাজ্যশাসনের ক্রমাপকর্ষ,—যেদিন সকল প্রকার ধর্ম্ম্য ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল;—জাতিভেদের কঠোর বন্ধন আর তত দৃঢ় রহিল না, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে রহিত হইয়া আসিল;—যেদিন ভণ্ডতা, স্বার্থপরতা, বিপ্লবপ্রিয়তা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল,—সেই দারুণ দুর্দ্দিনে সমগ্র ভারতের সহিত পঞ্চ গৌড়ের কি পরিবর্ত্তন হইল; তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে—দেখাইতে হইবে। সেই সময়ে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম আর্য্যহিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে সঙ্করত্বের বীজ বপন করিলে যখন শুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্রবংশীয় রাজগণের সিংহাসনসমূহে গুপ্ত, পাল, শূর ও সেনবংশের নৃপতিগণ আসীন

হইয়া দৃঢ়হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন;—যখন পাটলীপুত্র ও ওদন্তপুরী, গৌড় বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কিরণসুবর্ণ, বীরভূমি ও তাম্রলিপ্ত, কমলাঙ্ক ও কামরূপ প্রভৃতি নূতন বা পুরাতন রাজ্যের অভ্যুদয়ে বা পুনঃ সংস্কারে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মমতের অনুলোম ও বিলোম সংযোগ ও বিয়োগে নূতন নূতন ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইল, তখন বঙ্গীয় রাজনীতি ও সমাজনীতির কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, বাঙ্গালীর জাতীয়জীবন কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়াছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা দেখিতে হইবে—দেখাইতে হইবে। তাহার পর মুসলমানের আগমনে সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত বঙ্গদেশে ও হিন্দুর সমাজশরীরে কোন্ কোন্ দুর্জ্জয় বিষব্রণের উদ্ভব হইল,—আকবরের কঠোর করস্পর্শে বাঙ্গালী স্বাধীনতা হারাইয়া কিরূপে অষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইল;—ক্রমে যখন সপ্তসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে কতিপয় শ্বেতাঙ্গ আসিয়া বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যাপারে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য শক্তির সংঘর্ষ অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক পরিপন্থিদিগকে কিরূপে দগ্ধ করিয়া ফেলিল, তাহা দেখিতে হইবে—দেখাইতে হইবে। সেই ইংরাজ আজি ভারতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর।

মহোদয়গণ! এই সমস্ত সুবিশাল ঘটনাপরম্পরার প্রতীপ স্রোতে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত,—বিপর্য্যস্ত হইয়া আজি বঙ্গ নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অদম্য অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম, অকম্পিত সহিষ্ণুতা ও প্রগাঢ় গবেষণা সহযোগে বঙ্গের—শুধু বঙ্গ কেন!—ভারতের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া, নানা ভাষার মন্থন করিয়া, উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে বাঙ্গলার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস রচিত হইবে। আমি আবার বলি,—এক দিনে, এক মাসে বা এক বর্ষে এই পুরাবৃত্ত বা ইতিহাস রচিত হইবে না। দুই চারিজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বা দুই চারিশতমেয় রজতমুদ্রার ব্যয়ে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে না। সত্যানুসন্ধিৎসু সত্যসন্ধ শত শত ঐতিহাসিকের সমবেত ও ঐকান্তিক সুদীর্ঘ চেষ্টা, যত্ন ও অদম্য অধ্যবসায়, বিপুল অর্থব্যয়ে ইহার সার্থকতা সম্ভবপর হইতে পারে। সেদিন কবে আসিবে?—সেদিন বঙ্গের ধনকুবেরগণ ও প্রতিভা একত্র মিলিত হইয়া এই মহাব্রতের উদ্‌যাপনে ধনসম্পত্তি ও প্রাণ মন উৎসর্গ করিবেন; সেদিন কবে আসিবে? যেদিন ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে,—পরিত্যক্ত, বিসর্জ্জিত, ধ্বস্তবিধ্বস্ত পুরপ্রাচীর ও ভগ্নাবশেষরাশির অভ্যন্তরে শত শত থুসিদাইদিস্, জিনোফন, ও গিবন, ষ্টানলি ও লিভিংষ্টোন্ অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিবেন? তবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠিত হইবে;—বাঙ্গলার একখানি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস রচিত হইবে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রত্নতত্ত্বনিধি মহাশয় (কলিকাতা) দ্বিতীয় প্রস্তাবের উত্থাপন করিলেন। প্রস্তাব—বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার, রক্ষণ ও প্রচার-উদ্দেশ্যে মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ ও লৌকিক সাহিত্য সংগ্রহ করা হউক।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় (কলিকাতা) সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথায়, সরস ও মধুর বাক্যে ওজস্বিনী ভাষায় তাহার সমর্থন করিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু (রঙ্গপুর) তাহার দৃঢ়তর সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিলেন :—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মহারাজ বাহাদুর ও সমবেত সুধীমণ্ডলী! আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহাশয়দ্বয় আলোচ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে যে যে বক্তৃতা করিলেন, ইহার পর তেমন কিছু বলিবার নাই; আর আমার সেরূপ ক্ষমতাও নাই। তবে রঙ্গপুরে সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভা-স্থাপনাবধি এই অল্প সময়ে আমরা উত্তর বঙ্গের যে সকল কবির মূল্যবান্ গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, প্রস্তাবের পোষকতা স্বরূপ সেই সকল কবি ও গ্রন্থের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে কয়েকটী কথা মাত্র বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

উত্তর বঙ্গের কবি ও কাব্যের নাম :—

রঙ্গপুরের কবি কমললোচনের—"চণ্ডিকা বিজয়", কবি কৃষ্ণজীবনের—"অভয়ামঙ্গল", কবি হায়াত মামুদের—"জঙ্গনামা", কবি আসক মামুদের—"একদিনগার পুঁথি"। দিনাজপুরের কবি জগজ্জীবনের—"মনসামঙ্গল", কবি দ্বিজ জগন্নাথের—"দিনাজপুরের কবিতা"। কুচবিহারের কবি গোবিন্দ মিশ্রের—"(পঞ্চটীকা সমন্বিতা) গীতা", কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের "মহাভারত—'আদিপর্ব্ব', 'বিরাটপর্ব্ব' ও 'ভীষ্মপর্ব্ব', রাজকবি পিতাম্বরের—"সমগ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণ" ও "দশমস্কন্ধ ভাগবত পুরাণ"। পাবনার কবি রামপ্রসাদের—"নাটোরের কবিতা"। উত্তর বঙ্গের কবি বিশারদের—"বিরাটপর্ব্ব", কবি বাসুদেবের—"স্বর্গারোহণ পর্ব্ব", অজ্ঞাতনামা কবির—"বনপর্ব্ব"। বগুড়ার কবি জীবন মৈত্রের—"বিষহরি পদ্মপুরাণ" ও "ঊষাহরণ", কবি কবিবল্লভের—"রসকদম্ব", কবি অদ্ভুতাচার্য্যের—"রামায়ণ", কবি দ্বিজ গৌরীকান্তের—"মহাস্থানের কবিতা", কবি দুর্গতিয়া সরকারের—"ইমাম যাত্রার পুঁথি", কবি লালচাঁদের—"পদাবলী ও সঙ্গীত" এবং কবি খোসালচন্দ্রের—"পদাবলী ও সঙ্গীত"।

শেষোক্ত কবিদ্বয় যথাক্রমে মদীয় জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ প্রপিতামহ ও প্রপিতামহ।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে গোবিন্দ মিশ্রের গীতা, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের মহাভারত, কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয়, কৃষ্ণজীবনের অভয়ামঙ্গল, জীবন মৈত্রের বিষহরি পদ্মপুরাণ, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ এবং মুসলমান কবি হায়াত মামুদের জঙ্গনামা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ গোবিন্দ মিশ্র—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, আনন্দগিরির গীতাভাষ্য বিবেচন টীকা, হনুমানের পৈশাচ ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর সুবোধিনী টীকা ও রামানুজের শ্রীভাষ্য এই পাঁচটী ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া গীতার অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক আলোচনা দ্বারা যে অর্থ ভাল বুঝিয়াছিলেন, তাহাই পদবন্ধে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে! এ পর্য্যন্ত যতগুলি গীতা সম্পাদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই গীতাখানিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কোন আপত্তির কারণ দেখা যায় না।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ উত্তর বঙ্গীয় ভাষায় সমগ্র মহাভারত এবং অদ্ভুতাচার্য্য সমগ্র রামায়ণ অনুবাদ করিয়া উত্তর বঙ্গবাসীদিগের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডিকাবিজয় ও অভয়া-মঙ্গলে যথেষ্ট কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন মৈত্রের বিষহরি পদ্মপুরাণে বগুড়া জেলায় অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিষয় এবং কবির সময়ে বগুড়ায় বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান কবি হায়াত মামুদের জঙ্গনামা কবিত্বপূর্ণ একখানি মুসলমানী কেতাব। ইহা ব্যতীত উত্তর বঙ্গবাসী অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত অনেক পুরাণ ও আগম নিগমের অনুবাদ, বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক অনেক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। রঙ্গপুরে সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপনের পূর্ব্বে এ সকল কোন একটী কবির বিষয় কেহই জানিতেন না।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উত্তরবঙ্গবাসীদিগকে অজ্ঞ বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল, এই সকল পুঁথির আবিষ্কার দ্বারা সে কলঙ্ককালিমা অপসারিত হইবার সুযোগ হইয়াছে। এই পুঁথিগুলির সাহায্যে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেছি ও দেশেরও অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। তাই আমার বিশ্বাস এইরূপ প্রত্যেক জেলায় সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপন দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে।

অতএব "বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের উদ্ধার, রক্ষণ ও প্রচার উদ্দেশ্যে মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ ও লৌকিক সাহিত্য সংগ্রহ করা হউক।" এই সৎ প্রস্তাবটী আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয় (কলিকাতা) কিরূপে বিনা ব্যয়ে ও সহজে প্রত্যেক ব্যক্তিই মনে করিলে এবং চেষ্টা করিলে পুথি সংগ্রহ করিতে পারেন এবং মুসলমান হইয়াও চট্টগ্রামের মুন্সি আব্দুল করিম কিরূপে শত বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও কতশত পুঁথির উদ্ধার করিয়াছেন, সরল ও সারগর্ভ বাক্যে তাহা বিবৃত করিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাবের পুনঃসমর্থন করেন। পরক্ষণেই প্রথম দিনের সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় দিন।

১৮ই কার্ত্তিক, সোমবার, দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকা পর্য্যন্ত।

সভারম্ভ হইবামাত্র বঙ্গের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়* (কলিকাতা) নিম্নলিখিত দুইটী বাণীস্তুতি গান করিলেন :—

বাণীস্তুতি।

ভীমপলশ্রী—যৎ।

যা কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা,
যা শ্বেতপদ্মাসনা।

* বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সং

যা বীণাবর-দণ্ডমণ্ডিত-ভুজা,
যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা ॥
ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃসদা বন্দিতা,
সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

এ ভারতভূমে, সাহিত্যের ভালে, সুখের সে দিন আসিবে কি আর ?
বিদ্যার আদর, গুণের সম্মান, অতীতের মত হবে না কি আর ?
নাহি থাকে যেথা মানীর সম্মান, নাহি গায় যেথা গুণী-গুণ-গান,
উন্নতির আশা, ভবিষ্য-ভরসা, থাকে কি সেথায় কখন কাহার ?
কি ছিল ভারত, কিবা হ'ল আজ, সাহিত্য-সেবীর শিরে পড়ে বাজ,
রক্ষ, ধনবান্! হ'য়ে আগুয়ান, হৃদয়ে হউক দয়ার সঞ্চার :—২
ধনী হ'য়ে সবে রক্ষা না করিলে, কি ফল সে জলে শস্তে না পড়িলে ?
সাহিত্যের মান তুমি না রাখিলে, বিদেশীর দ্বারে কিবা আশা তার ? ৩
ভারতমাতার হ'য়ে সুসন্তান, বিভুর কৃপায় হ'য়ে ধনবান,
সাহিত্যের রাখ সমুচিত মান, মিনতি মোদের চরণে তোমার :—৪
সাহিত্য-সেবীরা, দুঃস্থ যে সকল, অনশনে তারা হারাতেছে বল,
ভারতমাতার আমরা সম্বল, এস সবে মিলি হই একাকার ॥ ৫

অনন্তর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ (কলিকাতা) তৃতীয় প্রস্তাবের উত্থাপন পূর্ব্বক "বাঙ্গলাভাষা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন (পরিশিষ্ট পৃষ্ঠা ৩।/০)

৩য় প্রস্তাব। বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি ও গঠনপ্রণালী নিরূপণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের চলিত ভাষার শব্দ ও তাহার প্রয়োগ-রীতি সংগ্রহ করা হউক এবং তাহার সাহায্যে বাঙ্গলাভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলিত হউক।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (কলিকাতা) এই প্রস্তাবের সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিলেন :—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, মহারাজ বাহাদুর এবং উপস্থিত সভ্যমহোদয়গণ! পূর্ব্ব-বক্তা শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয় যে প্রস্তাব করিলেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে উহার সমর্থন করি। কিন্তু তিনি অভিধান-প্রণয়ন সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন, উহার প্রত্যেক কথায় আমার সহানুভূতি নাই। সময় অল্প, পাঁচ মিনিট মাত্র। এরূপ মহতী সভায় নিয়মের অতিরিক্ত সময় গ্রহণ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে; অতএব বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও অভিধান-সংক্রান্ত বহুবক্তব্য সত্ত্বেও আমি সংক্ষেপে (পাঁচ মিনিটের মধ্যেই) আমার কথা শেষ করিব।

প্রথম, ব্যাকরণের কথা ;—এ সম্বন্ধে আমার মত এই—বাঙ্গালা ব্যাকরণ যথাসম্ভব সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী অবলম্বন করিয়া রচনা করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালীর অত্যন্ত বিরোধী এবং সংস্কৃতের নাম শুনিলেই তাঁহারা ভয়ে সড়সড় হন। বাস্তবিক পক্ষে ভয়ের কোনই কারণ নাই। আমরা সংস্কৃতের অনুরাগী হইলেও তেমন ভয়ঙ্কর ব্যাকরণের পক্ষপাতী নহি। সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অতিসরল এবং সহজবোধ্য ব্যাকরণ রচনা করা হউক, ইহাই আমার বক্তব্য।

আজ কাল প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলির উপর দোষারোপ করা একটা "ফ্যাশান্" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনিই বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে যান, তিনিই প্রচলিত ব্যাকরণগুলির ভীষণত্ব প্রদর্শন করিয়া সাধারণের মনে বিরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করেন। কেহ কেহ আবার বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার সাহচর্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু ঐরূপ পৃথক্ করা সম্ভব কি না, তাহা তাঁহারা একেবারেই চিন্তা করেন না। আমার বিশ্বাস, শুধু গ্রাম্যশব্দ (খাঁটি বাঙ্গালা) আর বৈদেশিক ভাষা (আরবী, পার্শী, ডেনিস্, পোর্ত্তুগিজ, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী প্রভৃতি) হইতে সমাগত শব্দের সাহায্যে কোন চিন্তাপূর্ণ সদ্গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে ঈকার ঊকার প্রভৃতি স্বরবর্ণ ও ণ য ষ স প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণ বিলুপ্ত করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক ; কিন্তু যে ভাষা সংস্কৃত শব্দের সাহায্য ব্যতীত একপদও অগ্রসর হইতে অক্ষম, তাহার বর্ণমালা হইতে বর্ণবিশেষ পরিহার করা যে কিরূপ ভীষণ প্রস্তাব, তাহা সকলেই একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

কেহ কেহ আবার মাণিকপীরের গানের উদাহরণ দেখাইয়া বলেন ;—"বাঙ্গালায় সন্ধি ও সমাস নাই"। কিন্তু অশিক্ষিত গ্রাম্য কবির রচিত মাণিকপীরের গানই যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ হইত, তাহা হইলে আমরা ঐ কথা মানিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু উক্ত গান ব্যতীত কৃতবিদ্য প্রাচীন গ্রন্থকারগণের লিখিত সন্ধিসমাসযুক্ত শত শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়া মনে করিব—বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধি ও সমাস নাই? দেবালয়, নরেন্দ্র, চন্দ্রোদয়, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি সন্ধিযুক্ত এবং রামলক্ষ্মণ, ভীমার্জ্জুন, শ্বেতপদ্ম, বৃক্ষশাখা, ত্রিভুবন, প্রতিদিন, পীতাম্বর প্রভৃতির ন্যায় সমাসযুক্ত পদ সকল পরিত্যাগ করিয়া কে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন? বিশুদ্ধ ভাষা ব্যতীত খাঁটী গ্রাম্যভাষায়ও সমাসের অভাব নাই। দোচখো, তেমাথা, রোখারুখি, চুলোচুলি, রাঙা পা, কুলি-অফিষ, জজসাহেব, খড়োঘর, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি পদ কি সংস্কৃতসমাসের অনুকরণজাত নহে?

কোন কোন মহানুভব মেছুনী, জেলেনী, ধোবানী, কলুনী, বাম্‌নী প্রভৃতি পদ হ্রস্ব ইকারান্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু মেছো মেছোনী, জেলে জেলেনী, ধোবা ধোবানী, কলু কলুনী, বামন বাম্‌নী ইত্যাদি পদ ও যে সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়ের অনুকরণসম্ভূত, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যাওয়া, খাওয়া, দেখা, শুনা, বাঁচা, মরা, গুরু-

গিরি, দারোগ্‌গিরি, বাবুগিরি প্রভৃতি পদও সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ও তদ্ধিতপ্রত্যয়ের অনুকরণ প্রসূত।

কেহ কেহ উচ্চারণ-অনুসারে বাঙ্গালা শব্দের বর্ণবিন্যাস করিতে চাহেন; কিন্তু উহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এ বিষয়ে চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু চেষ্টাকারীরা কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বর্ণবিন্যাসের ব্যতিক্রম করিলে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ইতিহাস বিনষ্ট হইয়া যায়। আজ কাল মুখে যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর বিরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহাদেরই লেখনী, সংস্কৃত ব্যাকরণের ও সংস্কৃত পদসমূহের উপাসনায় অধিক অগ্রসর। ইহা দ্বারা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, সংস্কৃতোন্মুখী বাঙ্গালা ভাষার গতিরোধ করা কাহারই শক্তিসাধ্য নহে। সমুদ্রগামিনী ভাগীরথীর গতিরোধ করা বরং সম্ভব, তথাপি সংস্কৃতোন্মুখী বাঙ্গালা ভাষার গতিরোধ সম্ভব নহে।

ভারতবর্ষের সমস্ত উপভাষার ব্যাকরণই যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে রচিত, তখন বাঙ্গলাভাষার বৈয়াকরণগণের সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রণালী অনুসরণ করায় লজ্জার কারণ কি? বররুচিকৃত প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ "প্রাকৃতপ্রকাশ," কাত্যায়নকৃত পালিব্যাকরণ, এবং আধুনিক হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী, কাণাড়ী প্রভৃতি সকল ভাষার ব্যাকরণই সংস্কৃতের ছায়া অবলম্বনে রচিত। অতএব আমি নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করি—ভাবী বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণও যেন সংস্কৃত ব্যাকরণের ছায়া হইতে বিচ্যুত না হয়।

পূর্ব্ববক্তা অভিধান সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু বলিব না। তবে সংপ্রতি বাঙ্গালাভাষার যে অভিধান-রচনার প্রস্তাব হইয়াছে, উক্ত অভিধান শুধু খাঁটি গ্রাম্য শব্দের অভিধান হইলে চলিবে না। বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার-যোগ্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শব্দের সমাবেশ উহাতে প্রার্থনীয়। কারণ, শব্দই ভাষার সম্পদ্, যে ভাষায় সর্ব্ববিধ মনের ভাবপ্রকাশক যত অধিক শব্দ থাকে, সেই ভাষাই সমধিক ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া সমাদৃত হয়। এজন্য প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক শব্দসমূহ সঙ্কলন করা আবশ্যক। লীলাবতী, বীজগণিত, রেখাগণিত, ত্রিকোণমিতি, সিদ্ধান্তশিরোমণি, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থসমূহে অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতভাষার ভাণ্ডারে দার্শনিক শব্দ অনন্ত। মূল দার্শনিক সূত্রগ্রন্থ ব্যতীত শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকগণের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ হইতেও অসংখ্য শব্দ সঙ্কলন করা যাইতে পারে। এই সকল শব্দসংগ্রহ সমাপ্ত হইলে প্রয়োজনানুযায়ী শব্দের সৃষ্টি (প্রস্তুত করা) আবশ্যক। এ সম্বন্ধে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।*

---

* "ইহা আমার অভিমতমাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা লেখকসম্প্রদায়ের কথার প্রতিবাদ নহে।"

"বিনীত বক্তা।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় (শান্তিপুর) উক্ত প্রস্তাবের দৃঢ়তর সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

১ম। বঙ্গীয় বর্ণমালার কোন অক্ষরই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। উচ্চারণ সাদৃশ্যে অক্ষর দ্বারা ধ্বনির প্রতিরূপ সকল অক্ষর না হইলেও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বর্ণমালা অপেক্ষা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সুসঙ্গত ও উচ্চারণের অনুরূপ তবে উচ্চারণ সাদৃশ্যে কোন অক্ষরের অবয়ব-ব্যত্যয় করিয়া অর্থাৎ রূপান্তর করিয়া উচ্চারণ সৌকর্য্য সমাধা করা যায়। উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়াদির অনুসৃত পদ্ধতি।

২য়। বাঙ্গলাভাষার সন্ধি অনিবার্য্য। উহা সংস্কৃত অনুসারেই হইবে। যথা—কুশাসন, মণীন্দ্র, গণেশ, মহেশ, সূর্য্যোদয়, মহর্ষি, অর্দ্ধেক, মহৌষধ, পিত্রালয়, শয়ন, উচ্চারণ, জগদীশ, যাজ্ঞা, জগন্নাথ, উন্নত, বিচ্ছেদ, সন্ন্যাস, অধোগতি, সদ্যোজাত, দুষ্প্রাপ্য, নিরামিষ, দুর্জ্জয়, অতএব, নীরস ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩য়। (লিঙ্গ) পিতা, ভ্রাতা, কর্ত্তা, বিধাতা, মাতা, দুহিতা বা ভগিনী ইত্যাদি শব্দের বাঙ্গলায় বাবা, ভাই, কর্ত্তা, বিধাতা, মা, দুহিতা, ভাগনীর জায়গায় প্রাকৃত বহিনী, তাহার অপভ্রংশে বোইন বা বোন বা বুন হইয়াছে। বৃদ্ধ সংস্কৃত, বুড্‌ঢ় প্রাকৃত বুঢ়া। ইহার স্ত্রীলিঙ্গে বৃদ্ধা, বুড্‌ঢ়ী, বুঢ়ী। এখানে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুসরণ করিতে হইল।

৪র্থ। সর্ব্বনাম, পুরুষ, বিভক্তি ও বচন। যথা—আমি, তুমি, তিনি, আমরা, তোমরা, তাহারা, উনি, যিনি, সে, কে, এক, দুই, তিন, চারি ইত্যাদি সংখ্যাবাচক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পূরণবাচক শব্দ ইত্যাদি স্থল দেখুন। সর্ব্বনাম, বিভক্তি ও বচনের প্রয়োজন হইবে। উহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন যথা—অস্মদ্ হইতে আমি, যুষ্মদের ত্বং হইতে তুমি। তদ্ শব্দ হইতে তিনি ইত্যাদি।

৫ম। কারকেরও প্রয়োজন যথা—আমাকে, তোমাকে, তাঁহাকে, আমি, তুমি, তিনি, আমার, তোমার, তাঁহার, আমার দ্বারা, তোমা দ্বারা, তাহা দ্বারা, আমা হইতে, তোমা হইতে, তাহা হইতে। আমায়, তোমায় এই সমস্ত পদের সঙ্গে ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিলেই কারক আবশ্যক হইবে।

৬ষ্ঠ। ক্রিয়ার ব্যবহারে কালনির্দ্দেশ আবশ্যক, সুতরাং বর্ত্তমান কালে হইয়াছি, হইতেছি ইহা সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় অস্ ধাতুর রূপান্তর। হইলাম, হইয়াছি প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। হইব, করিব, যাইব, ভবিষ্যৎ ত্যবের ইব। সুতরাং বাচ্যও নিরূপণ করিতে হইবে। যথা—তিনি মৃত কর্ত্তৃবাচ্য। রাবণ রাম কর্ত্তৃক নিহত ইহা কর্ম্মবাচ্য। তাহাকে সুশ্রী দেখাইতেছে; ইহা কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। আমার জাগাই প্রধান কাজ এখানে জাগা ভাববাচ্য।

৭ম। বাঙ্গলায় সমাস অনিবার্য্য তাহা সংস্কৃত হইতে হইবে। যথা—আমরা পদের ভিতরে তুমি, তোমরা, তিনি, তাঁহারা, আমি, আমরা এই সমুদয় পদের অর্থবোধ হইতেছে।

আমরা এই পদটী মাত্র আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের লোপ হইয়াছে। সুতরাং একশেষ দ্বন্দ্ব। হস্তপদ, কায়মনোবাক্য ইতরেতর সমাস। কীটপতঙ্গপক্ষী। গুল্মলতাগুচ্ছশৈবাল সমাহার দ্বন্দ্ব। কূপজল, গঙ্গাজল, বৃষ্টিজল, গোদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, দুঃখশান্তি, মৃত্যুভয়, তৎপুরুষ। অলক্ষণ, অসুখ, নঞ্ তৎপুরুষ। চিত্তচকোর, ঘনশ্যাম, কর্ম্মধারয় সমাস। ত্রিভুবন, পঞ্চবটী দ্বিগুসমাস। বিরূপাক্ষ, শূলপাণি, পীতাম্বর, নীলাম্বর, সস্ত্রীক বহুব্রীহি সমাস। উপকূল, অনুরূপ, প্রত্যক্ষ, অগোচর, অব্যয়ীভাব। সুতরাং এই সমস্ত প্রয়োগ দেখিয়া সমাস প্রকরণে সংস্কৃতের সহায়তা লইতে হইবে।

৮ম। কৃৎ প্রত্যয় কৃদন্ত পদ সংস্কৃত পদেরই অনুরূপ হইবে। যথা নায়ক, কথক, গণক (অক), ভাবী (ইন), হন (ত) হত, গম (তি) গতি ইত্যাদি। সুতরাং কৃৎপ্রত্যয় সংস্কৃতের অনুসারেই হইল।

৯ম। শেষ কথা তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ। উহা প্রত্যেক স্থলেই অনিবার্য্যরূপে বাঙ্গালায় প্রযুক্ত হইতেছে। যথা—পিতামহ, মাতামহ, বৈষ্ণব, শৈব, পৈতৃক, দাশরথি, দয়ালু, জ্ঞানী, বৈদিক, বশিষ্ঠ, মাতুল, পুরাতন, লঘুতা, গুরুত্ব, পাশ্চাত্য, অন্যথা, সর্ব্বদা, পিতৃব্য, মৃণ্ময়, ক্রমশ ইত্যাদি তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদগুলি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল শব্দের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে বাঙ্গলা ভাষার ঠাকুরদাদা বা ঠাকুরবাবা, আজামহাশয় বা দাদামহাশয়, দশরথের ব্যাটা, বিষ্ণুর চেলা, শিবের চেলা, বাবার জিনিস, দয়াল, চালাক, বেদজানা, জোয়ান, মামা, পুরোণো, হালকা, ভারি, পশ্চিমে, আর এক রকম, সব সময়ে, খুড়ো বা কাকা বা জেঠা, মেটে; আস্তে আস্তে ইত্যাদিরূপে প্রয়োগে ভাষার অবনতি ভিন্ন উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমার যতদূর বুদ্ধি এবং বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় যে সমস্ত পদ্যগদ্য কাব্যে ও ব্যাবহারিক প্রয়োগে যাহা দেখিতে পাই, তৎসমস্তেরই মূল সংস্কৃত বা প্রাকৃত।

অদ্য এই সভায় সভ্য মহোদয়গণ এবং মহারাজাধিরাজের অনুমোদনে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমি বাঙ্গলা ব্যাকরণ-গঠনের প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। বাঙ্গলা ব্যাকরণ-রচনায় নির্ম্মূল পদ্ধতির অনুসরণ করা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। যাহার মূল নাই তাহা কখন স্থায়ী হয় না। কোন বিষয় সমূল করিতে হইলে অগ্রে তাহার প্রকৃতি ও উৎস নির্ম্মাণ কোথা হইতে হইল, ইহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে। সুতরাং মহোদয়গণ আমার অল্প সময় মধ্যে অল্প কথায় ব্যাকরণ-প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ সঙ্ক্ষেপেই বলিলাম। আপনারা আমার এই বাক্যগুলিকে বাঙ্গলা ব্যাকরণরূপ উচ্চপ্রাসাদ-নির্ম্মাণের ভিত্তির সূত্রপাত মনে করিয়া আমার বাক্যের দোষ অথবা ব্যাকরণ পদ্ধতি রচনার আবশ্যক বিষয়ের স্খলন জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। অধিক বলা পিষ্টপেষণ মাত্র।

অনন্তর শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় (কলিকাতা), তৃতীয় প্রস্তাবের পুনঃসমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

সভাপতি মহাশয়, মহারাজ (?) বাহাদুর ও সভ্যমহোদয়গণ,

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা (পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়) একটা অদ্ভুত কথা বলিলেন যে, 'যদিও আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি নাই, তথাপি আমি যখন এই প্রস্তাব সমর্থন করিবার জন্ম অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তখন ইহা সমর্থন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।' প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রথম বক্তা শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ও কল্য শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভাষা-সংস্কার' সম্বন্ধে পঠিত প্রবন্ধে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহার মতের মিল নাই, ইহাই বোধ করি তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল। (এই স্থলে শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া এই কথাই বলিলেন)। আমি দেখিতেছি বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতানুগ কি না, ইহা লইয়া একটা বিতণ্ডা উঠিয়াছে, অথচ এই প্রসঙ্গে ওরূপ প্রশ্ন উঠা নিতান্তই যেন 'রাম না হইতে রামায়ণ।' বাঙ্গলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি কি রূপ, তাহাই নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে চলিত ভাষার শব্দ ও প্রয়োগ রীতির তালিকা প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব। এই সকল তালিকা প্রস্তুত হইলে তখন বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান লিখিবার সময় আসিবে, এবং তখন বুঝা যাইবে বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতানুগ কি না। এখন এ সম্বন্ধে এক তরফা ডিক্রী দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

যে কয়েকখানি বাঙ্গলা ব্যাকরণ আছে, সে গুলিতে চলিত ভাষার অনেক শব্দের ও প্রয়োগ-প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায় না। সে গুলি সংস্কৃতমূলক নহে অথচ সে গুলি ভাষায় বিলক্ষণ প্রচলিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে যাঁহারা বাঙ্গলা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাঁহারা সে গুলিকে আমল দেন না, প্রচলিত অভিধানে সে গুলি পাওয়া যায় না; সে গুলির ঠিক ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা। সেই গুলির সংগ্রহ করা এই প্রস্তাবের লক্ষ্য। ইহাতে মতান্তরের কোনও কারণ দেখি না।

বাঙ্গলাভাষার প্রয়োগপ্রণালী যে ঠিক সংস্কৃতভাষার মত নহে, বেশী উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইতে চাহি না। এই দেখুন, বক্তৃতার আরম্ভেই 'মহারাজ বাহাদুর' বলিব কি 'মহারাজা বাহাদুর' বলিব ইহা লইয়া সমস্যায় পড়িয়াছিলাম, শেষে এমন ভাবে কথাটা উচ্চারণ করিলাম যে কেহ স্পষ্ট বুঝিতে না পারে 'মহারাজ' বলিলাম কি 'মহারাজা' বলিলাম। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে 'মহারাজ' হইবে; কিন্তু বাঙ্গলায় 'রাজা মহারাজা' এইরূপ প্রয়োগ চলিত আছে। যাহাহউক, বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃতানুগ হইবে কি না তাহার জন্য এখন হইতে উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। আগে শব্দসংগ্রহ হউক, পরে বুঝা যাইবে ভাষার গতি ও প্রকৃতি কিরূপ?

এক পক্ষে অনেকে বলেন বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃতভাষার নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা ব্যাকরণ তিন পাতায় শেষ হইবে, এবং তিনি ইহার জন্য ভবিষ্যৎকালের ছাত্রদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃতানুগ হইবে কি না সে বিচারে

আমি প্রবৃত্ত হইতেছি না। বৎসর দুই পূর্ব্বে ইহা লইয়া কলিকাতায় খুব একটা বাদপ্রতিবাদ হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয়ের অন্ততঃ কথাটা বিলক্ষণ স্মরণ আছে। এখন আবার সেই কথার পুনরুত্থাপন করিতে চাহি না।

অনন্তর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ, মহাশয় (কলিকাতা) চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। প্রস্তাবটী—বাঙ্গালার ভৌগলিক তত্ত্বসংগ্রহের ব্যবস্থা হউক। শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় এম, এ, মহাশয় (বহরমপুর) সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

আমরা যত কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করিতেছি, তাহার সকল গুলিরই লক্ষ্য আমাদের নিজেদের পরিচয় সুন্দররূপে এবং যথার্থরূপে লাভ করা। এইরূপ লক্ষ্যসাধন পক্ষে আমাদের ভৌগলিকতত্ত্ব সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং নিতান্ত উপযোগী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ভৌগলিকতত্ত্ব সংগ্রহকর্ত্তারা নিম্নলিখিত বিভাগক্রমে ভূগোলতত্ত্বের আলোচনা করেন। যথা—

১ম। গণিত সংক্রান্ত ভূগোল Mathematical Geography।
২য়। প্রাকৃতিক তত্ত্বসংক্রান্ত ভূগোল Physical Geography।
৩য়। বাণিজ্যসংক্রান্ত ভূগোল Commercial Geography।
৪র্থ। সাম্রাজ্যসংক্রান্ত ভূগোল Political Geography।

আমাদের দেশের ভূগোলতত্ত্ব সংগ্রহ করিবার সময়, আমরা ঐরূপ বিভাগের অনুসরণ করিতে পারি। অবশ্য সমগ্র পৃথিবী সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব যে ভাবে আলোচিত হইতে পারে, বাঙ্গালা দেশের ন্যায় অল্পপরিমিত ভূখণ্ড সম্বন্ধে সেই সকল তত্ত্ব সেই ভাবে আলোচিত হইতে পারে না সত্য, কিন্তু আমরা মূল সূত্র ঠিক রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারি।

ভূগোলের গণিত বিভাগে আমরা সমস্ত বাঙ্গালা দেশের প্রতিখণ্ডের অথবা জেলার কিংবা নগরীর বা গ্রাম সমূহের দূরত্ব, এবং সংস্থান নির্ণয় করিয়া তাহাদের মানচিত্র সমূহের প্রকাশ করিতে পারি। আমাদের মাতৃভূমির যাহা কিছু গৌরবের বিষয় তাহার স্থিতিস্থান নির্ণয় করিয়া, মাতৃভূমির চিত্র প্রকাশ করিতে পারিলে, আমাদের মাতৃভক্ত দেশবাসীর নিকট সেই চিত্রসমূহ যে বড় আদরের জিনিষ হইবে, তাহাতে বোধ করি কোন সন্দেহ নাই। এই সকল মানচিত্রে বাঙ্গালা দেশের বৃহৎ বৃহৎ নদীগুলির সংস্থান, গতিপথ, গভীরতা প্রভৃতির নির্দ্দেশ করিলে—বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালার পরিচয় অধিকতর পরিচ্ছন্ন হইবে। সেইভাবে পাহাড় পর্ব্বতের সংস্থান ও উচ্চতা নির্ণয় করিলে, অথবা সমতল ভূভাগের উচ্চনীচতা নির্ণয় করিলে, কিংবা দেশের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পুরাতন নূতন পথগুলির বিস্তৃতি ও সংস্থান নির্দ্দেশ করিলে—অথবা বাঙ্গলাদেশের তীর্থস্থান—পুণ্যস্থান এবং মহাপুরুষের জন্মস্থানাদির নির্দ্দেশ করিতে পারিলে বাঙ্গালীর মনে দেশের প্রতি মমতা উদয়ের, অথবা জাতীয় আত্মগৌরবের পুষ্টিসাধনের অবলম্বন হইবে, সে বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে যে

আমাদের মধ্যে অনেকটা আত্মনির্ভর আবশ্যক হইবে, তাহাও নিশ্চয়। তবে দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় বিশেষ কিছুই অসম্ভব নয় মনে করিয়া এ সকল কথার উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম।

ভূগোলের গণিতাংশের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক তত্ত্বসম্বলিত বাঙ্গলার ভৌগলিক বিবরণ আরও অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই প্রাকৃতিক ভূগোল-বিবরণের মধ্যে বাঙ্গালার কোন প্রদেশে বাঙ্গালী সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে, কোন্‌টির কোথায় আদিম বাস, এক্ষণে কোন অঙ্গ অধিক পরিমাণে কোথায় বাস করে? এক প্রদেশের লোকের সহিত অন্য প্রদেশের লোকের স্বভাবগত, আচারগত, ভাষাগত কিরূপ একতা, অথবা ভিন্নতা আছে, তাহার আলোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধান করা প্রয়োজনীয় হইবে, কোন প্রদেশের জলবায়ুর সহিত অন্য প্রদেশের জলবায়ুর কি রূপ পার্থক্য আছে; বায়ুর গতি, জলের প্রকৃতি, বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ, বৃষ্টিপাতের কালনিরূপণ প্রভৃতি দৈনন্দিন সংগ্রহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোন প্রদেশে কিরূপ পীড়া বিশেষভাবে অধিকার লাভ করিয়াছে; কোন প্রদেশে কি রূপ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে; কিরূপ শস্যাদির জন্ম হয় না; কোন্‌ প্রদেশে কিরূপ উদ্ভিদ-বংশের অথবা বীজবংশের জন্ম হয়; ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভূগোলের আর এক ভাগে প্রদেশ বিশেষে পণ্যের ও শিল্পের উন্নতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কি রূপ পণ্য কোন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপত্তি লাভ করে—সেই সকল পণ্য কি পরিমাণে বহির্বাণিজ্যের জন্য আবশ্যক হয়, কি পরিমাণে স্থানীয় লোকের ব্যবহারে আইসে এবং কি পরিমাণেই বা ভারতবর্ষের অন্তর্বাণিজ্যের উপকারী হয়; কোন্‌ প্রদেশে কোন্‌ জাতির মধ্যে শিল্পের উন্নতি বা অবনতি হইতেছে—কোন নূতন শিল্পের প্রবেশ হইয়াছে কি না—সেই শিল্প দেশীয় লোক দ্বারা অথবা বিদেশীয় দ্বারা পরিচালিত হইতেছে; সেই শিল্পদ্রব্য দেশীয় অথবা বিদেশীয় লোকের প্রয়োজন কি পরিমাণে সাধন করে; এই ভাবের নানা কথায় এই তৃতীয় ভাগে আলোচিত হইতে পারে। আমরা ভূগোলের চতুর্থ ভাগে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি বিভাগ—হিন্দু, মুসলমানাদি ধর্ম্ম বিভাগ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারি। এই ভাগে হিন্দু ও মুসলমানের পুণ্যস্থান সমূহের বিবরণ এবং উন্নতি বা অবনতির ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারি।

আপাততঃ এইরূপ ভূগোলতত্ত্ব আমরা রাজকীয় Serveying Department হইতে সংগ্রহ আরম্ভ করিতে পারি। যে সকল বিষয়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, তাহার অনেক-গুলি রাজকীয় Engineering কাছারীসমূহে অথবা Meteorological office সমূহে অথবা Surveyor general's officeএ অনুসন্ধান করিলে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব আদম সুমারির বিবরণ হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আর দেশের লোক নিজের কাজ মনে করিয়া নিজের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় (টাকী, চব্বিশ-পরগণা) পঞ্চম প্রস্তাব যথা—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক,—উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—

"রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় এই দেশে শিক্ষাবিস্তার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর অবধি বাঙ্গালা ভাষার গদ্য সাহিত্য ক্রমে ক্রমে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কাল মধ্যে ভাষার পুষ্টিসাধন করিতে পারে, এরূপ গ্রন্থ অতি অল্প সংখ্যাই লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এ যাবৎ যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় প্রায়শঃ উপন্যাস, নয় কাব্য, নয় সঙ্গীত, নয় নাটক। কেবল এবম্বিধ সাহিত্য দ্বারা ভাষার প্রকৃত পুষ্টিসাধন হয় না। পৃথিবীর কোন দেশের ভাষাই কেবল ইত্যাকার সাহিত্যদ্বারা উন্নতিলাভ করে নাই। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক সারবান্ গদ্যগ্রন্থ ব্যতীত ভাষার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক গদ্যগ্রন্থই ভাষার প্রধান অলঙ্কার। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় আজি পর্য্যন্ত উক্তবিধ গ্রন্থ সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। অতএব বিবেচনা করি যে যাহাতে উক্তবিধ গ্রন্থের বহুল প্রচার ঘটে, তৎপক্ষে বঙ্গবাসিগণের বিশেষতঃ সাহিত্যিকগণের বিশিষ্ট প্রয়াস করা কর্ত্তব্য। উক্ত কার্য্য-সম্পাদনার্থ প্রধানতঃ দুইটি পন্থা অবলম্বনীয়। প্রথমতঃ বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস শাস্ত্রে যাঁহারা কৃতবিদ্য ও পারদর্শী হইয়াছেন, ঐ ঐ বিষয়ে সাধারণবোধ্য গ্রন্থ প্রচার করা তাঁহাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া যে পরিমাণ মানসিক উন্নতিলাভ করিয়াছেন, যদি তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ বঙ্গবাসিগণের শিক্ষার সাহায্য না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের ও ভাষার কি কার্য্য করিলেন? ফলতঃ জন্মভূমি ও মাতৃভাষা তাঁহাদিগের নিকট যথেষ্ট আশা করেন। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক যে সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তৎ-সমস্তের, অথবা তাহার কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। সংস্কৃত, আরবী, ইংরাজী, জর্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তির সংখ্যা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে নিতান্ত কম নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন, তাঁহারা ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাষার রত্নরাজী অনায়াসে বঙ্গবাসীদিগের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন। অতএব যদি ঐ সকল মহানুভব ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় ঋষিগণের এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অমূল্য গ্রন্থনিচয় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে দেশের ও ভাষার যে প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে, তৎপ্রতি অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেইজন্য বর্ত্তমান কৃতবিদ্য বঙ্গবাসিগণের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তাঁহারা বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থপ্রকাশে যত্নবান হউন, অথবা অন্যান্য ভাষার অপূর্ব্ব শাস্ত্র সকল অনুবাদিত করিয়া মাতৃভাষায় পুষ্টিসাধনে মনোযোগ করুন।

এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত, আরবী এবং ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্যগণের নিকট আমার একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। তাঁহারা তদ্বিষয়ে সম্যক্ প্রণিধান করেন, ইহাই আমার অনুরোধ।

মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তি কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করেন এবং সেই ধনরাশি স্বদেশ ও স্বদেশীয়ের উপকারার্থ ব্যয় না করিয়া বিদেশে ও বিদেশীর প্রয়োজনে তাহা অকাতরে বিসর্জ্জন করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি ঘটে কি না এবং তাঁহার নিকট তাঁহার স্বগ্রাম ও স্বদেশবাসীদের কোন দাবী থাকে কি না? আমিও তাঁহাদের নিকট মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনকল্পে সেই প্রকার দাবী করিতেছি। ভরসা করি কৃতবিদ্য মহোদয়গণ আমার এই দাবীর সত্যতা স্বীকার করিবেন এবং আমাদের সকলের মাতৃভাষার উন্নতি-উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালনে তৎপর হইবেন। আমি মনে করি বঙ্গের কৃতবিদ্য সন্তানগণ যদি নিজ নিজ উপার্জ্জিত বিদ্যা মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নিয়োগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে একটু অসম্পূর্ণতা থাকে।"

ইহার পর মুন্সী শ্রীযুক্ত মহম্মদ রওশন আলি চৌধুরী (ফরিদপুর) সারগর্ভ বাক্যে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, শ্রীযুক্ত হরিমোহন মৈত্র, (কৃষ্ণনগর, নদীয়া) তাহার পুনঃসমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহারাজ বাহাদুর ও মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এবং সমবেত সভামণ্ডলি! আপনারা আমার পূর্ব্ববক্তার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াছেন। এক্ষণে সভাপতি মহাশয়, নিজগুণে আমাকে ঐ প্রস্তাব সমর্থন জন্য অনুমতি করিয়া এত অল্প সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, এতাদৃশ গুরুতর বিষয় মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা, কোন প্রকারে সমর্থিত হইতে পারে না। তবে কর্ত্তব্যানুরোধে যতদূর সম্ভব, দুই একটী কথা বলিতেছি মাত্র, যথা;—

দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে বঙ্গভাষায় বহুবিধ সদ্‌গ্রন্থ সঙ্কলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে, জগতের কোন বস্তুরই প্রকৃত পরিচয় হয় না এবং দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানেরও পথ অপ্রশস্ত থাকে। সেই দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইলে, ভাষায় বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষা শিক্ষা না করিলে কোন শাস্ত্রে কোন অধিকার জন্মে না; সুতরাং জগতে যে কোন জাতি হউন না কেন, পরস্পরের জাতীয়ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যে জাতির মাতৃভাষায় অধিকার না থাকে, সে জাতির উন্নতি-আশা কি দুরাশা নহে? আমরা বাঙ্গালী; আশৈশব মাতৃক্রোড়ে শায়িত থাকিয়া যে ভাষা শুনিতে আরম্ভ করি ও আজীবন যে ভাষায় অহরহ কথাবার্ত্তা কহিয়া পরিশেষে মানবলীলা সম্বরণ করি, আমাদের সেই মাতৃভাষা বাঙ্গালা; অতএব সেই বাঙ্গলাভাষা যাহাতে বিশুদ্ধভাবে লিখিতে ও পড়িতে ও কহিতে পারি, তদ্বিষয়ে মন সংযোগ করা কর্ত্তব্য।

যদিও বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃতভাষার রূপান্তর মাত্র, কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশীয় ও বিধর্ম্মী রাজানুশাসনে সেই রাজকীয় অর্থকরী ভাষা, শিক্ষা করিতে গিয়া আমাদের মাতৃভাষায় উপেক্ষা হইয়া পড়ে।

নানাপ্রকারে যাবনিক ও ইংরাজীভাষা মিশ্রিত হইয়া প্রকৃত বাঙ্গলাভাষার

বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। এমন কি, শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও অনেকে বিদেশীয় ঐ অর্থকরী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি-লাভে মাতৃভাষার অপব্যহার করিতে বাধ্য হন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইংরাজী পার্সী ও উর্দ্দূ প্রভৃতি ভাষা মিশ্রিত হইয়া প্রকৃত ভাষা ব্যবহার করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে অনেকেই একটী বাঙ্গালা কথা ব্যবহার করিতে গিয়া, তাহার সহিত দশটী বিদেশীয় শব্দ ব্যবহার করিয়া বসেন। যদিও তাঁহারা ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু অভ্যাস-দোষে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া কিছুরই ঠিক রাখিতে না পারিয়া ইংরাজী অনুকরণে "খাব না ভাৎ, ডাল দিয়া" "হয় ভাঙ্গতে হাতির দাঁত" এইরূপে বাক্যবিন্যাস করিতে বাধ্য হন। কেহ কেহ বা স্থান বিশেষে বসবাস করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ জলবায়ুপ্রভেদে সকল শব্দ সমান ভাবে উচ্চারণ করিতে না পারায় হ-কে,-অ, বা-কে-না, ভ-কে-বা ইত্যাদি ভাবে উচ্চারণ করেন। অথচ সেই সকল লোকের সহিত নানাপ্রকার আত্মীয়তা ও বাধ্যবাধকতা থাকায় এমন কি, বিবাহাদি কার্য্য দ্বারা চিরসম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়। সুতরাং পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝিতে বড়ই অসুবিধা হইয়া উঠে। আবার স্থানবিশেষে বাঙ্গালাভাষার সহিত কতকগুলি সাঙ্কেতিক কথারও ব্যবহার হইতে দেখা যায়। যেমন মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইলে গাছাইমু বলে। এই সকল কারণে প্রত্যেক স্থানের ভাষার একতা সম্পাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে হইলে ঐ সকল শব্দব্যঞ্জক অভিধান সঙ্কলন করা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানের সকল লোকের কথাবার্ত্তার সামঞ্জস্যে এক ভাষা ঠিক করিতে হইলে সকল স্থানের ভাষাবিজ্ঞাপক সংগ্রহ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান।—দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা সহজে জন্মে। যেমন অট্টালিকা বলিলে ইষ্টকনির্ম্মিত একটী সুরম্য বাটী বুঝায়। সে জ্ঞান দর্শনশাস্ত্রানুসারে জন্মে। কিন্তু সেই অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে কি কি দ্রব্য লাগে এবং সেই সকল দ্রব্য কোথায় কিরূপে পাওয়া যায় ও কি উপায়াবলম্বন করিলে অনায়াসে ও সুলভমূল্যে ঐ দ্রব্য সংগ্রহ হয়, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বিজ্ঞানেরই সাহায্য প্রয়োজন। বিজ্ঞান-বলে জগতের কোন কার্য্য অসাধ্য নয় বলিয়া প্রতিদিন প্রতি মহাদেশে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিজ্ঞানচর্চ্চা না থাকিলে জগতে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। সামান্য বৃটন দ্বীপ ও সুবৃহৎ আমেরিকা খণ্ড ও ক্ষুদ্রকায় জাপান প্রভৃতি বিজ্ঞান-বলে ও তদনুশীলনে জগতের মধ্যে প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়া ক্রমশঃ আত্মসম্মান লাভ করিতেছে। আর আমরা আর্য্যসন্তান, বিজ্ঞান বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছি। আমাদের দেশে, যে সকল অমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহাতে কোন বিষয়েরই অভাব নাই; কিন্তু আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারায় ও অর্থকরী রাজভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমশঃ হীনদশা প্রাপ্ত হইতেছি। এক্ষণে বাঙ্গালাভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানাপ্রকার সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে ও ভরসাকরি, ভবিষ্যতে আরও হইবে।

অতএব সেই সকল সদ্গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলন করিয়া বাঙ্গালাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা ভিন্ন আর কোন উপায় দেখা যায় না। সুতরাং যতই বিজ্ঞানের চর্চ্চা বাড়িবে, ততই দেশের অভাব দূরীকৃত হইয়া এই বাঙ্গালী সর্ব্বগুণে সমাদৃত হইবেন। অতএব এতাদৃশ সর্ব্বহিতকর বিজ্ঞান বিষয়ে প্রকৃত বাঙ্গালা পুস্তক সঙ্কলন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

ইতিহাস।—কেবল ভাষা শিক্ষা করিয়া ও তৎপরে বিজ্ঞান শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিলে এবং দর্শনশাস্ত্রপ্রভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই যে, সহসা কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত উন্নতি লাভ করা যায়, তাহা নহে। তৎসঙ্গে ইতিহাস অর্থাৎ দেশের ইতিবৃত্ত পাঠ না করিলে কোথায় কোন্ ব্যক্তি কি রূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া মানব নামের প্রকৃত পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। আমরা বিদেশীয় রাজভাষা শিক্ষা করিয়া বিদেশীয় ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া বিদেশীয় দ্রব্যের অবস্থা অবগত হইতে লোলুপ। কিন্তু দেশের কোথায় কোন দ্রব্য জন্মে এবং কাহার দ্বারা কি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে ও হইতে পারে, তাহার জ্ঞানলাভে কোন চেষ্টা করি না। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় ইতিহাসের বড়ই অভাব ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজী ভাষার অনুকরণে আমাদের দেশে অনেক কৃতবিদ্য সাহিত্যসেবিগণ বাঙ্গালা ভাষায় নানাপ্রকার ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই সকল ইতিহাসবিষয়ক সদ্গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস লেখার অভাবে আমাদের অবস্থা দিন দিন এত হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা আমাদের দেশে কোথায় কি দ্রব্য পাওয়া যায় ও কি করিলে সেই সকল দ্রব্য সুলভ মূল্যে সংগৃহীত হয়, তাহা জানিবার কিছুই চেষ্টা করি না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

সারস্বত-ভবন।

ইহার পর ষষ্ঠ প্রস্তাব।—

৬। বাঙ্গালায় একটী "সারস্বত-ভবন" সংস্থাপিত হউক। এই সারস্বত-ভবনে নিম্নোক্তরূপ দ্রব্যজাত সংগৃহীত হউক এবং পুরাবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের মাসিক উপদেশ প্রদত্ত হউক।

(ক) প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথী।

(খ) প্রাচীন মুদ্রিত ও এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক।

(গ) বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত তাম্র-শাসন, খোদিতলিপি, মুদ্রা প্রভৃতি।

(ঘ) জয়দেব, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাসাদি প্রাচীন কবিগণের স্মৃতিচিহ্নাদি।

(ঙ) আধুনিক সাহিত্যিক—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র প্রভৃতির প্রস্তরমূর্ত্তি, চিত্র, এবং তাঁহাদের হস্তাক্ষর ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি।

(চ) বঙ্গের সাধারণ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের ঐরূপ স্মৃতিচিহ্ন।

(ছ) বাঙ্গালার প্রাচীন শিল্পবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যার যন্ত্রাদির নমুনা। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন দুর্গ, অট্টালিকা, দেবমন্দিরাদির চিত্র। প্রাচীন কালের ব্যবহৃত বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজস, অস্ত্রশস্ত্রাদির নমুনা।

(জ) অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, (ফলিত ও গণিত), বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, প্রাণিবৃত্তান্ত, শরীরতত্ত্ব, উদ্ভিদ, যন্ত্রতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

(ঝ) পূর্ব্বোক্ত বিদ্যানিচয়ের যথারীতি বাঙ্গলাভাষায় উপদেশ।

(ঞ) পুস্তকাগার ও পাঠগোষ্ঠীর জন্য পুস্তক-সংগ্রহ।

এবং এই সারস্বত-ভবন-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নিম্নলিখিত মহোদয়গণের প্রতি ভার অর্পণ করা হউক—

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর,
রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর,
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন,
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও
শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এম, এ, বি, এল, মহাশয় (রাজসাহী), এই প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়া কহিলেন,—

সভাপতি মহাশয় আমাকে সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যে প্রস্তাবটী আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় চিরসুহৃদের অনুরোধেও আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইতাম না। যে দেশে রাজা রামমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মহাপুরুষগণের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছে, সে দেশে আবার সারস্বত-ভবন-সংস্থাপনের প্রস্তাব কেন? এরূপ সংশয় সকলের মনেই উদিত হইতে পারে। এরূপ একটি ভবন সংস্থাপিত করিবার প্রয়োজন কি, তাহা লইয়া কোনরূপ মতভেদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। প্রস্তাবপত্রে তাহা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে। যাঁহারা এই দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রস্তাবপত্রের শেষাংশে লিখিত আছে, তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাইয়াই আমি এই প্রস্তাবটি সাহিত্য-সম্মিলনের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর, লালগোলার রাজা বাহাদুর, আমাদিগের সুপরিচিত স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং পরলোকগত ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন যাহার পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা যে সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইবে না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় (কলিকাতা), এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, (কলিকাতা), ইহার পুনঃসমর্থনের নিমিত্ত কহিলেনঃ—

"বাঙ্গালায় একটী 'সারস্বতভবন'-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যাহা সমর্থন করিয়াছেন—সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তাবের পুনঃসমর্থনচ্ছলে আমি সঙ্ক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

গত বৎসর কলিকাতায় যে শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই প্রদর্শনীর শিক্ষা-বিভাগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এক প্রত্নতত্ত্বপ্রদর্শনীর অবতারণা করিয়াছিলেন। আমি সেই প্রদর্শনীর জন্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শনীয় দ্রব্যজাত-সংগ্রহার্থ মুরশিদাবাদ জেলার কতিপয় স্থানে, প্রাচীন ইন্দ্রাণী পরগণা এবং দাশরথি রায়, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বাঙ্গালার কবিগণের জন্মভূমিতে প্রেরিত হইয়াছিলাম। ঐ সমস্ত স্থানের প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাচীন দেবমন্দির এবং দেববিগ্রহাদির চিত্র, কবিগণের ও মহাপুরুষগণের জন্মভূমি ও হস্তাক্ষরাদি এবং উপেক্ষিত তীর্থ সকলের আলোক-চিত্র এবং বিবরণাদি সংগ্রহ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয় সঙ্গীত সাহিত্যের একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ কল্পে এবং উপেক্ষিত প্রায় অজ্ঞাতনামা গ্রাম্যকবি, গায়ক, পাঁচালীকার, কথক, যাত্রাওয়ালা, কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতিদিগের বিনষ্ট প্রায় কীর্ত্তিকলাপ-অনুসন্ধান-মানসে বঙ্গদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। সেই সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বাঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রচুর উপাদানরাজি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আমি তাহা পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গোচরীভূত করিয়াছিলাম। সম্পাদক মহাশয় পরিষদের প্রত্নতত্ত্বপ্রদর্শনীর সফলতা এবং দর্শকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয়-দর্শনে প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে একটী সারস্বতভবন-স্থাপনের উপযোগিতা বিবৃত করিয়াছিলেন। আজি বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় দরিদ্রের চিরপোষিত সেই মনোরথ বঙ্গীয়সাহিত্য সম্মিলনে অনুষ্ঠেয় প্রস্তাবের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি নিজের অভিপ্রায়ে আমি সাহিত্যসম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। সারস্বতভবন-প্রতিষ্ঠার উপযোগিতাসম্বন্ধে প্রস্তাবক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য। সারস্বতভবনরূপ দেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ব্যতীত জাতীয় জীবন উন্নতির পথে আরূঢ় হইতে পারে না। চঞ্চলা কমলার অনন্ত ভাণ্ডার, ধনধান্যভূয়িষ্ঠ বিপুল সমৃদ্ধিসম্ভৃত বঙ্গের অঙ্গ হইতে অত্যাচারী দস্যুর লগুড়াঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সনাতন এবং নিত্য নূতন অক্ষয় সারস্বত ভাণ্ডারের বিলোপ নাই—অনন্তরত্ন-প্রভবা ভারতীয় লক্ষ্মীর বিশালভাণ্ডার সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর দস্যু-করে লুণ্ঠিত হইতেছে; মথুরা কিংবা কান্যকুব্জ, সোমনাথ কিংবা ভীম নগর, দেবগিরি কিংবা দ্বারসমুদ্র, লক্ষ্মণাবতী কিংবা নবদ্বীপের লক্ষ্মীর লীলানিকেতন সারস্বত কল্পনার প্রমোদ-কক্ষে বিশ্রাম লাভ করিতেছে;—

অযোধ্যা কিংবা অবন্তী, প্রতিষ্ঠান কিংবা পাটলীপুত্র, কৌশাম্বী কিংবা কুশীনগর, বৈশালী কিংবা বিদিশা কালের সর্ব্বসংহারক কুক্ষিতে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহাদের অস্তিত্ব এক্ষণে সারস্বত স্বর্গে; কিন্তু সারস্বতভবনের বিলোপ নাই—একদিন বিধর্ম্মীর লগুড়াঘাতে উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে, পুণ্যস্মৃতি বিক্রমের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার স্বর্ণসিংহাসন অচিহ্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে—কিন্তু কবিপ্রতিভাপ্রতিষ্ঠিত সারস্বত স্বর্গের বিনাশ নাই।—কলকণ্ঠ কালিদাসের প্রতিভা কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথির অভ্যন্তর হইতে আবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে। "সান্দ্রোদ্যান-স্থগিতগগন-প্রাঙ্গণ-গৌড়দেশে"—বল্লালের বিজয়নগর এবং লক্ষ্মণ সেনের-নবদ্বীপের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই—কিন্তু সারস্বত ভবনের অভ্যন্তরে আজিও আমরা ধোয়ী কবির পবন দূতে এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমায় সেই অতীত গৌরবের এবং বিনষ্ট বৈভবের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। তাই বলিতেছিলাম সারস্বত ভবনের অতীত গৌরবের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ পুরাতত্ত্বের লীলানিকেতন এবং ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উপাদানের আকরস্বরূপ। যে দিন বঙ্গদেশের প্রত্নতত্ত্বপূর্ণ প্রাচীন শিল্পকলালঙ্কৃত বিবিধ-নিদর্শনাকীর্ণ সরস্বতীর লীলাকাননরূপ সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠিত হইবে—সে দিন বাঙ্গালীর স্মরণীয় দিন—উৎপৎস্যমান কালের গর্ভে বাঙ্গালী সেই শুভক্ষণ স্মরণ পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তিনী সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে সঙ্কলিত প্রস্তাবের বিভাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বক আমার বক্তব্য শেষ করিব।

(ক) (খ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিতেছেন। তন্মধ্যে দুই চারি খানি প্রকাশিতও হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটীও বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিতেছেন—এই সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে ভারতচন্দ্রের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কত অজ্ঞাততত্ত্বের আবিষ্কার হইবে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও অনেক বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বঙ্গবাসী পত্রিকার পরিচালকগণ ধন্যবাদার্হ। মৌলবী আবদুল করিমের উদ্যমে বহু বাঙ্গালা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু আমি পল্লি-ভ্রমণ-কালে দেখিয়াছি যে, আজিও বহু পুঁথি পর্ণকুটীরে কীটের উদরে জীর্ণ হইতেছে। কাশীদাসের নলদময়ন্তী কাব্যের পুঁথির অনুসন্ধান আবশ্যক। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা পুঁথি ব্যতীত বাঙ্গালা কবির লিখিত সংস্কৃত পুঁথি এবং বৈদেশিক লেখকগণ লিখিত বঙ্গদেশ সংক্রান্ত সংস্কৃত পুঁথিরও অনুসন্ধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধোয়ী কবির পবন দূত, বা রামচন্দ্র কবিভারতীর ভক্তিশতক বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষুদ্র উপাদান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার এ বিষয়ে আর একটী অভিপ্রায় এই যে, পুঁথি ব্যতীত যে সমস্ত গান ও ছড়া বা গ্রাম্য গীতি আজি সেকেলে পল্লীবৃদ্ধগণের স্মৃতিমন্দিরে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে তদ্বিষয়েও বিশিষ্ট উপায় অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য। উপেক্ষিতপ্রায় ভৈরব হালদার, কৃষ্ণধন এবং রূপ অধিকারী প্রভৃতি শত শত ব্যক্তির অনুসন্ধান ব্যতীত বাঙ্গালা সাহিত্যের

ইতিহাস বিকলাঙ্গ থাকিয়া যাইবে। প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক তোতা ইতিহাস ও আনন্দলহরী প্রভৃতি বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক স্তরের অনেক তত্ত্ব ব্যক্ত করিবে।

(গ) সুন্দরবনের মধ্যে সমুদ্র সান্নিধ্যে প্রাচীন খাড়ী পরগণার প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসনে অনেক অতীত তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মহীপাল ও মদনপাল দেবের তাম্রশাসনের কথা পুরাতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। এই সকল তাম্র-শাসন বাঙ্গালার ইতিহাসের ভিত্তিশিলাস্বরূপ। প্রাচীন মন্দিরাদি সংলগ্ন প্রস্তর ফলকের খোদিতলিপি হইতে অনেক ঐতিহাসিক রহস্যের উদ্ভেদ হয়। মুদ্রাও প্রাচীন সভ্যতার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই স্থলে আমি বঙ্গদেশের সুবর্ণ বনের মধ্যে প্রাচীন গঙ্গাপ্রবাহের সন্নিহিত স্থানে প্রাপ্ত ৭টী রৌপ্য মুদ্রা সভাক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত ৫। ৬ শত বৎসরের প্রাচীন একটী তাম্রকৌটাও প্রদর্শন করিয়াছিলাম। মুদ্রাগুলির মধ্যে দুইটী ইলিয়াসসাহ এবং সেকন্দর সাহের সময়ে নির্ম্মিত। তৎকালে সেকেন্দরসাহ দিল্লীশ্বরের সৈন্যকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডুয়ায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। একটী মুদ্রা সেই প্রাচীন স্বাধীনবঙ্গের পরিচায়ক। সেকন্দর পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদের নির্ম্মাতা এবং ভূমিমাপ বিষয়ক তাঁহার সেকন্দরী গজ তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মুদ্রাগুলির একটী হোসেন সাহের সময়ে নির্ম্মিত। এই মুদ্রাটী (প্রদর্শন) অতীব কৌতুকাবহ; ইহাতে পারস্যলিপির মধ্যে বঙ্গীয় বর্ণমালার আদ্যাক্ষর 'ক' সুস্পষ্টরূপে খোদিত। এতদ্ব্যতীত এই মুদ্রায় শিবলিঙ্গের গৌরীপট্ট এবং দুইটী যুগলচরণ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। হোসেন সাহের মুদ্রাপৃষ্ঠে এই সমস্ত বিষয়ের একত্র সমাবেশ বড়ই রহস্যজনক এবং কোন বিচিত্র অতীত ঘটনার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রাপ্ত তাম্রশাসন, খোদিতলিপি এবং মুদ্রা পদকাদি যে দিন সারস্বত ভবনের প্রকোষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া প্রাচীন বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব উদ্‌ঘোষিত করিবে, সেই ভবিষ্যৎ শুভদিনের স্মৃতি আমার ক্ষীণকণ্ঠকেও আনন্দবাষ্পসংরুদ্ধ করিতেছে।

(ঘ) যে সমস্ত বাণীপুত্রগণের পবিত্র পদচিহ্ন বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাথমিক প্রকোষ্ঠে দেদীপ্যমান, তাঁহাদের যে কোন স্মৃতিই সাহিত্যিকের তীর্থকল্প। হায়, বাঙ্গালীর কি দুর্ভাগ্য, কাশীরাম দাস নিখাত "কেশে পুষ্করিণী" এবং কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ আজিও সাহিত্যিকের পুণ্য-তীর্থে পরিণত হয় নাই। কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের জন্মভূমি সিঙ্গি ও ফুলিয়া আজিও বাঙ্গালীর নিকট অনাদৃত ও উপেক্ষিত। যে দিন কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের জন্মভূমির ধূলিস্পর্শ-লালসায় তাঁহাদের পবিত্র বাস্তুক্ষেত্র দর্শন করিয়াছিলামএবং যে দিন তীর্থবারি-প্রতিম পবিত্র মনে করিয়া কেশে পুকুরের এক গণ্ডূষ জলপান করিয়াছিলাম—তদবধি তাঁহাদের জন্মভূমির পবিত্র স্মৃতি তীর্থের ন্যায় আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কবিগণের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইলে, বঙ্গবাসী এক নূতন সম্পদ্ লাভ করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ঙ) (চ) যাঁহারা সরস্বতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, দারিদ্র্যের দারুণ কশাঘাতেও যাঁহারা সারস্বতী শক্তির আরাধনা হইতে বিচলিত হন নাই, অথবা যাঁহারা

অলৌকিক গুণ-গরিমায় লক্ষ্মী সরস্বতীর বিরোধ ভঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত সাহিত্যসেবিদিগের প্রতিমূর্ত্তিই সারস্বত ভবনের সর্ব্বপ্রধান শোভাসম্ভার।

বাঙ্গালা-সাহিত্য যাঁহাদের তপস্যালব্ধ সাধনার ফল, সেই বাণীপুত্রগণই সারস্বত ভবনে কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজিত থাকিবেন। খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যে সমস্ত বিদ্যানুরাগী লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ সারদাসেবকদিগকে উৎসাহ দানে প্রমোদিত করিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিতবৎসল মহাত্মগণের স্মৃতিচিত্র সারস্বত ভবনে রক্ষিত হইবে। যে বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণপালক মহানুভব কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে ভারতচন্দ্রের কলকণ্ঠ মুখরিত হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক বিদ্যানুরাগী মহাত্মার কৃপায় কবি মুকুন্দরামের কবিতাকুসুম বিকশিত হইয়াছিল—যাঁহার বিদ্যানুরাগ ও উদ্যোগিতায় মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভব" উদ্ভূত হইয়াছিল,—সেই সমস্ত অক্ষয়কীর্ত্তি মহাত্মগণের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে বাণীপুত্রগণ বিরাজিত থাকিবেন।

(ছ) প্রাচীন বাঙ্গালার সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন সেই পবিত্র সারস্বত ভবনে সংরক্ষিত হইবে। বাঙ্গালার প্রাচীন প্রস্তরশিল্প, কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকশিল্প, কাষ্ঠফলকে ভাস্কর্য্যের বিবিধ বৈচিত্র্য, সমস্তই সারস্বত ভবনের প্রকোষ্ঠে সংস্থাপিত হইবে। যে সমস্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান বাঙ্গালীর হৃদয়ে অতীত গৌরবের স্মৃতি উদ্দীপিত করে, যে সমস্ত সরিৎ-প্রবাহ প্রাচীন বাঙ্গালার অগণ্য পণ্যপরিপূর্ণা বাণিজ্যতরণী বক্ষে ধারণ করিয়া সাগরে গমন করিয়াছিল, বাঙ্গালার যে পুণ্যপবিত্র স্থান মহাপুরুষগণের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়াছিল, বাঙ্গালার যে সমস্ত মহাপীঠ প্রাচীন বাঙ্গালীর পবিত্র তীর্থরূপে অধ্যুষিত হইত—সেই লুপ্তপ্রায় তীর্থরাজির আলেখ্য সারস্বত ভবনের প্রাচীর-গাত্র অলঙ্কৃত করিবে। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত মনীষি বঙ্গজননীর অঙ্কশোভন সুসন্তান—যাঁহারা বাহুবল কিংবা বুদ্ধিবলে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কিংবা শীলভদ্র, বিজয় সিংহ, কিংবা পাণ্ডুদাস, পশুপতি কিংবা হলায়ুধ, জয়দেব কিংবা চণ্ডীদাস, রঘুনাথ শিরোমণি কিংবা শ্রীচৈতন্য, চাঁদরায় কিংবা প্রতাপাদিত্য সারস্বত ভবনকে সমুজ্জ্বলরূপে বিভূষিত করিবেন।

অদূরবর্ত্তিভবিষ্যতে যে দিন সারস্বত ভবনের প্রতিষ্ঠা হইবে—সেই দিন বাঙ্গালীর অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান—প্রাচীন গৌরবের অনুধ্যান ব্যতীত কোন জাতি উন্নতির উচ্চতর সোপান পরম্পরায় অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয় না—বর্ত্তমান অতীতের সন্তান, ভবিষ্যতের প্রসূতি—প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন-প্রতিভা অতীত কীর্ত্তির অনুশীলনে উজ্জ্বলতর প্রতিভাত হইবে।

সারস্বত ভবন জাতীয় জীবনের পরিচয়ক্ষেত্র ও ঐতিহাসিক উপাদানের অক্ষয় ভাণ্ডারস্বরূপ হইবে। আমি অপরিসীম আনন্দোদ্বেল হৃদয়ে "সারস্বত ভবনের" প্রতিষ্ঠার সমর্থনকল্পে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণের প্রস্তাবের পুনরুক্তি করিতেছি। সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যে সমস্ত মহানুভবদিগের উপরে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহাদের যোগ্যতা দেশবিখ্যাত। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অদ্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনরূপ যে বিরাট্ অনুষ্ঠানের

প্রারম্ভ সূচনা করিলেন—সেই স্মরণীয় ঘটনা বিদ্যানুরাগী মহারাজকে চিরস্মরণীয় করিয়া অমরতার অতুল সম্পদ প্রদান করিবে। সাহিত্য-সম্মিলনের এই প্রথম মিলনক্ষেত্র উৎপদ্যমান বাণীপুত্রগণের দর্শনীয় স্থানরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। আজি এই স্থলে যে মহদনুষ্ঠান মহীরুহের বীজ উপ্ত হইল, কালক্রমে সেই অভ্যুদয়শীল মহীরুহ শাখাপ্রশাখা প্রবালপল্লবে বিভূষিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিবে।

ইহার পর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় (হুগলী), উক্ত ষষ্ঠ প্রস্তাবের দৃঢ়তর সমর্থন পূর্ব্বক কহিলেন,

মাননীয় সভাপতি, রাজা, মহারাজা এবং সভ্যগণ!

প্রস্তাবক মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহার উপর আমার বলিবার আর কিছুই নাই। পূর্ব্বের বক্তাদিগের সহিত আমি পুনরায় বলিতেছি যে, আমাদের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন সকল আর যেন আমাদের উপেক্ষার বিষয় হইয়া আমাদের দেশের জলবায়ুর প্রকোপে বিলয়োন্মুখ না হয়। আমাদের দেশে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে, আসুন আমরা এই নূতন যুগে নূতন বলের সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিত্যক্ত আমাদের গৌরবের বস্তু সকল সংগ্রহ করি। আমাদের উপেক্ষায় অনেক দ্রব্য নষ্ট হইলেও এখনও অনেক জিনিস নানা স্থানে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক নগরে সংগৃহীত হউক—সেই পবিত্র সারস্বত-ভবনে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতির ভেদ না করিয়া আদরের সহিত সকলের গৌরব নিদর্শন রক্ষিত হউক। সেই পবিত্র মন্দিরে আমার স্বদেশবাসী তীর্থযাত্রী যখন প্রবেশ করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন, তখন দেখিবেন ইতিপূর্ব্বে যিনি নিরাশায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন—আলস্যে পঙ্গুবৎ হইয়াছিলেন, তিনি উল্লাসে সঞ্জীবিত হইবেন। আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য এবং অন্যান্য সূক্ষ্মকলাবিষয়ক দ্রব্য সকলও তথায় সংগৃহীত হউক। সেই সকল সংগ্রহ দেখিয়া—অনাহারে মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর একমুঠা অন্ন-সংস্থানের উপায়স্বরূপ হইবে। আমাদের এই পবিত্র ক্ষেত্রে রাজনীতি বা বিদেশীবর্জ্জন নাই; ইহা আমাদের "সাধু স্বদেশী"। তাই বলিতেছি আসুন আমরা সকলে মিলিত হইয়া আমাদের সেই পবিত্র মন্দিরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সংস্থাপন করি। আমি বলিয়াছি আমাদের দেশের সর্ব্বত্র আমাদের প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন সকল প্রচ্ছন্নভাবে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। আপনাদের এস্থানে আসিবার পূর্ব্বে আমি মেদিনীপুরের একটী প্রাচীন রাজবাটীতে গমন করিয়াছিলাম, সে স্থানে যাহা দেখিয়াছি তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না, সেখানে দেখিলাম বর্গিদের সহিত আমাদের বাঙ্গালীরা যে সকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহারাষ্ট্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্রশস্ত্র মড়িচা পড়িয়া নষ্ট হইতেছে; উই পোকাতে মাটি করিতেছে। তাই বলিতেছি আসুন আমরা নূতন বলে নূতন উদ্যমে আমাদের দেশের "খুদ কুঁড়ো" যাহা কিছু আছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া এই পবিত্র সারস্বত-ভবনে সংস্থাপন করি।

৭ম প্রস্তাব। বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় সাহিত্যালোচনার জন্য যে সকল সভাসমিতি আছে, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করা হউক।

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার বসু এম, এ, বি, এল মহাশয় (বিক্রমপুর, ঢাকা), এই প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়া বলিলেন,

সভাপতি মহাশয় এবং সভ্যমহোদয়গণ !

আপনাদিগকে আমি প্রণাম করি এবং নমস্কার করি। আমার নিকট কোন বিস্তারিত বক্তৃতার আশা করিবেন না। কারণ প্রথমতঃ আমি বক্তা নহি, দ্বিতীয়তঃ সময় প্রায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আর এক ঘণ্টা মাত্র সময় আছে; তাহাতে পাঁচটী প্রস্তাবের উপর দশ পনের জন সভ্যকে বলিতে হইবে, তৎপরে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে এবং সভ্যমহোদয়গণেরও লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া বক্তৃতার উপর কিছু বিতৃষ্ণাও জন্মিয়াছে। সেই জন্য যদ্যপি আমার আয়ুঃ দশ মিনিট কাল মাত্র আছে, তথাপি সেই সময় অতিবাহিত না হইতে আমি আপনাদের উপকারার্থ আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত আছি।

বোধ হয় অধিকাংশ সভ্য জ্ঞাত আছেন যে, বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিন চারিটা সভা সমিতি আছে যথা—কলিকাতা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, সাহিত্যসম্মিলন ও সাহিত্যসভা এবং ভবানীপুরে সাহিত্যসম্মিলন ও অন্যান্য সমিতি আছে এবং তাহাদের বিনা সাহায্যে আমাদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কিছু কঠিন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলিতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহার সকলই সমস্ত সভা সমিতির সাহায্যের দরকার। সময় অধিক নাই সেই জন্য আপনাদিগকে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। তৃতীয় প্রস্তাবে আপনারা বাঙ্গালা ভাষার একটী অভিধান সঙ্কলন করা উচিত ইহা ঠিক করিয়াছেন। সেই অভিধান লিখিতে অনেক সভা সমিতির ও অন্যান্যের সাহায্য আবশ্যক। প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানারূপ বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। সেই সকল শব্দ এই অভিধানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। এই বাঙ্গালাভাষা মৃত ভাষা নয় ইহা জীবন্ত ভাষা। সময় সময় নূতন বাঙ্গালা শব্দের সৃষ্টি হইতেছে যথা—"বয়কট" শব্দ, ইহা পূর্ব্বে বাঙ্গলাভাষায় ছিল না; এখন এই শব্দটীকে ভাষান্তর্গত করিয়াছি। এইরূপ কত কত শব্দ বাঙ্গালা ভাষান্তর্গত হইতেছে। সেই জন্য পুনরায় বলিতেছি সমস্ত সভা-সমিতি এবং নানা জেলার নানা লোকের সাহায্য ব্যতীত এই অভিধান সঙ্কলন করা অসাধ্য। ওয়েবষ্টার সাহেব যখন ইংরাজীভাষার অভিধান সঙ্কলন করেন; তাহাতে আনুমানিক একলক্ষ শব্দ ছিল। কিন্তু এখন অক্সফোর্ড সহরে যে অভিধান প্রস্তুত হইয়াছে; তাহাতে আনুমানিক দেড়লক্ষ শব্দ সঙ্কলিত আছে। ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, অভিধান লিখিতে কত লোকের সাহায্যের দরকার। ফ্রান্সদেশে যখন একেডেমি অর্থাৎ শিক্ষা সমিতি সৃষ্ট হয়, তখন সেই সমিতির উপর এই আদেশ ছিল যে ফরাসিভাষার একটী অভিধান প্রস্তুত করে। ফ্রান্সের সেই সমিতিতে সর্ব্বদা দেশের ৪০জন প্রধান প্রধান

সাহিত্যজ্ঞ সভা ছিলেন। তাঁহারা সেই অভিধান ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে বাহির করেন। তৎপরে সময়ে সময়ে বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ অভিধান বাহির করেন। সেই অভিধান প্রস্তুত করিতে দুই শত বৎসরের অধিক লাগিয়াছিল। ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে এক অভিধান লিখিতে কত লোকের ও কত সময়ের দরকার। সেই জন্য আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে, বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার সাহিত্যালোচনার জন্য যে সকল সভা-সমিতি আছে, পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হউক এবং আমি আশা করি আপনারা সকলে এক বাক্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। অনন্তর অন্নদাচরণ বেদান্ত শাস্ত্রী (নওয়াখালি) উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন পূর্ব্বক কহিলেন,—

স্বনামখ্যাত লক্ষ্মীসরস্বতীর বরপুত্র দেশহিতৈষী মাননীয় শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়! দেশবৎসল করুণাকর কার্য্যনির্ব্বাহক সভাপতি শ্রীমন্মহারাজ! সমবেত সভ্যমণ্ডলী! আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও মহামনীষিপরিপূর্ণ ঈদৃশী সমিতিতে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হই নাই। অদ্যও বক্তৃতা করিয়া সহৃদয় শ্রোতৃবর্গের নির্ম্মল শান্তি উৎপাদন করতঃ যশস্বী হইব, এই আশায় দণ্ডায়মান হইয়াছি, কেহ মনে করিবেন না। বক্তৃতা করিতে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, তন্মধ্যে আমার কিছুই সংগ্রহ নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসিমাত্রেই বৃথা বাগ্‌বিস্তার পরিত্যাগ করতঃ কর্ত্তব্যপথে প্রধাবিত হইতেছে। গত দিবস ও অদ্য বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে যে সকল অনল্প প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত গুরুতর বিষয় সমালোচিত হইল, যদি প্রকৃত পক্ষে আলোচিত বিষয় সকল কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, দেশের যে কতদূর প্রভূত সুমঙ্গল সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আজ প্রাচীন নগর মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারে, সাহিত্যসেবি-কবিপূজিত কবিপ্রবর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের প্রকৃষ্ট যুক্তি-পরিপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্যাবলী সম্বলিত বঙ্গদেশীয় প্রধানতম শ্রীমন্মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের সার্থপ্রযত্নে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের প্রথম অধিবেশন যে ভাবে সাধিত হইল, ভরসা করি অচিরকাল মধ্যেই সমগ্র ভারত এই সমিতির সুফল দর্শন করতঃ বিমল আনন্দ অনুভব করিবে। কিন্তু প্রোক্ত বিষয় সকল সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করিলে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া প্রতিভাত হয়। ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সুফল পাওয়া কথঞ্চিৎ প্রয়াসসাধ্য। সুতরাং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। অতএব পূর্ব্ববক্তা শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার বসু এম, এ, বি, এল মহাশয় 'বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার সাহিত্য সমালোচনার জন্য যে সকল সভা সমিতি আছে, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করা হউক।—এই যে সপ্তম প্রস্তাব বঙ্গসাহিত্যসেবি সভ্যমহোদয়গণ-বেষ্টিত মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের নিকট উত্থাপিত করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবিত বিষয় সকল কার্য্যে পরিণত হইবার এইটী প্রকৃষ্ট উপায়। অতএব সপ্তম প্রস্তাবটী পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবিত বিষয়ের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আমি সমর্থন করিতেছি। অপিচ এই বঙ্গীয়

সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় বঙ্গসাহিত্যসেবি মহানুভবদিগকে অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রোক্ত প্রস্তাবগুলি আকাশে লীন না হইয়া সুফল উৎপাদন করতঃ বঙ্গ-সাহিত্য-রসসেবি মহোদয়গণকে সুরস দান করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলে প্রযত্নশীল হন, এইমাত্র আমার বক্তব্য।

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় (ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা), উক্ত প্রস্তাবের পুনঃ সমর্থন নিমিত্ত কহিলেন,—

মাননীয় শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় ও মহোদয় সভ্যগণ! এরূপ সভায় বক্তৃতা করিয়া বিদ্যা প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নাই, বিশেষতঃ আমাকে কমবক্তা (অল্পভাষী) জানিতে পারিয়াই বোধ হয় শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় আমার উপর পুনঃ সমর্থন করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন, কারণ শ্রীযুক্ত প্রস্তাবক এবং প্রথম সমর্থনকারী মহাশয়দ্বয় যথাকালে এই প্রস্তাবের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাদৃশ বিশদ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে "এই প্রস্তাবটী আমি পুনঃ সমর্থন করিতেছি", এই কয়টী কথা ছাড়া আমি এস্থলে যাহা বলিব, তাহাই পুনরুক্তি ভিন্ন আর কিছুই হইবে না, এইজন্য আমার পক্ষে আর কিছু না বলাই ভাল, এবং তাহাই আমার অভিপ্রেত। আমি প্রথমেই বলিয়াছি, এতাদৃশ মহতী সভায় আমি দাঁড়াইয়া দুকথা বলি, এরূপ ক্ষমতা আমার নাই। ফলতঃ এক্ষণে বলার সময় অতীত হইয়াছে, কাজ করিবার সময় আসিয়াছে, আজ কাল মুখে কিছু না বলিয়া কার্য্যারম্ভের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। তাই বলি উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় সাহিত্যালোচনার জন্য যে সকল সভা সমিতি আছে, তাঁহাদিগকে যতশীঘ্র অনুরোধ করা যায়, ততই আমাদের কর্ত্তব্যপালনে তৎপরতা প্রকাশ পাইবে। ঐরূপ অনুরোধ করিবার পক্ষে দুইটী উপায় আছে। ১ম—প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক সাহিত্য-সমিতিতে উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়া প্রস্তাবগুলির উপকারিতা বিশদরূপে তত্তৎ সমিতির সদস্যবৃন্দের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, তাঁহাদিগকে প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করা। কিন্তু এইটী প্রথম উপায় হইলেও বহুব্যয় এবং আয়াসসাধ্য, এইজন্য আমি দ্বিতীয় উপায়টী অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করি। সেটী এই ২য়—এই সভাস্থলে বঙ্গান্তর্গত সকল জেলা হইতেই সাহিত্যানুরাগীদিগের উপযুক্ত প্রতিনিধি সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ত গতকল্য এবং অদ্য এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলির শ্রীযুক্ত প্রস্তাবক এবং সমর্থক মহাশয়গণের যথাযথ প্রস্তাবের অবতারণা এবং সমর্থনাবসরের যুক্তিপূর্ণ সুমধুর ব্যাখ্যান শ্রবণ করতঃ উহাদের সারবত্তা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহার উপর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অভ্যর্থনা-সভার সম্পাদক মহাশয় এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের উদ্বোধন-বক্তৃতাতেও উপরি-উক্ত প্রস্তাবগুলির উপকারিতাই বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সকল প্রতিনিধি মহাশয়গণ নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তত্রত্য সাহিত্যসেবীদিগকে তাঁহারা এই সভা হইতে যাহা গ্রহণ করিয়া গেলেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া

প্রস্তাবগুলিকে অনায়াসেই কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন, ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যয় নাই, বিশেষ আয়াসও নাই, অথচ কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আমার মতে এই দ্বিতীয় উপায়-অবলম্বনই আমাদের পক্ষে ভাল।

অষ্টম প্রস্তাব।

প্রতিবর্ষে বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন' আহ্বান ও তাহার ব্যবস্থাদি করিবার জন্য একটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হউক। এই মণ্ডলীস্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভার অর্পিত হউক;—

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর	দেওয়ান খান বাহাদুর ফজলেরব্বী
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার
রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর	" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
রায় সেতাবচাঁদ নাহার	" পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়
রায় মণিলাল নাহার	" শরদিন্দুনারায়ণ রায়
বাবু বিজয়চাঁদ দুধুরিয়া	" সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক
রায় বুধসিংহ বাহাদুর	" শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
শ্রীযুক্ত ধনপৎ সিংহ কুঠারী	" পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়
" গণপৎ সিংহ বাহাদুর	

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল, মহাশয় (বহরমপুর) বিবিধ অকাট্য যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণস্পর্শী ভাষায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় (রাজসাহী), তাহার পুনঃ সমর্থন নিমিত্ত কহিলেন:—

সম্মিলনের সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে যে এই প্রস্তাব, অদ্বিতীয় উপায়, তাহা বিশদভাবে বিবৃত না করিলেও চলে। এ বিষয়ে স্বনাম-বিখ্যাত-বহুদর্শী মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, প্রাণস্পর্শী ভাষায় যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। এই সম্মিলনের এরূপ গুরুতর প্রস্তাব-সমর্থনে, উপস্থিত সুবহু কৃতবিদ্য ও সুদক্ষ মহোদয়গণ বিদ্যমানে আমার মত অযোগ্য ও নগণ্যজনের প্রতি ভারার্পণ, অবশ্যই আমার পক্ষে আশাতীত সম্মান-জনক, কাজেই আমাকে এতদুপলক্ষে কিঞ্চিৎ বলিতে হইতেছে। এই প্রস্তাব রচনায়, এই মণ্ডলী-স্থাপনের যে সঙ্ক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার মধ্যে যে মহা মহীরুহের স্ফুটনোন্মুখ ক্ষুদ্র বীজ সংরোপিত দেখিয়াছি, আমি সেই বিষয়েই কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রতি বৎসর এই সম্মিলন আহ্বান ও তাহার ব্যবস্থাদি করার নিমিত্তই এই মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পরিসর কথা-

গুলির মধ্যে আমি বঙ্গ সাহিত্যের সংস্কার ও সুগঠন কল্পে স্থায়ি ভাবে, কার্য্যক্ষম-কেন্দ্রের বীজ যাহা দেখিয়াছি, অনুষ্ঠাতৃগণ, তাহা ভ্রমাত্মক মনে করেন কি না জানি না। তবে সার্ব্বভৌম কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠা ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনে বড়ই যে অসুবিধা, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবে না। অস্থায়ী ভাবে প্রতিবৎসর, বঙ্গদেশের কোন এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া কেবল দুই তিন দিন মাত্র আলোচনায় এই গুরুতর কার্য্য সুনির্ব্বাহ হইতে পারে না। নানা বাধাবিপত্তিসঙ্কুল এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে যে কঠোর ব্রত পালন করা আবশ্যক, তাহা চিন্তা করিতে এই মণ্ডলিই তাহার এক মাত্র আশ্বাসজনক লক্ষ্য রূপে প্রতীয়মান হয়। কেন্দ্র-বল ব্যতীত জগৎ নিমেষ মাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। মস্তক শূন্য প্রাণী, সৃষ্টিতে অকর্ম্মণ্য ও নিরর্থক। দেবযুগের কথা স্মরণ না করাই উচিত; কিন্তু মনুষ্যাদির পক্ষে একাধিক মস্তক বিপত্তিজনক। অবশ্য কেন্দ্র বা তৎস্থানে কল্পিত এই মণ্ডলী, এক ভিন্ন যেমন ততোধিক হইতে পারে না, সেইরূপ ইহার অন্তর্গত নানা বিভাগ থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

অনেক দিন হইতে বঙ্গ ভাষার সংস্কার ও তাহা সুসম্বদ্ধ করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় মনস্বী-কৃত-বিদ্য-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত, আরবী, পারসী কি য়ুরোপীয় লাটিন, গ্রীক, ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষার মত, বঙ্গভাষা, একটা শিক্ষণোপযোগী ভাষা বলিয়াই গণনীয় ছিল না। এ দেশবাসিগণ, সাংসারিক কার্য্যোপযোগী কথোপকথন কল্পেই ইহা ব্যবহার করিতেন। তজ্জন্য জল বায়ু ও মৃত্তিকার বিভিন্নতায় ও নিকটবর্ত্তী প্রান্ত বাসিগণের কথনের ভাষার আকর্ষণে উচ্চারণ-বৈষম্যসহ ভাষার শব্দগত এত পার্থক্য ছিল যে, এই ভাষাকে শত শত বিভাগে বিভক্ত করিলেও বুঝি শেষ হইত না। তাহার পরে নানা কারণে নানা বৈদেশিক ভাষার শব্দ ইহার অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া নিত্যই ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইত। পণ্ডিত ও শিক্ষিত শ্রেণীর, কেহই এই ভাষাকে সুসম্বদ্ধ করিতে যত্ন করিতেন না। তাহার পরে য়ুরোপীয় মিশনরীগণ ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধা নিমিত্ত, বঙ্গভাষা শিখিতে আগ্রহান্বিত হইলেন কিন্তু ভাষা-শিক্ষার প্রধান অবলম্বন, অভিধান কি ব্যাকরণ না থাকায়, তাঁহারা তাহা প্রণয়নে মনোযোগ দিলে, এ দেশবাসী, সেকালের নেতৃগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

এইরূপে কি কি কারণ সমবায়ে বঙ্গভাষা, কোন্ কোন্ উদ্যমশীল মহাত্মার যত্নে, সেই শতাধিক বর্ষের বিশৃঙ্খল নানা আকারের মধ্যে অসম্বদ্ধ বঙ্গভাষা বর্ত্তমান উন্নতিতে পরিণত হইয়াছে, এ প্রসঙ্গে তাহা আলোচনার সময় নাই। এখন, বঙ্গভাষা একটা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়া বঙ্গের সুদূর নগর ও পল্লী সকলের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান রাজকীয় সীমাবদ্ধ বঙ্গ দেশে, এই ভাষাকে এক সার্ব্বভৌম শৃঙ্খলায় সুসম্বদ্ধ করিয়া তাহার যে যে অভাব আছে, তাহা পূর্ণ করিতে, কি শিক্ষিত, কি সাহিত্যসেবী, সকলেরই হৃদয় আলোড়িত হইয়াছে। বিভিন্ন সাহিত্যসেবী মহোদয়গণের সাহিত্যক্ষেত্রে বিভিন্ন পথানুসরণে আর সেই সার্ব্বভৌম সদুপায় সম্ভবপর নহে বলিয়া সকলেরই

প্রতীতি হইয়াছে। তাই এতদর্থে সার্ব্বভৌম মীমাংসার কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সেই মহৎ কার্য্য সু-সিদ্ধির সঙ্কল্পে কলিকাতা মহানগরে "সাহিত্য সভা" "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" "সাহিত্য সম্মিলন" নামে তিনটী কেন্দ্র-সভা প্রতিষ্ঠার বিষয়, আমি অবগত আছি। তদ্ভিন্ন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানেও কতকগুলি সাহিত্য-সমিতি সৃষ্টির কথাও সকলেই জানেন।

রাজধানীই, দেশীয় সাধারণের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের মূলকেন্দ্র। সকল সমাজের চিন্তা-শীল, কর্ত্তব্য-কুশল, বিদ্বন্মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় মহোদয়দিগের রাজধানীই, অধিষ্ঠান ও সম্মিলনের এবং তাঁহাদিগের অবধারিত কর্ত্তব্যগুলি দেশের সর্ব্বত্র সহজে প্রচারের সুবিধাজনক স্থান। কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলবিধায়ক"ও নিয়ামক কেন্দ্র, কদাচই একাধিক হইতে পারে না। প্রস্তাবিত "সাহিত্য-সভা" প্রভৃতি তিনটী সমিতির মনস্বী প্রতিষ্ঠাতৃবৃন্দের একবিধ বিরাট্ উদ্দেশ্যের সিদ্ধির দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলেও, মতবৈষম্য না ঘটিলে কদাচই এই ত্রিবিধ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইত না। মস্তক, অথবা কেন্দ্র, কি মধ্য বিন্দু এক ভিন্ন দুই কিংবা ততোধিক অসম্ভব। সরল কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অদ্যাপি প্রকৃত কেন্দ্র, নির্ণীত কি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাদেশিক শাখা সমিতিগুলি এখন ত্রিবিধ আকর্ষণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া "ন যযৌ ন তস্থৌ"-ভাবাপন্ন; অথবা বৈজ্ঞানিক কথায় তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গতি সম্ভবপর।

সকল দেশে, সকল কালে, সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দেশীয় সাধারণের মঙ্গলকর কোন সদনুষ্ঠান-সাধনে ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে মত-বৈষম্য অপরিহার্য্য। সে স্থলে শুভ কামি-নেতৃগণ, স্ব স্ব ব্যক্তিগত মত পার্থক্য-নিরাকরণে সার্ব্বভৌম উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে সংযত ভাবে সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। সেই সমিতির নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের অধি-কাংশের প্রদত্ত অভিমতই সমস্ত দেশবাসীর সার্ব্বভৌম মত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তাহাতে শুভাকাঙ্ক্ষী বিরুদ্ধমতদাতৃগণ স্ব স্ব রুচিবৈষম্য পরিহার দ্বারা অধিকাংশ মতকে শিরোধার্য্য ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাহা সু-সম্পন্ন করিয়া দেহ, মন, প্রাণ এবং অর্থ নিয়োগে দ্বিধা বোধ করেন না। অতএব উদ্দেশ্য-সাধনের নানাবাধা-বিপত্তি কাটাইয়া দেশের সুমঙ্গল সাধনে অসুবিধা হয় না।

যদি এই স্থলে নেতৃগণের স্ব স্ব মতের দুর্দ্দম পক্ষপাতিতা উপস্থিত হয়, তখন দলাদলিতে কার্য্যসিদ্ধি স্থানে, অসিদ্ধিই অবশ্যম্ভাবী। এই সামঞ্জস্য সম্পাদন পক্ষে সমাজের প্রস্তাবিত বল ক্ষীণ হইলে যদি সে সময়ে রাজশক্তি তাহাতে স্বার্থ বিজড়িত থাকেন, তবে রাজশক্তি সমাজের সেই কেন্দ্র স্থান অধিকৃত করিয়া স্বার্থানুকুলে এক দলকে হস্তগত করিয়া কি স্বকীয় শক্তিবলে স্ব মতানুসারে তাহা সুসম্পন্ন করেন। আদিমকাল হইতে প্রথমে সমাজবল গঠিত হইয়া, দেশীয় সাধারণকে সুনিয়ত করে। তাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলাদলি ঘটিয়া সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্ব্বল হইলে, বল ও প্রভুত্ব-পরায়ণ রাজশক্তি, আবির্ভূত হইয়া যথেচ্ছ ভাবে সমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ-বিধানে রাজবল অপেক্ষা

সামাজিক নেতৃত্ব যে, সকল কালে সকল দেশে স্পৃহনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ যদি দুর্দ্দৈব ঘটনায় রাজশক্তির সহিত নিরাপদে লোকমত গঠিত সমাজশক্তির সংঘর্ষ ঘটে, তবে সেই সংঘর্ষের ফল ও উদ্দেশ্য বিষয়ের ভবিতব্য বিধাতা ব্যতীত মানববুদ্ধির অনধিগম্য।

আমাদিগের সুদয়াল গবর্ণমেণ্ট, বিদেশীয় এবং ভিন্ন ভাষাভাষী হইলেও অপক্ষপাতে বঙ্গভাষার উন্নতিতে কোন বাধাই প্রদান করেন নাই এবং তাঁহারা এই মহৎকার্য্য সাধনে প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন। অতএব কোন রাজবিধান-প্রণয়নে আমাদিগের মাতৃভাষার সংস্কার ও সুগঠনে বিঘ্ন-উৎপাদনের কোন আশঙ্কাই নাই। তবে রাজমন্ত্রিগণ কিছু দিন হইল এদেশের শিক্ষাভার যে কারণে স্বহস্তে লইয়াছেন, আমাদিগের উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সুসিদ্ধি পক্ষে সেই কারণের সঙ্গে সংঘর্ষ সম্ভাবনা তেমন কিছুই দেখা যায় না। রাজপক্ষ সম্প্রতি বঙ্গভাষার শিক্ষাপুস্তকগুলি প্রণয়ন ভার পর্য্যন্ত স্বহস্তে গ্রহণ করায়, সেই পুস্তকগুলির ভাষা বৈদেশিকের হস্তে যেরূপ বিকৃত হওয়া সম্ভবপর, তাহাই হইতেছে। তদ্ভিন্ন মূলতঃ ভাষা-সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক সংস্রব বিন্দুমাত্রও নাই। বরং এই মহৎকার্য্যে প্রস্তাবিত অবস্থা সঙ্কটে বড়ই অশুভজনক। ব্যক্তিগত রুচি ও মতবৈষম্য অনিবার্য্য হইলেও, সুসংযমে তাহা সার্ব্বভৌম ভাবে সমাধান পক্ষে অদ্বিতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই।

প্রতিযোগিতার অবসর দিয়া প্রস্তাবিত কেন্দ্রগুলির ধ্বংস বিধান অকর্ত্তব্য। সেই সমিতিগুলির কর্তৃপক্ষ সকলেই বিদ্বান্ এবং অনেকেই বঙ্গীয়সাহিত্যে পরমহিতৈষী ও সুপরিচিত। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সমিতি গঠন করিলেও, সকলেই এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে লক্ষ্য রাখিয়া কায়মনোবাক্যে যে যত্ন করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহাদিগের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ। অতএব তাঁহাদিগের কথঞ্চিত মতবৈষম্য থাকিলেও, আমরা যেমন সেই সমিতিগুলির ধ্বংস কামনা করি না, সেইরূপ কোন এক সমিতির স্বার্থ ও প্রভুত্ব প্রসারক পক্ষ গ্রহণ ও বাঞ্ছনীয় নহে। সেরূপ করিতে গেলে এই সম্মিলনের সুমহৎ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বিষম বিঘ্ন ঘটিয়া, ইহাও একটা দলরূপে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব প্রস্তাবিত মণ্ডলী-গঠনে আমরা সকল সমিতির এবং বঙ্গীয় শিক্ষিত ও সাহিত্যসেবিবৃন্দের পূর্ণভাবে সহায়তা গ্রহণে এই কেন্দ্রকে সার্ব্বভৌম বলে বলীয়ান করিতে যত্নপর না হইলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল।

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এই মণ্ডলী বা কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠায় আমাদিগের সংযম ও লোক সেবাব্রতে অপক্ষপাতিতা প্রতিপন্ন করিলে, এবং ইহার বিরাট কার্য্যপ্রণালী বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে, আর ইহাতে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িকতার বিন্দুমাত্র সংস্রব না রাখিলে, প্রত্যেক সমিতির উৎসাহশীল কর্ত্তৃপক্ষ ও সদস্যবৃন্দের কেবল সহানুভূতি লাভ ব্যতীত, সকলকে সর্ব্বথায় এই কেন্দ্রের উন্নতি পক্ষে যথোপযুক্ত সাহায্যকারী ও পরিচালকরূপে পাইব। তাঁহারা বিভিন্ন নামকরণে স্ব স্ব সমিতির কল্যাণ-কামনার সঙ্গে এই কেন্দ্র স্বরূপ মণ্ডলীর সার্ব্বভৌম শক্তিসঞ্চয়ে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। আর শিক্ষাগ্রন্থ-প্রণয়ন ও প্রচারে রাজশক্তিও, নির্ব্বিঘ্নে শিক্ষাপুস্তক-প্রণয়নে এই মণ্ডলীর ভাষা সংস্কারক-

পদ্ধতি গুলির পরামর্শ গ্রহণ, তাহার প্রতি আস্থা স্থাপনে যে রূপ মনোযোগী হইবেন, সেইরূপ সাহিত্য-সেবী রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ এবং পুরুষানুক্রমিক বঙ্গবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মাড়বারী, কি খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায় নিরাপত্তিতে ইহাতে যোগদান করিয়া স্ব স্ব সম্প্রদায় হইতে যথোপযুক্ত সদস্য নির্ব্বাচন দ্বারা স্বতঃ পরতঃ নানা উপায়ে ইহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করিবেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সম্মিলনের দুরদর্শী অনুষ্ঠাতৃগণ, যেরূপ অপক্ষপাতী যত্নে ইহার আহ্বান ও কার্য্যপরিচালনা করিলেন, এবং "সারস্বতভবন" প্রতিষ্ঠা ও "মণ্ডলী" স্থাপনে যেরূপ উদারভাবে কার্য্যদক্ষ মহোদয়দিগের প্রতি ভার প্রদান দ্বারা ভবিষ্যতের কার্য্যভার অবলীলাক্রমে স্বকীয় স্কন্ধে লইলেন, তাহাতে "আমরা" এই বহুবচনান্ত স্বকীয়ার্থ বাচক সর্ব্বনাম, বঙ্গীয় হিন্দু, মুসলমান, মাড়বারী, খৃষ্টান পার্ব্বত্য ও বনবাসী সম্প্রদায়ের সকলের প্রতিই প্রযুক্ত হইল বলিয়া, আমার আনন্দের সীমা নাই।

এই মণ্ডলী বা কেন্দ্র স্থাপন দ্বারা বঙ্গভাষার সংস্কার ও সুগঠনে সর্ব্ববাদিসম্মত একটা শেষ মীমাংসা করিয়া, তদনুসারে বঙ্গসাহিত্য একপথে পরিচালনার উপায় করা উচিত। এখন যাহারা সুকুমারমতি শিশু, ভবিষ্যতে যে তাহারাই দেশ ও সমাজের নেতা, আর আমাদিগের প্রাণপণ যত্নের ফলাফল তাহারাই বংশপরম্পরায় ভোগ করিবে; তাহা বলাই বাহুল্য।

সেই সুকুমার শিশুগণের হৃদয়ে, ভাষাবিষয়ে যে প্রণালী গাঢ় অঙ্কিত হইবে, তাহা যৌবন কেন প্রৌঢ় বয়সেও অপসারিত করা বড়ই ক্লেশদায়ক। ইহাতে যে একটা ঘনঘটাচ্ছন্ন তিমিরাবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে বঙ্গীয় সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্বন্মণ্ডলী ও সাহিত্যসেবিগণের আর দলাদলি করিয়া আপনাদিগের মধ্যে মতবৈষম্য সংঘটন অবিধেয়। এই প্রবলতম বাধা অতিক্রম নিমিত্ত প্রত্যেকের একপ্রাণতার উদ্যমকল্পে আর বিলম্ব করা বৈধ নহে। ফলতঃ সকলের একপ্রাণতা থাকিলে সেই তিমিরাবরণ সহজেই বিদুরীকৃত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। একতা ও একাগ্রতার অভাব ঘটিলে সমস্তই ব্যর্থ। আমরা বঙ্গীয় সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব সমাজের সুমঙ্গলজনক বঙ্গভাষার সংস্কার ও সুগঠনে সার্ব্বভৌম এই মণ্ডলী-স্থাপনে প্রত্যেকে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ দ্বারা আড়ম্বর বর্জ্জনে কর্ত্তব্য সাধন করিব। তাহাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক রাখিব না। সংযত ভাবে সুশৃঙ্খলায় কর্ত্তব্য নিরূপণ ও নতশীর্ষে তাহার পালনে বদ্ধপরিকর হইলে কোন বাধা বিপত্তিতেও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিবে না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মত ও প্রভুত্ব-স্পৃহা সংযত না করিলে কোন সার্ব্বভৌম সদুদ্দেশ্য-সাধন সম্ভবপর নহে। সুসভ্য সকল দেশে সকল সমাজেই বিবিধ নীতিগাথা প্রচলিত আছে; আর তাহা দেশের নেতৃমণ্ডলীর সুবিদিত থাকিলেও ব্যক্তিগত প্রভুত্ব-আশা—বিকট যশোলিপ্সা, আর মতবৈষম্যে সেই অভিজ্ঞতার ফল অনেক সময়ে সংযত ভাবে নিয়ামক হয় না। আমাদিগের প্রত্যেক শিক্ষিত ও সাহিত্যসেবীকে সে কথা স্মরণ করিয়া চলা উচিত।

এই সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃগণ, বঙ্গের হিন্দু, মুসলমান, মাড়বারী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে প্রথিতনামা মহোদয়গণকে সম্মেলন নিমিত্ত, যেরূপ অপক্ষপাত উদারভাব প্রকাশ করিয়াছেন;—যেরূপ নানা বিঘ্ন বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া সুবিনীত ব্যবহার—অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন; জানিনা কি অলৌকিক ও অপরিজ্ঞাত কারণে তাঁহাদিগের সেই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। সর্ব্বশ্রেণীর সহস্রাধিক মহোদয়, সমাদরে আহুত হইলেও অনেক প্রতিভাশালী, কর্ত্তব্যনিপুণ সাহিত্যসেবী আগমন করিতে পারেন নাই। তদ্বিষয়ে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা হইলেও তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

এই সম্মিলনে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিন্দুমাত্র নাই। অথচ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রথিতযশোভূষিত সাহিত্যসেবিগণ, জানিনা কি কারণে একজনও এই সম্মিলনে আগমন করেন নাই। কর্ত্তব্য-পরায়ণ মনোবলে বলীয়ান্, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বিখ্যাত মুসলমান সাহিত্য-সেবিগণের মধ্যে মাত্র একজন মহাপ্রাণ মহোদয়কে উপস্থিত দেখিতেছি। তিনিও প্রাণস্পর্শী ভাষায় এজন্য যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এজন্য সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃ মহোদয়-দিগের ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই। এই সম্মিলনে যতগুলি কর্ত্তব্য-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত ও নির্ব্বিবাদে সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নাই। বরং বর্ত্তমান দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিরপেক্ষ সার্ব্বভৌম মঙ্গলই সেই সকল প্রস্তাবের বর্ণে বর্ণে প্রতিপাদিত হইতেছে। এখন এই সম্মিলনের আদ্যন্ত বিবরণ প্রচারিত হইলে, প্রস্তাবিত মণ্ডলী-গঠন এবং আগামী সম্মিলনে যে বঙ্গের সর্ব্বস্থানের সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিত ও সাহিত্যসেবীদিগের যথেষ্ট সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রকটিত হইবে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মহৎ কার্য্য আরম্ভের সূত্রপাতেই তাহার উদ্দেশ্য বিষয়, সকলের হৃদয়ে অনস্যূত হইবার সুবিধা হয় না। অতি ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজ হইতেই মহামহীরুহ উৎপন্ন হয়।

এখন এই মণ্ডলীস্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে বঙ্গবাসী শিক্ষিত ও সাহিত্য-সেবিবৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করাই সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য। বঙ্গের পুরুষানুক্রমিক অধিবাসী হিন্দু, মুসলমান, মাড়বারী, খৃষ্টান হইতে নিম্নশ্রেণী, পার্ব্বত্য বন্যজাতির মধ্যে শিক্ষিত, কিম্বা তাহার অসদ্ভাব ঘটিলে অল্পশিক্ষিত অথচ স্ব সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠাপন্ন সদস্যগণ পর্য্যন্ত মণ্ডলীর স্থায়ী সদস্য পদগ্রহণের বিশেষ যত্ন করা উচিত। সময়ের অল্পতায় তাহার কারণগুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না। ফলতঃ যোগ্যলোকের অভাব বলিয়া অল্প শিক্ষিতগণকে অবহেলা দ্বারা আমাদের অনেক সার্ব্বভৌম কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে। স্ব স্ব সম্প্রদায়ে এই অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিবিশেষের যে কিরূপ আধিপত্য, তাহা আমরা উপলব্ধি করি না। এরূপ সার্ব্বভৌম ভাষা-সংস্কার ও সুগঠন পক্ষে সেই অল্পশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের অপ্রয়োজন বলিয়া আশুপ্রতীতি হইলেও, তাহা-দিগকে সভা সমিতিতে ক্রমে যোগদানে সাদর আহ্বান, এবং তাচ্ছিল্য ও অবহেলা বর্জ্জন করিয়া সমাগত প্রত্যেক প্রতিনিধিকে ইহার উদ্দেশ্যগুলি ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে এই মণ্ডলীর বিস্তর সহায়তা-লাভের সম্ভাবনা। এ বিষয়ে প্রাদেশিক সভাগুলিকেই অধিকতর

যত্ন করা উচিত। আমরা বিজ্ঞের ন্যায় উপেক্ষা-স্থলে, সেই শ্রেণীর নেতৃগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া অম্লান হৃদয়ে ধীরভাবে উদ্দেশ্যগুলি বুঝাইবার উপায় করিলে, ক্রমশঃ তাহারা এবিষয়ে চিন্তা ও কর্ত্তব্যসাধনে কেন তৎপর হইবে না? হীন ব্যক্তিকে সাদরে স্বহৃদয়ে আশ্লিষ্ট করিয়া উন্নত করাই মহাপ্রাণতার কর্ম্ম। হীনকে হীন বলিয়া ঘৃণা দ্বারা, অভিমান প্রকাশ ব্যতীত, সমাজের উন্নতি হয় না। তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ, মত্ত বারণকেও বন্ধন করিতে পারে।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মধ্যে মণ্ডলী-স্থাপনের যত্ন করিতে যাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের মত সুদক্ষ কর্ত্তব্য-কুশল ব্যক্তি অদ্যকার সম্মিলনে অল্পই উপস্থিত আছেন। তাঁহাদিগের উদ্যমশীলতায় এই উদ্যোগকারীর সংখ্যা অবশ্যই ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে। পুরুষানুক্রমিক বসবাস ও জন্ম স্বত্বে মাড়বারী ও দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়কে এই মণ্ডলীর কর্ত্তব্য সাধনে প্রযত্ন-পরায়ণ করিতে এবং তাঁহাদিগের নির্ব্বাচিত উদ্যমশীল কর্ত্তব্য-কুশল মহোদয়-গণকে এই মণ্ডলীর সদস্য মধ্যে নিবিষ্ট করিতেও, বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। ফলতঃ পুনরায় নিবেদন করিতেছি, এই মণ্ডলী যে রাজনৈতিক কি সামাজিক কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক-শূন্য, একথা আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলীতে অক্ষোভে সরলভাবে প্রতিপন্ন না করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিস্তর বিঘ্ন আছে। এ বিষয়ে মণ্ডলী এবং প্রাদেশিক সমিতি সমূহের তুল্যরূপে একাগ্র মনে চেষ্টা করা উচিত। এ সকল বিষয় এখন বিস্তৃত আলোচনার সময় নাই। তৎসম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধে যথাসাধ্য বিবৃতির চেষ্টা করিয়াছি।

বঙ্গভাষার অনেক শব্দ ও নাম যে আবৃত্তি দোষে কেবল খৃষ্টান ও মাড়বারী সম্প্রদায়ই বিকৃত করেন, একথা বলা যায় না। আমাদিগের শিক্ষিত হইতে অল্পশিক্ষিত বালক ও যুবকগণও জানিনা কি একটা মোহাকৃষ্ট হইয়া পরস্পর আলাপে, লিপিব্যবহারে, বৈদেশিক শব্দ যেমন অকারণে ব্যবহার করেন, সেইরূপ নামগুলিকেও বৈদেশিক অনুকরণে বিকৃত করিতে অনুরাগী। "বারাণসী"কে "বেনারস", "মুম্বই"কে "বোম্বাই", "চট্টগ্রাম"কে চাটগাঁ-স্থলে "চিটাগং" এমন কি "কলিকাতা"কে পর্য্যন্ত "ক্যালকাটা" বলিয়া যেমন প্রচলিত করা হইতেছে, সেইরূপ ইংরাজী একাক্ষরী প্রণালীতে এমন কি ইংরাজী বর্ণমালা যোজনায় এ, সি, চাটুর্জি, বি, সি, সেন ইত্যাদি নামকরণে, কিম্বা কোন প্রকার ব্যবসায় ঘটিত কি স্বদেশীয় নানা বিষয়ক সভা সমিতির নামেও সেইরূপ একটা উৎকট চেষ্টার প্রবাহ এখনও বঙ্গদেশে প্রখর ভাবে বহিতেছে। এই সম্মিলনে আসিয়াও কোন কোন শিক্ষিত মহোদয়কে ইহার "কন্ফা-রেন্স" নাম উল্লেখ করিতে দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। অতএব বঙ্গভাষাকে পূর্ণাঙ্গ করা এবং সাধ্যমত বৈদেশিক নামের প্রতিনাম নির্ব্বাচন পক্ষে এখন শিক্ষিত সমাজের যত্ন প্রকটিত হইলেও আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত মোহ অপসৃত হইতেছে না। এই সম্মিলন এবং প্রস্তাবিত মণ্ডলীই তাহার প্রতিবিধানে সুপারগ। নতুবা এই মোহটাও বঙ্গভাষার সংস্কার, সুগঠন ও প্রচার পক্ষে অল্প বাধাজনক নহে। ইহা মণ্ডলীস্থাপনের প্রস্তাবসমর্থনার্থ উল্লেখ করা অপ্রা-সঙ্গিক হইলেও, নীরব থাকিতে পারিলাম না।

এখন উপসংহারকালে নিবেদন করিতেছি যে,—এই সম্মিলনে গত কল্য ও অদ্য যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত ও সমর্থিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সুনিয়মে স্থায়ীভাবে আলোচনা, মতামতসংগ্রহ, সুমীমাংসা এবং সেইগুলি প্রচার পক্ষে মণ্ডলীই প্রধানতম অবলম্বন। প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ, বৈদেশিক নানা বিষয় ও দ্রব্যাদির নামের প্রতিশব্দনির্ব্বাচন, বঙ্গীয় বর্ণমালাসংশোধন, অভিধান ও ব্যাকরণ-প্রণয়ন এবং প্রচার হইতে আরম্ভ করিয়া, সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠার উপকরণ সংগ্রহ, বৈদেশিক দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, রসায়ণ, ইতিহাস, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদির প্রয়োজনীয় পুস্তক-অনুবাদ, নূতন পুস্তকপ্রণয়ন ও প্রচারাদি পর্য্যন্ত, যাবতীয় কর্ত্তব্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া বঙ্গভাষার সংস্কার ও সুগঠন পক্ষে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহী যত্ন, স্থায়ীভাবে করিতে হইলে মণ্ডলী-স্থাপন যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা এখন বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি জেলায় ও বিভাগে কার্য্যকরী শাখা-সভা স্থাপন ও তাহার উন্নতি ও বলবিধানেও মণ্ডলীকে প্রাণপণে যেমন চেষ্টা করিতে হইবে, আবার সেই সকলগুলির সহায়তায় বঙ্গের সর্ব্বপ্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর বলসংগ্রহে মণ্ডলীর স্বকর্ত্তব্য পথ সুবিস্তৃত ও সার্ব্বভৌম শক্তিতে উন্নত করিতেও সেইরূপ যত্ন করা উচিত। আমি জ্ঞানবুদ্ধির অল্পতায় আগ্রহের দুর্দ্দমনীয় বেগে নানা কথার অবতারণায়, মাননীয় সদস্যবৃন্দের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার বুদ্ধির দোষে মণ্ডলীর কর্ত্তব্য বিষয়ে বিস্তর বাহুল্যকথা উপস্থিত করা দোষাবহ হইলেও এই সুমহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত মণ্ডলীকে সার্ব্বভৌম কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা, অথবা অন্যরূপে সেই কেন্দ্র সংস্থাপন করা, যাহাই কেন বিদ্বান ও সাহিত্যসেবিগণের বিবেচনায় স্থির হউক; আমি মণ্ডলীকেই সেই কেন্দ্র বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব সমর্থন উপলক্ষে প্রাগুক্ত বিষয়গুলি নিবেদন করিয়াছি। আর তাহাই ক্ষুদ্র হৃদয়ে আশার উজ্জ্বল দীপপ্রভায় লক্ষ্য রাখিয়া এই প্রস্তাব এবং মণ্ডলী-স্থাপনের ভার যে যথাযোগ্য মহোদয়গণের প্রতিই অর্পিত হইয়াছে, তাহা প্রাণের সহিত অনুমোদন করিতেছি।

৯। প্রস্তাব।

আগামী বৎসর রাজসাহী জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হউক।

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল মহাশয় (রাজসাহী), এই প্রস্তাব উত্থাপনপূর্ব্বক কহিলেন—

"সম্মিলন একবর্ষমাত্র পরমায়ু লইয়া জন্মিয়া থাকিলে ইহা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না। আমার মতে যাহাতে ইহার স্থায়িত্ব বিধান করা যাইতে পারে, সে চেষ্টা অত্যাবশ্যক। বর্ষে বর্ষে ইহার অধিবেশন হওয়া উচিত। এ নিমিত্ত আমি রাজসাহীবাসীর পক্ষ হইতে আগামী বর্ষে রাজসাহীতে সম্মিলনকে আহ্বান করিতেছি। সম্মিলন এই বিনীত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। এ স্থলে এ বর্ষের অভিজ্ঞতা হইতে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমার যে সকল কথা মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, তাহা

না বলিয়া নীরব থাকিতে পারিতেছি না। এরূপ বিরাট্ সভা সাহিত্য-আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ সাহিত্যকে মাতৃপূজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি তাহা স্বীকার করি না। সকল সাহিত্য, সকল বিদ্যাই সেই এক অদ্বিতীয় পরাৎপরের জ্ঞানলাভার্থ। মনুষ্যজীবনের অন্য উদ্দেশ্যই নাই। তাঁহাকে জানাই একমাত্র কার্য্য। এ কার্য্য বিরাট্ সভায় বহু করতালির মধ্যে হইতেই পারে না। এ নিমিত্ত আমার বিবেচনা হয় যে আগামী বর্ষ হইতে সম্মিলনের প্রথম দিনের আনুষ্ঠানিক অধিবেশনটী মাত্র সাধারণ হউক। কারণ সাধারণে ভাববিস্তার করাও সাহিত্যানুরাগে সাধারণকে অনুপ্রাণিত করাও, সম্মিলনের কর্ত্তব্য। এই সাধারণ সভায় সভাপতি মহাশয় কতিপয় বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন, এবং ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাসভা গঠিত করিয়া পর পর সভায় তত্তৎ বিষয়ের আলোচনা করিবেন। এই সকল শাখা সভায় সাধারণের প্রবেশ অধিকার থাকিবে না। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, কেবল তাঁহারাই ঐ সকল সভায় প্রবন্ধপাঠ এবং আলোচনাদি করিবেন। আগামী বর্ষে আমরা রাজসাহীতে এই তিনটী বিষয় আলোচনার নিমিত্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ১। সাহিত্য, ভাষাতত্ত্বসহ। ২। ইতিহাস, পুরাতত্ত্বসহ। ৩। ফলিত রসায়ণ (applied chemistry) প্রথম অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় এই তিন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা তিনটী ক্ষুদ্র সভা গঠিত করিয়া দিবেন। ইঁহারা ঐ সকল বিষয়ের প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা করিবেন। এইরূপ হইলে স্থায়ী উন্নতি হওয়ার সম্ভব। এই বিষয় আপনাদিগের অনুমোদন অপেক্ষা করি।

এক্ষণে আমরা বক্তব্য শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর সেরূপ চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, ভুরিভোজন দ্বারা আপনাদিগের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করিয়াছেন, তাহা আপনারা শীঘ্র ভুলিতে পারিবেন না। আমরা আপনাদিগের উদর ও রসনার তদ্দূর তৃপ্তিসাধন করিতে পারিব বলিয়া স্পর্দ্ধা করি না। তবে ভরসা আছে, আমাদিগের ইচ্ছাই আপনারা কর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করিবেন।

আমি পুনরায় আপনাদিগকে আগামী বর্ষের নিমিত্ত রাজসাহীতে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমাদিগের জেলায় যাওয়া বড়ই কঠিন, এবং সকল সময় সমান সুবিধাও থাকে না। এ নিমিত্ত সম্মিলনের অধিবেশন-কাল পশ্চাৎ নিরূপণ করিয়া আপনাদিগকে জানাইব।

আমি এই মাত্র শ্রীযুক্ত নাটোর মহারাজা বাহাদুরের প্রত্যুত্তর টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইতেছি। তিনি আপনাদিগকে পরম আহ্লাদের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে আহ্বান করিতেছেন। এ নিমিত্ত আমি এখন আপনাদিগের উদর ও রসনাকে আশ্বস্ত করিতে সক্ষম হইতেছি। আশাকরি আপনারা সকলেই তাঁহার এই আমন্ত্রণ স্বীকার করতঃ যথাকালে উপস্থিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল বাহাদুর (রাজসাহী) উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন নিমিত্ত কহিলেন—

শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় আগামী অধিবেশন রাজসাহীতে আহ্বান করিতে বড়

ভীত হইয়াছিলেন, আমি ঐ আমন্ত্রণ সমর্থন করিয়া বলিতেছি যে, মহারাজা কেবল কাশীমবাজারের মহারাজা নন, তিনি রাজসাহীরও মহারাজা, রাজসাহীতেও তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তি আছে, রাজসাহীর মঙ্গল দেখিতে তিনি বাধ্য, রাজসাহী তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে উপকার প্রত্যাশা করে। মহারাজা যে ভাবে কাশীমবাজারে অতিথি-সৎকার করিলেন, রাজসাহীও ঐ রূপ অন্ততঃ কথঞ্চিৎ অভ্যর্থনা করিতে পারে, তৎপক্ষে সাহায্য করিবেন। মহারাজার সুদৃষ্টি থাকিলে রাজসাহীর অধিবেশনও সুসম্পন্ন হইবে তৎ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সভাপতি (শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) মহাশয় রাজসাহীর অপরিচিত নহেন, তিনিও রাজসাহীর একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। ঐ উপবেশনে তাঁহারও সাহায্য আমরা আশাকরি। তা হইলে রায় মহাশয়ের ভীত হওয়ার কোন কারণ নাই। আমি তজ্জন্য নির্ভয়ে রাজসাহী অধিবেশনের নিমন্ত্রণ প্রস্তাব সমর্থন করি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় (রাজসাহী) উক্ত প্রস্তাবের পুনঃ সমর্থন নিমিত্ত কহিলেন—

মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে আমার পরম স্নেহভাজন, শ্রীমান শশধর রায়, আগামী বৎসরে রাজসাহীতে এই সম্মিলন আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবক শ্রীমান যেরূপ উচ্চ শিক্ষায় পারদর্শী, সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার দূরদর্শিতা ও নিরভিমান বিনীতভাব, যাহা তাহার স্বভাবের উজ্জ্বল ভূষণস্বরূপ, প্রস্তাব উত্থাপন কালে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনায় তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। আমার পূর্ব্বে যিনি এই প্রস্তাব সমর্থিত করিয়াছেন, তিনি আমার হৃদয়ের উৎসাহবর্দ্ধক যে একটা বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, রাজসাহী-বাসী জনসাধারণের মধ্যে আমার মত অক্ষম ও নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে দৃষ্টতঃ নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যে, তাহাই এক মাত্র আশার সমুজ্জ্বল আলোক। সেই আলোক পুরোভাগে রাখিয়া এই গুরুতর প্রস্তাব-সমর্থনে আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। আমি যে এই প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্ব্বেও প্রস্তাবিত আলোকে অনু-প্রাণিত হইয়াছিলাম, তাহা নিবেদন করা বাহুল্য।

এই সম্মিলনের মাননীয় সভাপতি এবং ইহার প্রাণস্বরূপ বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে অসীম উৎসাহশীল সুকৃতি শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, প্রত্যক্ষ রাজসাহীর অধিবাসী না হইলেও পরোক্ষে রাজসাহীর সঙ্গে সুদৃঢ় সম্বন্ধে চিরনিবদ্ধ। এই মাননীয় মহাত্মদ্বয়ের বিস্তৃত জমাদারী রাজসাহী জেলায় অবস্থিত; তদ্ভিন্ন রাজসাহী বিভাগে তাঁহাদিগের ভূম্য-ধিকারের সর্ব্বপ্রধান অংশ বিদ্যমান। সুতরাং তাঁহাদিগের সাক্ষাতে তাঁহাদিগের সঙ্কল্পে এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবা মাত্র, আমাদিগের সমস্ত অক্ষমতার চিন্তা তিরোহিত হইয়াছে। অতএব আমার অনুমোদনটা কেবল সম্মিলনের কার্য্য-প্রণালীর একটা প্রথা রক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

স্নেহভাজন শ্রীমান শশধর রায়, প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সম্মিলনে সমুপস্থিত মাননীয়

মহোদয়গণকে করজোড়ে সুবিনীত আমন্ত্রণ করিবার সময় বিষাদ-কলুষিত চিত্তে যে একটী কথার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মর্ম্মন্তুদ কথাগুলি কিছু বিশদ ভাবে নিবেদন করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন—"আমরা সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া আপনাদিগকে রাজসাহীর সম্মিলনে যথাসাধ্য সেবা ও অভ্যর্থনা দ্বারা লইয়া যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, কিন্তু আপনাদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে কিছু সহায়তা করিতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না।"

এই কথাগুলিতে সুবিনীত ভাবে রাজসাহী-বাসীর অকিঞ্চনতা যেমন প্রকাশ পায়, সেই সঙ্গে একটা হৃদয়বিদারক শোকাবহ ঘটনাও স্মৃতিপথারূঢ় হয়। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজধানী নাটোরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে "রাজনৈতিক প্রাদেশিক সম্মিলন" আহ্বান করা হয়। রাজসাহীবাসী-ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র সকল শ্রেণী প্রাণপণ যত্নে, আগন্তুক মহোদয়গণের সেবা করিলেও দৈবের আকস্মিক উৎপাতরূপ ভীষণ ভূ-কম্প উপস্থিত হইয়া সেই উৎসাহপ্রফুল্ল জনগণের মধ্যে যে কি নিদারুণ শোকাবেগ—কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই সুবিদিত। সেই সম্মিলনের কার্য্যারম্ভের পর সেই দৈব উৎপাত উপস্থিত হয়। ঐতিহাসিক নাটোর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন যাহা কিছু পুর্ব্বের ভূমিকম্পেও বিদ্যমান ছিল, এবার তাহাও বিধ্বস্ত হয়। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের কত শত মূল্যবান্ জীবনসুসজ্জিত প্রাসাদোপম গৃহ নিমেষ মধ্যে করাল কালকবলে কবলিত হয়, তাহার সংখ্যা করা কঠিন।

এই অভাবনীয় দৈব উৎপাতে কিছু সময়ের নিমিত্ত রেলওয়ে, টেলিগ্রাম ও ডাক চলাচল পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে বন্দ হয়। নিমন্ত্রিত মহোদয়গণ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন দূরের কথা, দূরস্থানে তাঁহাদিগের আত্মীয়বর্গের কি দশা হইল, তাহা পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন না। আর্জ্জেণ্ট টেলিগ্রাম নিমিত্ত শত শত টাকা প্রদত্ত হইলেও তাহা আর প্রেরিত হইল না।—দূরস্থ আত্মীয়গণের টেলিগ্রামও সেইরূপে বিফল হইল। রেলওয়ে ও গবর্ণমেণ্টের সংবাদ-সংখ্যার আধিক্য অন্যের সংবাদ আদান প্রদান তিন চারিদিন পর্য্যন্ত স্থগিদ ছিল।

আগন্তুকগণের হৃদয়ে এই তীব্র যাতনা; তাহার পরে নাটোরের মর্ম্মবিদারক, প্রত্যক্ষ শোকাবহ ঘটনায় সকলেই ম্রিয়মান হইলেন। অবশেষে যিনি যেরূপ পারিলেন, তিনি সেই উপায়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এজন্য পথে যে তাঁহাদিগকে কিরূপ অনভ্যস্ত দারুণ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, তাহার ভুক্তভোগী মধ্যে বোধ হয় কেহ কেহ অদ্যকার সম্মিলনে উপস্থিত আছেন।

ইহার পরে বরিশালে প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলন সংঘটনে, নিমন্ত্রিত মহোদয়গণ যথাকালে উপস্থিত হইলেও কি অভাবনীয় ঘটনায় তাহা পণ্ড হয়, তাহা সকলেই জানেন। সে সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, আমি অদৃষ্টবাদী ব্রাহ্মণ-সন্তান, সুতরাং আমি তাহাকে দৈব নিগ্রহই বলিব।

তৎপরে রঙ্গপুরে প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলন আহূত হইয়া নানা প্রতিবন্ধকে নামমাত্র কার্য্য হয়। বিগত বৎসরে অসীম উৎসাহশালী পুরোবর্ত্তী এই মাননীয় শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর এই স্থানে এই বিরাট সম্মিলনের আয়োজন করিলে কিরূপ মর্ম্মন্তুদ শোকাবহ ঘটনায় তাহা ব্যর্থ হয়, তাহা মনে করাইয়া দিয়া আর এই শুভ সম্মিলনকে নেত্র-জলাভিষেকে অভিষিক্ত করিতে চাই না। সেই কর্ত্তব্যকুশল অধ্যবসায়ী, মাননীয় মহারাজ এবার সেই অনুষ্ঠান করিয়া বোধ হয় নির্ব্বিঘ্নেই তাহা সুসম্পন্ন হইতে চলিয়াছে। মহৎকার্য্যে নানা বিঘ্ন। উহাই অনুষ্ঠাতৃগণের কর্ত্তব্যপ্রবণতা সম্বন্ধে বোধ হয় শ্রীশ্রীভগবানের কঠোর পরীক্ষা। শ্রীমন্মহারাজের মত কয়জন উদারহৃদয় মহাত্মা এই অগ্নি-পরীক্ষায় অটল থাকিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা নিবেদন করা কঠিন। তবে মহাজনের পথ অনুসরণ করাই পরবর্ত্তিগণের পক্ষে আশ্বাসজনক। আমরাও সেই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াই এই প্রস্তাব-সমর্থনে সাহসী হইয়াছি। দৈবের সেই অভাবনীয় শক্তির কথা স্মরণ করিলে স্নেহভাজন শ্রীমান শশধরের প্রস্তাবিত উক্তিগুলি সবিশেষ ধীশক্তি ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

অতএব আমি রাজসাহীর একজন অক্ষম ও নগণ্য অধিবাসী হইয়াও ফলাফল শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া সমস্ত রাজসাহীর অধিবাসীদিগের পক্ষ হইতে গললগ্নীকৃতবাসে, বিনয়নম্রভাবে আপনাদিগকে আগামী বৎসরে এই সম্মিলনে সানুগ্রহে যোগদান জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

১০। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পণ্ডিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও পণ্ডিত দামোদর বিদ্যানন্দের অকালমৃত্যুজন্য ক্ষোভ ও দুঃখপ্রকাশবিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয় (টাকী, ২৪ পরগণা) এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কহিলেন—

"ইহজগতে অবিমিশ্র সুখভোগ দুর্ঘট। সুতরাং অদ্য এই সাহিত্যিক সম্মিলনের আনন্দলহরী মধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রন্দনের রোল তুলিতে হইতেছে। এই সভায় বহুতর সাহিত্যিকের দর্শনলাভ করিয়া যেমন প্রীতির উদয় হইতেছে, অমনি সেই সঙ্গে দুইখানি পরিচিত মুখের অদর্শনে ততোধিক কাতর হইতে হইতেছে। অতি অল্পদিন হইল বঙ্গের সেই দুইটি কৃতী ও তেজস্বী সন্তান অকালে আমাদিগের মায়া কাটাইয়া নিত্যধামে ভগবানের ক্রোড়ে শান্তি ও আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। আমি পণ্ডিতবর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এবং ত্যাগীপুরুষ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের অকালমৃত্যুর কথাই উপস্থাপিত করিতেছি। ফলতঃ এই দুই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণে বঙ্গভাষায় দুইটি উজ্জ্বল রত্নের অভাব হইয়াছে। দুইজনেই বঙ্গভাষায় প্রচুর উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। জন্মভূমির সেবায় দুইজনেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্য করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। স্বদেশহিতৈষণায় চেষ্টা ব্যতীত

ভাষার উন্নতিকল্পেও তাঁহারা যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের ওজস্বিনী ভাষায় এবং হৃদয়োন্মাদক স্বদেশভক্তিসূচক সঙ্গীতাবলীর শক্তি এই দেশে বহুকাল জাগরূক থাকিবে। কিন্তু তাঁহার অভাবে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। উপাধ্যায় মহাশয়ও অসাধারণ শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। তত্তুল্য শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী ইদানীন্তনকালে অতি বিরল। সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তিনি আর্য্যশাস্ত্রের মহিমা বিস্তার করিয়াছেন। আচারে তিনি নির্লিপ্ত ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। ভাষার পুষ্টিকল্পেও তিনি যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন। সংবাদ পত্রের ভাষা তিনি একটি অভিনব স্রোতে পরিচালিত করিয়াছেন। সেই প্রবাহ এতই প্রীতিকর যে, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই তৎপাঠে এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিলাভ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই হৃদয়ে একটি অপূর্ব্বশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। এই দুইজন ভুলিবার বস্তু নহেন। এই জন্য তাঁহাদের মৃত্যুর নিমিত্ত শোক করিতে ও তাঁহাদের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করি।

অন্য একজন কৃতী সাহিত্যিকের নাম প্রস্তাবের সহিত গ্রথিত আছে। তিনি সভাসমিতিতে সর্ব্বদা উপস্থিত না হইলেও, তাঁহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। আমি পণ্ডিতবর দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম্, আর, এ, এস্, মহাশয়ের কথাই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। আমাদের মাতৃভাষাও তাঁহার নিকট কম ঋণী নহে। উপন্যাস হইতে শাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গীতার নানা ভাষ্য এবং সমস্ত টীকা, মূলসহ এবং সমুদয় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া বিদ্যানন্দ মহাশয় যে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবল যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে, শুদ্ধ তাহা নহে, তদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্য বিনির্ণয়ে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সূক্ষ্মদর্শিতারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি অন্য গ্রন্থ না লিখিয়া যদি কেবল গীতার এই প্রকার সংস্করণ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলেও তিনি বঙ্গভাষার কৃতীলেখকগণের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান লাভে সমর্থ হইতেন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এবম্বিধ মহাপুরুষ ইহধাম পরিত্যাগ করায়, আমরা সকলেই যে শোকাভিভূত হইব, তাহা প্রকাশ করিতে বহুবাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন নাই। আমি জানি আপনারা সকলেই তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা জানাইতেছেন।

সমগ্র সভা সমস্বরে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

১১। ধন্যবাদ-প্রস্তাব।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বি, এল, মহাশয় (বহরমপুর), সরল ও বিশদভাবে যুক্তপূর্ণ বাক্যে হৃদয়ের অকপট অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সমগ্র সভা কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,

এম, এ, বি, এল, মহাশয় (রাজসাহী) সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতিকে সাধুবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিলেন—

সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্যোগকর্ত্তা বহরমপুরের সুধীসমাজকে সমাগত সাহিত্যিকগণের পক্ষে ধন্যবাদ করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। কি বলিয়া আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। যে বঙ্গসাহিত্য কিছুদিন পূর্ব্বে লোকসমাজে কিছুমাত্র সমাদরলাভ করিত না, যাহাকে লোকসমাজ ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিত বলিয়া কবি লিখিয়াছিলেন—"কাহার ভাষা হায়, ভুলিতে সবে চায়, সে আমার জননী রে!" —সেই বঙ্গভাষার লেখকগণ অনাদরে জীবনযাপন করিতেন। তাঁহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন। তাঁহাদিগকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এরূপভাবে সমাদর প্রদর্শন করায়, বহরমপুরের সুধীবর্গ বঙ্গসাহিত্যকে আশাতীত সম্মানদান করিয়াছেন।

বহরমপুর নানা দেশহিতকর কার্য্যের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। যখন রাজনৈতিক উন্নতিলাভের আশায় দেশের লোক স্থানে স্থানে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন করাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই স্থানেই বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ, তাহার সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক স্বদেশানুরাগের বিবিধ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াও কখন প্রকাশ্যভাবে তাহার জন্য ধন্যবাদ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। অদ্য তাঁহাকে এই সাহিত্য-সম্মিলনক্ষেত্রেও একজন উদ্যোগীরূপে উপস্থিত দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ করিতেছি। তিনি বয়ঃক্রমে আমাদের জ্যেষ্ঠ—ব্যবহারেও চিরদিন স্নেহপরায়ণ জ্যেষ্ঠের ন্যায় আমাকে আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া সম্মানিত করিয়া থাকেন,—সেই অধিকার লইয়া বলিতে পারি, বৈকুণ্ঠনাথ উৎসাহে যুবকগণকেও লজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী বৃদ্ধ, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় অকৃত্রিম স্বদেশবৎসল, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বর্ত্তমান আছেন, সেইস্থানেই যে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন নানা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অদ্য সুসম্পন্ন হইল, ইহাই যথাযোগ্য হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণসাধন করা এবং স্বদেশের কল্যাণসাধন করা এক কথা। বরং বলিতে পারি ইহাই সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধন-চেষ্টার প্রথম চেষ্টা—মূল চেষ্টা—ইহার তুলনায় অন্যান্য চেষ্টা অধিক সাধুবাদলাভ করিতে পারে না। ইহাকে কেবল কল্যাণসাধনচেষ্টা বলিয়াই নিরস্ত হইতে পারি। ইহা পুণ্য—ইহাই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। মহারাজ বাহাদুর এই পুণ্যের অনুষ্ঠানে যেরূপ অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন—স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া অভ্যাগতগণের পরিচর্য্যা করিয়াছেন—তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—তিনি শ্রেষ্ঠ পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন। কারণ কবি বলিয়াছেন,—

সন্ধ্যাভ্র-বিভ্রম-নিভা বিভবা ভবেঽস্মিন্ প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দু-চলস্বভাবাঃ।
পুণ্যং নৃণামিহ পরত্র চ বন্ধুরেকো নোচ্চৈঃ স্বদেশহিতসাধনতোঽস্তি পুণ্যম্॥

সন্ধ্যার আকাশপটে যে অপূর্ব্ব মেঘমালার সমাবেশ হইয়া থাকে, তাহা পলে পলে মুর্ত্তিপরিবর্ত্তন করে—সংসারের বিভবরাশি সেইরূপ। এই সকল অট্টালিকা, এই সকল হস্ত্যশ্ব, এই মণিমাণিক্যখচিত চন্দ্রাতপ, এই রত্নসিংহাসন—এ সকল মেঘমালা অপেক্ষাও চঞ্চল! তৃণের অগ্রভাগে দোদুল্যমান জলবিন্দুর ন্যায় মানবপ্রাণ স্বভাব-চঞ্চল—অস্থির পদার্থ। যাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করা যায়, তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না,—ইহা আমরা প্রতি-নিয়ত নয়নজলে আপ্লুত হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। যে সংসারে ধনজন আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে ধনজনের এরূপ অবস্থা স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে কি সংসারে আমাদের প্রকৃত বন্ধু কেহই নাই? আছে,—পুণ্যই প্রকৃত বন্ধু,—ইহকালের বন্ধু,—পরকালের বন্ধু, সেই পুণ্যের মধ্যে স্বদেশহিতসাধনই শ্রেষ্ঠ পুণ্য। মহারাজ বাহাদুর সেই শ্রেষ্ঠ পুণ্যের অধিকারী হইয়া সমাগত সাহিত্যিকগণের সাধুবাদ লাভ করিতেছেন—ইহাই শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। ভগবান্ তাঁহার স্বদেশহিতসাধনরূপ পুণ্যকর্ম্মের এইরূপ পুরস্কার দিতেছেন। ইহাতে সকল শোক নিরস্ত হউক, সকল আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করুক, সকল মঙ্গল চিরপ্রবাহিত হউক, আসুন আমরা এই বাক্যে পুনঃপুনঃ সাধুবাদ করিয়া কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করি।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় (কলিকাতা), উক্ত সাধুবাদ প্রস্তাব সমর্থন করিবার নিমিত্ত কহিলেন—

সকল প্রস্তাবই সমর্থনের নিয়ম আছে, কিন্তু আমি মহারাজ বাহাদুর, অভ্যর্থনা সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দকে অক্ষয় বাবুর প্রদত্ত সাধুবাদ-প্রস্তাব সমর্থনের জন্য ঠিক উপস্থিত হই নাই। কারণ, আমার মনে হয়, তাঁহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত পুরস্কার সাধুবাদ বা ধন্যবাদ হইতে পারে না। সাধকপ্রবর বিল্বমঙ্গল এক স্থানে তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ফল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন। যাঁহারা আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষার সেবা করিয়া যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তাহা সুসম্পন্ন করিলেন, তাহার প্রকৃত পুরস্কার তাঁহাদের সেই কার্য্যই। আমার বিশ্বাস, ইহার জন্য তাঁহাদের সাধুবাদ বা ধন্যবাদ দিলে তাঁহাদের কার্য্যকে খর্ব্ব করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ যে ভাবে আমাদের সেবা ও যত্ন করিয়াছেন, বলিবার অগ্রে সমাজের প্রত্যেক অভাব যে ভাবে পূরণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যেন তাঁহাদের এ নিঃস্বার্থ সেবা ও সরল ব্যবহারের কোন প্রতিদান সাধুবাদ বা ধন্যবাদে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের সহিত প্রকৃত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে আমরা যেন তাঁহাদের প্রত্যেককে সাদরে কোল দিয়া যাই।

আমরা এই দুই দিনে যে আনন্দ পাইয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। জাতীয় সাহিত্যের সেবার জন্য জননী বঙ্গভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কল্পে আপনাদের এইরূপ সাধুচেষ্টা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। শ্রীভগবান মহারাজ বাহাদুরের কল্যাণ করুন। আমি

ব্রাহ্মণ-সন্তান আমিও প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ এবং স্বেচ্ছাসেবক বালকবৃন্দ, প্রার্থনা করি, আপনারা এইরূপে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সেবা করিয়া দেশের ও দশের উপকারে নিযুক্ত হউন।”

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ সভায় পঠিত হইবার কথা ছিল; কিন্তু সময়াভাবপ্রযুক্ত তৎসমুদায় পঠিত না হইলেও সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

(ক) মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিকতত্ত্ব—(শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি এল্। ৩৸৵০ পৃষ্ঠা)

(খ) মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব—(শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ রায়, বি এল্। ৫৵০ পৃষ্ঠা)

(গ) মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত বৈষ্ণবসাহিত্য—(শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ। ৭৷৵০ পৃষ্ঠা)

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্ট-সাধন উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষার আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা—(কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেনগুপ্ত শাস্ত্রী। ১৪৸০ পৃষ্ঠা)

(ঙ) বাঙ্গালাভাষা সংস্কার—(শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী। ১৩৷৵০ পৃষ্ঠা)

(চ) নদীয়ার ঐতিহাসিকতত্ত্ব—(শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক।)*

[তৎপরে বিদায়-সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। অতঃপর মহারাজ বাহাদুর বহরমপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এক শাখা-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয় উহা সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।]

রাত্রি ৭৷৷ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বিদায়-সঙ্গীত।

পুরবী—একতালা।

সারা হ'ল দেবী আরাধনা,
চলিলে গো সবে নিজ ঠাঁই।

বরষ-অন্তে মায়ের দুয়ারে
যেন গো আবার দেখা পাই।

জ্ঞান-তৃষা যেন বাড়ে সদা,
মিটেনা'ক যেন এই ক্ষুধা;
বাণীর মন্দিরে দাঁড়াইয়া যেন
ভাষার বলেতে বল পাই।

---

* এই প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত হয় নাই।

সারাটি বরষ থেকোনা ভুলিয়ে
পৃথিবীর যত খুঁটিনাটি ল'য়ে ;
'ক্ষীণ বাঙ্গালীর দীন মাতৃভাষা'
আর নাহি যেন শুনি ভাই ;—

শত কাজ ল'য়ে ভারনত শিরে
বারেক দাঁড়া'য়ো বাণীর দুয়ারে ;
সুখে থাক যেন থেকো সুখে,
বলিবার আর কিছু নাই।

অবশিষ্ট।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর বক্তৃতার মর্ম্ম।*

ভয় নাই! এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে—সভাভঙ্গের জন্য আপনাদের ব্যগ্রতার মধ্যে—হঠাৎ আমি আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম বলিয়া, আপনাদের ভয় নাই! ভয় নাই,—আমি প্রবন্ধ পাঠ করিতে আসি নাই! সাহিত্য-সম্মিলনের এই অধিবেশনে আমাকে যে কোনও প্রস্তাব সমর্থন বা উত্থাপন করিতে হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। সভারম্ভের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি এই সমাচার প্রাপ্ত হই। সুতরাং প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারি নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণের ন্যায় আমি যদি আগে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার প্রণীত নব-প্রকাশিত "স্বাধীনতার ইতিহাস" গ্রন্থ খানি আনিয়া সভাস্থলে পাঠ করিয়া, আপনাদিগকে তাহার কয়েক পৃষ্ঠা অনায়াসেই শুনাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু দুরদৃষ্ট! মনের ক্ষোভ মনেই রহিয়া গেল!

আমার উপর যে প্রস্তাবটি সমর্থনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, সে প্রস্তাবটি এই:—

"বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার, রক্ষণ ও প্রচার-উদ্দেশে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থ ও লৌকিক সাহিত্য সংগ্রহ করা হউক।"

প্রস্তাবটি পাঠ করিয়াই আমার মনে কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার ভৃত্য উদ্ধব রামের কথা উদয় হইল। ভৃত্য উদ্ধবরাম বহুকাল হইতে কবিরাজ মহাশয়ের খানসামার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; সময়ে সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধাদির উপকরণ—গাছ, গাছড়া, বাকল প্রভৃতি তাহাকে কাটিতে ও পিষিতেও হইত। এই সূত্রে, বিশেষতঃ বহুদিন কবিরাজ মহাশয়ের সংস্রবে আছে বলিয়া, সাধারণ লোকে অনেকেই মনে করিত,—উদ্ধব রাম নিশ্চয়ই কবিরাজী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে! সুতরাং পাড়া-প্রতিবাসী কাহারও ব্যারাম-পীড়া হইলে, তাহাদের অনেকেই অনেক সময় উদ্ধবরামের পরামর্শ লইতে আসিত। উদ্ধবরামও সেই গরবে বক্ষ স্ফীত করিয়া যথাসাধ্য দুই একটা টোট্‌কা টুট্‌কীর ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিত না। আমারও আজি সেই উদ্ধবরামের দশা উপস্থিত। "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে বহুবিধ প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি প্রকাশ হয়। বহু পাণ্ডিত্য, গবেষণা, অধ্যবসায় ও

---

* বিবরণী ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অর্থব্যয়ে তৎসমুদায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমি সেই "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয়ের সংস্পৃষ্ট একজন নগণ্য ব্যক্তি। সেই কার্য্যালয়ের সহিত আমার সংস্রব আছে,—এই মাত্র গুণে, আমিও আজি এই সভাস্থলে গণনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থায় আমার দ্বারা সভার যে কি শুভ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, সভার কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বলিতে পারেন। এই প্রস্তাব-সমর্থনের উপযোগী ভাষাভাষ যদি আমি প্রকাশ করিতে না পারি, সে ত্রুটি আমার নহে; প্রস্তাব-সমর্থনের জন্য আমায় যাঁহারা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, আমি মনে করি, সে ত্রুটি তাঁহাদেরই! কবিরাজ মহাশয়ের উদ্ধবরাম, আপন সঙ্কীর্ণ জ্ঞান অনুসারেই মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিত। তুলনায় আমিও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। সুতরাং আমার বুদ্ধির উপযোগী মুষ্টিযোগ ব্যবস্থায় যদি কোনও কুফল ফলে, সহৃদয়গণ মার্জ্জনা করিবেন।

প্রাচীন গ্রন্থ বা লুপ্তরত্ন উদ্ধারের যে কি পরিমাণ উপযোগিতা আছে, এবং সে কার্য্য যে কি প্রকার আয়াসসাধ্য,—আমি যে একেবারেই তাহা জানি না, এ কথা বলিলে, সত্যের অপলাপ করা হয়। কয়েক বৎসরকাল, নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ-সম্পাদন-ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় (বলা বাহুল্য, কবিরাজবাড়ীর উদ্ধবরামের গাছ-গাছড়া পেষার ন্যায়) বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবের উপযোগিতা আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছি। আপনারা হাজার দুহাজার বৎসর পূর্ব্বের পুঁথিপত্র সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন,—ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন; সে উদ্যম—সে চেষ্টা যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা আমি এক মুখে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারি না। দুই শত বা তিন শত বৎসর পূর্ব্বের রচিত কয়েক খানি গ্রন্থের পাঠোদ্ধার ও সম্পাদন কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া আমি যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, এই প্রস্তাব-সমর্থনে আমার ন্যায় ঐকান্তিক অনুরাগ এ সভার আর কাহারও সম্ভবপর নহে। আমি সম্পূর্ণ ভুক্তভোগী; সুতরাং এ প্রস্তাবে আমার অনুরাগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কি প্রকারে আমি ভুক্তভোগী এবং কিসে আমার এত অনুরাগ, তৎসম্পর্কে দুই একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন। "বঙ্গবাসী"-কার্য্যালয় হইতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে;—(১) "বাঙ্গালীর গান", (২) "বৈষ্ণব-পদ-লহরী", (৩) "শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ", (৪) "কৃত্তিবাসী রামায়ণ", (৫) রাজা জয়নারায়ণের "কাশীখণ্ড", (৬) "ব্রজরায়ের গ্রন্থাবলী"; ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে "বাঙ্গালীর গান" গ্রন্থে এক হিসাবে বাঙ্গালার আদি গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের প্রধান প্রধান সমস্ত সঙ্গীতকারগণের সঙ্গীত ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের গীত-সমুদায় এবং গীত-রচয়িতৃগণের পরিচয়াদি সংগ্রহে আমাকে যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। অনেক সময় আমি দেখিয়াছি, একই গান, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচিত বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরু ঠাকুর ও রাম বসুর গান অনেক মিশিয়া গিয়াছে; বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের গান, অনেক গ্রন্থে যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর রচিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কত বলিব? গানে ও গান-রচয়িতাদিগের

পরিচয়ে যে গণ্ডগোল বাধিয়া আছে, তাহার মীমাংসা করিতে এখন অনেক কষ্টের প্রয়োজন। এইরূপ, "বৈষ্ণব-পদ-লহরী" গ্রন্থ-সম্পাদনে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রায় চল্লিশ জন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগ্রহে আমায় যে কি উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। একের পদাবলী অন্যের সহিত মিশিয়া তো আছেই; অধিকন্তু অনেক আধুনিক পদাবলী, প্রাচীনের সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে। সে যে কি ব্যাপার, তাহা বুঝাইবার স্থান ও সময় এখন নাই। নচেৎ, দেখাইতে পারিতাম, একের কাণ্ডে অপরের শাখা সংযোজিত হইয়া, পরগাছার ন্যায় কেমন বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়া আছে! তৃতীয়তঃ, শ্রীশ্রীভক্তমাল-গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচনা-কাল দেড়শত হইতে দুই শত বৎসরের মধ্যে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে এই গ্রন্থ বটতলায় ছাপা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনও এই গ্রন্থের কত পাঠান্তর—কত ভাবান্তর! অধিক বলিব কি, এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম লইয়াও এখনও দ্বন্দ্বের অবধি নাই! কেহ বলিতেছেন—রচয়িতার নাম 'লালদাস'! কেহ বলিতেছেন—'কৃষ্ণদাস'। চতুর্থতঃ, "কৃত্তিবাসী রামায়ণ!" কৃত্তিবাসই বাঙ্গালার আদিকবি; অনূ্যন সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেই আদি-কবির আদি-গ্রন্থ এখন যে কি রূপ দুর্দ্দশাপন্ন, তাহা স্মরণ করিলে চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা বিনির্গত হয়। ১১৩০ সালে (১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরামপুরে মিশনারীদের চেষ্টায় প্রথম 'রামায়ণ' গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। প্রতিপন্ন হয়,—সেই রামায়ণও কৃত্তিবাস-রচিত আদি রামায়ণ হইতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎপরে, ৬০।৬২ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের আমূল সংস্কার-সাধন করেন। সে যেন প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ভিত্তিভূমির উপর—এক নূতন অট্টালিকা-সংগঠন! ইহার কিঞ্চিৎ পরে, ১২৮৭ সালে, গুপ্তপ্রেস হইতে এক রামায়ণ প্রকাশিত হয়। সে রামায়ণ খানি, আদি রামায়ণের, শ্রীরামপুরী রামায়ণের এবং জয়গোপালের রামায়ণের—তিন খানির মধ্যবর্ত্তী। ফলতঃ কোনও খানির সহিত কোনও খানির আগা-গোড়া মিল নাই। পরিশেষে 'সাহিত্য পরিষদের' চেষ্টায় এক্ষণে কৃত্তিবাসের যে আদি-রামায়ণ-প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে, তাহা আর এক স্বতন্ত্র সামগ্রী। তাহা দেখিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও খানিই যে আদি-গ্রন্থ নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ প্রথম হইতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের উদ্ধার ও রক্ষণের চেষ্টা না হওয়ায় পরিশেষে যে কি বিপদে পড়িতে হয়, রামায়ণ-সম্পাদন-ব্যাপারে আমি মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিয়াছি। পঞ্চমতঃ, "কাশীখণ্ড।" খিদিরপুর ভূকৈলাসের স্বর্গীয় রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কবিতা-ছন্দে এই "কাশীখণ্ড" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামে অবস্থিতি কালে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের ঐ গ্রন্থ বিরচিত হয়। এক সময়ে ঐ গ্রন্থের বড়ই সমাদর ছিল; অনেক স্থলে ঐ গ্রন্থ সুরতাল-সংযোগে গীত হইত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, মহাশয়ের নিকট হইতে ঐ 'কাশীখণ্ডের' এক খানি পুঁথি আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু

দুঃখের বিষয়, ঐ পুঁথি খানির মধ্যের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। সেই পৃষ্ঠা কয়েকটির জন্য আমি বহু স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। খিদিরপুরে ভূকৈলাস রাজবাটীতে, চন্দন-নগরে ভূকৈলাস-রাজবাটীতে, ৺কাশীধামে ভূকৈলাস-রাজবাটীতে এবং সাহিত্য-পরিষৎ 'এসিয়াটিক সোসাইটি' প্রভৃতির পুস্তকালয়ে নানারূপে অনুসন্ধান লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, ঐ পুঁথি দ্বিতীয় এক খানি কোথাও আর মিলে নাই। অগত্যা পুস্তক-প্রকাশের সময়, মধ্যের কয়েক পৃষ্ঠা (৩২ অধ্যায় হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রায় ৪৭ পৃষ্ঠা) আমাদিগকেই কবিতায় লিখিয়া দিতে হইয়াছে। আপাততঃ এই ভাবেই সেই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। ভবিষ্যতে যদি কখনও কোথাও পুরাতন আর এক খানি পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলেই পুস্তকের নূতন-লিখিত অংশ পরিবর্ত্তিত হইবে; নচেৎ ঐ পর্য্যন্তই উহা রহিয়া গেল। তবেই বুঝুন, মাত্র এক শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের ন্যায় পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত "কাশীখণ্ড" গ্রন্থের যখন এই পরিণাম, তখন অতি প্রাচীনকালের নিরন্ন নিস্পৃহ গ্রন্থকারগণের রচিত গ্রন্থের যে কি দুর্দ্দশা হইবে, সহজেই অনুমিত হয় না কি? তার পর, ব্রজমোহন রায়ের কথা। মাত্র ৩২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহার রচিত যাত্রার ও পাঁচালীর পালা-সমূহ সংগ্রহ করা দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার লিখিত জীর্ণ কীটদষ্ট খাতা হইতে অনেক স্থল উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। পালার মিল রাখিবার জন্য বিলুপ্ত বহু অংশ আমাকে নিজেই লিখিয়া দিতে হইয়াছে। আর কত বলিব? যে দিক দিয়া যে চক্ষেই দেখি, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধার ও রক্ষণের এই যে প্রস্তাব আমি সমর্থন করিতে উঠিয়াছি, সর্ব্বপ্রকারেই এই প্রস্তাবের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। আমার বিশ্বাস, এই প্রস্তাবে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি আমার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাবের সাফল্য-লাভের আশা করিলে, এতৎসম্পর্কে সাহিত্য-সেবি মাত্রেরই সমবেত যত্ন আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালার 'সাহিত্যিক'-গণ, প্রায় সকলেই আমারই ন্যায় দুঃস্থ ও নিরন্ন। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কোনও কাজ করাইতে হইলে, তাঁহাদের নিকট কোনও সুফল-লাভের আশা করিলে, তাঁহাদের মুখের প্রতি, তাঁহাদের দৈন্য-দারিদ্র্যের প্রতি, বাঙ্গালার সুসন্তান মাত্রেরই এক একবার চাহিয়া দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না কি? ভগবান করুন, এই 'সাহিত্য-সম্মিলনেরও' সেই দিন আসুক,—যে দিন সম্মিলন দুঃস্থ সাহিত্যসেবীর দুর্দ্দশা দূরীকরণে সমর্থ হইয়া, বর্ত্তমান প্রস্তাবের পূর্ণ-সাফল্য-সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবেন!

উপসংহারে এই সাহিত্য-সম্মিলন সৃষ্টির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। কথাটা অবান্তর হইলেও, আলোচ্য-প্রস্তাবের সহিত একেবারেই যে সম্বন্ধ-বিরহিত, তাহা কোন ক্রমেই বলিতে পারা যায় না। আমরা প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার ও রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছি; কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের—এই সাহিত্য-সম্মিলনের সৃষ্টির ও পরিপুষ্টির ইতিহাসটা আমরা কতদূর ঠিক রাখিয়া চলিয়াছি, তৎপ্রতি একবার আলা-

দের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে কি? অদ্যকার সভায় সে ইতিবৃত্ত যতটুকু আলোচিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মনে হওয়ায়, সাহিত্য সম্মিলন-সৃষ্টির ইতিহাস সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। সে ইতিহাস এই:—আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারি, "অনুসন্ধান" পত্রে প্রথমে সাহিত্য সম্মিলন-সৃষ্টির আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, এবং এই অধীনের "অনুসন্ধান"-কার্য্যালয়েই প্রথম "সাহিত্য-সম্মিলন" সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্বর্গীয় পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত জয়কুমার বর্দ্ধন রায়, শ্রীযুক্ত মোহিতগোপাল লাহিড়ী প্রভৃতি আমরা কয়েকজনে মিলিত হইয়া প্রথমে সাহিত্য-সম্মিলন সৃষ্টির আয়োজন করিয়াছিলাম। পরিশেষে ঐ আয়োজনে বাঙ্গালার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান মিরর"-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর "বঙ্গবাসী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন রায় প্রভৃতি—কাহাকে রাখিয়া আর কাহার নাম করিব—ক্রমশঃ ঐ সম্মিলনে যোগদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের অবস্থা-বিপর্য্যয় হেতু, কয়েকটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশনের পরই সাহিত্য-সম্মিলনের শুভ সঙ্কল্পসমূহ অঙ্কুরেই বিশুষ্ক হয়। বলাবাহুল্য, সেই "সাহিত্য-সম্মিলন" 'সাহিত্যিক' সভা-রূপে আজিও বিদ্যমান আছে;—যদিও তাহার সঙ্কল্পিত সকল কার্য্য আজিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যাউক সে কথা! প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে (১৩০৬ সালে) ও তৎপরবর্ত্তী কালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, কলিকাতার 'সাহিত্য-সম্মিলন' যে উদ্যমে ব্যর্থমনোরথ হন, ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ সহরে তৎপক্ষে পুনরায় উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় এবং তাৎকালিক "সুধা" পত্রের স্বত্বাধিকারিগণ, ঐ উদ্যোগের মূলীভূত ছিলেন। আমরাও সেই আয়োজনে যোগদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে সে কল্পনাও কার্য্যে পরিণত হয় না। অতঃপর ১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে, 'বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সমিতির' অধিবেশন সময়ে, বরিশালে সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হয়। বরিশালের সাহিত্যানুরাগী জমীদার শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কলিকাতার 'সাহিত্য-পরিষৎ' এবং 'সাহিত্য-সম্মিলন', আপনাপন সামর্থ্যানুসারে, সে আয়োজনেরও পৃষ্ঠপোষণে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সমিতি (কন্‌ফারেন্স) ভঙ্গ হওয়ায়, ঐ বৎসর বরিশালে 'সাহিত্য-সম্মিলন' অধিবেশনেও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পর বৎসর কলিকাতার "সাহিত্য-সম্মিলন" পুনরায় উদ্যোগী হন। ঐ উদ্দেশ্যে, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে, কলিকাতার "ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল" ভবনে এক সাধারণ সভাধিবেশন হয়। "সাহিত্য-সম্মিলনের" সেই অধিবেশনে

সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ অনেকেই এবং দেবকুমার বাবু প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় স্থির হয়, পুনরায় দেবকুমার বাবুই "সাহিত্য-সম্মিলন" আহ্বান করিবেন। ইতিমধ্যে মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। উক্ত ১৩১৩ সালের শেষে, বহরমপুরে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সমিতির (কন্‌ফারেন্সের) অধিবেশন সময়ে, মহারাজ বাহাদুরের ব্যয়ে, বহরমপুরেই "সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন হইবে—স্থির হইয়া যায়। 'সাহিত্য-পরিষৎ' ঐ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন; এবং আপনারা প্রায় সকলেই জানেন, ঐ অধিবেশনের আমন্ত্রণ পত্র পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট, মহারাজ বাহাদুর সে সময় নিদারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হন; মহারাজকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, দেশের আপামর সাধারণ নরনারীকে কাঁদাইয়া জ্যেষ্ঠ মহারাজ-কুমার ইহধাম পরিত্যাগ করেন। সেই শোকাবেগে, সে যাত্রাও সাহিত্য-সম্মিলন স্থগিত থাকে। তাহার পর অদ্য, ১৩১৪ সালের ১৭ই কার্ত্তিক, মহারাজ বাহাদুরের অশেষ অনুকম্পার প্রভাবে, এই সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কলিকাতার "সাহিত্য-সম্মিলন" এই "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন"-কল্পনার আদিভূত; বিশ্বাস করি, এক্ষণে সকলেই আমার সে কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমি আর অধিক বলিব কি?—"সাহিত্য-সম্মিলন" এই নাম-করণেও, কলিকাতার "সাহিত্য-সম্মিলনের" প্রভাব বিদ্যমান দেখিতে পাইতেছি। "অনুসন্ধান"-পত্রে "সাহিত্য-সম্মিলন" নাম লিখিত হওয়ার পূর্ব্বে, বাঙ্গালার কোন পুঁথিপত্রে কখনও "সাহিত্য-সম্মিলন" শব্দটী পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই! "সাহিত্য-সম্মিলন" সৃষ্টির কল্পনায় কলিকাতার "সাহিত্য-সম্মিলনের" নাম অবশ্যই স্থান পাইবার যোগ্য।

আমার কত প্রগাঢ় অনুরাগ—এই "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে";—আমি প্রাণের ভিতর কিরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" এই শুভ কল্পনাকে;—জানি না, কেমন করিয়া তাহা বুঝাইব আপনাদিগকে? আমার প্রার্থনা,—মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের এই ব্যয়ভার-বহন সার্থক হউক,—সাহিত্যসেবীদিগের প্রতি তাঁহার অকপট অনুরাগ ও সাদর অভ্যর্থনা দেশের ধনকুবেরগণের আদর্শ হউক। আর প্রার্থনা, ভগবান্ করুন, সাহিত্য-সম্মিলনের যেন সেই দিন আসে,—মুর্শিদাবাদ জেলার নানা ঐতিহাসিক কীর্ত্তি-স্মৃতি দেখিতে আসিয়া, পর্য্যটক, পীঠস্থান-জ্ঞানে, অগ্রে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" এই প্রথম অধিবেশন-স্থানে, ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া যায়। সেদিন কি আসিবে? সাহিত্য-সম্মিলন সংসারে কি এতদূর উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিবে? আমার আকাশ কুসুম কল্পনা কি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে? প্রতিধ্বনি বলিতেছে—"হইবে"—"হইবে"!

পরিশিষ্ট

প্রবন্ধ (১)

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান

(প্রবন্ধ লেখক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু)

এই শস্যসমৃদ্ধা সপ্তকোটী-জন-সেবিতা বঙ্গভূমি পূর্ব্বে কি ছিল, এখন কি হইয়াছে! পূর্ব্বতন বঙ্গবাসিগণ পূর্ব্বে কি সুখে ছিলেন এবং এখন কি অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, জানিবার জন্য অনেকেই ব্যগ্র হইয়াছেন। তাই বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস সঙ্কলনের সময় আসিয়াছে। কিন্তু এই মহাব্রত সুসম্পন্ন করিতে হইলে আমাদিগের কিরূপ পূজা, কিরূপ উপকরণ চাই, তাহা সর্ব্বাগ্রে একবার বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে ও বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আমরা ভূত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইতেছি—কালস্রোতে, আমাদেরই অনবধানতায় আমাদের কত শত গৌরবস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং ভবিষ্যতে মনোযোগী না হইলে আরও কি শোচনীয় পরিণাম হইবে। তাই আমি সানুনয়ে সকাতরে প্রস্তাব করিতেছি, কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের জননী জন্মভূমি রার্থ উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন করিতে হইবে এবং এই মহাযজ্ঞ সাধনা ও কৃতী সন্তানগণকে যোগদান করিতে হইবে।

সাধারণের বিশ্বাস, অতি অল্পদিন হইতেই বাঙ্গালায় ইতি ইংরাজ প্রভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ইতিহাসের কোন ধার ধারিতেন হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। এ কথা কি ঠিক! এ কথা মনে করি

যে দেশ সভ্যতার চরম শিখরে একদিন অধিষ্ঠিত ছিল, যে দেশের সভ্যতালোকে একদিন সিংহল, এমন কি ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আলোকিত হইয়াছিল—যে দেশের জ্ঞানালোকে তিব্বত, চীন, এমন কি জাপান পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ, যে দেশ শত শত ধর্ম্মাচার্য্যগণের লীলাস্থলী,—যে দেশের রাজভক্ত প্রজাগণের অসাধারণ বীরকীর্ত্তি কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কল্হণ উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, যে বঙ্গবাসী একদিন জ্ঞানগৌরবে ও ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, অক্ষয়লেখশিলাফলকে, কুন্তোত্থিন্ন তাম্রপট্টে যে বঙ্গরাজগণের বীরত্ব ও কীর্ত্তিকলাপ আজও বিলুপ্ত করিতে পারে নাই, তাঁহাদের ইতিহাস নাই, তাঁহারা জাতীয় গৌরবের নিদর্শন ইতিহাসের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, তাহাও কি কখন সম্ভব?

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে বঙ্গবাসী বড়ই ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন,—এখনও সেই অনুরাগের নিদর্শন এককালে লোপ পায় নাই! অনুসন্ধান করিলে বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই ইতিহাসের প্রভূত মালমসলা বাহির হইতে পারে। কোন সমাজের উত্থান পতন, বিভিন্ন সময়ের রীতিপদ্ধতি এবং স্মরণীয় ব্যক্তিগণের নাম ও বংশানুচরিতকীর্ত্তন করাই ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য। আমরা দেখিতে পাই, বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুসমাজে ঐরূপ ইতিহাসের চর্চ্চা চলিয়া আসিতেছে। আমরা আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি যে, শ্রাদ্ধকালে বা কোন উৎসবে ভারত ও পুরাণেতিহাস পাঠ করিবার নিয়ম ছিল। বাল্মীকীয় রামায়ণ পাঠেও জানা যায় যে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহসভায় বর ও কন্যাপক্ষ হইতে তত্তৎ পূর্ব্বপুরুষগণের বংশানুচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সুপ্রাচীন প্রথা ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনসমাজে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের মহাভারত পুরাণাদি, বৌদ্ধদিগের সূত্রগ্রন্থ ও জৈনদিগের নানা পুরাণ ও পট্টাবলী হইতে আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি।

আমি পুনরায় বলিতেছি—বঙ্গবাসী চিরদিনই ইতিহাসের সমাদর করিতেন, প্রতি জাতি, প্রতি সমাজ ও প্রতি পল্লীর মধ্যে ইতিহাসচর্চ্চার কেন্দ্র ছিল, ইতিহাসচর্চ্চা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য ছিল; কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, যে দিন হইতে বাঙ্গলায় ইংরাজপ্রভাব বিস্তৃত হইল, উচ্চ নীচ সকল সমাজে যে দিন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলিত হইতে চলিল, সেই দিন হইতেই বঙ্গবাসী প্রকৃত ইতিহাস-চর্চ্চায় বিমুখ হইলেন। সে সময়ের ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত ...সমাজের অবস্থা স্মরণ করিলে মনে বড়ই ক্ষোভের উদয় হয়। তাঁহারা রিচার্ড দি সেকেণ্ড বা ...থের চৌদ্দপুরুষের পরিচয়, অসভ্য কানিবলদিগের চরিত্রকথা অথবা রোম-সাম্রা-... ইতিহাসপাঠই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের আপন ...র, এমন কি প্রতি শ্রেষ্ঠ ঘরের এক একখানি বিস্তৃত ইতিহাস আছে, ...ই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

...হিত, স্পর্দ্ধার সহিত জানাইতেছি যে বঙ্গদেশে শত শত জেনোফন ...হণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উজ্জ্বলকীর্ত্তির নিদর্শন এখনও

খুঁজিলে যথেষ্ট মিলিতে পারিবে। বঙ্গবাসী স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্মপ্রেমিক, ভক্তিপ্রেমিক ও জ্ঞানপ্রেমিক। এই বঙ্গদেশ শত শত ধর্ম্মবীরগণের লীলারঙ্গভূমি। মহাভারতীয় যুগে এই বঙ্গদেশেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী অদ্বিতীয় বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেবের অভ্যুদয়। হরিবংশ ও পুরাণ ঘোষণা করিতেছে যে এই বঙ্গদেশে রাজন্যসমাজে কতশত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত, এমন কি দেবগণেরও পূজিত হইয়াছিলেন। শত শত জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ২২ জন জৈন তীর্থঙ্কর, তাঁহাদের পরে ভগবান্ শাক্যসিংহ ও তদনুবর্ত্তী শত শত বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য এই বঙ্গদেশে জ্ঞান ও ভক্তিমূলক নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে এখানে নিবৃত্তিধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

আমরা মহাভারত পুরাণাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া মোটামুটী বলিতে পারি যে ২৩শ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী হইতেই অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দী হইতেই গৌড়বঙ্গের ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত। পার্শ্বনাথ স্বামী রাঢ়, তাম্রলিপ্ত ও কলিঙ্গে যে নিবৃত্তিমূলক চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, বহু জৈনগ্রন্থে তাহার আভাস আছে। মানভূমের সমেতশিখর বা পরেশনাথ পাহাড়ে তাঁহার নির্ব্বাণ হয়। যে সকল স্থানে পার্শ্বনাথ স্বামীর অধিষ্ঠান হইয়াছিল, বহু শতাব্দকাল তথায় জৈনপ্রভাব বা জৈনস্মৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ সকল স্থান অনুসন্ধান করিলে অদ্যাপি সেই ক্ষীণ স্মৃতির আভাস পাওয়া যাইবে। ঐ সকল স্থানের ভূগর্ভ হইতে আদি জৈনযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন বাহির হইতে পারে। পার্শ্বনাথ স্বামীর ধর্ম্মমত প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া পার্শ্বনির্ব্বাণের ২০০বর্ষ পরে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল এই রাঢ় দেশে থাকিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা রাঢ়বাসীকে ধর্ম্মমার্গে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিমল উপদেশে অতি উচ্চ জাতি হইতে অতি নীচ বনের অসভ্য জাতি পর্য্যন্ত জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। সেই জৈনপ্রভাবের নিদর্শন বিশেষ অনুসন্ধান করিলে রাঢ়দেশের নানা স্থান হইতেই মিলিতে পারে। মহাবীরের সময়েই শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়। তাঁহার জীবনকালে না হউক, তাঁহার নির্ব্বাণের কিছুকাল পরে বিশেষতঃ সম্রাট অশোকের আধিপত্য প্রভাবে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে বুদ্ধদেবের মুক্তিমার্গ ও জ্ঞানোপদেশ প্রচারিত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই উত্তর রাঢ়ের গয়সাবাদ হইতে বৌদ্ধমতপ্রভাবনির্দ্দেশক ভগ্ন অশোকস্তম্ভ বাহির হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান চলিলে ও ঐরূপ অতি প্রাচীন স্থান সমূহের ভূগর্ভ উদ্‌ঘাটিত হইলে বাঙ্গালার আদি বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন কত বাহির হইতে পারিবে। আমরা নানা জৈনগ্রন্থ ও সম্রাট্ অশোকের পৌত্র দশরথের অনুশাসন হইতেও জানিতে পারি, খৃঃপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দ পর্য্যন্ত মগধ হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত পূর্ব্বভারতে পুনরায় জৈনাভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। পার্শ্বনাথ অথবা মহাবীর স্বামী পূর্ব্বভারতে যে বীজবপন

করিয়া গিয়াছিলেন,অশোক বা তদনুবর্ত্তী নৃপালগণের চেষ্টাতেও সে বীজ শুষ্ক হইতে পারে নাই, বরং অঙ্কুরিত হইয়া খৃঃপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে পল্লবিত ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়াছিল। মৌর্য্যাধিপ চন্দ্রগুপ্ত-পূজিত শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর শিষ্য প্রশিষ্যে এক সময় সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। জৈনকল্পসূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, সেই ভদ্রবাহুর শিষ্যানুশিষ্য হইতেই তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও খর্ব্বটীয়া এই চারিটী শাখা অতি প্রবল হইয়া অঙ্গ, বঙ্গ ও সমস্ত রাঢ়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলেই মহাবীরের মতাবলম্বী। এদিকে পার্শ্বনাথের মতানুবর্ত্তী আজীবকগণের প্রভাবও কম ছিল না, বরাবর ও নাগার্জ্জুনী শৈলে খোদিত সম্রাট্ দশরথের অনুশাসন এবং খণ্ডগিরির হাতীগুম্ফায় উৎকীর্ণ কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের শিলানুশাসনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত হাতীগুম্ফার অনুশাসনে প্রকাশ, ভিখুরাজ খারবেলের ভয়ে মগধপতি মথুরায় পলায়ন করেন। সুতরাং সমস্ত পূর্ব্বভারত ভিখুরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে (২০৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) জৈনধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বলিয়া সাধারণে পরিগৃহীত হইয়াছিল। সেই দুই সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী জৈনপ্রভাবের নিদর্শন দুর্ভেদ্য শালজঙ্গলবেষ্টিত ময়ূরভঞ্জ রাজ্য হইতে সম্প্রতি আমি বাহির করিয়াছি। উপযুক্ত স্থানীয় অনুসন্ধান চলিলে আমাদের এই বঙ্গভূমি হইতেও প্রভূত উপকরণ আবিষ্কারের সম্ভাবনা।

১৭৬ খৃঃপূর্ব্বাব্দে শুঙ্গমিত্রবংশের অভ্যুদয়। ৬৪ খৃঃপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহাদের রাজ্যকাল। ইঁহাদের সময়ে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়। এই ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সঙ্গে সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, এবং পৌরাণিকগণের অভিনব অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে শকাধিপ কনিষ্ক ভারতসম্রাট্ হইলেন। পূর্ব্বভারতেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মই রাজধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। এই সময়ে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, এই সুযোগে বঙ্গের নানা স্থানে মেদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতি মস্তকোত্তলন করিয়া আধিপত্য লাভ করিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে যে সম্রাট্ কনিষ্কের সময় প্রচারিত মহাযান মতই সর্ব্বত্র সমাদৃত, এমন কি আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কনিষ্কের সময় যে মহাযান মত প্রচারিত হয়, কালে তাহাই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্রই সেই প্রভাবের নিদর্শনের অভাব নাই। শকপ্রভাবকালেই শকদিগের এক আদিশাখা নাগবংশের অভ্যুদয়। এই নাগবংশের কএকটী শাখা অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে আসিয়া ভারতীয় আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে বৈরাট নামক স্থানে আসিয়াই এখানকার রাজবংশের সহিত প্রথমে নাগবংশ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মহাভারতীয় বিরাট্ রাজবংশের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া বিরাটের কীর্ত্তিকলাপও নাগবংশীয়গণ নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে নানা বৈদেশিক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়িক আক্রমণে উত্ত্যক্ত

হইয়া তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস যে কনিষ্কের শাসনকালে তাঁহারা পূর্ব্বভারতে আসিয়া বারেন্দ্র, সুহ্ম ও উৎকলের স্থান বিশেষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জের নানা স্থানে সেই নাগবংশীয় বৈরাট-রাজগণের কীর্ত্তিস্মৃতি ও কীর্ত্তিকাহিনী আজও উজ্জ্বল রহিয়াছে। যদিও গৌড়বঙ্গ হইতে সেই বৈরাটরাজবংশের পুরাবৃত্ত বিলুপ্ত, কিন্তু আমি পরম আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অতি অল্পদিন হইল ময়ূরভঞ্জের দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সেই বৈরাটরাজগণের অতীত ইতিহাস কতকটা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অদ্যাপি সেই বৈরাট্-রাজবংশধরগণ ময়ূরভঞ্জের কোঁইসারী গড়ে ও কোপ্তিপাদা নামক স্থানে বাস করিতেছেন এবং উৎকলের গড়জাতসমূহের অন্যতম নীলগিরি রাজ্য শাসন করিতেছেন। রীতিমত অনুসন্ধান চলিলে আশা করি গৌড়বঙ্গের বৈরাট্-রাজগণের অতীত ইতিহাস বাহির হইতে পারিবে। কতদিন এই বৈরাট-নাগবংশ গৌড়বঙ্গে আধিপত্য করিয়াছিল, তাহার প্রমাণাভাব। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে গুপ্তবংশের অভ্যুদয়ে এই রাজবংশের অনেকেই উৎকলের দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বৈরাটবংশের সময়েই গৌড়বঙ্গে নাগ-পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।

গুপ্ত-রাজবংশের সময় প্রথমে ব্রহ্মণ্য বৈদিক ধর্ম্মের, তৎপরে তান্ত্রিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। বর্দ্ধনবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গে গুপ্তবংশই প্রবল ছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে কর্ণসুবর্ণ বা গৌড়ের গুপ্তরাজবংশে প্রবল প্রতাপান্বিত শশাঙ্ক-নরেন্দ্র গুপ্তের অভ্যুদয়। বহরমপুরের দুই ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান রাঙ্গামাটী নামক স্থানে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ছিল। উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণে গঞ্জামের উত্তর সীমা, পশ্চিমে মগধ ও মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব্বে আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ রাজ্য গৌড়াধিপের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার যত্নে ও উৎসাহে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়েও গৌড়বঙ্গে পূর্ব্বতন ধর্ম্ম-প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। রাজনৈতিক চিত্র সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিবার অবসর পায় নাই। ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সহিত জাতীয়তা রক্ষার দিকে তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অল্পকাল পরেই বর্দ্ধনবংশীয় শ্রীহর্ষদেব শশাঙ্ককে পরাজয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইলেন। তাঁহার পর শতাধিক বর্ষকাল তান্ত্রিক বৌদ্ধপ্রভাবই চলিয়াছিল। তৎপরে বৈদিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শূরবংশীয় প্রথম পঞ্চগৌড়েশ্বর আদিশূর উপাধিধারী মহারাজ জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়।

এই সময় হইতেই গৌড়বঙ্গের জনসাধারণ মধ্যে একটি প্রতিকূল-স্রোত বহিতে আরম্ভ করে। এতদিন জনসাধারণ নিবৃত্তিমার্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুধ্যান করিতেছিলেন, এতদিন গৌড়বঙ্গসমাজে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মবীরগণের কীর্ত্তিচরিত্র, বৌদ্ধ ও জৈনাচার্য্যগণের গুরুপরম্পরা প্রভৃতি ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস পরিকীর্ত্তিত হইতেছিল, এতদিন তাঁহারা এক প্রকার সংসার-বৈরা-

গ্যের গাথাই সর্ব্বত্র শুনিতেছিলেন, বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদের সে চিত্র যেন পরিবর্ত্তিত হইল, সংসারের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, প্রবৃত্তিমার্গে চলিয়া নিবৃত্তির সেবা কতদূর ফলদায়ক, তাহারই চর্চ্চা চলিতে লাগিল। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গাবংশীয় রাজগণের যত্নে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ কতকটা সুবিধা পাইয়া মস্তকোত্তোলন করিতেছিলেন। দুইটী প্রতিকূল-স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে অল্পদিন পরেই বৈদিক-সমাজের অধঃপতন বা পরাজয় সাধিত হইল। পালবংশের অভ্যুদয়ের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্য্যগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলে শ্রেয়স্কর ও সহজসাধ্য ভাবিয়া পরম সমাদরে তান্ত্রিকধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই নবধর্ম্ম ভিক্ষু বা সাধকের উপযোগী হইলেও সাধারণ গৃহস্থের উপযোগী হয় নাই। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপ্রমুখ বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্য্যগণ পালরাজসভায় তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারা অসাধারণ ক্ষমতাশালী সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ মুমুক্ষু ভিক্ষুসঙ্ঘের উপকারী হইলেও, অনধিকারী সংসারীর হস্তে তাহার বিপরীত ফলে গৌড়বঙ্গ-সমাজে ঘোর অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই অনর্থ নিবারণ করিবার জন্যই অথচ তান্ত্রিকতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে গৌড়েশ্বর বল্লালসেন কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন। এই সময়ে সেনরাজগণের কৌশলে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ নবাভ্যুদিত হিন্দুতান্ত্রিক সমাজে মিশিয়া গেলেন। হীনাচার হইতে মুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ বৈদিকাচারে আনিবার জন্যই লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি সেনরাজগণ কএকবার সমাজ সমীকরণকল্পে কুলপদ্ধতি প্রচলিত করেন। সমাজকে উন্নত আদর্শে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়েই কুলমর্য্যাদার ও সমাজ-সমীকরণের সৃষ্টি। এই সময়ে যেন এক অপূর্ব্ব তাড়িত শক্তিপ্রভাবে আব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মধ্যেই স্ব স্ব আভিজাত্যের দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছিল। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে সমাজের জনসাধারণ কেবল নিবৃত্তিমার্গ ও জ্ঞানের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, মধ্যে যাঁহারা বৌদ্ধতান্ত্রিকতার বাহ্য চটকে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বতম সমাজের উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারা স্ব স্ব সমাজরক্ষা ও ধর্ম্মপালনে অগ্রসর হইলেন।

পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ধর্ম্মবীরগণের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ ও দেবচরিত এবং ধর্ম্মাচার্য্যগণের গুরুপরম্পরারূপ বংশানুচরিত ইত্যাদি ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসেরই শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইত, মধ্যে মহারাজ শশাঙ্কের সময়ে জাতীয় ইতিহাস রক্ষার দিকে সামান্য দৃষ্টি পড়িলেও এবং মহারাজ আদিশূরের সময়ে বৈদিকসমাজের সুপ্রাচীন প্রথা অবলম্বিত হইলেও সেনরাজগণের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অতিপ্রাচীন আর্য্যসমাজের আদর্শে সমাজনৈতিক ইতিহাসরচনা আরম্ভ হইল। নানা প্রাচীন জৈন গ্রন্থে বিবৃত তীর্থঙ্করমাহাত্ম্য, স্থবিরাবলী-চরিত, ভোট ও নেপাল হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধাচার্য্যগণের কীর্ত্তিকলাপ, উত্তরবঙ্গে অদ্যাপি প্রচলিত মহীপালের গান, মাণিকচাঁদের গান ও গোপীচাঁদের গান প্রভৃতি সেই প্রাচীন গাথা বা ধর্ম্মেতিহাসের সামান্য নিদর্শন। নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিপ্লবে আমাদের জন্মভূমির ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস এক প্রকার বিলুপ্ত হইলেও—প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে এবং দেশ-প্রচলিত প্রাচীন গাথায় তাহার ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র থাকিলেও আমাদের পূর্ব্বতন সমাজনৈতিক ইতিহাস এখনও

বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বলিতে কি, যাহা অপর দেশে নিতান্ত বিরল, এমন কি নাই বলিলেই হয়, গৌড়বঙ্গে তাহাই সুপ্রচার। বাঙ্গালীর চিরদিন লক্ষ্য ছিল ধর্ম্ম ও সমাজের দিকে। শত শত দেশবৈরির আক্রমণে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক আকাশ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইলেও—সহস্র সহস্র রাজনৈতিক সংগ্রামে গৌড়বাসী জয়শ্রী অর্জ্জন করিলেও রাজকীয় ইতিহাসের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাই গৌড়মণ্ডলে রাজনৈতিক ইতিহাস সেরূপ প্রচলিত হয় নাই। তাই আমরা রণক্ষেত্রের ইতিহাস—শোণিতপ্রবাহে ভাসমান বিভিন্ন রাজবংশের রাজনৈতিক কীর্ত্তিকলাপ—রীতিমত লিপিবদ্ধ দেখিতেছি না। তবে যে রাজনৈতিক ইতিহাস এ দেশে সর্ব্বকালেই এককালে অনাদৃত ছিল, তাহা মনে করিতে পারি না। এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাস—রাজবংশ, রাজপুরুষ বা রাজানুগৃহীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শত শত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে এবং তাহা যে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কীটদষ্ট পুথির মধ্য হইতে অতি অল্প সংখ্যক রাজেতিহাসের সন্ধান পাইয়াছি,—তন্মধ্যে নেপাল হইতে আবিষ্কৃত রামপালচরিত, শ্রীহর্ষের গৌড়োর্ব্বীশকুল-প্রশস্তি ও বিজয়-প্রশস্তি, বিক্রমপুর হইতে আবিষ্কৃত বল্লালোদয় এবং শ্রীহট্ট হইতে আবিষ্কৃত শ্যামলবর্ম্মচরিত উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইতে পারিলেও ঐ কয়খানি গ্রন্থ মধ্যে এক সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের কতক কতক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারিবে। কে বলিতে পারে ঐরূপ শত শত রাজচরিত যত্নাভাবে বিলুপ্ত না হইয়াছে ?

যাহা হউক, রাজনৈতিক ইতিহাস রাজসংসারেই সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণে তাহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। সাধারণে রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া আত্মীয় স্বজন-পরিবেষ্টিত স্ব স্ব পল্লী মধ্যে স্ব স্ব সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন। স্ব স্ব সমাজের উন্নতি, স্ব স্ব বংশের বিশুদ্ধিতা রক্ষা, স্ব স্ব কুলধর্ম্মপ্রতিপালন এবং স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব কীর্ত্তন, এই কয়টী বিষয়েই সাধারণের বিশেষ লক্ষ্য ও মনোযোগ ছিল, তাহারই ফলে বাঙ্গালার সকল উন্নত সমাজেই বিস্তৃত সামাজিক ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে অযত্নে অনাদরে সেই জাতীয় ইতিহাস আমরা নষ্ট করিতেছি, সেই প্রকৃত ইতিহাসের দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই প্রকৃত ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেন। কেবল কতকগুলি রাজবংশের তালিকা এবং কোন্ বর্ষে কে কোথায় যুদ্ধ করিল, কোথায় কিরূপে জয় পরাজয় হইল, কেবল এই সকল ঘটনাকে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইতিহাস বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা প্রতি সমাজ, প্রতি জাতি, প্রতি গোষ্ঠী, এবং প্রতি শ্রেষ্ঠবংশের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস আদরের সহিত কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে এই বঙ্গদেশে মহারাজ শশাঙ্কের সময় হইতে এক বিশাল সার্ব্বজনীন ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে কোন্ রাজার আশ্রয়ে কোন্ স্থানে কোন্ সমাজের অভ্যুদয় এবং কিরূপে সেই সেই সমাজের বিস্তৃতি, পুষ্টি ও সমাজবন্ধন সাধিত হইয়াছে, কোন্ গুণে বা দোষে কোন্

সময়ে কিরূপে কোন্ সমাজের উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে, কি সামাজিক নিয়মে কোন্ কোন্ ব্যক্তি সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি বা দলপতি অথবা সমাজে উচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছেন,— কিরূপ অসদাচরণে, কি কারণে সনাতন সদাচার বিসর্জ্জনে, কি প্রকার অনুদার নীতির অনুসরণে কোন্ কোন্ সমাজের অধঃপতন ঘটিয়াছে, কোন্ সময়ে কিরূপ ধর্ম্মবিপ্লবে কোন্ কোন্ শ্রেষ্ঠ জাতি অধঃপতিত এবং কোন্ কোন্ হীন জাতি উন্নত হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিবার ধারাবাহিক সামাজিক ইতিহাস আমাদের আছে। সমাজের গতি, পদ্ধতি ও রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া শত শত বঙ্গীয় জেনোফন বঙ্গীয় সমাজের সেই অতীত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুসভ্য য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে সার্ব্বজনীন ইতিহাসের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেও আজও য়ুরোপীয় সমাজে যে ইতিহাস সঙ্কলনের সুযোগ আসে নাই—অর্থাৎ যাহা অপর দেশে নাই বলিলেই হয়, তাহা আমাদের আছে, ইহা কম গৌরবের বা কম শ্লাঘার কথা নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংরাজপ্রভাব বিস্তারের সহিত আমরা সেই প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস চর্চ্চায় বিমুখ হইয়াছি, আমাদের অমনোযোগিতায়, অবহেলায় শত শত সামাজিক ইতিহাস নষ্ট করিয়াছি। তথাপি এই ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা হইতে ৮।১০ বর্ষের সামান্য চেষ্টায় আমি যে অতি সামান্য অংশ যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেও আপনারা বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাহা প্রায় ৫০০ খণ্ডে বিভক্ত, ২০ খানি মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ হইবে। তাহা সাধারণতঃ কুলগ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি জাতি বা সমাজ নির্ব্বিশেষে ঐ সকল সামাজিক গ্রন্থ উপযুক্ত সমাজতত্ত্বজ্ঞের হস্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঐ সকল কুলগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মূল পুরুষ কেহই এই বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী নহে, কি বৈদিক, কি অবৈদিক, কি কুলীন কি শ্রোত্রিয়, কি মৌলিক কি অমৌলিক, কি সিদ্ধ কি সাধ্য ব্রাহ্মণ হইতে নবশাখ পর্য্যন্ত সকল জাতিরই এই বঙ্গদেশে আদিবাস নহে। কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা, কেহ কান্যকুব্জ, কেহ বারাণসী, কেহ মগধ, কেহ মহারাষ্ট্র, কেহ দ্রাবিড়, কেহ মধ্যভারত, কেহ বা উৎকল হইতে আসিয়া এ দেশে উপবেশন স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার একই ব্যক্তির সন্তানগণ মধ্যে আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির বৈলক্ষণ্যে, বিভিন্ন স্থানে বাস ও বিভিন্ন সমাজে আশ্রয় হেতু কেহ রাঢ়ীয়, কেহ বারেন্দ্র, কেহ বৈদিক, কেহ মধ্যদেশী, কেহ পাশ্চাত্য, কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ উত্তররাঢ়ীয়, কেহ দক্ষিণরাঢ়ীয়, কেহ বঙ্গজ, কেহ উত্তর বারেন্দ্র, কেহ দক্ষিণ বারেন্দ্র, কেহ পঞ্চকোট, কেহ মঙ্গলকোট, ইত্যাদি একই শোণিত ধারা বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নামে পরিগণিত হইয়াছে।

এ দেশে প্রথমাগত সম্মানিত ব্যক্তিগণের বসবাস স্থাপনের পর বংশানুচরিত কীর্ত্তন ও বিভিন্ন সমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির যে

সকল কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শাকদ্বীপীয় বা মগ ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়। তাঁহারা পুণ্ড্রার্ক বা বারেন্দ্রগ্রহবিপ্র নামে পরিচিত। অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহাদের অধিকাংশ সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে, সামান্য কতকগুলি পাতড়া মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই জানা যায় যে অতি পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপ (Skythia) হইতেই তাঁহারা ভারতে আগমন করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের সময় গৌড়রাজসভায় শাকদ্বীপীয় গ্রহবিপ্রগণের পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে। আমরা মহাদেবের কারিকা নামক অতি প্রাচীন গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকা পাইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে কোন সময়ে গৌড়েশ্বর মহারাজ শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্যে অতিশয় রোগপীড়িত হইয়াছিলেন। নানা বৈদ্যের চিকিৎসায়ও তিনি আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্য তিনি সরযূতীর হইতে কতিপয় গ্রহবিপ্র আনাইয়াছিলেন। তাঁহারা যথাবিধি গ্রহযজ্ঞ সমাধা করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলে রাজার আদেশে তাঁহারা সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণও জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, রাঢ় ও বঙ্গে নানা স্থানে তাঁহারা আসিয়া উপনিবেশ করেন, মগব্যক্তি নামক শাকদ্বীপীয়গণের প্রধান পরিবার গ্রন্থে এবং খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত শিলালিপিতে এই শাখা বালার্ক নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা পূর্ব্ব হইতেই গুপ্তরাজগণের নিকট সম্মানিত।

মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত দেশের সেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশধরগণ এখন "সরযূ পারিয়া" ও নদীয়া বঙ্গসমাজভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আদিশূরের সময় বৈদিকব্রাহ্মণপ্রভাব কালে এই শাক ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব হ্রাস হয়, তৎপরে জ্যোতির্বিদ্যার গুণে পালরাজগণের সভায় তাঁহাদের কতকটা প্রতিপত্তি ঘটিলেও সেনরাজগণের সময় হইতে কনোজীয় সাগ্নিক ও বৈদিক বিপ্রগণের রাজসম্মান ও সাধারণের উপর প্রতিপত্তি বিস্তারের সহিত মগব্রাহ্মণসমাজের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। এমন কি পূর্ব্বতন রাজসম্মানিত গ্রহবিপ্রবংশীয়গণ অনাচরণীয় শূদ্রবৎ গণ্য হইতে থাকেন, এই কারণে অদ্যাপি বঙ্গের অনেক স্থানে উক্ত শাকদ্বীপীগণ 'বিপ্র'সন্তান বলিয়া গণ্য হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় যে উচ্চজাতির নিকট তাঁহাদের জল অস্পৃশ্য। এই পূর্ব্বসম্মানিত শাকদ্বীপীয় বিপ্রসমাজের অধঃপতনের সহিত অবস্থাবৈগুণ্যে ইঁহাদের বহুতর সামাজিক ইতিহাস লুপ্ত হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিকা ও উমেশচন্দ্রের কারিকা এবং বাঙ্গালা পদ্যে রচিত রামদেবের কুলপঞ্জী পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে আরও মিলিতে পারে।

উপরোক্ত বিভিন্ন সমাজভুক্ত শাক-ব্রাহ্মণগণের গৌড়ে বা বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনের বহুকাল পরে কিঞ্চিদধিক ৫ শত বর্ষ হইতে চলিল, মধ্যদেশ (সম্ভবতঃ ময়ূরভঞ্জ ও মেদিনীপুরের সীমা) হইতে আরও কএকজন শাকলব্রাহ্মণ সন্তান গৌড়দেশে আগমন করেন, তাঁহাদের ৪র্থ বা ৫ম পুরুষ অধস্তন বংশধরেরা রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করিয়া রাঢ়ীয়

গ্রহবিপ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ময়ুরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে সকল আঙ্গিরসের বাস দেখা যায়, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের সহিত রাঢ়ীয় শাকলব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহারে কতকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এই রাঢ়ীয় শাকলব্রাহ্মণের কএক ঘর আজিও "আঙ্গিরস" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের বহুতর কুলগ্রন্থের নাম শুনা যায়। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা, কুলানন্দের সংস্কৃতকারিকা, কুলানন্দের বাঙ্গালাকারিকা, অচ্যুতপঞ্চাননের রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা ও গ্রহবিপ্রকুলবিচার নামক কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। রীতিমত অনুসন্ধান চলিলে আরও মিলিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কনোজাগত সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের অভ্যুদয়ে শাকদ্বীপিয় ব্রাহ্মণ-গণের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে।

প্রাচীন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলপঞ্জিকার মতে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর জয়ন্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া বেদমার্গপ্রচারের আয়োজন করেন। এই সময় কনোজ হইতে বৈদিক বিপ্রগণ গৌড়রাজসভায় আগমন করেন।—তৎকালে মহাকবি ভব-ভূতির প্রতিপালক মহারাজ যশোবর্ম্মদেব কনোজের অধীশ্বর; কনোজ-রাজধানী সে সময়ে বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনের লীলাস্থলী এবং প্রধান প্রধান বৈদিক বিপ্রগণের কর্ম্মভূমি। ভবভূতির নাটককাব্যসমূহে ও বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে সেই সময়ের চিত্র প্রকটিত, তাই আদিশূরকে নিজ রাজ্যে বৈদিকাচার প্রচারার্থ কনোজ হইতেই সাগ্নিক বিপ্র আনিতে হইয়াছিল। হরিমিশ্র রচিত সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণকারিকা হইতেও জানা যায় যে আদিশূরের বংশধরের সময়েই পালবংশ প্রবল হইয়া গৌড় অধিকার করেন। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীর মতে, আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড়-দেশ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, দক্ষ ও ছান্দড় প্রভৃতি যে সাগ্নিক বিপ্রসন্তান প্রথমে রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারাই রাঢ়ীয় বিপ্রগণের বীজপুরুষ বলিয়া পরিগণিত। বাসস্থান অনুসারে এই ভূশূরের সময়েই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই তিনটি শ্রেণীভেদ ঘটে। প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের মুখে শুনা যায় যে, রাঢ়ীয় মুখুটী বংশের বীজপুরুষ শ্রীহর্ষের পুত্র শ্রীনিবাস সর্ব্বপ্রথম আদিশূরের পরিচয় ও কনোজাগত সাগ্নিক পঞ্চগোত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে পালরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ধপ্রাধান্য কালে সেই মূল গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। পালরাজগণের সময়ে যাঁহারা আবার যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্ব স্ব কুলধর্ম্মপরিচয়, গুরুপরিচয় ও সংক্ষেপে রাজপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ে প্রথমে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ এবং পরে তান্ত্রিক ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণের দারুণ অধঃপতন ঘটে। তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে কেহ কেহ "ডোমপণ্ডিত" নামে পরিচিত। এই ডোমপণ্ডিতগণের গৃহে কিছুকাল পূর্ব্বে সেই সকল আদিধর্ম্মকুলগ্রন্থ রক্ষিত ছিল; অযত্নে এবং বঙ্গের ধ্বংসশীল জলবায়ুর গুণে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। এই ডোমপণ্ডিতগণের বর্ত্তমান বংশধর-

গণের নিকট সেই আদিকুলগ্রন্থসমূহের খণ্ডিত সামান্য নিদর্শন মাত্র পাওয়া যাইতেছে। উপযুক্ত অনুসন্ধান চলিলে সেই অপূর্ব্ব জাতীয় উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগৃহীত হইলেও হইতে পারে।

বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ে পালঅধিকার বিস্তৃত হইলেও দক্ষিণ রাঢ়ে আদিশূরের বংশধরগণ বহুকাল রাজত্ব করিতেছিলেন। হরিমিশ্রের কারিকা ও রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীমধ্যে সেই শূরবংশীয় রাজগণের বংশাবলি ও তাঁহাদের সময়কার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আদিশূরের বংশধর প্রথমে গৌড় বা বারেন্দ্রপ্রদেশ হারাইলেও উত্তররাঢ় কিছুকাল তাঁহাদের অধিকারে ছিল, এই উত্তররাঢ়ে শূরবংশীয় আদিত্যশূর নৃপতির শাসনকালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পঞ্চ বীজপুরুষ আগমন করেন এবং এই উত্তররাঢ়ে বাস হেতু তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় বলিয়া পরিচিত হন। শ্যামদাসী ডাক, শুকদেব সিংহের ঢাকুরী, ঘনশ্যাম মিত্রের কারিকা প্রভৃতি উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে তাহাদের বিস্তৃত পরিচয় আছে। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ ও নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানিতে পারি যে রাজা জয়পালই প্রথম উত্তররাঢ় অধিকার করেন এবং আদিশূরানীত কনোজীয় বিপ্রগণের মধ্যে রাঢ়বাসী কয়েকজন প্রধান পণ্ডিত জয়পালের দান গ্রহণ করেন এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি পালরাজের মন্ত্রিত্বলাভ করিয়া উত্তররাঢ়ে নানা কীর্ত্তিস্থাপন ও প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ উত্তররাঢ়ের নানা স্থানে সামন্তনৃপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন—তাঁহাদের রাজকীয় ক্ষমতা কোন স্বাধীন নৃপতি হইতে কম ছিল না। এমন কি রাজা মানসিংহের উত্তররাঢ় অধিকারকালেও কোন কোন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন, নানা উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ এবং রাজা মানসিংহের সময়ে উত্তররাঢ়ে সমাগত জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণগণের পুণ্ডরীক-কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা নামক কুলগ্রন্থে তাহার কিছু কিছু পরিচয় আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্যকুলকে শূদ্র জাতিতে পাতিত করিবার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তৎকালে বৈশ্যবৃত্তিক বহু সম্ভ্রান্ত জাতি পালরাজবংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুবর্ণবণিক জাতি প্রধান। সুবর্ণবণিক জাতি পালরাজগণের সহিত যৌন-সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

কর্জ্জনার গোবর্দ্ধন মিশ্র সর্ব্বপ্রথম সুবর্ণবণিক জাতির কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধভূপালসংস্রবহেতুই সেনরাজগণের সময়ে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত গৌড়বঙ্গ মধ্যে সুবর্ণবণিক জাতির সামাজিক অধঃপতন ঘটে। আনন্দভট্টের বল্লাল-চরিতে উদ্ধৃত শরণ দত্তের উক্তি হইতেও আমরা তাহার বেশ পরিচয় পাই। বৌদ্ধাচার হেতু সদ্গোপ-জাতিও এদেশে হিন্দুসমাজে অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছিলেন। এই জাতি ইদানীন্তন কালেও মহাযান-মতাবলম্বী শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মত কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্ম ঠাকুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে বৌদ্ধযুগের যে সদ্ধর্ম্মের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি প্রকাশ করিয়াছেন, সদ্গোপকুলগ্রন্থ হইতে যেন আমরা সেইরূপ আভাস পাইতেছি। কেবল সদ্গোপ বলিয়া নহে, তিলি, তাম্বূলী, তন্তুবায়, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির কুলগ্রন্থের উপক্রমে শূন্যমূর্ত্তি সদ্ধর্ম্ম নিরঞ্জনের স্তবের পরিচয় পাইয়াছি। বৌদ্ধদিগের নিকট তাঁহাদের বুদ্ধ ধর্ম্মই 'সদ্ধর্ম্ম' নামে প্রসিদ্ধ। এমন কি ১৬৭০ শকে রচিত তিলকরামের যে তন্তুবায় কুলজী পাইয়াছি, তাহাতে ঐ গ্রন্থ "সদ্ধর্ম্মাচার-কথা" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"মাধবের সূত্র দেখি করিলু বর্ণন ॥
তিন গ্রন্থে কুলাজীর কৈলা সমাধান।
সদ্ধর্ম্ম-আচার-কথা শুনে পুণ্যবান।
পুরন্দর কুলে জন্ম বর্ণে তিলকরাম ॥"

তিলকরাম নামে অপর এক ব্যক্তি ও পরশুরাম গন্ধবণিক জাতির কুলগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দ্বিজপাত্র পরশুরাম "তাম্বূলী পরিচয়" এবং রামেশ্বর দত্ত "তিলির পরিচয়" লিপিবদ্ধ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণপ্রভাব কালে রচিত হওয়ায় প্রতিপাদ্য মূল কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে জাত্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে ইতিহাসবহির্ভূত অনেক বাজে অলৌকিক কথাই স্থান পাইয়াছে।

পশ্চিমোত্তর বঙ্গে যখন বৌদ্ধ প্রভাব অব্যাহত, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ধীরে ধীরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতেছিল। পাশ্চাত্য বৈদিক রাঘবেন্দ্র কবিশেখর প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে "ভবভূমিবার্ত্তা" নামক গ্রন্থে নিজ সমাজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহারাজ হরিবর্ম্মদেব তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই পরাক্রান্ত নৃপতি দক্ষিণাপথ হইতে সমুপাগত জৈন বৌদ্ধাদি বহুতর নৃপতিকে পরাজিত করিয়া একাম্রক্ষেত্রে (ভুবনেশ্বরে) হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতির বহুশত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র, বালবলভী ভট্ট (ভবদেব) প্রভৃতি সাতজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহার সচিব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে কান্যকুব্জে মুসলমান আগমন, দস্যুভয় এবং কনোজপতির রাজ্যনাশ ঘটে, এই বিপ্লবের সময়েই গৌতম গোত্রজ গঙ্গাগতিপ্রমুখ কয়েকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের অনুমতি লইয়া কোটালিপাড়ে বাস করেন, সেই সময় হইতেই কোটালিপাড়ের বৈদিক সমাজের সূত্রপাত। রাঘবেন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বঙ্গাগমন প্রসঙ্গে যেরূপ ব্রাহ্মণসমাজের গতি বিধি, আহার ব্যবহার ও বসবাসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কুটীরবাসী সরল হৃদয় পুণ্যচেতা মুনি ঋষিগণেরই যেন উপযুক্ত, সেই প্রাচীনকালে কুটীরবাসী উন্নত ব্রাহ্মণসমাজ কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা কতদূর আড়ম্বরশূন্য ছিলেন এবং কিরূপ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন, কবিশেখরের রচনায় তাহার প্রকৃত চিত্র যেন পরিস্ফুট হইয়াছে।

কবিশেখর নিজ কুলগ্রন্থে জৈন বৌদ্ধরাজবিজয়ী ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে শতাষ্টোত্তরশত মন্দিরনির্ম্মাতা যে হরিবর্ম্মরাজের পরিচয় দিয়াছেন, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বেজনীসার গ্রাম হইতে তাঁহার তাম্রশাসন এবং ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের প্রশস্তিমূলক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার অভ্যুদয়ের সময়ে মহাপরাক্রান্ত দক্ষিণাপথাধীশ্বর প্রসিদ্ধ জৈনরাজ রাজেন্দ্র চোল গৌড়বঙ্গ ও দণ্ডভুক্তি বা বেহার জয় করিতে আসিয়াছিলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তিরুমলয়ের গিরিলিপি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিলেও মহারাজ হরিবর্ম্মদেবকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। বৌদ্ধ পালনৃপতিগণও বোধ হয় হরিবর্ম্মদেবের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই কথাই বৈদিক কুলজ্ঞ রাঘবেন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সময়ে গজনীপতি সুলতান মান্দুদ ৯৪২ শাকে কনোজ আক্রমণ করেন, সেই মুসলমান আক্রমণ হইতে ধন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বহুলোক কনোজ পরিত্যাগ করেন, তন্মধ্যে বঙ্গাগত কয়েকজনের মাত্র পরিচয় রাঘবেন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তৎপরেই সুজলা সুফলা বঙ্গভুমির প্রতি বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং দলে দলে আসিয়া তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে উপনিবেশ করিতে থাকেন। তন্মধ্যে বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক মহারাজবি জয়সেনের সাময়িক ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর বৈদিক প্রায় তিনশত বর্ষ হইল, সদ্বৈদিককুলপঞ্জিকা নামে এক বৃহৎ পাশ্চাত্যবৈদিক সমাজের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। তিনি গ্রন্থের উপক্রমে লিখিয়াছেন,—

"বিচার্য্য তত্ত্বমুলানি চালোক্য তাম্রশাসনম্।
ক্রিয়তে কুলপঞ্জীয়মীশ্বরেণ চ ধীমতা॥"

অর্থাৎ বৈদিক সমাজের আদিতত্ত্বসমূহ বিচার করিয়া এবং তাম্রশাসন দেখিয়া এই কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানিকে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এখন যেমন শিলালিপি ও তাম্রশাসন-সাহায্যে প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হইতেছে, পূর্ব্বকালে এদেশের সামাজিক ইতিহাসলেখকগণও সেইরূপ প্রাচীন উপকরণাদি লইয়া আলোচনা করিতেন। উক্ত বৈদিক কুলপঞ্জী মতে, মহারাজ বিজয়সেনের পিতা সুবর্ণরেখা-প্রবাহিত কাশীপুরের নিকট রাজত্ব করিতেন। বিজয়সেনের দুই পুত্র মল্ল ও শ্যামল। মল্লকে পৈতৃক রাজ্যে রাখিয়া কনিষ্ঠ শ্যামলকে লইয়া মহারাজ বিজয় বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। নীলকণ্ঠ রচিত যশোধরবংশমালা প্রভৃতি বৈদিক কুলগ্রন্থ মতে, ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ বিজয়সেন সপুত্র শ্যামলবর্ম্মসহ গৌড়রাজ্যে অভিষিক্ত হন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কুলগ্রন্থে এই বিজয়সেনই দ্বিতীয় আদিশূর বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। ইনি রাঢ়-গৌড়বঙ্গে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বহুতর বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। তন্মধ্যে তৎপুত্র শ্যামল কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ গোত্রই আজও পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে শ্রেষ্ঠ

বা কুলীন বলিয়া সম্মানিত। নীলকণ্ঠের যশোধরবংশমালা প্রভৃতি বৈদিক কুলগ্রন্থ মতে শ্যামলবর্ম্মা ১০০১ শকে শাকুনসত্র উপলক্ষে উক্ত পঞ্চ গোত্রজ পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণকে কর্ণাবতী হইতে আনাইয়া বহু শাসন গ্রাম দান করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমিবার্ত্তা, ঈশ্বর বৈদিক রচিত পাশ্চাত্যবৈদিককুলপঞ্জী, নীলকণ্ঠের যশোধর-বংশমালা বা ধুল্লার শুনকবংশকারিকা, লক্ষ্মীকান্ত বাচস্পতির সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকা, মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধতত্ত্বার্ণব, বিক্রমপুরের সদ্বৈদিক কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের ইতিহাস বিবৃত আছে। ঈশ্বর বৈদিক লিখিয়াছেন যে শ্যামলই পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বতন রাজন্যগণকে পরাজয় করিয়া বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হন এবং বর্ম্মোপাধি ধারণ করেন। আবার সামন্তসারের বৈদিককুলার্ণবে লিখিত আছে যে শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় অধীশ্বর (বিজয়সেনের) আশ্রয়েই পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতেন। বিক্রমপুর হইতে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থোক্ত রাঢ়ীয়বারেন্দ্রদোষ-কারিকায় লিখিত আছে যে বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রভাবে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, মহারাজ বিজয়সেনের গৌড়াধিকারের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেকে সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া আবার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ-কুলগ্রন্থ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের অভিষেক-বর্ষেই দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের কতিপয় বীজপুরুষ এ দেশে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কান্যকুব্জ, কেহ হরিদ্বার, কেহ অযোধ্যা, কেহ কাশী, কেহ বা কাঞ্চীপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই সন্তানগণ এক্ষণে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নন্দী, চাকী, দাস প্রভৃতি পদ্ধতিতে পরিচিত এবং গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও সম্মানিত। প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে কায়স্থ বীজপুরুষগণের যেরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সহজেই মনে হইবে যে তাঁহারা সেনাধীশ্বরের সনাতন বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য করিবার জন্যই যেন এ দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরমমাহেশ্বর বিজয়সেন যেরূপ রাজ্যবিস্তারের সহিত বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন সেইরূপ বৈদিকগণের কতকটা বিরোধী হইয়া-ছিলেন। সেই জন্যই প্রাচীন বৈদিক কুলগ্রন্থে পিতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের নাম থাকিলেও বল্লালসেনের নাম স্থান পায় নাই। গৌড়াধিপ বল্লাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃ-পিতামহের আচরিত বৈদিক ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন না করিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ে সে বেগ কতকটা নিবারিত হইলেও পালবংশের অভ্যুদয়ে তান্ত্রিকতার স্রোতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রবল হইয়াছিল। মহারাজ বিজয়সেন প্রকৃত হিন্দু গৃহস্থের অনুপযোগী সেই বিসদৃশ আচার নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও নানা স্থান হইতে সমুপাগত কায়স্থগণ তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। এ সময়ে তান্ত্রিক ও বৈদিক মতাবলম্বীদিগের মধ্যে একটী দারুণ সংঘর্ষ

চলিতেছিল। যতদিন মহারাজ বিজয়সেন জীবিত ছিলেন, ততদিন তান্ত্রিকেরা মস্তকোত্তোলন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের সহিত মহারাজ বল্লালের নিকট উৎসাহ পাইয়া তান্ত্রিকেরা আবার প্রবল হইয়া উঠিলেন। তান্ত্রিকাচারে যাঁহারা গৌড়বঙ্গসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন এবং বল্লালের তান্ত্রিক কুলাচারের যাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন, গৌড়েশ্বর তাঁহাদিগকে কৌলীন্য প্রদান করিয়া একটী পৃথক্ সমাজের সৃষ্টি করিলেন এবং যাঁহারা তৎপ্রবর্তিত কুলাচার বৈদিকাচারসম্মত নহে মনে করিয়া বাধা দিয়াছিলেন, রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক বরং তাঁহারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অনাদিবর সিংহবংশীয় বল্লালসেনের অন্যতর মন্ত্রী ব্যাসসিংহ ও দেবদত্তবংশীয় বহুতর দত্তসন্তান বল্লালের প্রতিকূলে মত প্রকাশ করায় জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রঢাকুর গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, বল্লালের সভায় বহু কায়স্থ তাঁহার কুলাচারের সমর্থন করিতে না পারায় নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় সুদূর উত্তরবঙ্গে পলায়ন করেন এবং জটাধর নাগের আশ্রয়ে একটী পৃথক্ সমাজ গঠন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বেদশাস্ত্রপারদর্শী পাশ্চাত্য বৈদিকগণও বল্লালের রাজধানী হইতে বহুদূরে থাকিয়া বরং তাঁহার বিরুদ্ধাচারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। এদিকে কিন্তু প্রথম আদিশূরের সময় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে সমাগত কনোজের সাগ্নিক বিপ্রপঞ্চকের বংশধরগণ বহুকাল তান্ত্রিকগণের সহিত এক সমাজে বাস ও অনেকটা একাচারী হইয়া পড়ায় বল্লালের পক্ষ লইলেন এবং মহারাজ বিজয়সেনের সময় সমাগত কতকগুলি কায়স্থসন্তানও রাজসম্মানলাভের প্রত্যাশায় মহারাজ বল্লালসেনের পোষকতা করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালসেন স্বীয় মতানুবর্ত্তী বা দলভুক্ত প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও বংশবিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য কুলবিধি প্রবর্ত্তন করেন। দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ তান্ত্রিক আচার লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বল্লালসেন মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় বা মৌলিক এই ত্রিবিধ কুলনিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

হরিমিশ্রের কারিকায় লিখিত আছে যে মহারাজ বল্লালসেন সেই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বহুতর তাম্রশাসন দ্বারা কুলস্থান দান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহারাজ বল্লালসেনের কুলবিধি স্থাপনের পূর্ব্বে কি ব্রাহ্মণ ও কি কায়স্থসমাজের মধ্যে রীতিমত শ্রেণীভেদ বা সমাজপার্থক্য ঘটে নাই।—কি ব্রাহ্মণ ও কি কায়স্থ এ দেশীয় নানাশ্রেণীর কুলগ্রন্থ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক এবং উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে বল্লালের কুলবিধির পূর্ব্বে বিবাহাদি ও অন্নব্যবহার প্রচলিত ছিল। বল্লালসেনের কুলবিধি প্রচলিত হইলে যাঁহারা রাজবিধি স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা বল্লালী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়েই গৌড়বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে প্রধানতঃ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, উৎকল বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পাশ্চাত্য বৈদিক ইত্যাদি শ্রেণীচতুষ্টয় এবং কায়স্থসমাজ মধ্যে উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই শ্রেণী চতুষ্টয় গঠিত হইল। তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় ব্যাসসিংহ

জাতীয় সম্মানরক্ষার জন্য প্রাণদান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতা লক্ষীধর উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সমাজপতি ও করণগুরু বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। করণগুরু লক্ষীধরের চেষ্টায় উত্তর-রাঢ়ে সমাগত বল্লালের মতবিরোধী কায়স্থগণকে লইয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ গঠিত হয়। এইরূপে জটাধর নাগের চেষ্টায় বারেন্দ্রসমাজ গঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজ তখনও গঠিত হয় নাই। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের বীজপুরুষগণ তখনও গৌড় ও নবদ্বীপ অঞ্চলে মহারাজ বল্লালের উভয় রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মহম্মদ-ই-বথতিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া ও গৌড়বিজয়ের পর লক্ষ্মণপুত্র মহারাজ বিশ্বরূপের সময় দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ এই দুই স্বতন্ত্র সমাজ গঠনের সূত্রপাত এবং মহারাজ লক্ষ্মণপৌত্র দনৌজা মাধবের সময়ে তাঁহারই উৎসাহে বঙ্গজসমাজ দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন কুলনিয়মের অধীন হইয়াছিল। দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ-কুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে—

"দনুজ মাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
সেন পদ্ধতিতে তাঁহার মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হইলা চিন্তাপর॥
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থকুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি॥"

দ্বিজ বাচস্পতির কারিকা হইতে বেশ জানা যাইতেছে মহারাজ দনৌজা মাধবের গোষ্ঠীপতিত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে বল্লালী নিয়মের অধীন প্রধান কুলীন কায়স্থগণ গৌড় দেশেই বাস করিতেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজসভায় আহূত হইবার পর তাঁহাদিগকে লইয়াই সম্ভবতঃ বঙ্গজ শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে কায়স্থগণও বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে লিখিত আছে,—মহারাজ বল্লালসেন মৃত্যুকালে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কেবল তান্ত্রিক কুলাচার দ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজের স্থায়ী মঙ্গলের সম্ভাবনা অল্প, একারণ তিনি মৃত্যুকালে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকে তৎপ্রবর্ত্তিত কুলবিধি সংস্কার করিবার উপদেশ দিয়া যান। মহারাজ লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বরং পিতামহ বিজয়সেনের ন্যায় বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের জন্য প্রচ্ছন্নভাবে সচেষ্ট ছিলেন। এই কারণে তিনি বহুসংখ্যক বৈদিক ব্রাহ্মণকে তাম্রশাসন দ্বারা বহুতর গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এবং হলায়ুধ, পশুপতি ও কেশব প্রভৃতি তাঁহার সভাস্থ বৈদিক পণ্ডিতগণ দ্বারা, বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের উপযোগী গ্রন্থ সকলও রচনা করাইয়াছিলেন। এদিকে পিতার আদেশ অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া তিনি কুলীন সমাজের সংস্কারেও মনোযোগী হইয়াছিলেন, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধকে দিয়া মৎস্যসূক্ত নামে একখানি মহাতন্ত্র প্রচার করেন। তান্ত্রিকপ্রধান গৌড়বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক আচারের মধ্যে বৈদিক আচারের প্রবর্ত্তনই মৎস্যসূক্ত নামক মহাতন্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্য। মৎস্যসূক্তে তান্ত্রিক সমাজ-সংস্কারের

জন্য লক্ষ্মণসেন প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আজও গৌড়বঙ্গের হিন্দু সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত দেখিতেছি। মহারাজ লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিকসমাজের যে সমন্বয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহা মৎস্যসূক্ত পাঠ করিলে বিশেষরূপে জানা যাইতে পারা যায়। যাহা হউক বৈদিক আচার প্রবর্ত্তনের জন্য লক্ষ্মণসেনের মনোগত অভিপ্রায় থাকিলেও এবং তান্ত্রিকগণকে বৈদিক গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া বৈদিক প্রাধান্যস্থাপনের চেষ্টা থাকিলেও তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়নাই। এমন কি দেখা যায়, ভবিষ্যতে তাঁহার সম্মানিত বৈদিক সমাজও তান্ত্রিক সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া "তান্ত্রিকী বৈদিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতি কীর্ত্তিতা" ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইয়া তন্ত্রেরও বেদমূলকতা ঘোষণা করিতেছেন।

মহারাজ বল্লালসেনের কুলবিধি প্রচলিত হইবার পর তন্নিযুক্ত কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রত্যেক কুলীনের অংশ-বংশনির্ণয়ার্থ কুলগ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হইতে থাকে। বল্লালসেনের সময়ে যে সকল কুলগ্রন্থ রচিত হয়, সে সমস্ত গ্রন্থ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তৎপৌত্র কেশবসেনের সভাসদ এড়ু মিশ্ররচিত কুলগ্রন্থের কতকটা পাওয়া গিয়াছে। এড়ু মিশ্র লিখিয়াছেন, মুসলমান কর্ত্তৃক নদীয়া ও গৌড় অধিকারের পর রাজা কেশবসেন পিতামহপ্রতিষ্ঠিত কুলীনগণকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে অপর এক সেনরাজের সভায় পলায়ন করেন। পূর্ব্ববঙ্গাধিপ সেই সেনরাজের সভাতেই সেই রাজকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এড়ু মিশ্র বল্লালী কুলনিয়ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যে পূর্ব্ববঙ্গাধিপ সেনরাজের সভায় রাজা কেশবসেন ও এড়ু মিশ্র প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই নৃপতি তাম্রশাসনে 'স গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ' 'বিশ্বরূপসেনদেব' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। বিশ্বরূপ সেনকে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য দীর্ঘকাল মুসলমানদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল, এ কারণ তিনি সমাজ-সংস্কারের দিকে মনোযোগ করিতে পারেন নাই। হরিমিশ্রের কারিকা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র দনৌজামাধব, লক্ষ্মণসেন যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সংসাধনের জন্য সকল কুলপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সৎপণ্ডিতদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। এই দনৌজামাধবই চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র বঙ্গজ সমাজের সমাজপতি হইয়াছিলেন। তিনি যেমন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে কেবল ধার্ম্মিক সৎপণ্ডিতদিগকেই সম্মানিত করেন, সেইরূপ গৌড় হইতে প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থ ও কুলাচার্য্যদিগকে আনাইয়াও চন্দ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাতেও বল্লালী কুলীন সমাজের কয়েকবার সমীকরণ হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কুলবিধি এখন ব্রাহ্মণসমাজ হইতে উঠিয়া গেলেও বঙ্গজকায়স্থ-সমাজে আজও প্রচলিত রহিয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ হইতেই বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, একারণ আজও চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গজকায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থান বলিয়া পরিগণিত। দনৌজামাধবের আশ্রয়ে বহু কুলাচার্য্য সমাজের ইতিহাস লিপি-

বদ্ধ করেন, তন্মধ্যে হরিমিশ্রের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকারিকা মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই কারিকা হইতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের আদর্শ ইতিহাস এবং গৌড়বঙ্গের পূর্ব্বতন রাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। এই দনৌজামাধবের সময়েই যে সকল বৈদ্য রাঢ় হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা বঙ্গজশ্রেণী বলিয়া গণ্য হন, অর্থাৎ সেই সময়ে বৈদ্যসমাজের মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে বসবাস হেতু পঞ্চকোট, রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ এই ত্রিবিধ শ্রেণিভেদ ঘটিয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পর রাঢ়ে ও গৌড়ে মুসলমান অধিকার ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গে তখনও সেনবংশের অধিকার ছিল। দনৌজামাধবের সময়ই পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান কবলিত হইয়াছিল, একারণ তিনি আত্মরক্ষার্থ সমুদ্রতীরে চন্দ্রদ্বীপ নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মুসলমান স্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া যাঁহারা শুদ্ধাচার রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়াই দনৌজামাধব সমাজ বন্ধন করেন। এই সময়ে হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা নিবারিত হইতে থাকে। তাহা আমরা বিভিন্ন শ্রেণির পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি।

রাঢ়ে, গৌড়ে মুসলমান অধিকার বিস্তারের সহিত এ দেশের বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু সমাজের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিবার সূত্রপাত হইলেও রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজ গৌড়ের প্রথম মুসলমান নৃপতিগণের নিকট বিশেষ সম্মানিত ও তাঁহাদের উৎসাহে সমাজেও অনেকটা প্রতিপত্তি লাভ করেন। চূর্জ্জয়দাসের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, ভরতমল্লিকের রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলতত্ত্ব বা সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, কবিকণ্ঠহারের বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি বহু সংস্কৃত কুলগ্রন্থে তাহার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ, কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির আত্মপরিচয় ও কায়স্থকুলগ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলে অনেক সদাচারী ব্রাহ্মণ কায়স্থ আবার রাঢ়দেশে পলাইয়া আসেন, এ সময় যাঁহারা সেস্থানে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার বংশধরগণ কেহ কেহ সেই সেই স্থান নামে অথবা কেহ কেহ সেই সমাগত প্রথম ব্যক্তির নামেও পরিচয় দিতে থাকেন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময় যে সকল কায়স্থ সেনাধিপের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হওয়ায় উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র নামে বিভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বল্লালসেনের পূর্ব্বে অর্থাৎ পালবংশের সময় উত্তররাঢ়ের নানাস্থানে সামন্ত নৃপতি বলিয়া গণ্য ছিলেন; সেনবংশের সময় তাঁহাদের কতকটা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলেও মুসলমান বিপ্লবকালে তাঁহারা আবার মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন, কখন কখন তাঁহারা দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন, কখন বা স্বাধীনতা অবলম্বনে প্রয়াসী হইয়া গ্রহবৈগুণ্যে মুসলমাননিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন।

যাহা হউক, মোগল রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ীয়গণ উত্তররাঢ়ে কতকটা অর্দ্ধ-স্বাধীন ভাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন। আমরা কুলগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, রাজা মানসিংহ আসিয়াই তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করেন এবং সেই সময় হইতেই উত্তররাঢ়ীয় রাজন্যবর্গের অবস্থা ক্রমেই হীনতর হইতে থাকে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের শেষবীর কায়স্থ রাজা সীতারাম রায়। সম্মানিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সামন্তবংশের পরিচয় বহু সংখ্যক কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমরা "শ্যামদাসী ডাক", শ্যামদাসের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, ঘনশ্যাম মিত্রের ঢাকুর, ঘনশ্যামী কল্লোল্লাস, শুকদেব সিংহের কুলপঞ্জী, শুকদেবী কক্ষানির্ণয়, শুকদেবী গ্রামনির্ণয়, শুকদেব সিংহের ঢাকুরী, দ্বিজঘটক সিংহের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, দ্বিজ সদানন্দের ঢাকুরী, দ্বিজ সদানন্দের বঙ্গাধিকারীকারিকা, জন্মেজয়ের নিবারিল ঢাকুরী, ধনঞ্জয়ের কক্ষানির্ণয়, অভিরাম মিত্রের ঢাকুরী, বল্লভের গ্রামভাবনির্ণয়, জয়হরি সিংহের কল্লোল্লাস, বংশীবদনের কুলপঞ্জিকা, কুলানন্দের কারিকা প্রভৃতি কয়েকখানি প্রধান গ্রন্থের নাম করিলাম, এই সকল গ্রন্থ ঐতিহাসিক সাহিত্য হিসাবেও অতি মূল্যবান। চারি শত হইতে দুই শত বর্ষের পূর্ব্বে ঐ সকল অমূল্য গ্রন্থ বিরচিত। একটি সম্মানিত সমাজের উত্থান ও পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে ঐ সকল কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

মুসলমান-শাসনকালে বাঙ্গালী বেহীনবল ছিলেন না, তাঁহারা যে অস্ত্রচালনায় ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন; তাহা আমরা উত্তররাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজসমাজের কুলপরিচয় হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। এমন কি সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যপণ্ডিত ভরতমল্লিক তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামক বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেনভূমের রাজবংশের মধ্যে যাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হন।* সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা তখন কায়স্থ সমাজের সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া গণ্য ছিল। কায়স্থ সমাজের অবশ্য শিক্ষণীয় হইলেও বঙ্গের অপরাপর জাতিও কেহ নিশ্চেষ্ট বা ভীরু ছিলেন না। এমন কি আমরা ধ্রুবানন্দের মহাবংশ নামক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক ও প্রধান কুলগ্রন্থে পাইয়াছি যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ সন্তান রাঢ়ে আসিয়া পুনরায় সমাজ পত্তন করেন, তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই বীরব্রতধারী এবং যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এমন কি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের শেষভাগে রাজা গণেশ তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে

* "রাজা বিজয়সেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ। চন্দ্রবৎ চন্দ্রসেনোঽভূৎ বুধসেনো বুধোপমঃ॥
চন্দ্রসেনোঽভবৎ রাজা ভিষজামপি সম্মতঃ। লক্ষ্মীনারায়ণঃ খ্যাতো দেবভূদেবসেবকঃ॥
ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্য অষ্টাদশ কুমারকাঃ। চন্দ্রখানাদয়ো জাতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি॥
অষ্টৌ সুতা অপরাশ্চ চন্দ্রখানাদয়োঽভবন্। যে সারাস্তে চ সদ্বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ॥
অষ্টৌঃ পুত্রাস্ততঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ। অসারেষ্বপি পুত্রেষু চন্দ্রখানঃ প্রতাপবান্।
ততশ্চামরসেনোঽভূৎ বলবানস্ত্রপণ্ডিতঃ॥" ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভা ২১০ পৃষ্ঠা।

গৌড়ের বাদশাহকে মারিয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর কুলপরিচয় বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানী প্রেমে পড়িয়া মুসলমান ফকিরের কৌশলে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিলেও গৌড়ের চারি পার্শ্বে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব তখনও হ্রাস হয় নাই। সেই সকল বারেন্দ্র ভূম্যধিকারিগণের পরিচয় নানা বারেন্দ্রকুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বারেন্দ্র-সমাজে কাপপ্রতিষ্ঠাতা সমাজপতি রাজা কংসনারায়ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে ইনি দ্বিতীয় বল্লাল বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। কুলগ্রন্থে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের উপাধি ও পরিচয় হইতে জানা যায় যে তৎকালীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজেও বিশেষ ভাবে মুসলমানপ্রভাব ঘটিয়াছিল। এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণসমাজেও ঐ সময় দুই দল দাঁড়াইয়াছিল। একদল মুসলমান আদব কায়দা, মুসলমানী রীতিনীতি ও মুসলমানী উপাধির পক্ষপাতী, আর একদল হিন্দু শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া চলিতে, হিন্দু রীতিনীতি পালন করিতে এবং পূর্ব্বপুরুষের নামগুণ রক্ষা করিতে তৎপর। শেষোক্ত দলের প্রধান সমাজ নবদ্বীপ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর নদীয়ার ব্রাহ্মণসমাজকে লক্ষ্য করিয়া চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা ও চৈতন্যদেবের সমকালীন কবি জয়ানন্দ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—

"নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা॥"

বাস্তবিক নদীয়ার পণ্ডিতসমাজকে ধনুর্দ্ধারী দেখিয়া গৌড়েশ্বরও বিচলিত হইয়াছিলেন, এমন কি তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর যে দারুণ মুসলমান অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহা নিবারণ করিতে এবং ব্রাহ্মণসমাজের স্ব স্ব অধিকার বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবি জয়ানন্দের গ্রন্থ ও নানা কুলপঞ্জিকায় সে কথা বিবৃত হইয়াছে। বাস্তবিক নবদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজ শস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিতে না পারিলেও শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন,— এ সময় হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। নবদ্বীপের ন্যায় ও নৈয়ায়িক সমাজের ইতিহাস সকলের সময় আসিয়াছে। নদীয়ার জ্ঞানী পণ্ডিতগণের মধ্যে যেমন ন্যায়, সেইরূপ একই সময়ে ভক্তবৈষ্ণবের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়াছিল। রাজা হরিবর্ম্মদেবের সময় বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইলেও তান্ত্রিকপ্রভাবে অনেকটা লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে প্রেমের অবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ আবার মস্তকোত্তোলন করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে না হউন, প্রেমের প্রভাবে গৌরাঙ্গদেব একপ্রকার ভারতবিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তদনুবর্ত্তী শিষ্যগণের অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির ইতিহাস সহস্র সহস্র বৈষ্ণবগ্রন্থে ছড়াইয়া আছে, তাহা একত্র করিলে, একখানি অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তির স্রোতে বাঙ্গলা সাহিত্য প্লাবিত হইয়াছিল, এই সময় শত শত ভক্ত সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের ইতি-

হাসেও সেই সকল গ্রন্থ প্রধান উপকরণ বলিয়া গণ্য। সুলতান হোসেনশাহের শান্তিময় রাজ্যে হিন্দুসমাজ স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে কতকটা নিরাপদ হইলে—স্ব স্ব সমাজসংস্কারেও বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে মেলপ্রচলন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে কাপপ্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের মধ্যে আথড়ায় চতুর্দ্দশ বৈদিক সমাজের সম্মিলন, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে গৌড়েশ্বরের রাজস্ব-সচিব গোপীনাথ বসু পুরন্দরখান্ কর্ত্তৃক কুলবিধি ও একজাই প্রবর্ত্তন প্রভৃতি নানা হিন্দুসমাজে সমাজসংস্কারের চেষ্টা লক্ষিত হয়। এই সময়ের সামাজিক বিবরণ শত শত কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। যে যে সমাজে রীতিমত কুলপঞ্জিকা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, এই সময় হইতেই তাহার একটা রীতিমত ব্যবস্থা হইতে থাকে। মেলপদ্ধতি লইয়া শত শত ক্ষুদ্র কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৬ খানি আমাদের হস্তগত। এতন্মধ্যে দেবীবরের মেলবন্ধ ও ভাগভাবাদি নির্ণয়, শ্যামচতুরাননের বৃহৎ কুলপঞ্জিকা, গোপাল কবিভূষণের ধ্রুবানন্দমত-ব্যাখ্যা, হরিহর ভট্টাচার্য্যের কুলসার, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম, মহেশমিশ্রের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা, দনুজারিমিশ্রের সারাবলী, হরি কবীন্দ্রের দোষতন্ত্রপ্রকাশ, নুলা পঞ্চাননের দোষকারিকা এবং নীলকান্ত ভট্টের পিরালী-কারিকা উল্লেখযোগ্য। পুরন্দরখানের কুলবিধি প্রচলনের পর পূর্ব্ববর্ত্তী কুলগ্রন্থের অনুসরণে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের শত শত কুলগ্রন্থ রচিত হইতে থাকে, তন্মধ্যে কুলীন ও মৌলিক উভয় সমাজের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কুলগ্রন্থ একত্র করিলে সংখ্যায় প্রায় দুই শতাধিক হইবে, এত অধিক কুলগ্রন্থ অপর কোন সমাজের পাওয়া যায় নাই। উক্ত কুলগ্রন্থ সমূহের মধ্যে মালাধর ঘটকের কারিকা, ঘটককেশরীর দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকা, দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির রাঢ়ীয় কারিকা, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৃহৎ সমীকরণকারিকা, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলসার, কুলসর্ব্বস্ব, ঘটক বাচস্পতির কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি কুলীনসমাজের এবং সার্ব্বভৌম ঘটকের বড় ঢাকুর, সরস্বতী ঘটকের ঢাকুরী, বাচস্পতি ঘটকের ঢাকুরী, ঘটক শম্ভুবিদ্যানিধির ঢাকুরী, ঘটক নন্দরাম মিত্রের ঢাকুরী, ঘটক কাশীনাথ বসু ও মাধব বসুর ঢাকুরীতে কুলীন ও মৌলিক উভয় সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজেও পূর্ব্বাদর্শে পূর্ব্বাপর বহুতর কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ও কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, এই সকল গ্রন্থের মধ্যে দ্বিজ বাচস্পতির বৃহৎ কারিকা, দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজী সার সংগ্রহ, ঘটক চূড়ামণির বঙ্গজ সমীকরণকারিকা, ধ্রুবানন্দ ঘটকের বঙ্গজ কুলপঞ্জিকা, বৃহৎ সমীকরণ গ্রন্থ, বঙ্গজ সম্ভাববিবেক, দ্বিজ রামানন্দের বঙ্গজ ঢাকুরী ও বঙ্গজ সমাজনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজের ন্যায় রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বৈদ্যসমাজেও সমাজসংস্কার ও গৌরব কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বহুতর কুলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুর্জ্জয় দাসের কুলপঞ্জিকা, ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা বা সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, ৺ভরত মল্লিকের রত্নপ্রভা বা বিশিষ্ট কুলীন-পরিচয়, কবিকণ্ঠহারের সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, চতুর্ভুজের কুলপঞ্জী, রাঘব কবিরাজের সম্ভাববিবেক, জগন্নাথের ভাবাবলী, রামকান্তের দোষাবলী প্রভৃতি গ্রন্থই প্রধান।

উপরোক্ত বিভিন্ন জাতি ভিন্ন ইদানীন্তনকালেও কতকগুলি দাক্ষিণাত্য, জিঝোতিয়া ও মৈথিল ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে কোন কোন ব্রাহ্মণসমাজে মিলিত হইয়াছেন। এই সকল নবাগত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কতকগুলি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে উৎকল হইতে দক্ষিণ বঙ্গে আসিয়া বঙ্গাধিপের উৎসাহে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পূর্ব্বতন দাক্ষিণাত্য সমাজের সহিত সম্মিলিত ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ৺প্রাণকৃষ্ণের বৈদিককুল রহস্যে তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা মানসিংহের সময়ে বুন্দেলখণ্ডবাসী কয়েকজন জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণবীর তাঁহার সঙ্গে বঙ্গবিজয়ে আগমন করেন এবং এদেশে আসিয়া তাঁহারা এখানকার ভুঁইহার ব্রাহ্মণদিগের সহিত সম্মিলিত হন, পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা নামক গ্রন্থে তাঁহাদের কুলপরিচয় বিবৃত হইয়াছে।

বলিতে কি, এখনও উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান হয় নাই, অতি সামান্য অনুসন্ধানে অল্পদিন মধ্যে যে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

এখন বিচার করিয়া দেখুন, বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের কত বিশাল উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখুন বঙ্গবাসী সকল জাতিই কতদূর ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব পরিচয় দিবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মালমসলা সংগৃহীত হইলে গৌড়বঙ্গের এক বিশাল ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারিবে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক J. C. Morrison লিখিয়াছেন—"All history, it was perceived, needed rewriting from new points of view, with more knowledge, deeper insight, keener sympathy" (p. 20.)

বাস্তবিক পূর্ব্বকালে এ দেশে যে ভাবে ইতিহাস রচিত হইয়াছে, এখন সে ভাব চলিবে না, এখন সেই প্রাচীন মালমসলা লইয়া বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে, এবং তজ্জন্য যথেষ্ট গবেষণা, যথেষ্ট পরিশ্রম ও যথেষ্ট অর্থব্যয় আবশ্যক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের জন্মভূমির ইতিহাসউদ্ধারকল্পে সকলে মনোযোগী হউন, জন্মভূমির গৌরবরক্ষা করুন, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

প্রবন্ধ (২)

বাঙ্গলা ভাষার সংস্কার

(প্রবন্ধ লেখক—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভাষার সংস্কার বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে ভাষার প্রকৃতি, ভাষার অবয়বসংস্থান প্রভৃতি নানা দিক দিয়া ভাষার পরিচয় গ্রহণ করা আবশ্যক। পৃথিবীতে নানা দেশ এবং দেশে দেশে পৃথক্ ভাষা আছে; তাহা ছাড়া জাতিভেদেও এবং সম্প্রদায়ভেদেও কোথাও কোথাও অল্পাধিক ভাষাভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে নানা প্রকার পৃথক্ ভাষা আছে বটে, কিন্তু বোধ হয় কোনও ভাষাই অন্য ভাষার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বা পরম্পরা-সম্বন্ধে সম্পর্কিত না হইয়া থাকিতে পারে না। বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুরোধে, পর্য্যটকদের প্রয়োজনের অনুরোধে এবং অন্য অন্য বিবিধ লোকব্যবহারের অনুরোধে এক ভাষা অন্য ভাষায় প্রবেশ করিয়া কোথাও অল্প পরিমাণে, কোথাও বা অধিক পরিমাণে বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং কোনও এক ভাষার সংস্কার বিষয়ে যিনি চিন্তা করিতে ইচ্ছা করেন, নানা ভাষায় তাঁহার অধিকার থাকা আবশ্যক এবং অসাধারণ বিচারশক্তিও থাকা আবশ্যক। সে বিদ্যা আমার নাই, তেমন বিচার-শক্তিও আমার নাই। তথাপি আমি যে সাহস করিয়া এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি তাহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এই সম্মিলনের আমন্ত্রণকারী মহাত্মারা আমার উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয়তঃ আমার অজ্ঞান, আমার ভ্রম, আমার প্রমাদাদি জন্য যতই কেন ত্রুটি হউক না, বিদ্বজ্জনের সম্মিলনে এই কথা তুলিয়া আমি সুশিক্ষার সুযোগলাভে কৃতার্থ হইতে পারিব। আমি বয়সে প্রবীণ হইলেও বিদ্যায় শিশু; কাহাকেও শিখাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নাই; বরং শিখিতে পারিলে কিছু কিছু শিখিবার সাধ আমার আছে। আমার বিদ্যা শৈশবে আপনাদের যদি বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার কথাতেও আপনারা অমৃত উদ্ধার করিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা ভাষা মূলে প্রাকৃত ছিল কি না তাহা জানি না; কিন্তু এখনকার বাঙ্গলা ভাষা যে বহু ভাষার মিশ্রণে পিণ্ডীকৃত, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। এখনকার বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃ-

তের প্রভাব আছে, নানা প্রকার প্রাকৃত ভাষার প্রভাব আছে, আরবি ফারসির প্রভাব আছে, পর্ত্তুগিজ ফরাসী প্রভৃতি কত কত ভাষারই প্রভাব আছে। তাহার উপর ইদানী ইংরেজির প্রভাবের ত কথাই নাই।

প্রত্যেক ভাষারই দুইটি অবয়ব; এক অবয়বে অভিধান প্রস্তুত হয়, অন্য অবয়বে ব্যাকরণ প্রস্তুত হয়। এই অভিধানে এবং এই ব্যাকরণে ভাষার পার্থক্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্য বুঝিতে পারা যায়। কোন এক ভাষাতে যত শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং সেই সকল শব্দ যে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, অর্থ সঙ্কেত সেই সমুদয় শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে সে ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত হইতে পারে। আর বাক্যের অবয়ব-ঘটক-রূপে শব্দগুলির যেখানে যেমন যে পরিমাণ রূপান্তর হয়, কিম্বা রূপান্তর না হয়, এবং বাক্যার্থ প্রকাশ করিতে সেই শব্দগুলির যে প্রকার ক্রমবিন্যাস হয় তাহার বিধান প্রদর্শন করাই ব্যাকরণের কার্য্য। অভিধানেই ভাষার পার্থক্য দেখা যায়, আর ব্যাকরণে ভাষার স্বাতন্ত্র্য বুঝা যায়। ভাষার আভিধানিক পার্থক্য যদি বা কখনও নষ্ট হইতে পারে, ব্যাকরণের স্বাতন্ত্র্য কখনই নষ্ট হইতে পারে না। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কোন ভাষাই অন্য ভাষার অধীনতা স্বীকার করে না; প্রত্যেক ভাষারই ব্যাকরণ-তন্ত্র আপন আপন। কালপ্রভাবে বা সংসর্গপ্রভাবে এই ব্যাকরণ-তন্ত্রের অল্প অল্প ব্যতিক্রম না হয় এমন নহে, কিন্তু প্রবাহ-রূপে সে তন্ত্রে একটা একতা থাকিয়া যাইবেই যাইবে।

মনের ভাব প্রকাশ করাই ভাষার কাজ। ভাবসম্পদ যতই অধিক হইতে থাকে শব্দসম্পদেরও ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাব উজ্জ্বলও হয় মলিনও হয়, ভাব প্রশস্তও হয় নিন্দিতও হয়। যে জাতির ভাষা বা যে সম্প্রদায়ের ভাষা যত উজ্জ্বল, যত প্রশস্তভাব-সম্পন্ন, সে জাতি বা সে সম্প্রদায়ও ততই উন্নত এবং সম্মানার্হ হয়। ভাষার সংস্কার পক্ষে সতত এই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

কিন্তু ভাষা বড় ব্যাপক পদার্থ। মানুষ যত ক্ষণ জাগ্রত থাকে তত ক্ষণ মানুষের মনে ভাষার তরঙ্গলীলা নিরন্তর ত হইতেই থাকে, স্বপ্নাবস্থাতেও ভাষার লীলানিবৃত্তি হয় না। মানুষের মন কখনই অকর্ম্মকৃৎ থাকিতে পারে না। চিন্তা বা ভাবনা মনের কর্ম্ম, একটি ভাবের পর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাবের উদয় হইবেই হইবে। ভাবের বিরাম থাকে না; কাজেকাজেই ভাষাও বিরাম পায় না। ভাবের প্রকার যদি অল্প হয় তাহা হইলে ভাষার প্রকারও অল্প হয়; কিন্তু প্রকার অল্প হইলেও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে মন যেমন ভাবময় হইয়াই থাকে, মানুষও কথা না কহিলেও ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাষা লইয়া কালক্ষেপণ করিতে থাকে। তাহাতেই বলি যে ভাষা বড় ব্যাপক পদার্থ।

অব্যক্ত ভাষাকে বাদ দিলে ব্যক্ত ভাষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এক ভাগ কথোপকথন লইয়া, অন্য ভাগ লিপিবদ্ধ ভাষা লইয়া। এই লিপিবদ্ধ ভাষার আবার দুই ভাগ; এক ভাগ ব্যক্তিগত ব্যাপার নির্ব্বাহে ব্যবহৃত হয়, অন্য ভাগ ব্যক্তি বিশে-

ষকে লক্ষ্য না করিয়া লোকসমষ্টির নিমিত্তেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ব্যক্তির হিতসিদ্ধি তাহাতেও হয় বটে, কিন্তু ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া সমষ্টিতেই সেই লিপিবদ্ধ ভাষার লক্ষ্য থাকে। জমাখরচ লেখা, পত্রব্যবহারের লেখা, দলিল দস্তাবেজের লেখা ব্যক্তিগত হিতের ভাগে পড়ে; সমষ্টির নিমিত্তে যে লেখা তাহাই আজিকালি সাহিত্য নামে পরিচিত।

সাহিত্য শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দের যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহাতে সাহিত্যের বিষয় অল্প বলিয়াই বুঝা যায়। মনুষ্যকৃত শ্লোকময় বা ছন্দোময় কতকগুলি গ্রন্থই সংস্কৃতে সাহিত্যনামে পরিচিত। এই ব্যাপ্য অর্থে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সাহিত্য বলিয়া গণিত হয় না; কিন্তু আজিকালি—সম্ভবতঃ ইংরেজির প্রভাবেই—আমরা সমষ্টি উদ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ ভাষাকেই সাহিত্য শব্দে বুঝিয়া থাকি। এখন কাব্য সাহিত্য, ইতিবৃত্ত সাহিত্য, গণিত সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান সাহিত্য, এ সব ত বলিয়াই থাকি, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈদিক সাহিত্য, পৌরাণিক সাহিত্য ইত্যাদি বলিতেও কুণ্ঠিত হন না।

যাহা হউক, বাঙ্গলা ভাষার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সাহিত্য শব্দের এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই সাহিত্যের ভাষার দিকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভাষণের বা কথোপকথনের ভাষায় দৃষ্টিপাত করিতে হইবে না, এমন নহে। তবে সাহিত্যের ভাষা না কি দীর্ঘকালস্থায়ী এবং বহুদূরব্যাপী, তাই সাহিত্যের ভাষায় বিশেষ লক্ষ্য করিলে আমাদের আলোচনার ফল আপনা আপনি ভাষণের ভাষাতেও পাওয়া যাইবে। কেন না, সাহিত্যের প্রভাব ক্রমে ক্রমে পরিস্রুত হইয়া ভাষার সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পরন্তু এই স্থলে একটি কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা আবশ্যক। কথাটি এই যে, সাহিত্যের ভাষা যেন কথোপকথনের ভাষা হইতে এমন দূরে সরিয়া না পড়ে যে সাহিত্যের সঙ্গে কথোপকথনের সম্পর্ক লোপ পায়। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের ভাষার যত নৈকট্য থাকে, যত ঘনিষ্টতা থাকে, ততই ভাল; দুইএর অন্তর যত অধিক হয় ততই মন্দ। বিচ্ছেদ হইলে কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না; একই ভাষা ক্রমে দুইটি পৃথক্ ভাষা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহাতে কেবল যে ভাষার অনিষ্ট তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা হয়। পরে উদাহরণ দেখাইয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারে আলোচনা করিব।

ভাষা যত ক্ষণ মুখে মুখে থাকে তত ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাষা যেন তরল, ভাষায় আঁট থাকে না, যেন টলটল করে, ভাষায় জমাট বাঁধে না, যেন এলাইয়া এলাইয়া থাকে। লিপিবদ্ধ হইবার সময়ে ভাষার আর সে ভাব থাকিতে পায় না। রস থিতাইলে তাহাতে দানা বাঁধিয়া যেমন মিছরি হয়, লিপিবদ্ধ হইলে ভাষাও যেন দানা-বাঁধা গোছের হয়; তখন একটু কঠিন হয়, কিন্তু সেই কঠিনতাতেই ভাষার শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রাণসঞ্চার হয়। ভাষার মলামাটিও, বেশী হউক, কম হউক, কাটিয়া যায়। ইহাতেই বলিতেছি যে, সাহিত্যের ভাষা স্থায়ী হয়, ইহার ফলেই সাহিত্যে ভাষার গৌরববৃদ্ধি হয়।

ভাষার এই যে দানা-বাঁধার কথা বলিতেছি, সাহিত্যের এই যে গৌরবের সূচনা করিতেছি, ইহা প্রধানতঃ ব্যাকরণের বিধানের গুণেই হইয়া থাকে। ব্যাকরণের বিধানবশে ভাষার একটা স্থিরমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ভাষা তখন অসংযত থাকিতে পারে না, অনিয়ত হইতে পারে না; সংযমের আর নিয়মের শাসনে প্রামাণিকতা লাভ করে, এবং তাহার ফলে লেখকদের এবং ভাষকদের মনের ভিতর একটা একতা স্থাপিত হয় এবং তাহাতে ভাষার প্রসারবৃদ্ধির সুযোগ হয়।

এখন দিন দিন বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টিবৃদ্ধি হইতেছে; বাঙ্গলা সাহিত্য অমন্দগতিতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা এখনও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় নাই সত্য, কেবল বাঙ্গলা শিখিয়া কোনও ব্যক্তি বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে পারে এমন অবস্থা এখনও হয় নাই, ইহাও সত্য; কিন্তু এমনটি হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গলা ভাষার সংস্কারের সুযোগ হইয়াছে, আমি এরূপ মনে করি। "কচি বেলায় নোয় বাঁশ, পাকিলে পরে ট্যাঁস ট্যাঁস"—এ কথা কেবল বাঁশের পক্ষে খাটে তাহা নহে, অনেক বিষয়েই খাটে। আঁশ মোটা হইলে, গাঁইট পাকিয়া উঠিলে, তখন সংস্কার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বাঙ্গলা ভাষা এখনও ঠিক গড়ে নাই, গড়িয়া উঠিতেছে মাত্র। বাঙ্গলা ভাষা এখনও স্বাধীন হইতে পারে নাই, স্বাধীন হইবার যোগ্যতাও লাভ করিতে পারে নাই। আজিও বাঙ্গলা ভাষা নিতান্তই পরমুখাপেক্ষী। প্রতি পাদক্ষেপেই বাঙ্গলা ভাষাকে পরের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়। আমার ধারণা এই যে, এখনও বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বড় সাহসীর মতন এই কথাটি বলিয়া ফেলিলাম। বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ এখন চলিতেছে। আমি সে সব গ্রন্থ দেখি নাই, অথচ অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলাম যে, এখনও বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই। বাস্তবিক যদি ভাল ব্যাকরণ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও আমার এই উক্তিতে ভাষার কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই; কেবল আমার কথাগুলা বৃথা হইবে এই মাত্র।

আমি কেমন ব্যাকরণ চাই এই বার তাহার ইঙ্গিত করিতেছি। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার যাহা অভিপ্রেত তাহা যদি সিদ্ধই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এই প্রস্তাবকে কৈফিয়তের হিসাবে ধরিয়া লইলেই চলিবে; আর যদি সিদ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার প্রস্তাব সুধীগণের বিচার্য্য হইবে এবং তাহা হইলেই আমার উদ্যম সার্থক হইবে।

বলিয়াছি যে, বাঙ্গলা ভাষা এখন বহু ভাষার মিশ্রণে পিণ্ডীকৃত; কিন্তু ব্যাকরণ সম্বন্ধে অন্য কোন ভাষার তাদৃশ আধিপত্য না থাকিলেও বাঙ্গলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের আধিপত্য লইয়া যেন একটা সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া আমার মনে হয়। দেখিতে পাই যে, এক দল সাহিত্যচালক মহারথী পদে পদেই সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ধরিয়া সাহিত্যপথের

পথিকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেন। ইঁহাদের আদেশ বা উপদেশ মানিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিলাভ করা আবশ্যক হয়। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে অনেক জনের, অন্ততঃ আমার, উদ্দেশ্য সফল হইবে না, ইহা নিশ্চয়। এই উদ্দেশ্যবিরোধে ক্ষতিবৃদ্ধির কেমন সম্ভাবনা তাহা আমি সংক্ষেপে বুঝাইতে ইচ্ছা করি।

বাঙ্গলা এখন বাঙ্গালীর ভাষা, কেবল বর্ণাশ্রমীর ভাষা নহে; সংস্কৃত কেবল বর্ণাশ্রমীর ভাষা। অন্য অন্য জাতির বা অন্য অন্য সম্প্রদায়ের উপর বর্ণাশ্রমীদের প্রভাব বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু সে প্রভাব বিস্তার করিতে গেলে বর্ণাশ্রমীদেরই যে অনিষ্ট ঘটিবে না, এমন আমার মনে হয় না। কিন্তু এ কথা যদি ছাড়িয়াই দেওয়া যায় তাহা হইলে দুইটি আপত্তি আমি কোন মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারি না। প্রথম আপত্তি এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব করিতে হইলে বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রকৃত পক্ষে কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারিবে না, আর স্বতন্ত্র যদি না হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষা কখনও আত্মগৌরবে সম্পন্ন হইবে না। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গলা ভাষার উপযোগী নহে। এই দ্বিতীয় আপত্তির একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

লিপিকর্ম্ম বা লেখাই সাহিত্যের বাহন। ভাষা বা শব্দ কতকগুলি স্ফুটধ্বনির সমষ্টিমাত্র। একটি একটি স্ফুটধ্বনিকে বর্ণ বা অক্ষর বলে। এই বর্ণ বা অক্ষরই ভাষার অবয়ব। যে শব্দে যতগুলি বর্ণ থাকে—একটিমাত্র বর্ণেও একটি শব্দ হইতে পারে; আবার অনেক বর্ণ মিলিত হইয়াও একটি শব্দ হইতে পারে—শব্দের অবয়বস্বরূপ সেই বর্ণের বা বর্ণগুলির উচ্চারণ হইলে শব্দ তখন শ্রুতিগোচর হয় এবং তাহাতে উচ্চারকের অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়। শব্দসমষ্টি লইয়াই ভাষা, অতএব মনে রাখা উচিত যে, ভাষা বা শব্দ বা বর্ণ প্রকৃত পক্ষে কর্ণে শুনিবারই সামগ্রী, চক্ষে দেখিবার সামগ্রী নহে। কিন্তু কণ্ঠের স্বর, যতই উচ্চ হউক না কেন, অধিক দূর যাইতে পারে না এবং উচ্চারণের কিছু ক্ষণ পরেই লুপ্ত হইয়া যায়। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শব্দ স্বল্পকালপরিচ্ছিন্ন এবং স্বল্পদেশব্যাপী। এই শব্দকে বিস্তীর্ণদেশব্যাপী এবং দীর্ঘকালস্থায়ী করিবার নিমিত্ত লিপির প্রয়োজন। লিপির এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে এক একটি বর্ণের এক একটি চক্ষুগ্রাহ্য সঙ্কেত আছে। এই সংকেতগুলিকেই আমরা বর্ণ বা অক্ষর বলিয়া থাকি; বাস্তবিক এই সংকেতগুলি স্বরূপতঃ বর্ণ বা অক্ষর নহে, সংকেতগুলি বর্ণের প্রতিনিধিমাত্র। কাণে যাহা শুনা যায় বাস্তবিক তাহাই বর্ণ, সংকেতটা দেখিলে সেই বর্ণের স্মরণ হয় এবং লেখক মুখে বলিলে যে শব্দ শুনা যাইত, সংকেত দেখিয়া পাঠকের মনে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সেই শব্দের বা ধ্বনির উদয় হইয়া থাকে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, সেই লিপিই নির্দ্দোষ, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির পৃথক্ পৃথক্ সংকেত থাকে। মনে করুন, 'ক' এই সংকেতটি দেখিলে যদি পাঠকের মনে 'ক' এই ধ্বনিরই উদয় হয়, অন্য কোনও ধ্বনির উদয় না হয়, তাহা হইলেই

সংকেতটি নির্দ্দোষ হইল। কিন্তু 'ক' এই সংকেতটি দেখিয়া যদি 'খ' কিম্বা 'চ' কিম্বা অন্য কোনও ধ্বনির উদয়ের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সংকেতে দোষ ঘটিল এবং সমস্ত লিপি দোষগ্রস্ত হইল।

এখন যে কারণেই হউক বাঙ্গলা ভাষার নিজস্ব লিপিসঙ্কেত নাই; সংস্কৃতের সঙ্কেত লইয়াই আমরা বাঙ্গলা লেখার কাজ সারিয়া আসিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, সংস্কৃত সঙ্কেতগুলি যে যে ধ্বনির উচ্চারণের স্মারক, বাঙ্গলা ভাষায় ঠিক সেই সেই ধ্বনির উচ্চারণ নাই; কতকগুলি আছে, কতকগুলি নাই। বাঙ্গলায় মূর্দ্ধণ্য 'ণ' বলি, কিন্তু মূর্দ্ধণ্য ণকারের যে উচ্চারণ বাঙ্গলায় সে উচ্চারণ একেবারেই নাই। সে উচ্চারণ নাই বলিয়াই আমরা দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধণ্য 'ণ' এই রূপ বিশেষণ দিয়া উহাদের পরিচয় করিয়া থাকি। দেখুন 'ক' এই বর্ণটির বেলায় কণ্ঠ্য 'ক' ত বলিতে হয় না, শুধু 'ক' বলিলেই হয়। তবে 'ণ'কারের বেলায় মূর্দ্ধণ্য এই বিশেষণটি লাগাই কেন? বাস্তবিক বাঙ্গলায় এই মূর্দ্ধণ্য 'ণ'টি ঠিক যেন "সোনার পাথরবাটি" কিম্বা "কাঁঠালের আমস্বত্ব।"

এই যে উচ্চারণ আর লিপিসঙ্কেত, ইহা লইয়া বেদে খুব বাঁধাবাঁধি আছে শুনিতে পাই। এই উচ্চারণব্যাপার বেদাঙ্গ ব্যাকরণের বিষয় নহে, ইহা এক পৃথক বেদাঙ্গের বিষয়, সে বেদাঙ্গের নাম 'শিক্ষা'। বেদ প্রধানতঃ পারলৌকিক বিষয়েই দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে ততটা পারলৌকিকতা না থাকাতে এই উচ্চারণপ্রকরণ লৌকিক ব্যাকরণের বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই জন্যেই ব্যাকরণের প্রসঙ্গে আমি এই বানানের কথা তুলিয়াছি। লৌকিক সংস্কৃত ব্যাকরণেও বর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে উপদেশ আছে এবং সংস্কৃতে বর্ণগুলির উপযোগিতা স্থির রাখিবার অভিপ্রায়েই কোন্ বর্ণের উচ্চারণস্থান কোথায়, তাহার উপদেশ থাকে। সংস্কৃত বর্ণমালা সংস্কৃত উচ্চারণেরই ঠিক উপযোগী; কিন্তু বাঙ্গলাতে উচ্চারণের ভেদ থাকাতে সংস্কৃত বর্ণমালা সর্ব্বাংশে বাঙ্গলা ভাষার উপযোগী হইতে পারে না।

অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, সংস্কৃতে এই কয়টি স্বরবর্ণ আছে। ইহার মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ৯ এই পাঁচটি হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ভেদে পনেরোটি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনিরূপে গণিত হয়। সংস্কৃতে এ, ঐ, ও, ঔ এই চারিটি সন্ধ্যক্ষর, অর্থাৎ 'অ' বর্ণে 'ই' বর্ণে মিলিয়া 'এ', 'অ' বর্ণের এবং 'এ' কারের সন্ধিতে 'ঐ', 'অ' বর্ণে 'উ' বর্ণে 'ও' এবং 'অ' বর্ণে 'ও'কারে মিলিত হইয়া 'ঔ' হয়। সংস্কৃতে এ, ঐ, ও, ঔ হ্রস্ব স্বর নহে; এ কয়টি বর্ণের মোটেই হ্রস্ব নাই।

তাহার পর সংস্কৃত 'অ' কণ্ঠ্য বর্ণ, আর ঐ কণ্ঠ হইতেই দীর্ঘ মাত্রায় উচ্চারিত হইয়া যে 'আ' হয় তাহাও ঐ কণ্ঠ্য বর্ণ। এই 'অ', 'আ' একই স্থান হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহারা পরস্পরের সবর্ণ বা সমান বর্ণ। এই রূপে ই, ঈ উভয়েই তালব্য এবং পরস্পরের সবর্ণ; উ, ঊ, ওষ্ঠ্য এবং সবর্ণ; ঋ, ৠ মূর্দ্ধণ্য এবং সবর্ণ; ৯, ৡ দন্ত্য এবং সবর্ণ; কিন্তু 'এ'কারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ এবং তালু, সুতরাং একার বর্ণসঙ্কর; এই রূপে ঐ, ও, ঔ এই তিনটিও বর্ণসঙ্কর।

এখন দেখুন সংস্কৃতের এই স্বরবর্ণগুলি সংস্কৃতে যে কাজ করে বাঙ্গলায় সেই কাজ করে কি না। আমি দেখাইতেছি যে, তাহা করে না।

সংস্কৃতের যেটি প্রথম স্বরবর্ণ বাঙ্গলায় সেটি প্রথম স্বরবর্ণ নহে। বাঙ্গলায় প্রথম স্বরবর্ণটি অর্থাৎ 'অ' বিশুদ্ধ কণ্ঠ্য বর্ণ নহে; সেই জন্যে বাঙ্গলা অ-কারকে দীর্ঘ করিয়াই উচ্চারণ করুন, আর প্লুত করিয়াই উচ্চারণ করুন, কিছুতেই 'আ' হইবে না। 'আ'কারের যাহা হ্রস্ব তাহাই সংস্কৃতের আদ্য স্বরবর্ণ। আমাদের বাবা, কাকা, মামা, দাদা শব্দে যে 'আ' শুনিতে পাওয়া যায় সেইটি সংস্কৃতের আদ্য স্বর। কিন্তু বাঙ্গলার আদ্য স্বরটি কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলিয়া সংস্কৃত আদ্য স্বরবর্ণের সবর্ণও নহে। তাহার ফলে বাঙ্গলা 'অ'কারে এবং 'আ'কারে যে সন্ধি করা হয়, সে কেবল গায়ের জোরেই করা হয়, সে সন্ধি অস্বাভাবিক এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ।

একটা স্থূল কথা এই খানে বলিয়া রাখি। বাঙ্গলায় দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ অতি বিরল। ভয়, বিস্ময়, ক্রোধ, প্রশ্ন প্রভৃতি স্থলেই আমরা দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ করি, এবং গানে প্লুত স্বরের প্রয়োগ অবশ্যই করি; কিন্তু তদ্ভিন্ন স্থলে আমরা দীর্ঘ স্বরের কাছ দিয়া বড় একটা যাই না। আমাদের 'এ'কার 'ও'কারও হ্রস্ব। সংস্কৃতে ইহা অসম্ভব। বাঙ্গলায় 'ঐ'কার এবং 'ঔ'কার বস্তুতঃ সন্ধ্যক্ষর নহে। দ্রুত উচ্চারিত বর্ণদ্বয়ই আমাদের 'ঐ'কারে 'ঔ'কারে থাকিয়া যায়।

আমাদের ঐকার বস্তুতঃ ওই, আমাদের ঔকার বস্তুতঃ ওউ। এই কারণেই 'কৈ' লিখিতে কেহ 'ক'তে ঐকার লাগাইয়া দেন, কেহ বা ক'র পর একটি 'ই' বসাইয়া দেন। 'ব'য়ে ঔকার বৌ, কি ব উ বৌ, এ প্রশ্ন তুলিলে দাঙ্গা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহার পর, হ্রস্বই কি আর দীর্ঘই কি, মূর্দ্ধণ্য স্বরবর্ণ এবং দন্ত্য স্বরবর্ণ বাঙ্গলাতে মোটেই নাই। সংস্কৃত 'ঋ' বাঙ্গলার 'র'তে ইকার, সংস্কৃত ৯ বাঙ্গলার ল'তে ইকার। তবেই বুঝা গেল যে, সংস্কৃত স্বরমালার সঙ্কেত গুলি এবং তাহাদের ক্রমবিন্যাস আমরা দৃষ্টতঃ লইলেও কাজে লই না। তবেই সংস্কৃত স্বরমালা কোন মতেই বাঙ্গলার স্বরমালা হইল না।

স্বরবর্ণের নিমিত্তে আমাদের আরও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। 'এক' এই শব্দের গোড়াতে যে স্বরের উচ্চারণ করিলাম, বাঙ্গলায় তাহার কোনও সাঙ্কেতিক অক্ষর পাওয়া যায় না। কেহ শুধু 'যা'কার লিখিয়া বসেন, কেহ 'য়'র গায়ে 'যা'কার দেন, আবার কেহ বা 'এ'র গায়ে 'যা'কার দিয়া ফেলেন। বাঙ্গলায় হ্রস্ব 'এ' আছে, কিন্তু হ্রস্ব 'এ' দীর্ঘ 'এ' ভেদ করিবার চিহ্নভেদ বাঙ্গলাতে নাই। ওকারের বেলায়ও এইরূপ। স্বরবর্ণে এই, ব্যঞ্জনবর্ণেও ভাবিবার বিষয় আছে।

ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ, র, ল, হ—এই বর্ণগুলিতে কোনও গোল নাই। তবে সংস্কৃতে সংস্কৃতের আদ্য স্বর যোগে ইহাদের

উচ্চারণ হয়, বাঙ্গলায় বাঙ্গলারই আদ্য স্বর যোগে উচ্চারণ করিতে হয়, এই মাত্র ভেদ। সংস্কৃতে কা, খা, গা, ঘা, ইত্যাদি বলিতে হয়, বাঙ্গলায় ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি বলি।

ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধে প্রথম গোল তালব্যবর্গে এবং মূর্দ্ধণ্যবর্গে; কণ্ঠ্যে, দন্ত্যে এবং ওষ্ঠ্যে সংস্কৃতের সঙ্গে মিল আছে বলিয়াই আমার ধারণা। তালব্য বর্গের অনুনাসিক বর্ণ ঞ, বাঙ্গলাতে কখনও ँ কখনও 'ন'। প্রাচীন লেখাতে গোস্বামীর বাঙ্গলা-মূর্ত্তিতে ঐ তালব্য অনুনাসিকটি লাগিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে ँ (চন্দ্রবিন্দু) লাগান হয়। আর সঞ্চয়, বাঞ্ছা, সঞ্জয়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শব্দের অনুনাসিকটি স্পষ্টই 'ন'। বাঙ্গলায় একটি শব্দে কেবল এই অনুনাসিকটি অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়াছে—অন্তঃস্থ 'য'এ আকার আর 'চ'এর নীচে 'ঞ'তে আকার দিয়া বোধ করি সকলেই জাচিঞ্চা পড়িয়া থাকে। মূর্দ্ধণ্যবর্গের অনুনাসিকটির কথা কিছু বলিতে হইবে না; সকলেই জানেন ওটি কেবল শোভার্থ; বরং মূর্দ্ধণ্য 'ষ'এর আশ্রয় পাইলে, কোন দেশে ँ যুক্ত কোথাও বা ँ হীন 'ট' হইয়া দাঁড়ান; স্বয়ং কৃষ্ণ বিষ্ণুই তাহার সাক্ষী। তিনটি উষ্ম বর্ণের মধ্যে বাঙ্গলায় মূর্দ্ধণ্য 'ষ'কারের প্রচুর প্রয়োগ আছে, দন্ত্য 'স'কারের কদাচিৎ। তালব্য 'শ'কারের ব্যবহার থাকা আমি জানি না।

চারিটি অন্তঃস্থ বর্ণ সংস্কৃতে সন্ধ্যক্ষর। ইকারে অকারে 'য', ঋকারে অকারে 'র', ৯কারে অকারে 'ল' এবং উকারে অকারে 'ব'। প্রথমটিকে 'জ'কারের কাজ কেন করিতে হয় জানি না; চতুর্থটি নামমাত্র আছে, কাজের বেলায় কেন নাই এবং তাহার মূর্ত্তিই বা কেন অবিকল বকারের মত হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারি না। প্রাচীন লেখায় বকারে এবং এই অন্তঃস্থ চতুর্থ বর্ণটির মূর্ত্তিতে ভেদ দেখিয়াছি, নাগর অক্ষরেও দেখিতে পাই; কিন্তু বাঙ্গলা বর্ণমালায় দুই বারই ব লিখি এবং 'ব' বলি, অথচ এই চতুর্থ অন্তঃস্থের ভূরি প্রয়োগ বাঙ্গলাতেও আছে। এখন আমরা উয়, ওয় লিখিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার বানানের সৃষ্টি করিয়াছি; কিন্তু চতুর্থ অন্তঃস্থের একটা সংকেত করিয়া লইলেই যে উপদ্রবের নিবৃত্তি করিতে পারি, এটা ভাবি না। খাওয়া, হওয়া, দুয়ার, গোঁয়ার ইত্যাদি শব্দের বানান স্মরণ করিলেই আমার খেদের হেতু বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

যাহা বলিলাম তাহার সার সংগ্রহ করিলে এই দাঁড়ায় যে, প্রচলিত ব্যঞ্জনবর্ণমালায় কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া আর কতকটা কমাইয়া না লইলে বাঙ্গলা ভাষার যথাযথ বর্ণমালা প্রস্তুত হইবে না। স্বরবর্ণমালার কেবল ঋ, ৯ বাদ দিলেই হয় ত চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সংস্কৃত সংকেতগুলির সংস্কৃত উচ্চারণগুলি আদায় করিয়া লওয়া আবশ্যক হইবে। জানিয়া লইতে হইবে যে সংস্কৃত 'অ'=দাদা, কাকার 'আ'। সংস্কৃত 'য' (য ফলা) প্রায় বাঙ্গলা হ্রস্ব একার, সংস্কৃত 'ঐ' বাঙ্গলায় এক শব্দের একার; সংস্কৃত 'ঔ' বাঙ্গলায় দীর্ঘ 'অ'। আর এ পন্থা স্বীকৃত না হইলে বাঙ্গলা স্বরগুলির নূতন সংকেত গড়িয়া লইতে হইবে।

বানান সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলিবার আছে। যে সকল শব্দের অন্তে অকারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, প্রায় সে গুলির উচ্চারণের সময় অকার বাদ দিয়া হসন্ত করিয়া লওয়া

হয়। সংস্কৃতে এমন করা ত চলেই না, উড়িয়াতেও চলে না। দাস, কটক, বালেশ্বর, লবণ ইত্যাদি যত অকারন্ত শব্দই মনে করিবেন, বাঙ্গলাতে তাহার সবগুলিই হসন্ত—দাস্, কটক্, বালেশ্বর্, লবণ্ ইত্যাদি; কিন্তু উড়িয়াতে সবগুলিই অকারান্ত। বাঙ্গলায় অকারান্ত করিয়া লিখিবার উপায় না থাকায় অগত্যা ওকারান্ত করিয়া তাহাদের উড়িয়া উচ্চারণ দেখাইতেছি—দাসো, কটকো বালেশ্বরো, লবণো ইত্যাদি। বাঙ্গলাতে আকার, ইকার, উকার প্রভৃতির যেমন চিহ্ন আছে, অকারের তেমনই একটি চিহ্ন থাকিলে সুবিধা হয়। পূর্ব্বে এই রূপ চিহ্ন ছিল বলিয়াই আমার ধারণা। প্রাচীন প্রয়োগে 'করহ' 'শুনহ' ইত্যাদি স্থলে যে 'হ'কারের চিহ্ন দেখা যায় তাহা বস্তুতঃ 'হ' নহে, অকারেরই জ্ঞাপক মাত্র। অন্ত্য অকার উচ্চারণ করিতে হইলে ঐ চিহ্নটি তাহারই সূচক। এখন আমরা ওটিকে উড়াইয়া দিয়াছি, কিন্তু উড়াইয়া দিয়া ফাঁপড়েও পড়িয়াছি। এখন একটা উপায় চিন্তা করা আবশ্যক। যত নাম শব্দ আছে এবং বিশেষণ শব্দ আছে তাহাদের মধ্যে ত, য, র, ল, ব, ড়, ঢ় এই সাতটি বর্ণ ছাড়া আর সকল অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণই হসন্ত উচ্চারিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। তান্ত শব্দের অকারবিশিষ্ট উচ্চারণ এবং অকারশূন্য উচ্চারণ বোধ হয় সমান সমানই হইবে; নহিলে হসন্ত ত বা খণ্ড ৎ এই রূপ একটা বিশেষ চিহ্নের সৃষ্টি হইয়াছে কেন? আর বোধ হয় যে, হসন্ত য, হসন্ত র, হসন্ত ল, হসন্ত ব, লিখিতে হইলে প্রাচীন লেখায় এখনকার হসন্ত চিহ্নের মতন ঐ অক্ষর গুলির নিম্নে একটি একটি তির্য্যক রেখা (্) দেওয়া হইত। য় এবং র এই দুইটি অক্ষরের নিম্নে এখন যে ফুটকি থাকে, ইহা বোধ হইতেছে নিতান্তই আধুনিক। পূর্ব্বে 'ব'কারের পেট কাটিয়া দিলেই 'র' হইত। যাহা হউক একটা কোন উপায় করিতে পারিলে ভাল হয়; উপায় না করিলে সময়ে সময়ে বড় গোলে পড়িতে হয়। বাঙ্গলায় দেয় (অর্থাৎ দান করে) এবং দেয় (অর্থাৎ দিবার যোগ্য) এক বানানেই বানান করা হয়; বার (অর্থাৎ পালা) এবং বার (অর্থাৎ দ্বাদশ), ভাল (অর্থাৎ কপাল) এবং ভাল (অর্থাৎ প্রশস্ত), সব (অর্থাৎ সমুদয়) এবং সব (অর্থাৎ সহ্য করিব) প্রভৃতি শব্দেও ঐ বিপত্তি। যেমন খণ্ড ৎ আছে, হয় তেমনই খণ্ড য, খণ্ড র, খণ্ড ল, খণ্ড ব, গড়িয়া লওয়া হউক, না হয় যেখানে হসন্ত উচ্চারণ সেইখানে হসন্ত চিহ্ন দিবার বিধান হউক। আবার কেবল বিধান করিলেও চলিবে না, বিধান মানা চাই। দেখুন এখন অখণ্ড অর্থাৎ অকার সমেত ত এবং খণ্ড অর্থাৎ অকারহীন ৎ, এই দুই বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কেত থাকিতেও মত (অর্থাৎ অভিপ্রায়, বুদ্ধি) এবং মত (অর্থাৎ সদৃশ) আমরা একই প্রকারে লিখিয়া থাকি। বিধান মানিয়া চলিলে উৎপাত, জাত, ভাত, সমেত, ক্ষেত ইত্যাদি স্থলে অখণ্ড ত লেখা কোন মতেই উচিত নহে।

ফল কথা, বাঙ্গলা ভাষার উপযুক্ত বর্ণসঙ্কেত অবধারিত না হইলে বানানের গোলযোগ এবং বানান ভুলের বিভ্রাট অনিবার্য্য। মানুষ স্বভাবতঃ প্রচলিতের পক্ষপাতী; অন্যে প্রচ-

লিতের আংশিক বিপর্য্যয় করিতেও কুণ্ঠিত, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমি নিতান্ত উদ্ভট বা অতি নূতন প্রস্তাব যে উত্থাপন করি নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতকটা পথ দেখাইয়া গিয়াছেন; তাঁহার বর্ণমালায় য়, ড়, ঢ়, ং, ঃ, ঁ যোগ করিয়া এবং তখনকার প্রচলিত ক্ষ আর সংস্কৃতের দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯কার বাদ দিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় বর্ণমালার শোধনের বা সংস্কারের প্রয়োজন আছে।

এইবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্য অন্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে মোটামুটি এই কয়টি প্রকরণ আছে—সন্ধি, সুবন্ত, তিঙন্ত, স্ত্রী প্রত্যয়, কৃৎ, তদ্ধিত, কারক এবং সমাস। বাঙ্গলায় ইহার মধ্যে কোনও প্রকরণেরই উপযোগিতা নাই।

বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃত সেগুলি বাদ দিলে অন্য কোনও অংশে সন্ধি চলে না। সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। 'তথাপ্যাটচালাথানায়' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পড়িয়া রহিয়াছে। তবে সংস্কৃত সন্ধির সমুদয় নিয়মগুলি মানুষের স্বাভাবিক সংস্কারের অনুগত হউক কিম্বা না হউক, অধিকাংশই যে স্বভাবের অনুকূল বটে তাহাতে সন্দেহ নাই। কথোপকথনের বাঙ্গলায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

দেশের মাটির, দেশের জলের, দেশের রোদের, দেশের বাতাসের গুণে বাঙ্গালী স্বল্পাক্ষর শব্দের বড়ই পক্ষপাতী; দুই অক্ষরের শব্দ পাইলে বাঙ্গালী তিন অক্ষরের শব্দ লইতে চায় না; তিন অক্ষরের শব্দ পাইলে চারি অক্ষরের দিকে যায় না। কিন্তু মাটি, জল, রোদ, বাতাস বাঙ্গলার সর্ব্বত্র একই প্রকারের নহে; অল্প অল্প অন্তরেই ইহাদের গুণভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যোজনান্তর ভাষা—ঐ ভেদই এই প্রবাদের মূল। শিক্ষাভেদের বা সংসর্গভেদের কথা এখানে তুলিতেছি না, কেবল মাটি, জল, রোদ, বাতাসের ভেদের কথাই এখানে বলিতেছি। এই ভেদের ফল এক হিসাবে বড়ই অনিষ্টকর; কেননা, যোজনান্তরে ভাষাভেদ হইলে সামাজিক ঐক্যস্থাপনের এবং লোকব্যবহারের প্রসারবৃদ্ধির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই অনিষ্টের প্রতিবিধান করিতেই সাধুভাষা কল্পিত হইয়াছে। লিপিকর্ম্মের নিমিত্তে সাধুভাষাই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া প্রমাণরূপে স্বীকৃত এবং সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কথোপকথনের সময়ে সাধুভাষার এ সমাদর কেহ রাখে না। আপন আপন স্থানভেদের অনুকূল করিয়া লোকে সেই সাধুভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লয়। তাহারই ফলে 'খাইতেছি' ইত্যাদি শব্দের সাধুকল্পিতরূপ ভাঙ্গা গড়া হইয়া কোন স্থানে খাতেছি, কোন স্থানে খাতিছি, কোন স্থানে খেতেছি, কোন স্থানে খেচি, কোন স্থানে খাচ্ছি প্রভৃতি নানা রূপ ধরিয়া থাকে। এই ভাঙ্গা গড়াতে সন্ধির কাজ দেখিতে পাওয়া যায়; আর এই সন্ধিকেই আমি স্বভাবানুগত সন্ধি বলিতেছি। এই দেখুন 'খা' ছিল ইতেছি সন্ধি করিলেই খেতেছি হয়, খাৎ ছিল ছি সন্ধি করিলেই খাচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙ্গলা সাধুভাষায় সন্ধির ভয় বা সন্ধির প্রতি বিরাগ এতই প্রবল যে, প্রাচীন লেখকেরা 'ঞ' এই অক্ষরের আশ্রয় লইয়া সন্ধিভীতিতে আত্মরক্ষা করিতেন। রাঢ়দেশে বীরভূম অঞ্চলে সানুনাসিকের প্রকোপ কিছু বেশী বটে, কিন্তু হঞা, খাঞা, গিঞা, মুঞি, তেঞি প্রভৃতি বানান সে প্রকোপের ফলে নহে। অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তিস্বরূপে আমরা এখন 'ইয়া' লিখিয়া থাকি; পূর্ব্বে স্বরের 'আ' লিখিবার রীতি ছিল। য় লিখিলে পূর্ব্বের 'ই'টা বৃথা হয়। এখন দেখুন যে প্রাচীন রীতিতে 'হইআ' লিখিতে গেলে সন্ধি ব্যাঘ্রলম্ফনে আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়ে। 'হ' অকারান্ত বর্ণ তাহার পরে 'ই'—ব্যাকরণ বলিলেন "সন্ধিরেক পদে নিত্যঃ", তবেই 'হ' কারের পর একটি ব্যঞ্জন আনিতে হইল; ই তালব্য স্বর, 'ঞ' তালব্য ব্যঞ্জন; এই দুই বর্ণে যতটা সাজাত্য ইকারের সঙ্গে অন্য কোনও বর্ণেরই ততটা সাজাত্য নাই; অগত্যাই 'হ'কারের পর 'ঞ' আসিলেন, আর সেই 'ঞ'তে আকার দিলেই 'হঞা' আসিল। কেহ বা অন্যরূপে সন্ধির কাজ সারিলেন। 'ই' তে 'আ'তে 'য়া', তিনি লিখিলেন হয়া, বোধ করি পাবনা অঞ্চলে কথোপকথনে 'হয়া' বলে। কোথাও বা 'ই'র উচ্চারণ প্রকট রাখিবার নিমিত্তে ঐ অন্তঃস্থ 'য়'কারের দ্বিত্ব করিয়া দেওয়া হয়, সেখানে লেখা হয় 'হয়্যা'। আবার অন্য কেহ বা ঐ সন্ধির ভয়েই 'ঐ'কারের আশ্রয় লইয়া 'হৈয়া' লিখিয়া দিলেন। প্রাচীন পুঁথির পাঠ উদ্ধার করিতে গিয়া আমরা নানা স্থানে নানা রহস্যের কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু প্রায়শই দেখিবেন সন্ধিভীতি প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকাই বহুবিধ পাঠান্তরের বা বানানের একমাত্র কারণ।

অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে, সংস্কৃতের সন্ধিবিধান লইয়া বাঙ্গলা ভাষার বিব্রত হইবার প্রয়োজন নাই। সত্য বটে যে, সমাসে জোড়া এবং সমাসে না-জোড়া বিস্তর সংস্কৃত পদ বা শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় অবিকলভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। সে সকল শব্দের ভিতরে ভিতরে সন্ধিও করা থাকে; আবার অনেক ছুটা শব্দ সন্ধির নিয়মানুসারে আমরা জুড়িয়া লই; কিন্তু সে অনুরোধেও বাঙ্গলা ব্যাকরণে সন্ধি আনা আবশ্যক বলিয়া আমি স্বীকার করি না। যে সকল শব্দে সন্ধি করা আছে, যেমন—মহাশয়, সদাশয়, যথেষ্ট, অভিপ্রেত প্রভৃতি, সে গুলিকে বাঙ্গলার পক্ষে রূঢ় শব্দ মনে করিয়া লইলেই চলিতে পারে। ফারসি কি আরবি কি ইংরেজি কি লাটিন শব্দের ব্যুৎপত্তি বা সংঘটন লইয়া আমরা মাথা ঘরাই না; সংস্কৃত শব্দের বেলাতেও আমরা সে পথে না চলিব কেন? পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে বাঙ্গলা ভাষাকে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র করিতে না পারিলে বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত গৌরব কখন হইবে না। 'নিয়ম অনুসারে' কিম্বা 'অন্য অন্য' না লিখিয়া, 'নিয়মানুসারে' কিম্বা 'অন্যান্য' লিখিতেই হইবে ইহা আমি মানিতে চাই না। বাঙ্গলাতে যত ভাষার শব্দ লইয়াছি বা লইতেছি তত ভাষারই ব্যাকরণ লইনাই বা লইবও না। সংস্কৃত সম্বন্ধে এ কথার ব্যতিক্রমের কারণ দেখি না। আর বাঙ্গলা ব্যাকরণ যে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র তাহা কেবল সন্ধিতে নহে, ব্যাকরণের অন্য অন্য প্রকরণ সম্বন্ধেও বটে, তাহা দেখাইতেছি।

সুবন্ত প্রকরণ ধরা যাউক। সুবন্তের সঙ্গে সঙ্গে কারকেরও আলোচনা করিব এবং আনুসঙ্গিক বলিয়া বচনের ও লিঙ্গের কথা কহিব।

সংস্কৃতে তিন বচন এবং শব্দের তিন লিঙ্গ। বাঙ্গলায় বলিতে গেলে বচন একটি মাত্র। মানুষের বেলায়, কি বড় জোর বুদ্ধিমন্ত জন্তুর বেলায়, আর সর্ব্বনামে একবচনের এবং বহুবচনের ভেদ আছে; কিন্তু অন্য জন্তুর কি অন্য পদার্থের বেলায় সে ভেদ থাকে না। তাহারা, তোমরা, আমরা, আর ব্রাহ্মণেরা, শূদ্রেরা, যবনেরা ইত্যাদিতেই বহুবচনের 'রা' শুনিতে পাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বানরের সম্মান বাড়াতে এখানেও আমরা কখন কখন 'বানরদের' আদর করি, কিন্তু এমন প্রয়োগের বিশেষ প্রসিদ্ধি বোধ করি নাই। তাহার পর বাঙ্গলা ব্যাকরণে দ্বিবচনের প্রসঙ্গই নাই।

সংস্কৃতে শব্দের লিঙ্গ আছে। শব্দ মাত্রেই হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ, নয় ক্লীবলিঙ্গ। বাঙ্গলায় শব্দের লিঙ্গ নাই। ময়রাণী বাস্তবিক স্ত্রীলোক বলিয়াই ঐ আনীটুকু পায়, কিন্তু ময়রাণী শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ নয়। সংস্কৃত দার শব্দে স্ত্রী বুঝায়, কিন্তু 'দার' শব্দটি পুংলিঙ্গ। কোন কোন বাঙ্গলা ব্যাকরণে দেখিয়াছি যে লতা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু এটা স্পষ্ট ভুল। এক জন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর রচনায় ফলবতী বৃক্ষ পড়িয়াছিলাম। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সে রচনায় দোষ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে দোষ মনে করি না। সংস্কৃত বৃক্ষ পুংলিঙ্গ হইবে হউক, কিন্তু বাঙ্গলায় গাছও পুংলিঙ্গ নয়, বৃক্ষও পুংলিঙ্গ নয়। আমাদের এক জন পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃতের অনুরাগভরে এক দিন সূত্র গড়িয়া শিখাইতেছিলেন যে, "আকারান্তা মেয়ে লিঙ্গা"। এক জন ছাত্র ধরিয়া বসিল যে, বাবা, কাকা, জেঠা,মামা—ইহাদের কি হইবে? তাহারাও কি স্ত্রীলিঙ্গ? পণ্ডিত মহাশয় নিজকৃত সূত্রে যোগ করিলেন "গোঁপদাড়ী বিবর্জ্জিতা।" আবার আপত্তি হইল যে বাবা খুড়া যদি মাকুন্দ হন? পণ্ডিত মহাশয় লিঙ্গপ্রকরণ ছাড়িয়া দিলেন।

সংস্কৃত সুবন্তে একুশটি বিভক্তি। সেই বিভক্তি ধরিয়া কারকভেদ আদি হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় বিভক্তি বলিতে গেলে মোটে তিন প্রস্ত। এক প্রস্তে আছে 'এ', 'তে', ইহা কর্ত্তা কারকে, করণ কারকে এবং অধিকরণ কারকে লাগে, আর এক প্রস্তে আছে, 'কে', 'রে', ইহা কর্ম্মকারকে লাগে, আর সম্বন্ধের বিভক্তি 'র'। 'দ্বারা', 'দিয়া', 'হইতে', এ গুলিকে বিভক্তি বলা যায় না; এ গুলি একটি একটি স্বতন্ত্র শব্দ। বাঙ্গলায় সম্প্রদান কারক নাই; সম্প্রদান কারক থাকিতেই পারে না। সংস্কৃতে পরলোকের সহিত এবং অদৃষ্টের সহিত ইহলোকের যে বন্ধন আছে, বাঙ্গলায় সে বন্ধন মনেই করিতে হয় না। অতএব নিঃসঙ্কোচে এক কথাতেই বলিতে পারা যায় যে, সংস্কৃত সুবন্ত প্রকরণের সহিত বা কারকবিধান প্রকরণের সহিত বাঙ্গলা ব্যাকরণের কোন অংশেরই সম্পর্কও নাই, মিলও নাই।

তিঙন্তেও ঐ কথা। সংস্কৃত ক্রিয়াপদে বচনভেদ সূচিত হয়, বাঙ্গলায় তাহা হয় না। বাঙ্গলায় বিধিলিঙএর বা আশীর্লিঙএর স্থান নাই। অন্য অন্য লকারের অনুরূপ প্রয়োগ বাঙ্গলাতে নাই বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। আর বিভক্তির মিল ত কোন মতেই হইতে পারে না। সর্ব্বোপরি সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের মূল যে ধাতু, বাঙ্গলায় সেই ধাতুর অনুরূপ কোন পদার্থই নাই। ভূ, কৃ, গম্ ইত্যাদির নাম ধাতু। ভবতি, কুর্ব্বতঃ, গচ্ছন্তি এগুলি যেমন ঐ ভূ, কৃ, গম্ ধাতুতে গড়া, সংস্কৃতের কি তিঙন্তের কি অন্য প্রকরণের শব্দ বা পদ মাত্রেই তেমনই কোন না কোন ধাতুতে গড়া। বাঙ্গলায় সংস্কৃত শব্দ আছে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ধাতুটুকুও আছে, তাহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এমন বলা যায় না যে বাঙ্গলাতেও ধাতু আছে। বাঙ্গলার তিঙন্তের অনুরূপ পদ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন নহে, অন্য এক জাতীয় ক্রিয়ামূল হইতে নিষ্পন্ন। বাঙ্গলাতে অনুজ্ঞার ক্রিয়ায় এবং আরও কোথাও কোথাও, মধ্যম পুরুষের দুইটি ভাব আছে; একটিকে সাধারণভাব, আর এক-টিকে নিম্নভাব বলা যাইতে পারে। 'তুমি যাও' এখানে মধ্যম পুরুষের সাধারণভাবের প্রয়োগ, আর 'তুই যা' এখানে 'যা' পদটিকে আমি নিম্নভাবের প্রয়োগ বলিতেছি। বাঙ্গ-লাতে অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের নিম্নভাবটি ক্রিয়াপদের মূল বলিয়া আমার ধারণা। 'দিতেছি' এই ক্রিয়াপদের মূল, সংস্কৃত দা ধাতু নহে। দা ধাতুকে মূল বলা যেমন সঙ্গত লাটিন বা গ্রিক ভাষার তৎসদৃশ মূলকে মূল বলাও তেমনই সঙ্গত। বাঙ্গলার কতকগুলি ক্রিয়ামূল এই স্থানে সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চাই যে বাঙ্গলার ক্রিয়ামূল সর্ব্বত্রই অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের নিম্নভাব। এই ধরুন——বক্, রাখ্, রাগ্, বাঁচ্, আচ্, সাজ্, বুঝ্, কাট্, লুট্, পড়্, কাঁদ্, সাধ্, শুন্ বা শোন্, কাঁপ্, ভাব্, কর্, ভুল্ বা ভোল্, বইস্, গাহ্, রহ্——এইগুলি ব্যঞ্জনান্ত, আবার হ, বা, খা, শো বা শু, দে, নে এইগুলি স্বরান্ত। দেখুন ইহার সবগুলি অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের নিম্নভাব। আরও যত মূল দেখিবেন সমস্তই এইরূপ। ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতে হইলে আমরা এই মূলে 'আ' বিভক্তি যোগ করিয়া থাকি। পূর্ব্ববঙ্গের, সর্ব্বত্র না হউক, কোথাও কোথাও 'অন্' যোগ করা হইয়া থাকে; যেমন,—রাখা, রাখন্; বাঁচা, বাঁচন; কাটা, কাটন্ ইত্যাদি। ব্যঞ্জনান্তের বেলায়ও এই নিয়ম। স্বরান্তের বেলায় ঐ 'আ' যোগের পূর্ব্বে বা অন্ যোগের পূর্ব্বে একটা অন্তঃস্থ 'ব' দেওয়া হয়; যেমন,— হওা, হওন; খাওা, খাওন; দেওা, দেওন ইত্যাদি। আর এই মূলের উপর ক্রিয়াপদ গড়িতে অসমাপিকায় 'ইয়া', নিমিত্তার্থে 'ইতে', বর্ত্তমান কালের প্রথম পুরুষে 'এন', 'এ', মধ্যম পুরুষে 'ও' উত্তম পুরুষে 'ই', অতীত কালের প্রথম পুরুষে 'ইলেন', 'ইলেক', 'ইল'; মধ্যম পুরুষে 'ইলা', উত্তম পুরুষে 'ইলাম'; ভবিষ্যতের প্রথম-পুরুষে 'ইবেন', 'ইবে'; মধ্যম পুরুষে 'ইবা'; উত্তম পুরুষে 'ইব'; অনুজ্ঞার ভবিষ্যতে 'ইও', ইস্, অনুজ্ঞার বর্ত্তমানে প্রথম পুরুষে 'উন্', 'উক্' মধ্যম পুরুষে 'ও', উত্তম পুরুষে 'ই'। একটা মূলের রূপ করিয়া দেখাই,—

ক্রিয়ামূল 'কর্'।

ক্রিয়াভাব—কর্+আ=করা।

অসমাপিকা—কর্+ইয়া=করিয়া।

নিমিত্তার্থে—কর্+ইতে=করিতে।

বর্ত্তমান কাল।

প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
কর্+এন=করেন। কর্+এ=করে।	কর্+ও=করো।	কর্+ই=করি।

অতীত কাল।

প্রঃ পুরুষ।	মঃ পুরুষ।	উঃ পুরুষ।
কর্+ইলেন=করিলেন।	কর্+ইলা=করিলা।	কর্+ইলাম=করিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল।

প্রঃ পুরুষ।	মঃ পুরুষ।	উঃ পুরুষ।
কর্+ইবেন=করিবেন।	কর্+ইবা=করিবা।	কর্+ইব=করিব।

অনুজ্ঞা (বর্ত্তমান)।

প্রঃ পুরুষ।	মঃ পুরুষ।	উঃ পুরুষ।
কর্+উন=করুন।	কর্+ও=করো।	কর্+ই=করি।

অনুজ্ঞা (ভবিষ্যৎ কাল)।

মধ্যম পুরুষ।

কর্+ইও=করিও। কর্+ইস=করিস।

সংস্কৃত সবল এবং বাঙ্গলা দুর্ব্বল ভাষা। সংস্কৃত সবল, কেন না একটি একটি ধাতুর উপরেও ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি এবং প্রত্যয় যোগ করিয়া কত গড়নই গড়া যায়। বাঙ্গলায় ধাতু নাই; ক্রিয়ামূলগুলিও ক্ষীণ, বেশী পোড়ও সহিতে পারে না, বেশী ঘাও সহিতে পারে না। 'আছ' এই একটি ভগ্নমূলকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলায় অনেকগুলি ক্রিয়া-পদের কালভেদ করিয়া লইতে হয়, যেমন, 'করিতে' 'আছি' যোগ করিয়া গড়িতে হইল করিতেছি; এই রূপ করিতেছ, করিতেছে ইত্যাদি। আবার ঐ রূপই করিতেছিল, করিতেছি না, করিতেছিলাম, করিয়াছিল, করিয়াছিলাম ইত্যাদি। 'আছ্' এইটিকে ভগ্নমূল বলিয়াছি; ক্রিয়ার সকল ভাবে কেবল 'আছ্' লইয়া কাজ হয় না। 'যা' এটিও ঐরূপ ভগ্নমূল, 'যা' ক্রিয়া সমস্ত ভাবে চলে না; 'যাইয়াছে' শিষ্টপ্রয়োগ নহে; গিয়াছেই শিষ্ট-প্রয়োগ। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। ইদানী কেহ কেহ 'গিয়াছে' এই পদের পরিবর্ত্তে 'গেছে' বা 'গ্যাছে' লিখিয়া থাকেন। এরূপ লেখাতে প্রমাণস্বরূপে সাধুভাষা স্থির থাকে না এবং পদসাধনে অকারণে ব্যভিচার ঘটান হয়। 'ই আছে' বিভক্তির পরিবর্ত্তে 'য়াছে' বা 'এছে' লিখিতে হইলে, সর্ব্বত্রই ঐ একই রূপ লেখা উচিত।

সংস্কৃত সুবন্ত তিঙন্তের সহিত বাঙ্গলার কোনও মিল নাই এবং থাকিতেই পারে না, ইহা বিস্তারিত করিয়া দেখানই বাহুল্য। কেন না, সুবন্ত তিঙন্তই প্রত্যেক ভাষার মেরুদণ্ড স্বরূপ। ভাষায় ভাষায় অন্ত ভেদ না থাকিলেও অথবা অন্য অংশের ভেদ অল্প হইলেও সুবন্তে তিঙন্তে ভেদ থাকিবেই থাকিবে।

স্ত্রী প্রত্যয়েও বাঙ্গলা ভাষার দুর্ব্বলতা; এবং সেই হেতুতে সংস্কৃতের সহিত ভেদ বিলক্ষণরূপেই দেখা যায়। বাঙ্গলায় স্ত্রী প্রত্যয় আছে। হ্রস্ব বা দীর্ঘ ঈ এবং আনী বা নী—তা হ্রস্ব 'ই'কারান্তই হউক বা দীর্ঘ 'ঈ'কারান্তই হউক—যোগ করিয়া স্ত্রীবাচক শব্দ করা যায় বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতি বুঝাইতে প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দের রূপান্তর করিতে হইবে এমন কোনও বাঁধাবাঁধি নাই। পাঁটি বলিলেও চলে মেদিছাগল বলিলেও চলে, গয়লানী বলিলেও চলে বা গোয়ালাবৌ, গোয়ালাঝি, বা গোয়ালার মেয়ে বলিলেও চলে। পুরুষ মানুষও মানুষ, স্ত্রীও মানুষ। আবার বিশেষণেও স্ত্রীত্বের খাতিরে বহু বিচার করা না করা, শব্দের রূপান্তর করা না করা বক্তার বা লেখকের সম্পূর্ণ ইচ্ছায়ত্ত। সুন্দর মেয়েটি, এ মেয়েটি কেমন সুন্দর, এ পুরুষটা খোঁড়া, ও মেয়েটি খোঁড়া ইত্যাদি প্রয়োগ ত নির্দ্দোষ বটেই, সাদা, কাল, ময়লা, ফর্সা, ভাল, মন্দ ইত্যাদি শব্দের স্ত্রীত্বসাধন মোটেই করিবার জো নাই। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দ্দু, ফারসি এত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ করিয়াও বাঙ্গলাকে স্ত্রীত্বপ্রকরণে কোট ছাড়াইতে পারে নাই।

কৃৎ প্রকরণের কথা না তুলিলেও চলে। সংস্কৃতের কৃৎ প্রত্যয়গুলি ধাতুর উপরেই কাজ করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে বাঙ্গলায় মোটেই ধাতু নাই। বাঙ্গলা ক্রিয়ামূল হইতে 'আ'যোগে ভাববাচক শব্দ করা যায়। 'য়িআ' যোগে দুই চারিটা কর্ত্তাবাচক শব্দও করা যায়; যেমন গায়িআ, খায়িআ, বাজ্‌য়িআ, নাচ্‌য়িআ ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল শব্দের সাধুপ্রয়োগ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর সংস্কৃত কোনও প্রত্যয়ই, বাঙ্গলায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন, কোনও শব্দে লাগান যায় না। যে পড়ে তাহাকে পড়্‌তা, লোকটাকে মারাই বিধি, এ স্থলে মারিতব্য কি মারণীয় কি মার্য্য এ সব কিছুই বলিবার জো নাই। তদ্ধিত প্রত্যয় সম্বন্ধেও ঐ কথা।

বাঙ্গলায় একটা 'মন্ত' প্রত্যয় ছিল, কিন্তু সেটা অনাদরে মারা গিয়াছে। ধনমন্ত, ভাগ্যমন্ত, আক্কেলমন্ত, শ্রীমন্ত প্রভৃতি কথোপকথনে ত শুনিতামই, প্রাচীন পুঁথিতেও যেন কোথাও কোথাও দেখিয়াছি। আর ওালা বা অয়লা, যেমন ঘাসওালা বা ঘাসঅয়লা, দুধওালা বা দুধঅয়লা এবং স্ত্রীবাচক ওালী বা অয়লী বা ঔলী এখনও যেন আনাচে কানাচে উঁকি ঝুঁকি মারে। আমার বিবেচনায় একটু আদর করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় ইহাদিগকে স্থান দিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গলায় কিছু কিছু সমাস আছে। দাকাটা তামাকে, দা-কাটা বোধ হয় করণ-তৎপুরুষ; আর কলম-কাটা ছুরিতে কলমকাটা বোধ হয় কর্ম্মতৎপুরুষ; তবে তৃতীয়া-তৎপুরুষ, দ্বিতীয়াতৎপুরুষ বলিবার জো নাই, কেন না সংস্কৃত বিভক্তির ক্রমসংখ্যার

সঙ্গে বাঙ্গলা বিভক্তির ক্রমসংখ্যা মিলিবে না। ধামা-ধরা, হাঁড়িহাতে প্রভৃতি শব্দে সমাস আছে কি নাই, আর যদি থাকে তবে অলুক সমাস কি না, সে বিচার করা আমার কর্ম্ম নয়। তবে সংস্কৃত সমাস সংস্কৃতেই খাটে; বিভক্তির কাঙ্গাল বাঙ্গলাতে খাটিবে না, এ কথা বলিতে আমার সংকোচ হইতেছে না।

আমি বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিতেছি না, রচনা করিতে পারি এমনও মনে করি না। উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যাকরণ রচনার স্থলও নহে। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার সংস্কারের নিমিত্তে দিগ্‌দর্শন করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি ইহাই মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ নহে, এবং বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ করিতে হইলে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালিলে কাজ হইবে না। আরও দেখাইতে চাই যে, বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের দিকে অযথা পক্ষপাতের ফলে লাভ না হইয়া লোকসানই হইবে। সংস্কৃতে আমার বিদ্যা নাই অথচ বিলক্ষণ ভক্তি অনুরাগ আছে, ইহা বলিতে আমি কুণ্ঠিত নহি। ভক্তি অনুরাগ আছে বলিয়াই আমি ইঙ্গিত করিতেছি যে, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বাঙ্গলা ভাষার সংস্কার চেষ্টা করা উচিত। নহিলে এখনকার বাঙ্গলা ভাষার যে একটা দোষ দেখিতে পাই তাহা ক্রমশঃ আরও প্রবল হইতে পারে। দোষটা এই যে, সংস্কৃত শব্দের অজ্ঞানকৃত অযথার্থ প্রয়োগ জন্য বিস্তর সংস্কৃত শব্দের ধর্ম্ম এবং শক্তি নষ্ট হইতেছে। শুধু এইটুকু হইলেও সহ্য হইত, কিন্তু দেখিতে পাই যে, বাঙ্গলাতে সংস্কৃত শব্দের বিকৃত অর্থ শিখিয়া কেহ কেহ সংস্কৃতে সেই বিকৃতির আরোপ করেন এবং অভিসন্ধি নির্দ্দোষ হইলেও বুদ্ধিমালিন্যপ্রযুক্ত নিজের এবং পরের ইহকাল পরকালের হানি করিয়া থাকেন। সভাস্থলে এ কথার দৃষ্টান্ত উদাহরণ দেওয়া উচিত মনে করি না।

অভিধানের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেন। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে সে প্রয়োজন আরও প্রকট হইবে এইরূপ আশা করি। শব্দকল্পদ্রুম কিম্বা বাচস্পত্য, অমরকোষ কিম্বা মেদিনী বাঙ্গলা ভাষার অভিধান নহে। ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ আমি যখন তখন দেখিয়া থাকি; উহা সুন্দর সংগ্রহ। দোষের মধ্যে বহুতর বাঙ্গলা শব্দই উহাতে পাওয়া যায় না। আমি প্রকৃতিবাদের নিন্দা করিতেছি না, কিন্তু প্রকৃতিবাদে বা ঐ প্রকারের অন্য সংগ্রহে আমাদের কুলায় না, ইহাই বলিতে চাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে যত শব্দ পাওয়া যায় তাহার নিরবশেষ সংগ্রহ আবশ্যক। আর সংগৃহীত প্রত্যেক শব্দের মূল এবং যে ভাষার সেই শব্দ সে ভাষায় সে শব্দ কি কি অর্থ প্রকাশ করে এবং পরে বাঙ্গলায় সে শব্দ কোন্ স্থলে কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই প্রয়োগটি দেখাইয়া অভিধান খানির রচনা করিতে হইবে। সেই সঙ্গে আরও এমন চেষ্টাও করিতে হইবে যে, প্রদেশে প্রদেশে কথোপকথনে যে সকল শব্দ পাওয়া যায়, সাহিত্যে সে সকল শব্দের মূর্ত্তি আছে কি না। আর সেই সেই মূর্ত্তিতে যদি অন্তর থাকে, অর্থাৎ প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রভেদও যেন অভিধানে দেখান হয়। ইহা যদি হয় তবেই বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত সংস্কার হইতে পারিবে।

রচনার রীতি সম্বন্ধে এবং শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে দুই একটা কথা ভাবিবার মতন আছে। এখন যাঁহারা বাঙ্গলা লেখেন বা বাঙ্গলা বলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই শিক্ষা ইংরেজিতে, তাহার উপর কেহ কেহ বা সংস্কৃত জানেন, কাহারও কাহারও বা সংস্কৃতের আমেজ আছে। সাধ করিয়া কেহ কেহ বা বাঙ্গলার প্রাচীন নবীন রচনাও কিছু কিছু পড়েন। ইহার ফলে বাঙ্গলা ভাষার উপর ইংরেজির ভাবনাপদ্ধতির, ইংরেজির রচনারীতির, ইংরেজির প্রকৃতগত বৈলক্ষণ্যের প্রকোপ অতি মাত্রাতেই অনুভব করিতে হয়। সর্ব্বপ্রকারেই বা সকল স্থলেই যে ইহা নিন্দনীয় তাহা বলিতেছি না, কিন্তু কোন্ টুকুই বা সম্পদ আর কোন্ টুকুই বা বিপদ বুঝি, সব ক্ষেত্রে তাহার বিচার হয় না। 'তিনি বলিলেন তিনি আসিবেন না' এ রীতি ইংরেজির। তিনি আসিবেন না বলিলেন, বা তিনি বলিলেন যে আমি যাইব না, ইহাই আমাদের দেশীয় রীতিসঙ্গত। কোন্ রীতি বর্জ্জনীয়, বা কোন্ রীতি গ্রহণীয়, দশ জনের মতন দশ জন তাহার বিচার করুন, এই আমার অনুরোধ। তাহার পর ইংরেজিতে ভাবিয়া বা ইংরেজি বাঙ্গলাতে মিশাইয়া ভাবিয়া, বাঙ্গলায় লিখিবার সময়ে আমরা যেন একটু তাড়াতাড়ি করি বলিয়া মনে হয়। ইংরেজি শব্দ, তাহার ভিতরে খাঁটি অপরিচিত ভাব সমাবিষ্ট, তাহাকে বাঙ্গলা মূর্ত্তি দিতে হইবে, তেমন একটি বাঙ্গলা কথা পাওয়া গেল না; এ দিকে সংস্কৃত ত ধাতুর খনি, টপ্ করিয়া একটা ধাতু তুলিয়া লইয়া তাহার এ দিকে এক ঘা ও দিকে এক ঘা দিয়া আমরা কখন কখন কাজ চালাই না কি? অভিধান দেখা অনেকেই দোষ বলিয়া মনে করেন; কেন না, বাঙ্গলা ভাষা এখনও শিখাইবারই ভাষা, শিখিবার ভাষা নহে। আরও দেখুন, অনেক স্থলে বাঙ্গলার অর্থ করিতে হইলে, ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়া তবে তাহা বুঝা যায়। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না তাঁহারা ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া অগত্যা লেখকের জয়জয়কার করিয়া ক্ষান্ত হন। আজিকালি আমরা গড়গড়ার মাথায় কলিকা বসাইয়া দিলে চাকরকে 'ধন্যবাদ' না দেওয়া অশিষ্টাচার মনে করি। আত্মীয় স্বজনের বা বন্ধু বান্ধবের সম্পদে বিপদে আমরা এখন 'সহানুভূতি' ঠেলিয়া দিই। সহানুভূতি ঠেলিয়া দিয়া 'যোগদান' করিতে পারি ত যোগদান করি, আর যোগদানে অসুবিধা বুঝিলে চা-চুরুটে 'মনোযোগ প্রদান' করি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মা, অদৃষ্ট, জন্মান্তর, ঈশ্বর, জাতি, বর্ণ, মন্ত্র, দেবতা, প্রকৃতি, কর্ম্ম, গুণ প্রভৃতি শব্দে কি বুঝিতেন সে প্রশ্নের ভার প্রত্নখোরদের উপর অর্পণ করিয়া আমরা অনেক পরিমাণে স্বাধীনতার এবং সভ্যতার সুখাস্বাদনে বদ্ধপরিকর হইতে পাই এবং সাহিত্যের ষড় রসে বিভোর হইয়া অকুতোসাহসে—(তয়ে ওকার)—পরস্পরের করকম্পন করিতে থাকি। এ সব, অভ্যুদয়ের লক্ষণ কি অধোগতির প্রমাণ, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। তবে ভাষার সংস্কারপ্রসঙ্গে এগুলিও যে ভাবিবার কথা, ইহা আমি মনে করি।

যাহা হউক, বাঙ্গলা ভাষার যে প্রকার প্রসার এবং পুষ্টি হইতেছে তাহা এক হিসাবে বিস্ময়জনিক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রায় প্রতি দিনই নূতন নূতন গ্রন্থ বাহির হই-

তেছে। প্রবন্ধপত্রের এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে নিভৃত পল্লীগ্রামেও ভাষাচর্চ্চা বিস্তৃত হইতেছে। কত কত সদ্বক্তা বাঙ্গলা ভাষাতে কত উপদেশ দিতেছেন, কত ব্যাখ্যান করিতেছেন, কত কত বিষয়েরই আলোচনা করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষা নিরাশ্রয়, বাঙ্গলা ভাষা অনাথ, তবু যে বাঙ্গলা ভাষার এমন প্রসার, কে বলিবে যে ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে? গবরমেণ্টের কাছে, আপিসে আদালতে, বাঙ্গলা ভাষার আদর ত নাই-ই, বাঙ্গলা ভাষার স্থান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যত টুকু বাঙ্গলা ও অঞ্চলে আগে চলিত তাহার এক আনাও এখন আর চলে কি না সন্দেহ। এখন বাঙ্গালি হাকিম বাঙ্গালি সাক্ষীর জবানবন্দি আর বাঙ্গালায় লিখিতে পান না। বাঙ্গালি উকিল মোক্তার বাঙ্গালি হাকিমের কাছেও বাঙ্গলায় বহস্ করেন না কিম্বা করিতে পারেন না। এমন অবস্থায় যে টুকু বাঙ্গলাও আদালতে চলে তাহা ইংরেজির আওতায় নিতান্ত বিবর্ণ, শীর্ণ এবং শ্রীবিহীন। স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় যে বাঙ্গলা টুকু প্রবেশ করিতে পায় তাহাও কতকটা সংস্কৃতের চাপে, কতকটা ইংরেজির ভাপে, চণ্ডীমণ্ডপের কলা-বৌএর মতন জড়সড়। তবু দেখুন বাঙ্গলা ভাষার প্রকোপ! এ কি সোজা কথা! শুধু গবরমেণ্টের ঘরে কি স্কুলে আদর পায় না বলিয়াই যে বাঙ্গলা ভাষাকে নিরাশ্রয়, অনাথ বলিতেছি, তাহা নহে। বর্ষাকালের ভিজা পাতায় চাঁদের আলো যেমন একটুকু ঝিকিমিকি করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, বৈঠকখানার আলাপে আপ্যায়িতে বাঙ্গলা ভাষা ততটুকুও ঝিকিমিকি করিতে পায় কি না সন্দেহ! তবু দেখুন বাঙ্গলা ভাষা কেমন করিয়া, কোন্ দিক দিয়া, ফুঁড়িয়া উঠিতেছে। এ অবস্থা কেবল অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিকদের করুণা-কটাক্ষের গুণেই হইতেছে। কিন্তু করুণাই ত? বোধ করি এখনও কেহই বাঙ্গলা ভাষার কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী নহে। যাঁহারা বাঙ্গলার আদর যত্ন করেন বরং তাঁহারাই বাঙ্গলাকে অনুগ্রহ করেন। মেষ বৃষ আদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে কোন্ রাশির অধিকারে কে আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে, ত্রিশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল পূর্ব্বে পঞ্চানন্দের লেখাতে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, বাঙ্গলা সাহিত্য কুম্ভরাশি। যে টুকু শোভা বা সমাদর তাহা কেবল রমণীকক্ষে। এখন আর ঠিক সে অবস্থা নাই, কিন্তু অনেক টুকু 'কিন্তু' এখনও আছে। আশা হইতেছে যে, সে 'কিন্তু' আর দীর্ঘকাল থাকিবে না। এখন হইতে একটুকু ভাল করিয়া লাগিলে অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই বাঙ্গালি বাঙ্গলা ভাষার গৌরবে বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতে আর কুণ্ঠিত হইবে না। অসাধারণ অধিকারীরা তখন অলঙ্কারস্বরূপে অন্য ভাষার সেবা করিবেন। কিন্তু তোমার আমার মতন লোককে, দেশের রাম, শ্যাম, যদু, মধুকে তখন আর ইংরেজির মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি, আজি যে সংস্কারের সূচনা হইতেছে তাহার ফলে সেই দিন সত্বর উপস্থিত হউক।

প্রবন্ধ (৩)

সাহিত্য-সম্মিলন

(প্রবন্ধ লেখক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

কেরোসীনের প্রদীপ জ্বালিলে তাহার চিমনির ভিতর হাওয়া জন্মে; আপন ঘরে আগুন দিয়া গ্রামের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বাধাইলে ছোট খাট একটা ঝটিকার উৎপত্তি হয়; কিন্তু দেশশুদ্ধ লোক জটলা করিয়া দেশব্যাপী সাইক্লোন উৎপাদন করিতে পারে না।

বাঙ্গলা দেশ ব্যাপিয়া যে একটা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অতি-বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না; এবং এই হাওয়া যে কেবল আমাদের চেষ্টায় ও ইচ্ছায় জন্মে নাই তাহাও বলা বাহুল্য। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী ফুৎকার প্রয়োগে পটু, কিন্তু সাতকোটি বাঙ্গালী এক সঙ্গে ফুৎকার দিলেও বাঙ্গলাদেশে এমন একটা ঝটিকাবর্ত্তের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। ঝড় একটা বহিতেছে তাহা স্বীকার্য্য; প্রত্যক্ষ প্রমাণেও যদি কেহ অস্বীকার করেন, তাঁহাকে আমরা ভারতসচিব সাধু মর্লির বক্তৃতা হইতে কোটেশন তুলিয়া মানাইতে পারিব, এরূপ ভরসা করি। এই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া বাঙ্গলার যত নগণ্য ধূলিকণা, বাঙ্গলার যেখানে যত তৃণাদপি লঘু পদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহা এখানে ওখানে সেখানে পুঞ্জীভূত হইতেছে, ও স্থানে অস্থানে স্তূপের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গলার ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে আমরা দল বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার হাওয়ার গতি দল বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহারা কংগ্রেসে কন্‌ফারেন্সে জেলাসমিতিতে পল্লীসমিতিতে দল পাকাইতেছেন; যাঁহারা সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁহারা সামাজিক কন্‌ফারেন্সে মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা ধর্ম্মমহামণ্ডলে সম্মিলিত হইতেছেন; যাঁহারা শিল্পের উন্নতি চান তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; যাঁহারা শিক্ষার উন্নতি চান, তাঁহারা দল বাঁধিতেছেন; আমরা সাহিত্যসেবীরাই কি চুপ করিয়া থাকিব? সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট

বাঁধিয়া এখানে আজ উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি দল বাঁধিতে চাহেন, আমরাই বা দল না বাঁধিব কেন? সকলেই যদি হাওয়ার অনুকূলে গা ঢালিয়া দেন, আমরাই বা বসিয়া থাকিব কেন? আমাদের এই সাহিত্যসম্মিলনকে যদি কেহ গড্ডলিকাপ্রবাহের মত পরের অনুকরণজাত বলিয়া উপহাস করিতে চাহেন, তাহাতে আমরা কর্ণপাত করিব না।

করিব না, কেননা, যে হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাহা বিধাতার প্রেরিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। সাতকোটি বাঙ্গালী একযোগে ফুৎকার দিয়া কখনই ইহা জন্মাইতে পারিত না।

আমাদের বন্ধুগণ, যাঁহারা নানা স্থানে নানারূপ দল বাঁধিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন। কেহ লোকশিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ শিল্পশিক্ষার ভার লইতেছেন, কেহ কাপড়ের কল চালাইতেছেন, কেহ দেশের অন্ন বাহিরে না যায় তাহার জন্য প্রাচীর গাঁথিবার কল্পনা করিতেছেন, কেহ সরকারের নিকট রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য ঘোঁট করিতেছেন, কেহ দল বাঁধিয়া সরকারের উপর গোসা করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা হাতের কাছে কর্ম্ম না পাইয়া স্বরাজস্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা দল বাঁধিয়া কি করিব? আমরা কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় পাইব? আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কি রূপ হইবে?

বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহিত অন্যান্য দলের একটু পার্থক্য আছে। কোন শরীরী জড়পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, অশরীরী ভাবপদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার। আমরা ভাবের হাটে বেচাকেনা লেনাদেনা করিয়া থাকি। আমাদের নিকট যাহার মূল্য অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুইতে গেলে তাহা ধূঁয়ার মত ও বাষ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া আমরা বিচরণ করি না; আমরা পাখীর মত বায়ুমার্গে উড়িয়া বেড়াই। এই উড্ডয়ন কার্য্যে আমাদের আর কোন লাভ নাই; লাভের মধ্যে কেবল আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম এবং যা কিছু চেষ্টা, এবং বলা বাহুল্য এই পরিশ্রম স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত নহি। কেননা এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফল্য।

আমরা এই পাখীর দল যে আজ নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত হইয়া এই ছায়ামণ্ডপতলে ঘটা করিয়া পরামর্শ করিতে বসিয়াছি, আমাদের এই সভা ভঙ্গ হইলে তৎপরে আমরা কি করিব? আমাদিগকে আবার ত উড়িতে হইবে, আমরা কোন্ পথে কোন্ দিকে উড়িব? দেশের যে হাওয়া বহিয়াছে, সেই হাওয়ার গতি লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে উড়িতে হইবে। প্রবাহের অনুকূলে উড়িলেই সুবিধা; এবং সেই দিকে উড়িলেই আমাদের পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে। কেবল দেখিতে হইবে, হাওয়ার গতিটা কোন্ দিকে? উহা সুপথে না বিপথে? উহার টান একটা আশ্রয়ের দিকে, না কোন অকূল পাথারে আমাদিগকে নিক্ষিপ্ত করিয়া উহা আমাদের বিহঙ্গজীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিবে?

সকল দেশেই এক এক সময়ে এক একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে ঝড় বহে। কোন দেশেই অন্তরিক্ষ চিরকাল প্রশান্ত থাকে না; চির-বসন্ত কোন দেশেই বিরাজ করে না। বৎসরে যেমন ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, মানব সমাজের ইতিহাসে তেমনি যুগের পরিবর্ত্তন ঘটে; এক এক যুগের হাওয়া এক এক দিকে। যুগের যাহা লক্ষণ, যাহাকে যুগধর্ম্ম বলা যায়; হাওয়ার গতি দেখিয়া তাহার নিরূপণ হয়।

আমাদের বাঙ্গলা দেশেও কতবার এইরূপ হাওয়া বহিয়াছে; কতবার কত যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই হাওয়ার বেগে নীয়মান হইয়া দেশের লোকে বিক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। ভাবের পাথারে তখন তরঙ্গ উঠিয়াছে; কখনও বা পাথারের উপর তুফানের সৃষ্টি হইয়াছে। তাৎকালিক সাহিত্যিকেরা সেই হাওয়াতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; সেই তরঙ্গ ঠেলিয়া পাথারের মধ্যে তাঁহারা সাঁতার খেলিয়াছেন।

বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি, সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢলিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্য স্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না।

বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন পণ্যদ্রব্য দেখাইবার আছে কি? ধনপতি সদাগরের ডিঙায় চাপিয়া সিংহল যাত্রার সময়ে যাঁহারা সাত সাগরের জল খাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহিনী তুলিয়া আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাণিজ্যের প্রসার প্রতিপন্ন করিতে পারি; কিংবা প্রতাপাদিত্য দিল্লীপতির সহিত লড়াই করিবার পূর্ব্বে আপন পিতৃব্যের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই প্রমাণে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর বাহুবল প্রতিপন্ন করিতে পারি। কিন্তু তথাপি আমার সংশয় আছে যে প্রাচীন বাঙ্গালীর এই বৈশ্যবৃত্তির বা বীরবৃত্তির উদাহরণ বড়বাজারে অধিক মূল্যে বিকাইবে না। জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্ত্তিকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না।

নাই বা হইলাম! তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙ্গলার পুরুষপরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সেকালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? যাহারা এতদিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।

সে আজ দেড় হাজার বৎসরের কথা, যখন চীনপরিব্রাজক ফা হিয়াং সুহ্মরাজ্যের রাজধানী তাম্রলিপ্তার বন্দর হইতে জাহাজে চড়িয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সাহিত্য তখন জন্মগ্রহণ করে নাই; তখনকার বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা কহিত, তাহাকে বাঙ্গলা ভাষা বলিব কি না, তাহা জানি না। বাঙ্গালী জাতি কিন্তু তখন গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। পুণ্ড্র, চণ্ডাল ও কৈবর্ত্ত তখন বোধ করি বাঙ্গলা দেশ ছাইয়া অবস্থিত ছিল। অনার্য্যের অধিবাস বঙ্গভূমিতে আর্য্যের উপনিবেশ তাহার বহু পূর্ব্বে কোন্ পৌরাণিক যুগে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় কঠিন; রামায়ণে ও মহাভারতে, এমন কি ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে, তাহার স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। নরকাসুরের বংশধর কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে অক্ষৌহিণী চালনা করিয়াছিলেন; পৌণ্ড্রক বাসুদেব যদুপতি বাসুদেবের স্পর্দ্ধা করিতেন; এই সকল নরপতির দেহ মধ্যে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত ছিল কি না জানিবার কোন উপায় নাই। তবে আর্য্য সভ্যতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল। সে কোন্ পুরাতন কালের কথা আমি যে কালের কথা বলিতেছি, তাহা সেকালের তুলনায় একাল। এই একালেই বা বাঙ্গলার অবস্থা কিরূপ ছিল ও বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ ছিল? ভাগীরথী তখনও শতশাখা বিস্তার করিয়া শতমুখে সাগরসঙ্গমে চলিতেন; গঙ্গাস্রোতের অন্তরমধ্যে দিগ্বিজয়ী রাজারা যে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়া যাইতেন, পরবৎসরের গঙ্গাস্রোতে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইত। সোণার বাঙ্গলার ধানের ক্ষেতে শালিধানের চারা এখনকার মতই উৎখাত হইয়া প্রতিরোপিত হইত ও হেমন্তাগমে কৃষকপত্নী রাত্রি জাগিয়া সোণার ফসল রক্ষা করিত, উজ্জয়িনীর মহাকবি তাহার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। সে কালের রাজধানীতে ও নগরমধ্যে নাগরিকেরা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিত, দশকুমারচরিতের বর্ণনার সহিত একালের নাগরিক চরিত মিলাইলে বাঙ্গলাদেশে মানবচরিত্রের এই দেড়হাজার বৎসরে সবিশেষ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উত্তরবঙ্গের কামরূপ ও পুণ্ড্র রাজ্য ফাহিয়াংএর সময়েই প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরও দুই শত বৎসর পরে যখন হুয়েং চাং বাঙ্গলাদেশের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখনও উত্তরবঙ্গের সেই দুই রাজ্য সমৃদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। হুয়েং চ্যাংএর পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই পশ্চিমবঙ্গ আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, গুপ্ত রাজাদের তাম্রশাসন তাহার সাক্ষী। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের পরও তাহার এক

ভগ্নাংশ পশ্চিমবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতেছিল, হুয়েং চ্যাং স্বয়ং তাহার সাক্ষী। এই সভাস্থলের ক্রোশ দুই তিন ব্যবধান মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে রাঙ্গামাটির রক্তমৃত্তিকামধ্যে হুয়েং চ্যাং বর্ণিত সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ হয় ত নিহিত রহিয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তখন আর্য্যাবর্ত্তের চক্রবর্ত্তী পদে আসীন আছেন; গৌড়েশ্বর গুপ্তরাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার হত্যাসাধন করিয়া সেই চক্রবর্ত্তী রাজার ক্রোধানল জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। গুপ্ত নরপতিরা বৈদিক প্রথার প্রবর্ত্তক ছিলেন; তাঁহাদের রাজ্যকালে ব্রাহ্মণ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছিল। কিছু দিন পরেই দেখিতে পাই বেদপন্থী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গের রাজসভায় আহূত হইয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইতেছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের ভিত্তিপত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

তার পরেই পাল রাজাদের অভ্যুদয়। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই একটা নূতন যুগ। তখন দেশ জুড়িয়া একটা নূতন হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরাতন তখন ভাঙিতেছে, উহার ভগ্নশেষের আবর্জ্জনা সেই যুগের হাওয়ায় দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জঞ্জালের মধ্য হইতে মাল মশলা সংগ্রহ করিয়া নূতনের গঠন চলিতেছে। এই যুগটা বস্তুতই অতি আজগুবি যুগ—চারিদিকেই তখন অদ্ভুত রসের বাহুল্য। পাল রাজারা সৌগত শাসন মানিতেন; ব্রাহ্মণ্য তাঁহাদের সময়ে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারিতেছে না। তখন ব্রাহ্মণ্যের সহিত বৌদ্ধ পন্থার দ্বন্দ্ব চলিতেছে; দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা আছে; উভয়ের সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়কে আশ্রয় করিয়া ও উভয়কে বিকৃত করিয়া তান্ত্রিকতা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। নাথ যোগীদের চেলারা তখন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী বুজরুকি দেখাইয়া বেড়াইতেছে। যোগীরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা মাটিতে পা ফেলিয়া চলেন না; তাঁহারা গাছে চড়িয়া আকাশ পথে দেশ ভ্রমণ করেন। বড় বড় বটের গাছ ও তালের গাছ তাঁহাদের এয়ার-শিপের কাজ করে। তাঁহারা মন্ত্র পড়িয়া জলের ছিটা দিবামাত্র মানুষ অবলীলাক্রমে ভেড়া বনিয়া যায়। তখন হাড়ি গুরুর আদেশে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ধর্ম্মঠাকুরের ডোম পুরোহিতের সম্মুখে ব্রাহ্মণ মাথা হেঁট করিয়া চলেন। চণ্ডীদেবী ব্যাধের নিকট পসার জাহির করিয়া পূজা লইবার জন্য ব্যস্ত; চ্যাং মুড়ি বিষহরী চাঁদ সদাগরের সর্ব্বনাশ করিয়া মহাদেবের উপর জয়লাভ করেন।

যে দেশে যে সময়ে ভবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী রাষ্ট্র শাসন করেন, সে দেশে সে সময়ে সকলই সম্ভবপর হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তখন উলূকবাহন ধর্ম্মঠাকুরের তোষামোদ করিতে প্রবৃত্ত হন। চণ্ডীর আদেশে হনুমান ধনপতি সদাগরের ডিঙা ডুবাইবার আয়োজন করেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, সীতাপতি যাঁহার পদরেণু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন, যাঁহার ব্রহ্মবলের নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রতেজ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, যিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনি আপনার প্রাচীন মহিমা ভুলিয়া গিয়া নূতন করিয়া সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় মহাচীন দেশে বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হন, এবং সেই মহামুনির আদেশে মাতলামি ধরিয়া "উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা

পুনঃ পততি ভূতলে" এই উপদেশ মতে বীরভূম জেলায় রামপুরহাটের নিকট তারাপুর গ্রামে তারাপীঠের সম্মুখে গড়াগড়ি দিয়া অবশেষে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

বশিষ্ঠ ঋষির যখন এই অবস্থা, তখন তিনি যে ভাষায় সঙ্কলিত ঋক্‌মন্ত্র দর্শন করিয়া মহর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবভাষা প্রাকৃত ভাষার নিকট অভিভূত হইয়া থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দের নির্ব্বাসনের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে নজীর সংগ্রহের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিক পন্থা প্রবর্ত্তনের জন্য যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদের নামকরণেই এই নজীর মিলিবে। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট নারায়ণের পাঁচপুরুষ পরে যে বংশধরগণ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের নাম আউ আর গাউ; কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের পঞ্চম পুরুষগণের নাম হারো আর নারো; ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীহর্ষের পঞ্চম পুরুষ আবর আর পাবর আর সাবর। সেকালের আদর্শ রাজার নাম লাউ সেন, রাজমহিষীদের নাম উদুনা আর পুদুনা; শ্রেষ্ঠী বণিকের পত্নীদের নাম খুল্লনা আর লহনা। যাঁহারা খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আপনার পুত্রকন্যার নামকরণে এই খাঁটি বাঙ্গলা নামগুলির ব্যবহারের জন্য আমি সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা অগ্রণী হউন; আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিব।

আজ হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাল রাজারা বর্ত্তমান ছিলেন; এবং সে সময়ে দেশের মধ্যে যে হাওয়া বহিয়াছিল, তাহারই প্রবাহে বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ আমরা অনুমান করি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্প্রতি শূন্যপুরাণ নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন; সেই গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় দেখিয়া আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রন্থ মধ্যে উহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ মনে করা যাইতে পারে।

এই মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ঐ গ্রন্থ সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাদিগকে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যে উহা এক নূতন জিনিষ,—কতকটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ গ্রন্থের বয়স কিরূপ নিরূপণ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় উহা অন্ততঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্য তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের বিখ্যাত গ্রন্থকার তোড়রমলের সভায় কৃত্তিবাস, কালিদাস ও কবিকঙ্কণকে এক সঙ্গে উপস্থিত করিয়া সেই ধারণার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যকে অন্ততঃ আরও তিন শত বৎসর পিছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছি। এবং এই শূন্যপুরাণই যে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ, তাহাই বা কিরূপে বলিব। মহীপাল ও যোগীপালের গীত আমা-

দিগকে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যে অধুনা-বিলুপ্ত ছাকন্দপুরাণ বাঙ্গলা দেশে এককালে ভাগবত পুরাণের অপেক্ষা বেশী আদর পাইত, তাহার নামেই বোধ হয়, উহা সংস্কৃত ভাষার বড় ধার ধারিত না। এই শূন্যপুরাণের কত কাল পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে বলিব? ফলে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাল রাজাদের সময়ে ডোমে যখন পৌরোহিত্য করিত ও হাড়িতে যখন গুরুগিরি করিত, ব্রাহ্মণ্য যখন অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া মুখ লুকাইয়াছিল, মহাদেব যখন কোচপাড়ায় ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া কোচবধূদের সহিত রহস্যালাপ করিতেন, এবং লাঙ্গল হাতে জমি চষিতে প্রবৃত্ত হইয়া মশার কামড়ে বিপন্ন হইতেন, ধর্ম্মের গাজনে ঢাকের বাদ্যে পল্লীসমাজ যখন উন্মত্ত হইয়া উঠিত, সেই অদ্ভুত রসের একত্র সমাবেশের সময়ে, বাঙ্গলার শস্যক্ষেত্রের উপর শ্রাবণের বারিধারার বেগ মাথালির উপরে বহন করিয়া, উৎখাত—প্রতিরোপিত ধান্যের হরিদ্বর্ণ চারাগুলি জমিতে গুছাইবার অবকাশে, বাঙ্গলার কৃষকের কণ্ঠে গোপীচাঁদ ও মাণিকচাঁদ, লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যে কীর্ত্তিকথা গীত হইত, তাহা হইতেই আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, আপাততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইতে পারি।

দক্ষিণদেশ হইতে ওষধিনাথবংশীয় সেনরাজারা বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়া হাওয়ার গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বঙ্গের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালের ভ্রষ্টাচার ব্রাহ্মণকে সদাচার শিখাইবার জন্য তৎকালের রাজা ও রাজমন্ত্রী একযোগে দানসাগর ও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব রচনা করিলেন, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকায়স্থকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিলেন, যে জনসঙ্ঘ শাস্ত্রশাসন অবহেলা করিয়া যোগী গুরু ও ডোম পুরোহিতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থান দিলেন। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী দেবভাষায় গ্রথিত হইয়া ভাবুক জনকে নূতন রসের আস্বাদন দিয়া নূতন পথের পথিক করিল। মুসলমান আসিয়া সেনরাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন রাজারা যে নূতন বাতাস বহাইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এই রাষ্ট্রবিপ্লবেও নিবৃত্ত হয় নাই। দণ্ডধারী রাজা যে সমাজসংস্কার ও সমাজ শাসনের কার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, রাজার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইলেও সমাজ সেই কার্য্য স্বয়ং চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। হিন্দুসমাজে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা বন্ধনের পর বন্ধন আঁটিতে লাগিলেন; কুলীনদিগের মেল বন্ধনে ও রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে তাহার পরাকাষ্ঠা ঘটিল। রামায়ণ ও মহাভারতের পুরাণকথা ক্রমশঃ মহীপালকে ও মাণিকচাঁদকে স্থানভ্রষ্ট করিতে লাগিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে সুধাস্রোত বহাইলেন, শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদেরা তাহাতে গৌড়ভূমি ভাসাইয়া দিলেন। এই কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত; ইহার সবিস্তর বর্ণনা অনাবশ্যক।

চৈতন্য দেবের তিরোভাবের পর কয়েক শত বৎসর অতীত হইয়াছে। ঠিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই সভাস্থলের অনতিদূরে বাঙ্গলার ইতিহাসের এক অঙ্কের অভিনয়ে যব-

নিকাপাত হইয়া গিয়াছে। স্বদেশী বা বিদেশী যে সকল অভিনেতা সেই যবনিকাপাত কালে অভিনয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের প্রেতাত্মা এখন কোথায় কি অবস্থায় বিদ্যমান আছেন তাহা বলিতে পারিনা, কিন্তু চিত্রগুপ্তের কোন্ খাতায় তাঁহাদের নাম লেখা আছে, তাহা আমরা কতকটা অনুমান করিতে পারি। পিতৃপুরুষের কর্ম্মের ফলভাগ যদি বংশধরকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে ধ্বজা তুলিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্মুখে রাখিয়া বিধাতার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবার অধিকার আমাদের কিছুতেই থাকে না। যাহাই হউক, বিধাতা কি মনে করিয়া এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একটা নূতন হাওয়া তুলিয়াছেন; এবং সেই হাওয়ার বেগেই নীয়মান হইয়া আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যসেবীরা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে।

যুগে যুগে যুগধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যিনি সম্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার সম্ভব প্রতীক্ষায় যাঁহারা বসিয়া আছেন, একালের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহার আলোচনা না করিলে তাঁহাদের চলিবে না। সুখের বিষয় যে বিধাতৃপ্রেরণায় মানবসমাজে যখন যে হাওয়া বহে, তাহাতেই সেই যুগধর্ম্ম নিরূপিত করিয়া দেয়। আমরা সাহিত্যসেবীরা গর্ব্বের সহিত অনুভব করিতেছি, যে অধুনাতন বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি আমাদের সকলের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন, বিধাতা তাঁহার মুখ দিয়াই একালের যুগধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

শ্যামামায়ের পাগল ছেলে কবি রামপ্রসাদ তাঁহার পাগলী মায়ের চরণতলে আপনার মনপ্রাণ ষোল আনা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। এই আত্মনিবেদন উপলক্ষে তিনি যে গীত গাইয়াছেন, তাহার ধ্বনি আমাদের কাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিন ধরিয়া মরমের তারে ঝঙ্কার দিবে। সেই ঘোররূপা মহারৌদ্রী গলরুধিরচর্চ্চিতা শ্যামাঙ্গিনী জননীর হস্তধৃত করাল খড়্গ রামপ্রসাদের হৃদয়ে কোন রূপ আতঙ্ক জন্মাইত না, তাঁহার রাঙাপায়ের রক্তজবার অভিমুখে তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ থাকিত, এবং তিনি সেই রক্তজবায় দৃষ্টি রাখিয়া তন্ময় হইয়া নিরবধি আনন্দসুধা পান করিতেন। তাঁহার চোখে মায়ের যে মূর্ত্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা অন্যের চোখে হয় নাই।

সাধকভেদে যেমন জননীর মূর্ত্তিভেদ হয়, সেইরূপ দেশভেদে ও কালভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। "বন্দে মাতরম্" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই, এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীরা এই মূর্ত্তি দর্শনের জন্য বাঙ্গালীকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রবাসযাত্রী মধুসূদন দত্ত "সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ," এই চিন্তায় যখন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তখন তিনি ক্ষণেকের জন্য এই শ্যামা জন্মদার প্রতি

অশ্রুসিক্ত লোচনে চাহিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যখন এই জননীকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার ভেরী বাজাইতেন, তখন আমাদের হৃৎপিণ্ড যেমন স্পন্দিত হইত, তেমন আর তাঁহার অন্য কোন আহ্বানে ঘটিত না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরে ঐ পত্রিকায় দশমহাবিদ্যা নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা আপনারা অবগত আছেন। তাঁহার সহচর ও সহবর্ত্তীরা একে একে অন্তর্হিত হইয়াছেন ও হইতেছেন; তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্য এই সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত হইয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি। ঐ প্রবন্ধে তিনি আমাদের জননীর স্বীকৃত মূর্ত্তি সকলের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, জননী আপন হাতে আপন মাথা কাটিয়া ছিন্নমস্তা সাজিয়াছেন; তাঁহার ছিন্নকণ্ঠ হইতে সমুদ্গত শোণিতধারা ডাকিনী যোগিনীতে পান করিতেছে। কোন্ তারিখে কোন্ স্থানে জননী আপন হাতে আপন মাথা ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রবন্ধলেখক খুলিয়া বলেন নাই। মায়ের এখনকার মূর্ত্তি ধূমাবতী—বর্ষীয়সীর দেহ কঙ্কালসার, চক্ষু কোটরগত, পরিধানে ছেঁড়া কাপড়, মাথায় রুক্ষ কেশ, গায়ে ধূলি উড়িতেছে। ভাঙা রথের মাথার উপর কাক ডাকিতেছে।

সেই বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র যখন যুগধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি জননীর মূর্ত্ত্যন্তর দেখিয়াছিলেন; সে মূর্ত্তি মায়ের ষোড়শী মূর্ত্তি—মা যাহা ছিলেন, অথবা কমলা মূর্ত্তি—মা যাহা হইবেন। এই মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তি-বিহ্বল-স্বরে ডাকিয়াছিলেন—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্যসেবী মাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে। প্রত্যেকের পক্ষে চলিবার পথ ভিন্ন হইতে পারে। সাহিত্য-সেবীর মধ্যে কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ জ্ঞান-প্রচারে ব্রতী, কেহ ভক্তি পথের উপদেষ্টা, কেহ কর্ম্মমার্গের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আজিকার দিনে বঙ্গের সাহিত্যসেবীর এক বই দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতে পারে না। যিনি যে কামনা করিয়া

কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে সেই শ্যামাঙ্গিনী জননীর চরণে সেই কর্ম্মফল অর্পণ করিতে হইবে। যিনি যে ফুল আহরণ করিবেন, সে সকল ফুলই সেই রাঙাচরণের রক্তজবার সহিত মিশাইতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, তোয়, যাহা আহরণ করিবেন, তাহা ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানেই অর্পণ করিতে হইবে। "যজ্জুহোসি, যদশ্নাসি, যৎ করোষি, দদাসি যৎ"—ভগবতীর আদেশ—সে সমস্তই সেই এক চরণে অর্পণ করিতে হইবে।

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত থাকিতে পারে। এই সভা-স্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা অনেকেই অনেক উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছেন। কেহ বা এই সাহিত্যসম্মিলনকে বঙ্গের দুঃস্থ সাহিত্যসেবকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিবেন; কেহ বা ইহাকে সাহিত্যিকগণের স্বার্থরক্ষিণীসভায় পরিণত করিতে চাহিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্যের আবর্জ্জনা অপসারণের জন্য সম্মার্জ্জনী হাতে লইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে গ্রাম্য অপভাষা নির্ব্বাসনের জন্য কমিশন বসাইতে অনুরোধ করিবেন। এই সমুদয় উদ্দেশ্যের সহিতই আমার সহানুভূতি আছে। এ সকলই কাজের কথা ও পাকা কথা, তাহা আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যিনি যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে সর্ব্বদা সম্মুখে না রাখিলে চলিবে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও আমরা সকলে মিলিয়া একটা উচ্চ লক্ষ্য, একটা মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি।

বর্ত্তমান কালে দেশে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে দেশের লোককে দল বাঁধিয়া সমবেত শক্তিপ্রয়োগে কোন্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে, তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিবার জন্য আমি চেষ্টা করিয়াছি। যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব। আজ যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আমার অপেক্ষা স্পষ্টতর ভাষায় পুনঃ পুনঃ আপনাদিগকে সেই কর্ম্মের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" এই উদ্দীপনাময় কাতর আহ্বান তাঁহার কণ্ঠ হইতে ইতঃপূর্ব্বে মুহুর্মুহুঃ নিঃসৃত হইয়াছে। "আমরা এসেছি আজ মায়ের ডাকে" বলিয়া তিনি যখন বীণার তারে আঘাত করিয়াছেন, তখন আমাদের শিরায় শিরায় রক্তধারা বেগে বহিয়াছে। "আগে চল্ আগে চল্ ভাই" বলিয়া তিনি যখন আমা-দিগকে পুরোগমনে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন অনেকেরই পঙ্গুচরণ লম্ফ প্রদানের উদ্যোগ করিয়াছে; মরা গাঙে বান দেখিয়া যখন তিনি জয় মা বলে তরী ভাসাইতে বলিয়া-ছেন, তখন তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপিয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে এই সাহিত্যসম্মিলন যদি আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সাহিত্যসম্মিলনের এই দুই দিনের পরিশ্রম নিতান্ত বিফল হইবে না।

কিন্তু আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চ্চনা করিব? আমরা যে

মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্যপানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যে দিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই; আমরা মাকে চিনিতে এ পর্য্যন্ত সম্যক্ চেষ্টাই করি নাই। চিনিবার চেষ্টাই আমাদের বর্ত্তমান কালের অর্চ্চনা। এবং আমরা সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্যসম্মিলন সফল মনে করিব।

আহ্লাদের বিষয়, এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদের বড় সম্ভাবনা নাই। এই সাহিত্যসম্মিলনে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাহিত্যসেবক কর্ত্তৃক যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, জননীর পরিচয় লাভই সে সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রস্তাবগুলি আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত হইলেই আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

একটি কথা আপনাদিগকে নিবেদন করিয়া রাখিতে চাহি যে, আজিকার সভায় যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, সেই সকল প্রস্তাবের অনুযায়ী কাজ ইহার মধ্যেই কিছু কিছু আরব্ধ হইয়াছে। আপনারা বোধ হয় জানেন, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ নামে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভা আজ চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত আছেন। অল্প অর্থবল এবং অল্পতর লোকবল লইয়া সাহিত্যপরিষৎ যতটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্য-পরিষৎ গর্ব্বিত হইতে পারেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টায় সহস্রাধিক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কীটের ও অগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বহুসংখ্যক গ্রন্থকারের নাম ও কীর্ত্তি সাহিত্যপরিষৎ বিস্মৃতির কুক্ষি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কৃত্তিবাস কাশীদাসের মত বিখ্যাত কবিগণ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন পোনের বৎসর পূর্ব্বে লোকের সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না; সাহিত্যপরিষৎ অনেকাংশে সেই অস্পষ্টতা দূর করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের হাতের লেখা পুঁথি আশ্রয় করিয়া তাঁহার চণ্ডী গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গলার পুরাতত্ত্ব ও বাঙ্গলা ভাষার গঠনপ্রণালী সাহিত্য-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

সাহিত্যপরিষদের কৃত কর্ম্মের ফর্দ্দ দিয়া তাহার পক্ষে ওকালতির জন্য আমি আজ আসি নাই, তবে সম্প্রতি সাহিত্যপরিষদের একটি আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পক্ষ হইতে জানাইতে চাহি। সেই আকাঙ্ক্ষাটি অন্যতর প্রস্তাবরূপে আপনাদের সম্মুখে যথাসময়ে উপস্থিত করা হইবে। প্রস্তাবটির গুরুত্ববোধে আমি একটু ভূমিকা করিয়া রাখিব। সাহিত্যপরিষৎ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব। সেই খানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব

ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব।

সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত মুদ্রিত অমুদ্রিত, প্রকাশিত অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতেলেখা প্রাচীন পুঁথি সেই খানে স্তূপাকৃতি হইবে। সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফশল জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত দেখিতে পাইব। গ্রীক ও রোমান হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পর্য্যন্ত যে কোন বৈদেশিক আগন্তুক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংরেজ সরকার বাঙ্গলার ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ও সরকারি সাহায্য ব্যতীত যিনি যাহা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা সেই স্থানে সযত্নে রক্ষিত হইবে।

মন্দিরের অন্তস্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব। চণ্ডীদাস যে বাশুলী দেবতার পূজক ছিলেন, কবিকঙ্কণ স্বপ্নাবেশে চণ্ডীদেবীর যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনার গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস যে ভিটায় বসিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাস যে কেশে পুকুরের নিকট বাস করিতেন, রামপ্রসাদ যে আসনে বসিয়া সাধনা করিতেন, এই সকলের ছায়াচিত্র বা তৈলচিত্র গৃহপ্রাচীর শোভিত করিবে। শ্রীচৈতন্তের হস্তাক্ষরের পার্শ্বে নিত্যানন্দের ছড়ি বিদ্যমান থাকিবে। রামমোহন রায়ের পার্শ্বে হেমচন্দ্রের পাষাণ মূর্ত্তি উপবিষ্ট থাকিবে। বিদ্যাসাগরের পাদুকার নিকটে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী শোভা পাইবে।

আর এক স্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গলার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। পাষাণের উপর বা ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রতিলিপি সুরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানী সমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইবে। বাঙ্গলার যে যে স্থান বিরাট রাজার নামের বা কর্ণসেনের নামের সহিত জড়িত আছে, চাঁদ সদাগরের বা বেহুলা ঠাকুরাণীর স্মৃতির সহিত মিশিয়া আছে, সেই সকল স্থানের চিত্র আমরা সেখানে বসিয়া দেখিতে পাইব। প্রাচীন দুর্গ, দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি দর্শনীয় যেখানে যে কিছু আছে, তাহার চিত্রও আমরা সেইখানে দেখিব। প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর ভাঙা কলসী হইতে পলাশীর লড়াইয়ের গোলা পর্য্যন্ত সংগৃহীত দেখিব।

আর এক স্থানে বাঙ্গলার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্ম্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ও তার্কিক শিরোমণি হইতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও তারানাথ তর্কবাগীশ পর্য্যন্ত

পণ্ডিতগণের বংশলতা ও জীবনচরিত সংগৃহীত হইবে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবে।

বাঙ্গলার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা সেখানে জানিতে পারিব। বাঙ্গলার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের আর প্রয়োজন নাই।

এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি, ও এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃ-প্রতিমা নাম দিতে পারি। সাহিত্য পরিষদের এই আশার কথা ও আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বহু আশা বুকে বাঁধিয়া সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখে স্থাপন করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি, আপনারা ইহার অনুমোদন করিবেন। আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু "অল্পানামপিবস্তূনাং সংহতিঃ" যখন কার্য্যসাধিকা হয়, তখন আপনাদের শক্তিসমষ্টির পক্ষে এই প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা অসাধ্য না হইতেও পারে।

এই মন্দির গঠনে প্রভূত লোকবল ও প্রভূত ধনবল আবশ্যক। বাঙ্গলার সাহিত্য-সেবীরা লোকবল জোগাইতে পারেন; কিন্তু ধনবল তাঁহাদের নাই। ধনবলের জন্য আমা-দিগকে বাঙ্গলার ধনীদিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে। আজিকার দিনে যখন বাঙ্গলার ধনী দরিদ্র সকলেই মায়ের ডাকে সাড়া দিতেছেন, তখন মায়ের কাজের জন্য ভিক্ষাভাণ্ড হাতে লইয়া ধনীর দ্বারস্থ হইলে আমাদিগকে বিমুখ হইতে হইবে না, এই আশা করি। বঙ্গের ধনিগণ ধনের কিয়দংশ এইরূপে মাতৃপূজায় নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের ধনবত্তা সার্থক করুন, এই প্রার্থনা।

যাঁহার উদ্যোগে ও আহ্বানে আমরা আজ এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাশীমবাজার নগরে উপস্থিত হইয়াছি, বলা বাহুল্য এই কার্য্যের সফলতার জন্য মুখ্যতঃ আমাদিগকে তাঁহারই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে। তাঁহার নেতৃত্ব বিনা এই কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই প্রস্তাবে আমি তাঁহার অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের আতিথ্যলাভে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন আজ অতুল আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু সেই আনন্দের অভ্যন্তরে দারুণ ব্যথার চিহ্ন প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। গত বৎসর আমরা আতিথ্যলাভের আনন্দভোগের জন্য আয়োজন করিতেছিলাম; নিষ্ঠুর বিধাতা অকস্মাৎ বজ্র হানিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দভোগে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের দারুণ শোক বঙ্গের সাহিত্য-সেবকেরা বিনাবাক্যে অঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহার সম্যক্ হেতুও বর্ত্তমান ছিল। মহিমচন্দ্রের বিনয়মণ্ডিত মুখশ্রীর সহিত আমার যেরূপ পরিচয় ঘটিয়াছিল, আপনাদের সকলের সেরূপ ঘটে নাই, কিন্তু বঙ্গের এই দুর্দ্দিনে তাহার একটি উজ্জ্বলতম আশার প্রদীপ অকস্মাৎ নিবিয়া গেলে বঙ্গসমাজ যে তমোমলিন হইয়া যাইবে ইহা স্বাভাবিক। সাহিত্যিক সমাজ তখন যে ব্যথা পাইয়াছিলেন, সেই ব্যথার চিহ্ন কথঞ্চিৎ আচ্ছাদিত রাখিয়া আজ

অতিথিরূপে এই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য যিনি আপনার অরুন্তুদ মর্ম্মপীড়া মর্ম্মস্থলে সঙ্গোপন করিয়া বঙ্গের সারস্বত সমাজের অতিথিসৎকারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বোধ করি প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন না করিলে আমাদের ধর্ম্মহানি হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এই আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন যদি এই সময়ে মাতৃমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে মহারাজের সহকারিতা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আশা করি আমাদের এই সময়ের অনুপযোগী ধৃষ্টতা মার্জ্জিত হইবে। হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে আগুন জ্বলিয়া থাকে, তাহার নির্ব্বাপণ মানুষের সাধ্য কি না, তাহা জানি না, তবে পুণ্য কর্ম্মের জাহ্নবীবারি তাহাকে কতকটা শান্ত রাখিতে পারে। এই সারস্বত সম্মিলনের আহ্বানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মহারাজ যে পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শোকবহ্নির উপর শান্তিবারি নিক্ষেপ করিতে পারে। মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকে আমি পুণ্যতম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করি। মহারাজের যদি ইহা অনুমোদিত হয়, এবং তিনি যদি অগ্রণী হইয়া বঙ্গের জনগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, তাহা হইলে মহারাজের নিত্যানুষ্ঠিত সহস্র পুণ্য কর্ম্মের মধ্যে এই পুণ্যতম কর্ম্ম তাঁহার অন্তরের বিয়োগব্যথার অপনোদনে সমর্থ হইবে, ইহাই বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া, আমি আপনাদিগকে সাহিত্যসম্মিলনের কর্ত্তব্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

প্রবন্ধ (৪)

বাঙ্গলা ভাষা

(প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ)

যেখানে মনুষ্যসমাজ আছে, সেইখানেই ভাষা আছে। সেই ভাষা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, অথবা একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সচরাচর পরস্পরের সহিত কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহাকে সাধারণতঃ কথিত, লৌকিক বা চলিত ভাষা বলে। এটী আমাদের আটপৌরে ভাষা—পর্দার আড়ালেই ইহার আদর বেশী। আর ঐ লৌকিক ভাষা সাহিত্যানুশীলনে দেশকালপাত্রাদি ভেদে যথাসম্ভব মার্জ্জিত বা সংস্কৃত হইয়া যে আকার ধারণ করে, তাহার নাম লিখিত বা সাধুভাষা। ইহা আমাদের পোষাকী ভাষা বলিয়া পর্দার বাহিরে সমাদরণীয়। যে জাতির চিন্তাশীলতা যত গভীর, কল্পনাশক্তি যত বিস্তৃত, রুচি যত মার্জ্জিত, সে জাতির ভাষা তত সুন্দর; কিন্তু যে ভাষা যতই সুন্দর হউক না কেন, সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জগতের প্রায় সকল ভাষাই অল্পবিস্তর বিমিশ্র দোষে দুষিত এবং যে ভাষার বিমিশ্র দোষ যত অধিক, তুলনায় সে ভাষা তত আধুনিক। এক সংস্কৃত ভাষা ছাড়া (সংস্কৃত ভাষায়ও "সত", "নেম", "পিক" ইত্যাদি দুই চারিটী বিদেশী শব্দ যে নাই তাহাও নয়, তবে সংখ্যায় বড় অল্প; সুতরাং তাহা গণনীয় নয়) প্রায় সকল ভাষাতেই এই বিমিশ্রদোষ অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে; তাহার কারণ এই যে, সংস্কৃত ভাষা যখন সাহিত্যে প্রকটিত হইয়াছে অর্থাৎ যখন সুপ্রাচীন দেবভাষা "সংস্কৃত" নামে অভিহিত হইয়াছে, তখন অনেক আধুনিক ভাষাই জন্মগ্রহণ করে নাই বা জন্মগ্রহণ করিলেও সংস্কৃতের সংস্রবে আসে নাই। এই সংস্কৃতই সম্ভবতঃ প্রাচীন কালের সাহিত্যিক ভাষা ছিল। সে সময়েও একটা লৌকিক ভাষার প্রচলন ছিল। এই কথিত ভাষার মধ্যেও দেশভেদে অল্পবিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান কালে যেমন বাঙ্গালায় কথিত ভাষার শব্দ ও বাক্‌ছন্দের সহিত সাহিত্যের ভাষা মিশিয়াছে, পাণিনীয় যুগপর্য্যন্ত প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ কথিত ভাষার সহিত ধীরে ধীরে মিশিতেছিল। ক্রমশঃ ইহা হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাকৃত আবার দেশভেদে বিভিন্ন প্রকার।

আমাদের বঙ্গভাষা এই প্রাকৃতসঞ্জাত বলিয়া অনেক প্রাচীন পুঁথিতে আজও বাঙ্গালাকে প্রাকৃত নামে অভিহিত করিতে দেখা যায়। বৌদ্ধযুগে প্রাকৃতের যথেষ্ট আদর ও উৎকর্ষ হইয়াছিল; কিন্তু বৌদ্ধাবনতিতে যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তখন প্রাকৃতোদ্ভূত বাঙ্গলা যতদূর সম্ভব প্রাকৃত শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই সময়কার সংস্কৃত শব্দসম্ভারে স্ফীত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় প্রাকৃত অপেক্ষা সংস্কৃতশব্দসাদৃশ্য সংখ্যায় অধিক; কিন্তু ক্রিয়া ও নিত্যব্যবহার্য্য শব্দ, এইগুলিই ভাষার আদি-বিজ্ঞাপক। বাঙ্গালায় ক্রিয়া ও নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দে প্রাকৃতের সাদৃশ্য এত অধিক যে, ইহাকে প্রাকৃতসম্ভূত বলাই যুক্তিসিদ্ধ। সে যাহা হউক বাঙ্গালা ভাষার মূল সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। তবে যিনি যাহাই বলুন, বাঙ্গলা ভাষাটা যে এখন সমাজে দশের কাছে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার মত একটা হইয়াছে—শুধু তাহা নহে, সাহিত্য-রাজ্যের প্রায় সমুদয় বিভাগেরই শাসনভার গ্রহণ করিতে পারে, এ ক্ষমতাও যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার অনেক পরিমাণে হইয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করেন না। আমরা বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের মধ্য দিয়া প্রাকৃত হইতে সৃষ্ট মনে করি। অবশ্য এ পক্ষপাতিত্বের কৈফিয়ৎ দিতে আমরা অধুনা প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষার ব্যুৎপত্তিবিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে, লিখিত ও কথিত বাঙ্গালায় ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইলে, যাহা সৃষ্ট হইবে তাহারই নাম ব্যাকরণ। এ কার্য্য অভিধানের সাহায্য-ব্যতীত সম্পাদিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-সংখ্যা কত, তাহা আজও পর্য্যন্ত কাহারও জানা নাই। বাঙ্গালা ভাষায় আজকাল যে সমস্ত অভিধান দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি সংস্কৃত ভাষার অভিধানের পদবাচ্য।

আমরা কথাবার্ত্তায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করি, সে সমস্ত শব্দ এ সকল অভিধানে পাওয়া যায় না। যদি কেহ বলেন, এ সকল কথা যখন সকলেই জানে, তখন সেগুলিকে অভিধানে পূরিয়া অভিধানের কলেবর-বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? আমরা বলি কথাটা ঠিক নয়। আমরা সকলে যে সব চলিত কথার অর্থ বুঝি তা নয়। আর যদিও আমরা অনেক চলিত কথার অর্থ নিজে বুঝি, আমার বিশ্বাস সেগুলির প্রকৃত অর্থ কি তাহা স্পষ্ট করিয়া পরিষ্কার করিয়া আমরা বুঝাইতে পারি না।—তাহাদের ঠিক সংজ্ঞা কি, তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তা'ছাড়া একটা ভাবিবার বিষয় এই যে, কোন কোন শব্দ এক জেলায় প্রচলিত, অন্য জেলায় তাহার প্রয়োগ একেবারেই নাই; আর যদি বা ব্যবহার থাকে তো তাহার অর্থ ভিন্ন রকমের। এরূপ অনেক শব্দ প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গীভূত—বর্ত্তমান নাটক উপন্যাসাদিতেও ইহাদের স্থান হইয়াছে। বিশেষতঃ, এক জেলার লোক অন্য জেলার সকল লোকের কথা বুঝিতে পারে না। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটা উপায় স্থির করা নিতান্তই আবশ্যক।

এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি এক জেলায় দুষ্ট, অশিষ্ট, অশ্লীল, কিন্তু অন্য জেলায় শিষ্ট, শ্লীল। বিভিন্ন জেলার ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তায় অনেক সময় এই সকল কথা লইয়া মহা

অপ্রস্তুত হইতে হয়। এরূপ শব্দেরও অর্থ, ব্যবহার প্রভৃতি নির্ণয় করিবার একটা সহজ উপায় আবশ্যক।

বাঙ্গালায় সমার্থবোধক শব্দের অভাব নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য এপর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই দেখা যায় নাই। অবশ্য যাঁহারা গুণী সমঝদার, তাঁহারা এ সমস্ত শব্দের অপব্যবহার করেন না সত্য; কিন্তু সাধারণ লোকে তাহাদের যথাযথ অর্থ ও প্রয়োগ ঠিক করিবে কি করিয়া? যাহার সাহায্যে এই বঙ্গভাষায় প্রচলিত সমার্থবোধক শব্দের সহজেই একটা কিনারা হয় তাহার চেষ্টা হওয়া কি অসম্ভব?

সূক্ষ্মতর পার্থক্যবোধক অনেক শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। সেগুলি একত্রিত করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "ছোরা, ছুরী, দা, কাস্তে, ছেন, চাকু, খাঁড়া, রাম-দা" ইত্যাদি কথাগুলি লউন; কিংবা "ডালা, ডুলা, ডালী, ঠোঙা, টুক্‌রী, ধামা, ধামী, ঝাঁকা, ঝাঁকী" এই কথাগুলি লউন। এগুলির মধ্যে কোনটী নিষ্প্রয়োজন শব্দ নাই। নিষ্প্রয়োজন শব্দ ভাষায় স্থান পায় না, আর প্রয়োজন হইলেই ভাষার নূতন শব্দ গঠনেও বিলম্ব হয় না। এটী ভাষার সার্ব্বভৌমিক সনাতন শক্তি। এ সব শব্দের অর্থ সকলে বুঝিতে পারে না; আর সকল স্থানে ইহাদের নামও সমান নয়। যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে বিষয়ের আলোচনা অধিক, সেই শ্রেণীর মধ্যে সেই বিষয়ক শব্দ তত বেশী পাওয়া যায়। চাষার নিকট চাষের শব্দ, তাঁতির নিকট তাঁত ও সুতার শব্দ, মৎস্যজীবী, পণ্যব্যবসায়ী, সাপুড়িয়া, পাখীধরা প্রভৃতির নিকট স্ব স্ব ব্যবসায়ের শব্দ পাওয়া যায়। ছুতার কাষ্ঠ ও কাষ্ঠ-কার্য্যের শব্দের ফর্দ্দ দিবে। বেণে ও কবিরাজের নিকট গাছ গাছড়ার নামের তালিকা পাইবে। যেখানে খনি দেখিবে, পাহাড় দেখিবে, জিজ্ঞাসা করিলে সেখানে খনি ও পাহাড় সম্বন্ধীয় কত শব্দই পাইবে। আর কত নাম করিব? কিন্তু এগুলির অর্থ, ইহাদের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা কে বলিয়া দিবে? অবশ্য বিশেষজ্ঞরা জানেন বা পারেন; কিন্তু সকলেই ত আর বিশেষজ্ঞ নয়। সাধারণে তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? একখানি প্রাদেশিক শব্দের অভিধান সঙ্কলিত হইলে কি এ সকলের জ্ঞান বিস্তৃত হইবে না? ভাষারও কি ইহাতে উপকার হইবে না?

তারপর বাঙ্গালায় "দেশজ" নামক এক অদ্ভুত শ্রেণীর শব্দ আছে। বর্ত্তমান অভিধানগুলিতে কেবল খাঁটি সংস্কৃত শব্দগুলিরই প্রকৃতি প্রত্যয়াদি দেওয়া হইয়াছে। বাকী যে মুষ্টিমেয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শব্দগুলিকে অভিধানকার তাঁহাদের অভিধানে দয়া করিয়া স্থান দিয়াছেন, সেগুলির বংশপরিচয়ে যখন তাঁহারা গোলমাল বুঝিলেন, তখনি সেগুলিকে "দেশজ", "যাবনিক" ইত্যাকার উপাধিভূষিত করিলেন। বাঙ্গালার অভিধানে সকল কথার ব্যুৎপত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে চলিত কথাও ভাল ভাল গ্রন্থ হইতে উপযুক্ত উদাহরণ দেওয়া চাই। বাঙ্গালাভাষার শব্দের দশভাগ খাঁটি সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। আপাততঃ, খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন দেখি না। তবে কোন্ শব্দটী কোন্ প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন তাহা স্থির করিতে হইবে। বাঙ্গালাভাষার আর বাকী ছয় ভাগ পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় ভাষার

শব্দ হইতে জাত। কতক শব্দের জন্য হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, তেলেগু, তামিল ভাষার শরণ লইয়া তাহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইবে। বঙ্গদেশ অনেকদিন মুসলমানদিগের অধীনে ও সংস্রবে থাকিয়া বাঙ্গালায় অনেক পারসী, আরবী ও তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত শব্দেরও যথাযথ ব্যুৎপত্তি স্থির করিতে হইবে। আবার বাঙ্গালাভাষার সংস্কৃত, পারসী ইত্যাদি ভাষার এমন অনেক শব্দ আছে, যেগুলি সেই সেই ভাষার আদি অর্থ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; যেমন, অধিবাস—বরাবর ইত্যাদি। এগুলি কেমন করিয়া কি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান অর্থ প্রকাশ করিতেছে, তাহা-অর্থ পরিবর্ত্তনের ক্রম বা ধারা ধরিয়া বাহির করিতে হইবে। নবাবী আমলের অন্তিম দশায় পর্ত্তুগীজ, মগ, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বিজাতীয়গণের কোন কোন শব্দ বাঙ্গালায় স্থান পাইয়াছে। অনেক ইংরাজি শব্দও বাঙ্গালায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। এ সমস্ত ভাষা সমুদ্ভূত শব্দেরও ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পূর্ব্বপ্রচলিত শব্দ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন বশতঃ ভাষা হইতে লোপ পাইতেছে, ইতিহাসের জন্য সেগুলিও এই অভিধানে স্থান পাইবে। এতটা উন্নতির মুখে আসিয়া আমরা বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়, শব্দোচ্চারণের ন্যায়সঙ্গত সামঞ্জস্য, খাঁটি ব্যাকরণ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত নহি। অবশ্য আমাদের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর শিক্ষিত ভাষানুরাগী ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে হইবে না। বাঙ্গালার যাবতীয় প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া, তৎসমুদয়ের অর্থ, দৃষ্টান্ত, ব্যবহার ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয়পূর্ব্বক একখানি প্রকাণ্ড অভিধান সঙ্কলনের যে বিশেষ প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ কি? অন্যান্য সাহিত্যিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার এরূপ একটা কার্য্য যদি করিতে না পারিলাম, তবে ভাষার জন্য করিলাম কি? আমরা আজকাল "বাঙ্গালা কিরূপ হওয়া উচিত" ইত্যাদি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ক ব্যাপার লইয়া আলোচনা বড়ই প্রীতিকর, হিতকর বলিয়া মনে করি; কিন্তু, ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইবে কি সংস্কৃতাপসারিণী হইবে, অথবা সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয়ের সামঞ্জস্য-বিধান করিবে, শব্দানুশীলন শেষ হইবার পূর্ব্বে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক। সাহিত্যের ভাষা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া চলিবে? এ প্রশ্নের উত্তর সময় তো কার্য্যতঃ মীমাংসাই করিয়া দিয়াছে—দিতেছে—ভবিষ্যতেও দিবে। তবে, এ কথা লইয়া এত বাগ্বিতণ্ডা কেন? আমরা বলি, নানা স্থান হইতে প্রাদেশিক শব্দ সংগৃহীত হউক; তাহা হইলে এক খানি বৃহৎ প্রাদেশিক অভিধান সঙ্কলিত হইতে পারিবে। তবে এই প্রাদেশিক অভিধান সঙ্কলনের কার্য্য অল্পজনের বা অল্পদিনের কাজ নয়। বিলাতে যেমন Oxford dictionary বহুজনের সমবেত চেষ্টায় প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, আমাদেরও এ চেষ্টা সেইরূপ অনেক লোকের সাহায্যে সফল হইতে পারে। আমার বিবেচনায় এই কার্য্যের জন্য এইরূপ একটা বিধান করিলেই চলিতে পারে—একজন সম্পাদকের হস্তে এই বিষয়ের ভার দিয়া তাঁহাকে অভিধানের প্রয়োজনমত কয়েকজন সহকারী সম্পাদক দিলেই এ কার্য্য চলিতে পারে; কিন্তু, সর্ব্বাগ্রে শব্দ ও উদাহরণ-

সংগ্রহ, শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ, উচ্চারণ প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্য শত শত লোকের সাহায্য আবশ্যক। বিভিন্ন ভাষাসম্ভূত শব্দের জন্য যাঁহারা নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও এই বিষয়ের জন্য নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতে হইবে। সম্পাদকগণ বৈষ্ণব-সাহিত্য, প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য, কুলজী, পুঁথি, প্রাচীন দলিল প্রভৃতি হইতে অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শব্দসংগ্রহে নিযুক্ত থাকিবেন। এইরূপে বা অন্য কোন সহজ উপায়ে বঙ্গভাষার একখানি অভিধান সঙ্কলিত হউক। তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভাষার যথেষ্ট কার্য্য করা হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এইরূপ শব্দসংগ্রহে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। পরিষদের যত্নে ও চেষ্টায় কয়েকটী জেলার অনেক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাই পরিষদের উদ্দেশ্য, কার্য্য ও কর্ত্তব্য। সাধারণে পরিষদের এ সদনুষ্ঠানের সহায় হইলে, বঙ্গভাষার মুখ উজ্জ্বল হইবে সন্দেহ নাই। আজকালকার মুদ্রিত অভিধানের সংখ্যা আটত্রিশ। সে গুলিতে চলিত শব্দ বড় একটা দেখা যায় না; কিন্তু, অনেক পুরাণো অভিধানে বিস্তর প্রাদেশিক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলিও প্রধানতঃ একদেশের এবং যথেষ্টও নহে। তবে সে অভিধানগুলির দ্বারাও এ কার্য্যের অনেক সাহায্য হইবে। অভিধানগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করিলাম। আশা করি তৎসমুদয় হইতেও সংগ্রহকারীর সংগ্রহকার্য্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারিবে।

1. Forster, H. P.—Vocabulary, English aud Bengalee and Bengalee and English.—2 vols, Calcutta, 1799—1802.

2. Ram Kissen Sen,—Vocabulary, English—Latin Bengali (Bengalee in Roman characters) Calcutta. 1821.

3. Carey, W.—A Dictionary of the Bengalee language, in which words are traced to their origin and their various meanings given. 2 vols, Serampore, 1825, 2nd Edition 1840.

4. Chukraburtee, T.—A Dictionary in Bengali—English, Calcutta, 1827.

5. Morton,—Bengali—English dictionary, Calcutta, 1828.

6. Haughton, Sir G. C.—A Dictionary, Bengali and Sanskrit, explained in English.—London, 1833.

7. Ram Komul Sen,—A Dictionary in English and Bengali. 2 vols, Serampore, 1834.

8. D' Rozaris, P. S.,—A Dictionary of the principal languages spoken in the Bengal Presidency, viz English. Bengali, Hindusthani, Calcutta, 1837.

9. Annon,—A Dictionary in English, Bengali and Manipuri—Calcutta, 1837.

10. Brown, N.,—A Bengali Vocabulary in J. A. S. B. vol VI. 1837.

11. Mendies,—A Dictionary Bengali and English, 1851.

12. Addy, N. C.,—English—Bengali Dictionary. Calcutta 1854.

13. Robinson. J.,—Dictionary of Law and other terms commonly employed in the Courts of Bengal. English and Bengali. Calcutta, 1860.

আমি আজ দশ বৎসর ধরিয়া প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ণনানুসারে প্রায় ৪২,০০০ প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। তন্মধ্যে প্রায় ২০০০ শব্দের ব্যুৎপত্তি যথাশক্তি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার বিনীত নিবেদন এই, যদি এই অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ দ্বারা অভিধান সঙ্কলনের একটুও সাহায্য হয়, তাহা হইলে আমি তাহা সানন্দচিত্তে এ কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইব।

এই তো গেল অভিধান। তারপর ব্যাকরণের কথা। আজকাল বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে অন্যূন ৪০০ খানি পুস্তক প্রকাশিত আছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন খানিকেই বাঙ্গালা ব্যাকরণ নাম দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। সে গুলি প্রকৃতই সংস্কৃত ব্যাকরণ। সংস্কৃতের নিকট যে যে বিষয়ের জন্য বাঙ্গালাভাষা ঋণী; ঐ ব্যাকরণগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের সেই সেই বিষয়ের আংশিক অনুবাদ মাত্র। এ সকল পরিচ্ছেদের জন্য যদি ব্যাকরণ পড়া দরকার হয়, তাহা হইলে মূল সংস্কৃত ব্যাকরণ বা তাহার বঙ্গানুবাদ পড়াইলেই চলিতে পারে। খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ এখনও লিখিত হয় নাই—লিখিবার সময়ও আসে নাই। আমাদের প্রচলিত ব্যাকরণ গুলিতে খাঁটি বাঙ্গালা অংশের কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। শব্দ, পদ ও বাক্য কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গঠিত হইয়াছে; সেই নিয়মগুলি বাহির করাই ব্যাকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিতেছি না, তবে তাহাতে শুধু সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিচ্ছদগুলির বিবরণ কেন? তবে বাঙ্গালার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা, তাহার আলোচনা যে ব্যাকরণে থাকিবে না তাহা বলিতেছি না। সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত যত শব্দ আছে, তাহাদিগকে বৈয়াকরণিক প্রথায় কি রূপে সাধিতে পারা যায়, বাঙ্গালা ব্যাকরণ আদৌ সেই চেষ্টা করিবে; কিন্তু, অভিধানের সাহায্য ব্যতীত এরূপ শব্দাদিসাধন অসম্ভব। অভিধান সঙ্কলিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বৃথা। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত শব্দ ও বাক্‌ছন্দের নিয়ম পূর্ব্বে আবিষ্কার হওয়া দরকার, তবে বাঙ্গালা শব্দ ও বাক্‌ছন্দের সাধারণ নিয়ম বাহির হইতে পারে। ভাষা আদৌ, পশ্চাৎ ব্যাকরণ। ভাষা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে। কোন্ জেলায় কি ভাবে বাঙ্গালা ভাষা সেই নিয়মের বশবর্ত্তী, আমাদিগকে তাহা পরিশ্রম সহকারে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে করুন, আমরা "অক্কি" এই লৌকিক শব্দটি লইলাম। দেখা গেল, এ শব্দটি সংস্কৃত 'ঐক্য' শব্দের অপভ্রংশ; দেখা যাক্, এ রূপ অপভ্রংশ হইল কেমন করিয়া। ধরুন, বাঙ্গালায় শব্দের শেষে "য"-ফলা থাকিলে তাহার স্থানে "ই" হয় এবং অসংযুক্ত শেষ বর্ণটীর দ্বিত্ব হয়। এইরূপ শব্দের আদিতে 'ঐ'কার থাকিলে 'ঐ'-স্থানে 'অ' হয়। যথা, বাক্য—বাক্কি; নস্য—নস্সি; দৈত্য—দত্তি; বৈদ্য—বদ্দি; মুখ্য—মুখ্‌খি; দিব্য—দিব্বি; পুণ্য—পুন্নি ইত্যাদি; কিন্তু এ নিয়ম

কি সকল স্থানে খাটে? দেখা গেল, দন্ত—দন্তে, জন্য—জন্যে হয়। এখানে দন্নি, জন্নি হইল না। আচ্ছা তবে নিয়ম হউক, কয়েকটী শব্দের শেষে 'ই'কার না হইয়া 'এ'কার হইয়া থাকে আর ইহাদের "য"-ফলার লোপ ও শেষ ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয় না। আর একটু তলাইয়া দেখা গেল 'পোষ্য'র স্থানে 'পোষ্‌ষি' না হইয়া পুষ্‌ষি হয়, ঐ রূপ ভোজ্য—ভুজ্জি। নিয়ম আরও একটু গড়াইল। শেষ দেখা গেল কয়েকটা 'য'ফলান্ত শব্দের আদৌ অপভ্রংশ নাই—গদ্য, সদ্য, পদ্য, মদ্য, অদ্য—ইহারা য-ফলা ছাড়িতেই চায় না। দেশভেদে এ নিয়মকেও সার্ব্বভৌম বলা যায় না। এ রূপ কেন হয়? এ সব নিয়ম কি তবে ভুল? আবার কলিকাতা অঞ্চলের ব্যবহৃত এই শব্দ অন্য জেলায় কি আকার ধারণ করে? যদি এ শব্দ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ সংস্কৃত য-ফলান্ত শব্দ কিরূপে অপভ্রষ্ট হয়? ইত্যাদি প্রশ্ন স্থাপন করিয়া বাঙ্গালার শব্দতত্ত্ব স্থির করিতে হইবে। শেষে ব্যাকরণের এক একটী বিষয়ের জন্য সাধারণ সূত্রাদি গঠিত হইবে। এ কাজ বহুকাল সাধ্য। অভিধান না হইলে ইহাতে হাতই দেওয়া যাইতে পারে না। তবে আপাততঃ, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রচলিত সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যুৎপত্তি হিসাবে একটা বৈয়াকরণিক চেষ্টা মাত্র করা যাইতে পারে। তবে ইহাও বড় সহজ-সাধ্য হইবে না।

যাহা হউক, ফলকথা এই দাঁড়াইতেছে—যতদিন বাঙ্গালা ভাষার সমস্ত প্রদেশের শব্দ সংগৃহীত না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্ণাবয়বে পাওয়া যাইবে না। আমাদের প্রস্তাবিত অভিধান, শব্দের সীমা-নির্দ্দেশ-বিষয়ে সাহায্য করিবে। একার্য্য সুসম্পন্ন হইলে বঙ্গভাষার শরীরকে আমরা ব্যবচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশের নিঃসংশয়িত রূপে পরীক্ষা করিয়া ভাষার ধাতু, অস্থি, মজ্জা, শোণিত, প্রকৃতি বিনির্ণয়ে সমর্থ হইব। এই বৈজ্ঞানিক অংশটুকু ব্যাকরণের দ্বারাই সংসাধিত হইবে; সুতরাং, প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার সাহিত্যে বর্জ্জন না করিলে, ভাষার গাম্ভীর্য্য থাকিবে কিনা, সকলের পক্ষে তাহা সুগম হইবে কিনা, এখন এরূপ তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন লাভ দেখি না। তর্ক করিবারও কোন ভিত্তি বা প্রয়োজন নাই। আধুনিক বঙ্গভাষার ন্যায় নমনীয় পরিবর্দ্ধনশীল ভাষাকে বন্ধনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ করিলে, ইহার উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। ছুটা বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক প্রাদেশিক পরিভাষা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিলে, সাহিত্যের শব্দসম্পত্তি বাড়িবে কিনা সে বিচার করিবার সময় আমাদের এখনও হয় নাই। এখন ধীরভাবে সাময়িক সাহিত্যের প্রকৃত গতি লক্ষ্য করিয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। সাহিত্যে যে সমস্ত শব্দ অনাবশ্যক হইবে, তাহারা কোন আইনকানুন মানিয়া চলিবে না। সেগুলি আপনা আপনি ঝরিয়া পড়িবে। আর যদি সে গুলি সাহিত্যে স্থান পাইয়া টিকে, বুঝিতে হইবে সে গুলি অপ্রয়োজনীয় শব্দ নয়। আপনি আমি সহস্র বাধা দিলেও সে শব্দগুলি সাহিত্যে থাকিয়াই যাইবে।

প্রবন্ধ (৫)

মুর্শিদাবাদের প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য

(প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল)

পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর সলিলবিধৌত হইয়া মুর্শিদাবাদ প্রদেশ বহু প্রাচীনকাল হইতে অতীতের নানাবিধ রহস্যময় ও বিস্ময়কর ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। শ্মশানক্ষেত্রের ভস্মস্তূপের ন্যায় ভাগীরথীর উভয় তীরে মুর্শিদাবাদের প্রাচীন গৌরবের ভগ্নস্তূপগুলি সর্ব্বধ্বংসকর কালের অশনি-নিক্ষেপ সহ্য করিয়া আজিও আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান, মোগল এবং ব্রিটিশ রাজত্বকালের অনেক পুরাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য ইহার পুরাতনী স্মৃতির সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার বক্ষে অনেক নব নব লীলার অভিনয় সংঘটিত হইয়াছিল। সেই সময়ে বঙ্গরাজলক্ষ্মী মুর্শিদাবাদে আপনার সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানীরূপে বিরাজ করিয়া মুর্শিদাবাদ অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার রঙ্গভূমি হইয়া উঠে। কাজেই সে সময়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বলিলে সমগ্র বঙ্গরাজ্যেরই ইতিবৃত্ত বলিয়া বুঝিতে হয়। তাই জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—"The history of Murshidabad city is the history of Bengal during the eighteenth century." এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা হইতে মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। পলাশীর বিশাল প্রান্তরে মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত নিশান ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলে বঙ্গরাজলক্ষ্মী মুর্শিদাবাদের সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিতা হন। এই জন্য বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধকাল হইতে ব্রিটিশ রাজত্ব পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদে অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অদ্যাপি মুর্শিদাবাদে তাহাদের নিদর্শনের অভাব নাই। তান্ত্রিক, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক চিহ্ন মুর্শিদাবাদ প্রদেশে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের রাজত্ব, বৌদ্ধভিক্ষুগণের সঙ্ঘারাম,

তান্ত্রিক দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতির নিদর্শন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইখানে সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হইতে মুসলমান ও ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিউয়েনসিয়াংবর্ণিত কর্ণসুবর্ণ প্রদেশ এই মুর্শিদাবাদেই অবস্থিত, আর ইউরোপীয় পর্য্যটকগণবর্ণিত বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর কাশীমবাজারে আজ আমরা উপস্থিত। আমরা যে স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি, সেই ঐতিহাসিক ভবনের সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে চারিদিকেই ঐতিহাসিক চিহ্ন বিদ্যমান। আমাদের পশ্চাতে যে প্রস্তরখচিত বিশালগৃহ দৃষ্ট হইতেছে, উহা বারাণসীর চেৎসিংহের ভবন হইতে আনীত। সম্মুখে ইংরেজ রেসিডেন্সী ও সমাধিক্ষেত্র। তাহার সম্মুখে প্রাচীন গঙ্গার পরপারে বাঙ্গলার রাজস্বমন্ত্রী সন্ন্যাসব্রতধারী, রায়রায়ান চায়েন রায়ের আবাসস্থান সন্ন্যাসীডাঙ্গা। বাম পার্শ্বে চেতসিংহের নিকট হইতে আনীত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, ইংরেজ কুঠীর স্থান ও ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্র। দক্ষিণে—প্রাচীন জৈন দেবালয় নেমিনাথের মন্দির। এইরূপ মুর্শিদাবাদের অনেক স্থানে ঐতিহাসিক চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদের সহিত গৌড়াধিপ হোসেন সাহের স্মৃতি বিজড়িত আছে, মানসিংহ ও ওসমানের সহিতও ইহার সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় বণিক্ ইহাতে অনেক লীলার অবতারণা করিয়াছিল। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণকের ও ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত ইহার সম্বন্ধ বাঙ্গলার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার রাজধানী হইয়া ইহাতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার নূতন পরিচয় এ স্থলে প্রদান করা অনাবশ্যক। সর্ব্বশেষে যে সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিশিখা সমগ্র উত্তর ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, মুর্শিদাবাদেই তাহার প্রথম স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। সুতরাং প্রাচীন কাল হইতে ব্রিটিশ রাজত্ব পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদে যে কত রহস্যময় ও বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য ইহার পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদানের চেষ্টা করিতেছি।

মুর্শিদাবাদের পুরাতত্ত্বের বিবরণ প্রদানের পূর্ব্বে ভাগীরথীর অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কারণ ভাগীরথীর পরিবর্ত্তনে প্রাচীন মুর্শিদাবাদেরও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, গঙ্গা হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থান অতিক্রমের পর মুর্শিদাবাদের নিকট হইতে পদ্মা নাম ধারণ করেন এবং ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। ভাগীরথী তাহার একটি শাখা মাত্র। অর্থাৎ পদ্মাই প্রধান প্রবাহ, ভাগীরথী তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এক্ষণে যাহা ভাগীরথী নামে অভিহিত তাহাই পূর্ব্বে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ছিল। ক্রমে উক্ত প্রবাহ পূর্ব্ব মুখে সরিয়া পদ্মাকে প্রধান প্রবাহ করিয়া তুলিয়াছে। এক্ষণে যে স্থানে পদ্মা অবস্থিত, তাহা পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল, পরে তথায় দ্বীপসৃজন আরব্ধ হইয়া

ক্রমে বর্ত্তমান পদ্মার উৎপত্তি হয়। রামায়ণের সময় ব্রহ্মপুত্রই পদ্মার স্থান অধিকার করিয়াছিল। রামায়ণের লিখিত গঙ্গা যে সপ্তধারে প্রবাহিত হন, তাহার তিন স্রোত পূর্ব্ব দিকে হ্লাদিনী, পাবণী ও নলিনী নামে ও তিনস্রোত পশ্চিম দিকে সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু নামে প্রবাহিত হয়। অবশিষ্ট আর একটি স্রোত মধ্যভাগে ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রে পতিত হয়। এই স্রোতই গঙ্গা বা ভাগীরথী। রামায়ণে ভাগীরথী ও নলিনী দুইটি বিভিন্ন প্রবাহ বা নদী, নলিনী পদ্মার নামান্তরমাত্র এবং তাহা পূর্ব্বদিকের শেষ ভাগেই অবস্থিত। কাজেই আমরা ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা উভয়কে, নলিনী বলিয়া অনুমান করিতেছি। পাবণীর পরিবর্ত্তন হইয়া অন্য আকার হইয়াছে, কিন্তু পাবনা প্রদেশ তাহার প্রাচীন নামের স্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। হ্লাদিনী সম্ভবতঃ নন্দা বা মহানন্দা হইবে, উভয়ের নাম একই। গঙ্গা বা ভাগীরথী ও পদ্মা যে বিভিন্ন নদী, তাহা দেবীভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি হইতেও জানা যায়। কাজেই এই ভাগীরথী প্রবাহ যে গঙ্গার প্রাচীন প্রধান প্রবাহ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন প্রবাদানুসারে ইহার জলই প্রকৃত গঙ্গাজল বলিয়া ব্যবহৃত হয়, পদ্মার জল কেহ গঙ্গাজল বলিয়া ব্যবহার করেন না। তদ্ভিন্ন ইহার পশ্চিমতীরস্থ ভূমির মৃত্তিকা ও তাহাতে প্রধান প্রধান নগরের অবস্থান, ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব বলিতেছেন—"There can hardly be a doubt that the present Bhagirathi represents the old channel of the Ganges, by which the greater part of the waters of the sacred river were formerly brought down to the sea. The most ancient tradition, the traces of ruined cities, and the indelible record of names, all lead to this conclusion."

আরও দুই একজন ইউরোপীয় লেখক এই রূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগীরথী গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ হইলেও বর্ত্তমান সময়ে তাহা যেখানে সমুদ্রসঙ্গতা হইয়াছে, প্রাচীনকালে তাহা ততদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ নিম্নবঙ্গের অনেক স্থল প্রথমে দ্বীপাকারে উৎপন্ন হইয়া, পরে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রামায়ণের সময় ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ প্রদেশ পর্য্যন্তই প্রবাহিত ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অনেক প্রাচীন স্থানের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বতীরের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহাতে কোন প্রাচীন চিহ্ন পাইবার উপায় নাই। ঐতিহাসিক যুগ হইতে ভাগীরথী প্রায় এইরূপ আকারেই অবস্থিত আছেন। ইহার তীরবর্ত্তী দুই প্রধান বন্দরের নামানুসারে ইউরোপীয়গণ ইহাকে কাশীমবাজার নদী ও হুগলী নদী নামে অভিহিত করিতেন। ভাগীরথীর মোহানা হইতে তাহার সহিত জলঙ্গীর মিলন পর্য্যন্ত অংশের নাম কাশীমবাজার নদী ও তাহার পর হইতে ভাগীরথী হুগলী নদী নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে সমস্ত

ভাগীরথীই হুগলী নদী নামে কথিত হইয়া থাকে। ভাগীরথী, জলঙ্গী ও পদ্মা এই তিন নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে ইউরোপীয়গণ কাশীমবাজার দ্বীপনামে অভিহিত করিতেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই প্রাচীনকালের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পশ্চিম তীরই রাঢ় প্রদেশের অন্তর্গত। পূর্ব্ব ভাগ হইতে বাগড়ী আরম্ভ হইয়াছে। রাঢ়, বাগড়ী প্রভৃতি বিভাগ বল্লাল সেনদেব কর্ত্তৃক হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে রাঢ়ের নাম কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্দসরের শিলালিপি, সিংহলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে, তিরুমলয়ের শিলালিপিতে বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত লাড় বা লাঢ়ের উল্লেখ আছে। উহা যে রাঢ় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত রাঢ়াপুরীর উল্লেখ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীক পর্য্যটক মেগাস্থিনিস লিখিত গ্যাঙ্গারিডাইকে গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাঢ়ী অনুমান করিয়া তাহা হইতে রাঢ়ের উৎপত্তি বলিয়াছেন। কিন্তু গ্যাঙ্গারিডাই জনপদের নামকরণ যে উক্ত নামের একটি প্রসিদ্ধ নগর হইতে হইয়াছিল আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। এই রাঢ় প্রদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান কালের যে কত চিহ্ন বিদ্যমান আছে উহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদি কেহ রাঢ়ের পুরাতত্ত্বসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, ইহাতে কত ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদ প্রদেশের অন্তর্গত রাঢ়েও সেইরূপ চিহ্নের অভাব নাই। আমরা নিম্নে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি।

মুর্শিদাবাদের মধ্যে কিরীটেশ্বরী একটি প্রাচীন স্থান। সহর মুর্শিদাবাদের পর পার ডাহাপাড়া হইতে প্রায় সার্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে কিরীটেশ্বরী অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম কিরীটকণা, কিন্তু ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিরীটেশ্বরীর নামানুসারে এই স্থানও কিরীটেশ্বরী নামে অভিহিত হয়। কিরীটেশ্বরী একটি পীঠ স্থান, এখানে সতীদেবীর কিরীট পতিত হইয়াছিল। তন্ত্রচূড়ামণি, মহানীল তন্ত্র প্রভৃতিতে কিরীটেশ্বরীর উল্লেখ আছে। তন্ত্রচূড়ামণিতে কিরীটে কিরীটপাতের কথা আছে, কিন্তু তাহার মতে দেবীর নাম বিমলা ও ভৈরবের নাম সম্বর্ত্ত। মহানীল তন্ত্রে দেবী কিরীটেশ্বরী নামেই উল্লিখিত আছেন। কোন্ সময় হইতে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবার হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র মিলিয়া নূতন তান্ত্রিক মতেরও প্রচলন হইয়াছিল। ইহার প্রকৃত ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করা যায় না। তবে বৌদ্ধবিপ্লবের পর আমরা দেখিতে পাই যে, শঙ্করাচার্য্য হইতে বৈদিক মতের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক মতেরও প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ তিনিই আধুনিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রচিত মঠাম্নায় নামক গ্রন্থে তাঁহার স্থাপিত মঠচতুষ্টয়ে তন্ত্রের পীঠমালানুরূপ দেবদেবীর উল্লেখ আছে। কোন্ সময়ে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা লইয়া নানা মত প্রচলিত আছে। আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক তান্ত্রিক মতের প্রচলন আরব্ধ হইলেও আমরা দেখিতে

পাই যে, গুপ্ত রাজবংশীয়গণ শক্তি-উপাসক ছিলেন, তাঁহাদের মুদ্রাদি হইতে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। সেই গুপ্তরাজগণের একটি শাখা মুর্শিদাবাদ প্রদেশের কর্ণ-সুবর্ণে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের সময় কিরীটেশ্বরীর প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহার পর মোগলরাজত্বকালে বঙ্গাধিকারিগণের সময়ে কিরীটেশ্বরী শ্রীশালিনী হইয়া উঠে। বঙ্গাধিকারিগণের আদিপুরুষ ভগবান রায় হইতে তাহার সূচনা হয়। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর সমসাময়িক বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ কর্তৃকই ইহার মন্দিরাদি সুন্দর রূপে গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গাধিকারিগণ বাদসাহের প্রধান কাননগোর কার্য্য করিতেন। দর্পনারায়ণ ঢাকা হইতে ডাহাপাড়ায় আসিয়া বাস করায় কিরীটেশ্বরীর উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সময়ে মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, সেই সময়ে কিরীটেশ্বরীর উন্নতি চরম সীমায় উপনীত হয়। রাজা রামকৃষ্ণ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি কিরীটেশ্বরীর উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কিরীটেশ্বরীতে তাঁহাদের কীর্ত্তির নিদর্শন আছে। কিরীটেশ্বরী পীঠস্থান হওয়ায় তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। মন্দিরাদি সমস্ত ভগ্নদশায় পতিত। অনেক দিন হইতে তাহার সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আজিও পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। কিরীটেশ্বরীর একটি মন্দিরে ভৈরব বলিয়া যে দেবতা পূজিত হইয়া থাকেন, তিনি ধ্যানী বুদ্ধ। বুদ্ধ ভৈরব রূপে পূজিত হইতেছেন। বুদ্ধের এরূপ সুন্দর মূর্ত্তি কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিস Gangaridai নামে এক জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার নিকটস্থ গণকর নামক এক স্থানেরও উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিস বলেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণ বাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্ব্ব সীমা। উইলফোর্ড সাহেব বলেন যে, মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে বুঝায় যে, বাঙ্গলার বদ্বীপের শীর্ষভাগে গ্যাঙ্গারিডাই ও গণকর অবস্থিত ছিল। আমরা বলি, অবস্থিত ছিল না, এক্ষণেও রহিয়াছে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর উপবিভাগে, গাঙ্গারডা ও গণকর উভয় স্থানই বিদ্যমান। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদের নাম সমভাবেই রাখিয়াছে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা ও উইলফোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে মুর্শিদাবাদের গ্যাঙ্গারডা ও গণকর যে প্রাচীন গ্যাঙ্গারডাই ও গণকর তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মিগাস্থিনিসের গ্যাঙ্গারডাই জনপদকে গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাষ্ট্র বলিয়াছেন। গ্যাঙ্গারডা নগর বা গ্রাম হইতে যে তাহার উৎপত্তি ইহাই আমাদের অনুমান হইয়া থাকে। এক্ষণে গ্যাঙ্গারডা গ্রাম বা নগর গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারাষ্ট্রের অপভ্রংশ কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহার যে নাম ছিল, এক্ষণে তাহাই সমভাবে রহিয়াছে। যদি গ্যাঙ্গারডাই গঙ্গারাঢ় বা রাঢ় হয়, তাহা হইলে উহা প্রবোধচন্দ্রোদয়ের রাঢ়াপুরী হইতেও পারে। মিগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে, গ্যাঙ্গারডাইএর রাজার এরূপ প্রতাপ ছিল যে, তাঁহার হস্তিসৈন্যের ভয়ে কেহ তাঁহার স্বদেশ আক্রমণ করিতে সাহস করিত না। আলেকজাণ্ডারও

তাঁহার প্রতাপ শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্যাঙ্গারডাই বা গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালী চিরদিনই ভীরু বাঙ্গালী ছিল না।

রাঙ্গামাটি মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন স্থান, বহরমপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার রক্তাভ ভূমি, ও ভূমিসংলগ্ন অসংখ্য ইষ্টকখণ্ড ও মৃৎপাত্রচূর্ণ ইহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং যে কর্ণসুবর্ণ প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন, রাঙ্গামাটিই সেই কর্ণসুবর্ণ বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। প্রবাদানুসারে মহারাজ দাতাকর্ণের পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময় বিভীষণ এইখানে সুবর্ণ বৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কর্ণসুবর্ণ নাম হয়। কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, এককালে রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত থাকা অসম্ভব নহে। হিউয়েন সিয়াং কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর পার্শ্বে লো টো বী-চী,বা-কী-টো-মো-চী নামক সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। লো-টো-বী চী রক্তভিত্তি ও কী-টো-মো-চী রক্তমৃত্তির চৈনিক আকার। তাহা হইলে রক্তভিত্তি বা রক্তমৃত্তির অপভ্রংশ যে রাঙ্গামাটি তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার এই রাঙ্গামাটি কর্ণস্বর্ণ বা কানসোনা নামে পূর্ব্বে অভিহিত হইত। শব্দকল্পদ্রুমে মুর্শিদাবাদ নগরের নিকট কর্ণস্বর্ণ নামধেয় সমাজের উল্লেখ আছে। দক্ষিণরাঢ়ীর ও বারেন্দ্র কুলজীতে কানসোনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে রাঙ্গামাটিকে কাণসোনাপুরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং রাঙ্গামাটি যে হিউয়েন সিয়াং বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। হিউয়েন সিয়াং কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্ক নামে রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এই শশাঙ্ক গুপ্তবংশীয় ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাঁহাকে নরেন্দ্রগুপ্ত বলিয়া থাকেন। শশাঙ্ক কান্যকুব্জের সুপ্রসিদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বৌদ্ধদ্বেষী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। গুপ্তবংশীয়েরা শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের মুদ্রাদি হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। রাঙ্গামাটি হইতে কয়েকটি গুপ্তমুদ্রার আবিষ্কারও হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, গুপ্তবংশের একটি শাখা অনেকদিন রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিয়াছিলেন। হিউয়েন সিয়াং কর্ণসুবর্ণ রাজ্যকে ফলপুষ্পশালী ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিবাসীরা বিদ্যার সমাদর করিত। তাহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। উক্ত রাজ্যে দশটি সঙ্ঘারাম ও দুই হাজার আচার্য্য ছিল। তদ্ভিন্ন ৫০ টি দেবমন্দির দৃষ্ট হইত। হিউয়েন সিয়াং, আরও তিনটি সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারামই শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানে অশোকরাজার স্তূপও ছিল। হিউয়েন সিয়াং বর্ণিত রক্তমৃত্তি সঙ্ঘারাম ও অশোকরাজার স্তূপাদির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটি হইতে অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্ন দেবদেবী মূর্ত্তি ও মন্দিরের প্রস্তরফলকাদি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে কোনও কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

রাঙ্গামাটির পর আমরা মহীপাল নামক একটি স্থানের বিবরণ প্রদান করিতেছি। এই মহীপাল নামক ক্ষুদ্র পল্লী আজিমগঞ্জ-নলহাটি রেলশাখার বাড়ালা ষ্টেশন হইতে সার্দ্ধ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই মহীপাল হইতে ভাগীরথীতীরস্থ গয়সাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অসংখ্য ইষ্টক ও মৃৎপাত্রচূর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা যে একটি প্রাচীন জনপদের ভগ্নাবশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মহীপাল পালবংশের উত্তররাঢ়াধিপ মহীপাল রাজার নামানুসারে হইয়াছে। উত্তর রাঢ়াধিপ মহীপাল দিনাজপুরাধিপ মহীপালদেব হইতে পৃথক ব্যক্তি। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালের সমসাময়িক, ধর্ম্মপাল গৌড় জয় করিয়া সম্ভবতঃ স্বীয়বংশীয় মহীপালকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোলদেব সঙ্গুকোত্তমের মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন, এই মহীপাল উত্তররাঢ়াধিপ মহীপাল কি না স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না এবং সাঙ্গুকোত্তমকে সমুদ্রতীরস্থ বলায় তাহা সমতটও হইতে পারে। মহীপালে এখনও অনেক ভগ্নস্তূপ ও তাহার নিকটে প্রস্তরফলকাদি পতিত আছে। কাপ্তেন লেয়ার্ড সাহেব ইহার নিকট হইতে একটি দ্বাদশহস্তযুক্ত ভগ্ন দেবমূর্ত্তি এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত মূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন।

নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলশাখায় সাগরদীঘী নামে একটি ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনের নিকটে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড দীঘী দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার নাম সাগরদীঘী। সাগরদীঘী মহীপাল রাজা কর্ত্তৃক খনিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজার স্কন্ধাবারের ভয়ে বৃক্ষারূঢ় একটি ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু হওয়ায়, রাজা তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য এক দীঘী খনন করিয়াছিলেন। সাগরদীঘী সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত শ্লোকটি হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

"শাকে সপ্তদশাব্দকে স্থিতা সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহামুক্তিহেতুনা॥"

এই শ্লোকটি হইতে সাগরদীঘীর সময় নির্ণীত হইতেছে। ৭১০ শাকে উহা খনিত হয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সুতরাং মহীপাল দেব যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে উত্তররাঢ়ে রাজত্ব করিতেন তাহা বুঝা যাইতেছে। এই সাগরদীঘী খননকালে অনেক গো, সুবর্ণ, বস্ত্র ইত্যাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধেও শ্লোক প্রচলিত আছে। ইহাতে দশটি বাঁধা ঘাট ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহাদের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাগরদীঘীর কতকাংশ শুষ্ক হইয়া গেলেও এক্ষণেও তাহা একটি বিশাল জলাশয়রূপে বিরাজ করিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে উত্তর রাঢ়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই উত্তর রাঢ়ে যে কায়স্থগণ বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ নামে খ্যাত। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বল্লালী কৌলীন্য গ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে ঘোষবংশীয়দিগের আদিপুরুষ সোমঘোষ

কর্ত্তৃক কান্দীর নিকট বজান গ্রামে যে সর্ব্বমঙ্গলা ও সোমেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বিদ্যমান আছে। কান্দীতে রুদ্রদেব নামে যে শিবমূর্ত্তি আছেন, তাহা বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এইরূপে মুর্শিদাবাদের অনেক স্থানে প্রাচীন কালের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, বাহুল্যভয়ে এস্থলে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা গেল না।

হিন্দু ও বৌদ্ধকালের চিহ্ন ব্যতীত মুর্শিদাবাদে পাঠান ও মোগল রাজত্বকালের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় সার্দ্ধ দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে গয়সাবাদ নামে একটী গ্রাম আছে। উহা একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে উহা মহীপাল নগরের একাংশ ছিল, পরে আবার নবগঠিত হয়। গয়সাবাদ গৌড়ের সুলতান গয়সউদ্দীনের নামানুসারে হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। গৌড়ে গয়সউদ্দীন নামে দুই জন সুলতান রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রথম গয়সউদ্দীনের সময় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গয়সাবাদ স্থাপিত হয়। গয়সাবাদে একটি দরগা আছে, তাহা সুলতান গয়সউদ্দীনের সমাধি বলিয়া কথিত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা একটি ফকীরের সমাধি। গৌড়ের দুইজন গয়সউদ্দীনই গৌড়ে প্রাণত্যাগ করিয়া তথায় সমাহিত হইয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ফতেসিংহ নামে যে প্রসিদ্ধ পরগণা আছে, তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশের আবাসস্থান আছে। তাঁহারা পাঠান রাজত্ব সময়ে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরস্থ চুনাখালি পাঠান রাজত্ব কালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই চুনাখালি কাগজ ও আম্রের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহাতে মসনদ আউলিয়া নামে ফকীরের সমাধিতে আবুল মজঃফর ফেরোজ সুলতানের নামোল্লেখ দেখা যায়। ফেরোজ হিজরী ৮৯৬ অব্দে বা ১৪৯০ খৃঃ অব্দের শেষভাগে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

যে বিদ্যোৎসাহী হোসেন সাহা গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিতও মুর্শিদাবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সাগরদীঘী রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এক-আনি চাঁদপাড়া নামে গ্রাম অবস্থিত। হোসেন সাহার পিতা সৈয়দ আসরফ, ত্রিমিজনগর হইতে আসিয়া চাঁদপাড়ায় প্রথমে বাস করেন। ইঁহারা সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন, কিন্তু অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় হোসেন সাহা চাঁদপাড়ার জনৈক ব্রাহ্মণের অধীনে একটী সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধিরায় বলিয়া কথিত। স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে চাঁদ রায় বলিয়া থাকে। চাঁদপাড়ার কাজী, হোসেন সাহার বংশপরিচয় পাইয়া স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করেন। ক্রমে হোসেন আপনার প্রতিভাবলে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন ও সুবুদ্ধিরায়কে এক আনা মাত্র করে চাঁদপাড়া প্রদান করেন। সেইজন্য তাহার একআনি চাঁদপাড়া নাম হয়। সুবুদ্ধি রায় এক সময়ে হোসেনের অঙ্গে চাবুকের আঘাত করিয়াছিলেন, সেই দাগ দেখিয়া হোসেনের বেগম, সুবুদ্ধিকে বধ করিতে বা তাহার জাতি লইতে অনুরোধ করেন।

হোসেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেগমের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে জলপাত্র হইতে জল লইয়া রায়ের মুখে প্রদান করেন। সুবুদ্ধিরায় তাহাতে সংসার পরিত্যাগ করেন, পরে মহাপ্রভুর শরণাগত হন ও শেষজীবন ঈশ্বরোপসনায় যাপন করেন। এই চাঁদপাড়ার নিকট হোসেন সাহের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি একটি বিশাল দীঘী খনন করাইয়া ছিলেন। তাহার বর্ত্তমান নাম সেখের দীঘী। সেখেরদীঘীর প্রস্তরফলকে আবুল মজঃফর হোসেন সাহার নামোল্লেখ আছে, এবং তাহা যে তাঁহার কর্ত্তৃক নিখাত ইহাও স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট আছে। ৩২১ হিজরীতে সেখেরদীঘী নিখাত হইয়াছিল। এই সেখের দীঘীর নিকটে আবুসৈয়দ ভ্রিসিজ নামে এক জন ফকীর বাস করিতেন। হোসেন সাহা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আবু সৈয়দের বংশধরেরা অদ্যাপি সেখেরদীঘীতে বাস করিতেছেন।

গৌড়ে পাঠান রাজত্বের অবসান হইলে তাহা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের পরিবর্ত্তে গৌড় বা বঙ্গরাজ্য মোগল সুবেদারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে আরব্ধ হয়। রাজমহলের যুদ্ধে গৌড়ের শেষ স্বাধীন নরপতি দায়ুদ খাঁর মুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইলেও পাঠানগণ কতলু, ইশা, ওসমান প্রভৃতি সর্দ্দারগণের অধীনে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন, সে সময়ে পাঠানগণ ওসমানের পতাকামূলে সমবেত হয়। মোগল সৈন্যগণ ওসমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। মানসিংহ মুর্শিদাবাদ প্রদেশে উপস্থিত হইলে সেরপুর আতাই নামক স্থানে ওসমান তাঁহার সম্মুখীন হন। এই সেরপুর আতাই মুর্শিদাবাদের কান্দী উপবিভাগের খড়গ্রাম থানার অধীন। সেরপুর আতাইএর যুদ্ধে মোগল কামানের গোলাঘাতে পাঠানদিগের হস্তিদল পলায়ন করিতে আরম্ভ করায় তাহারা পরাজিত হইতে বাধ্য হয়, এবং এই যুদ্ধের পর পাঠানগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত হতবীর্য্য হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিল। সেরপুর আতাইএ অদ্যাপি এই যুদ্ধের কথা প্রচলিত আছে।

মানসিংহের সহিত একজন কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি জিঝোতিয়া শ্রেণীভুক্ত, ইঁহার নাম সবিতা রায়। সবিতারায় মানসিংহের সৈন্য পরিচালনা করিতেন। সবিতারায় ক্রমে মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ অধিকার করেন। সবিতারায় জেমো রাজবংশের আদিপুরুষ। এই বংশের জয়রাম রায় শক্তিপুর গ্রামে কপিলেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে মন্দির এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে। বর্ত্তমান মন্দির পরে নির্ম্মিত হয়। ফতেসিংহ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, জিঝোতীয় ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশীয়গণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়া মুর্শিদাবাদের একটি প্রসিদ্ধ জনপদরূপে বিরাজ করিতেছে।

মোগল রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদে ইউরোপীয় বণিকগণ সমাগত হয়। সর্ব্বাগ্রে ওলন্দাজগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কাশীমবাজারের পশ্চিম

সংলগ্ন কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের কুঠী স্থাপিত হয়। এক্ষণে যথায় কাশীমবাজার ষ্টেশন সেইখানে ওলন্দাজদিগের কুঠী ছিল। ষ্টেশনের নিকটে অদ্যাপি তাহাদের সমাধি-ক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কুঠীর কার্য্য গৌরবসহকারে পরিচালিত হইয়াছিল। ওলন্দাজদিগের পর ইংরেজেরা কাশীমবাজারে কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কাশীমবাজার কুঠীর বিষয় জানিতে পারা যায়। সেই সময়ে জন কেন ইহার প্রধান অধ্যক্ষ ও জব চার্ণক তাঁহার সহকারী ছিলেন। রেশম, তুলা, রেশমীবস্ত্র, মসলিন ও গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য সে সময়ে কাশীমবাজার সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক ইহার প্রধান অধ্যক্ষ হন। তাঁহার সহিত নবাব সায়েস্তা খাঁর বিবাদ ঘটায় চার্ণক কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিয়া হুগলী গমন করেন। তথায় মোগলদিগের সহিত তাঁহাদের বিরোধ ঘটিলে তাঁহারা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে পলায়ন করেন। পরে নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে বাঙ্গালায় প্রত্যাগত হইয়া চার্ণক সুতানটিতে কুঠী স্থাপন করেন। সেই সুতানটি কালে কলিকাতা নামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইয়া উঠিয়াছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে মিষ্টার ওয়াট্‌স কাশীমবাজারের রেসিডেণ্ট বা প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস তথায় সামান্য কেরাণীর কার্য্য করিতেন। এইখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী ও শিশুকন্যার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের সমাধি আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। আমাদের নিকটে ইংরেজ কুঠী, রেসিডেন্সী ও সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান। ওয়ারেণ হেষ্টিংস সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইয়াছিলেন। পরে তথা হইতে পলায়ন করিয়া কুঠীর সরবরাহকার কান্ত বাবুর আশ্রয় লন। কান্তবাবু তাঁহাকে লুক্কায়িত রাখিয়া পরে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন। সেই জন্য হেষ্টিংস কান্তবাবুকে পরে আপনার দেওয়ান করিয়াছিলেন। আমরা সেই কান্ত বাবুর ভবনে আজ সকলেই সমবেত। তাঁহার বংশধর মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের ঐকান্তিক যত্নে আজ এখানে সম্মিলনের অধিবেশন। ইংরেজগণের পরে আর্ম্মানীয়গণ ও ফরাসীগণ সৈদাবাদে আপনাদের কুঠী স্থাপন করে। আর্ম্মানীয়গণের কুঠীর স্থানকে খেতাখাঁর বাজার বলে, তথায় একটি গির্জ্জা বিদ্যমান আছে। ফরাসীদিগের স্থানকে ফরাসডাঙ্গা কহে, এক্ষণে তথায় জলের কল অবস্থিত। এই কুঠীতে সুপ্রসিদ্ধ ডিউপ্লে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সময় যিনি কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহার নাম মুঁসো লা, ইনি সিরাজউদ্দৌলার হিতৈষী ছিলেন। ইংরেজদিগের প্ররোচনায় সিরাজ তাঁহাকে স্বীয় দরবার হইতে অপসৃত করিয়া দেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গলায় যে মহাবিপ্লব উপস্থিত হয়, মুর্শিদাবাদের সহিতও তাহার সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে। বর্দ্ধমান প্রদেশের চেতোয়া ও বর্দ্দার জমীদার সভাসিংহ রহিম খাঁ নামক পাঠানসর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গের অনেক স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বালিত করে। সে সময়ে নবাব ইব্রাহিম খাঁ সুবেদার। তিনি

বিদ্রোহের শান্তি করিতে পারেন নাই। যশোরের ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ তাহাদিগকে দমন করিতে আসিয়া শেষে নিজে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজকুমারীকে আক্রমণ করিতে যাওয়ায়, তাঁহার ছুরিকাঘাতে নিহত হইলে রহিম খাঁ বিদ্রোহিগণের নেতা হইয়া শেষে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে উপস্থিত হয়। ফতেসিংহের জমীদারগণ তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল। সেই সময়ে নিয়ামত খাঁ মুর্শিদাবাদের জায়গীরদার ছিলেন, তিনি বিদ্রোহিগণের দমনের জন্য অগ্রসর হইয়া শেষে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। তাঁহার অনেক লোক জন হত ও আহত হয়। কাশীমবাজারের কুঠীয়ালগণ অনেক টাকা প্রদান করিয়া রহিমখাঁর হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করে। পরে বাদসাহ আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্বান বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া এই বিদ্রোহ দমন করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মুর্শিদাবাদের প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগ আরব্ধ হয়। বাঙ্গলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ সুবেদার আজিম ওশ্বানের সহিত বিবাদ করিয়া মুকসুদাবাদে আপনার দেওয়ানী স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহার নামানুসারে মুকসুদাবাদের মুর্শিদাবাদ নামকরণ হয়। মুকসুদাবাদের নামকরণ লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে মুখসুদন দাস নামক সন্ন্যাসীর নামানুসারে মুকসুদাবাদ হয়, কাহারও মতে মুকসুদসাহ হইতে ইহার নামের উৎপত্তি। আবার রিয়াজুস সালাতীনের মতে মুকসুদ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হইতে ইহার নামকরণ হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান হইতে পরে নবাব নাজিম হইয়াছিলেন। তদবধি মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ তোড়র মল্ল ও সাসুদা কর্ত্তৃক বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন সরকারের অপেক্ষা বৃহত্তর আকারে বঙ্গরাজ্য বিভক্ত করিয়া সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার বিভাগ সাধারণতঃ চাকলা নামে অভিহিত হইত। কুলী খাঁ বালেশ্বর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, সাত গাঁ বা হুগলী, ভুষনা, যশোর, আকবরনগর, ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহাট ও ইসলামাবাদ এই ত্রয়োদশ চাকলায় বঙ্গরাজ্য বিভাগ করেন। তিনি বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া অনেক আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্দোবস্তী কাগজের নাম জমাকামেল তুমারী। খালসা ও জায়গীর সাধারণতঃ দুই ভাগে জমী বন্দোবস্ত হয়, তাহার কর ব্যতীত মুর্শিদকুলি আবওয়াব বা অতিরিক্ত করেরও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে সীতারাম রায় ও উদয়নারায়ণের অভ্যুদয় হয়। ইংরেজ কোম্পানী বাদসাহ ফরখসেরের নিকট হইতে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ক্ষমতা লাভ করে। মুর্শিদকুলী খাঁ যে স্থানে সমাহিত হন তাহাকে কাটরা কহে। কাটরার বিশাল মসজীদের সোপানের নীচে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে।

মুর্শিদকুলী খাঁর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। মুর্শিদকুলী খাঁ যে জমীদারী বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সুজাউদ্দীনের সময় তাহা সম্পূর্ণ হয়। খালসা ভূমি ২৫ জমীদারীতে ও জায়গীর ১৩ ভাগে বিভক্ত হয়। তদ্ভিন্ন

ঐ প্রকার আবওয়াবও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুজাউদ্দীনের সময় বিহার প্রদেশ বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত হয়, এবং আলিবর্দ্দী খাঁ তাহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। আলিবর্দ্দির এই নিয়োগের সময় সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হইয়াছিল, তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সুজাউদ্দীন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে ফরহাবাগ নামে এক সুন্দর উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। রোশনীবাগে তিনি সমাধিস্থ হন। তাঁহার সমাধি একটি সুন্দর দৃশ্য।

সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের তৃতীয় নবাব। ইনি অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন, প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সহিত ইঁহার বিবাদ ঘটায় তাঁহার উজীর হাজী আহম্মদ, রাজস্বমন্ত্রী রায়রায়ান আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইচ্ছুক হন। তাঁহারা আলিবর্দ্দী খাঁকে বিহার হইতে আহ্বান করিলে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সহিত আলিবর্দ্দির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন। সরফরাজের সেনাপতি গাওস খাঁ ও জালিম সিংহ নামে এক রাজপুত বালক এই যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। নগিনাবাগ নামে মুর্শিদাবাদের এক নির্জ্জন উদ্যানে সরফরাজের সমাধি অবস্থিত।

গিরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আলিবর্দ্দী মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ নবাব বাঙ্গলার সিংহাসনে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে তিনি সকল বিভাগে নিযুক্ত করিয়া ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে বাঙ্গলার আকবর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে সামরিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে জানকীরাম, দুর্ল্লভরাম, নন্দকুমার প্রভৃতি সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ যেরূপ উদারপ্রকৃতি ছিলেন, যদি তাঁহার রাজত্ব শান্তিপূর্ণ হইত, তাহা হইলে আমরা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতির অনেক উন্নতি দেখিতে পাইতাম। তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গরাজ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। প্রথমে উড়িষ্যায় সরফরাজ খাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। তাঁহাকে দমন করিতে না করিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের 'হর হর, মহাদেও' শব্দে সমস্ত বঙ্গরাজ্য বিকম্পিত হইয়া উঠে। বিরারের রঘুজী ভোঁসলা স্বীয় সেনাপতি ভাস্করপন্তকে বঙ্গরাজ্য অধিকারের জন্য পাঠাইয়া দেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে বাঙ্গলার সমগ্র অধিবাসী ভীত হইয়া পড়ে, অনেকে বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আলিবর্দ্দি খাঁ অসীম বিক্রম প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। কিন্তু কিছুতেই তাহারা প্রতিনিবৃত্ত না হওয়ায়, তিনি সন্ধির ছলে ভাস্করকে আহ্বান করিয়া মনকরা নামক স্থানে তাহার হত্যা সম্পাদন করেন। এই মনকরা বহরমপুরের নিকটে অবস্থিত। ভাস্করের মৃত্যুর পরও মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গলা রাজ্যে পুনর্ব্বার উপদ্রব আরম্ভ করে, আলিবর্দ্দি কিছুতেই তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে

না পারিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে আবার আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া নবাবের তৃতীয় জামাতা সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দীন আহম্মদকে নিহত করিলে, নবাব তাহাদিগকে দমন করিয়া শান্তিস্থাপন করেন। এইরূপে তাঁহার সমগ্র রাজত্ব অশান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু নবাব তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাওয়ায়, তিনিই মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। খোসবাগ নামক স্থানে আলিবর্দ্দি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সিরাজউদ্দৌলা আপনার পরিবারস্থ প্রতিপক্ষদিগকে দমনের প্রয়াসী হন। নবাব আলিবর্দ্দি মৃত্যুকালে উদ্ধত ইংরেজ বণিকদিগকে দমন করিবার জন্য সিরাজকে উপদেশ দিয়া যান। সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে ইংরেজদিগের কাশীমবাজার কুঠী আক্রমণ করিয়া পরে কলিকাতায় উপস্থিত হন। নবাব সৈন্যের সহিত সামান্য যুদ্ধের পর ইংরেজদিগের কতকগুলি আহত হয় ও কতকগুলি নৌকাযোগে পলায়ন করে। যাহারা দুর্গমধ্যে ছিল তাহারা বন্দীভাবে অবস্থিতি করে। ইহাদের সংখ্যা কত ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাহাদিগকে অন্ধকূপ নামক একটি গৃহে সিরাজের সেনাপতি মাণিকচাঁদের আদেশে রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যুদ্ধে আহত ও ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহাদের মধ্যে কয়েকজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনা লইয়া অন্ধকূপহত্যা নামে একটি কাল্পনিক বিয়োগান্ত ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় Black Hole Tragedy নামে কোন কাণ্ডই ঘটে নাই। কয়েকটি আহত ইংরেজ একটি গৃহে বন্দী থাকায় তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছিল মাত্র। ইহার সম্বন্ধে যে কল্পনার স্তম্ভ এতদিন পুস্তকে পত্রে ছিল, কার্জ্জন বাহাদুর আবার তাহাকে ঘনীভূত করিয়া কলিকাতার পথে দাঁড় করাইয়াছেন।

কলিকাতার পরাজয়ের কথা মান্দ্রাজে পৌঁছিলে তথা হইতে ক্লাইব ও ওয়াটসন কলিকাতা উদ্ধারের জন্য আসেন। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও অমাত্যবর্গের জন্য সিরাজউদ্দৌলা ভীত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন ও ইংরেজেরা কলিকাতা পুনরধিকার করেন। ভাগ্য অপ্রসন্ন হওয়ায় সিরাজের বিরুদ্ধে এক ঘোরতর ষড়যন্ত্রের অবতারণা হয়। মীরজাফর, জগৎশেঠ, মাণিকচাঁদ, রায়দুর্ল্লভ প্রভৃতি তাহার নেতা ছিলেন। ইহারা ইংরেজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজেরা কলিকাতায় সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ক্রমে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে পলাশী প্রান্তরে নবাবসৈন্যের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। নবাবের অগণিত সৈন্য দেখিয়া মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য আম্রকুঞ্জে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। মীরমদন ও মোহনলালের বীরত্বে তাহারা আম্রকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু গোলার আঘাতে মীরমদনের মৃত্যু হইলে, নবাব ভীত হইয়া বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্ল্লভের পরামর্শে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে ইংরেজেরা জয়লাভ করে। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে,

পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। উহা একটি যুদ্ধাভাস মাত্র। পলাশী হইতে পলায়ন করিয়া নবাব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন, পরে তথা হইতে রাজমহলের দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু মীরজাফরের চরেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনে। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে মহম্মদী বেগের তরবারি আঘাতে সিরাজের মুণ্ড তাঁহার সৌন্দর্য্যময় দেহযষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হয়। যেখানে সিরাজউদ্দৌলার হত্যা হইয়াছিল, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ মধ্যে সে স্থানটি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজকে খোসবাগে সমাহিত করা হইয়াছিল। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

ইংরেজদিগের অনুগ্রহে মীরজাফর মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। এই জন্য তিনি ক্লাইবের গর্দ্দভ নামে অভিহিত হইতেন। মীরজাফর রাজ্যশাসনে তাদৃশ মনোযোগ দিতেন না, তাঁহার পুত্র মীরণই শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। মীরণ সিরাজউদ্দৌলার পরিবারবর্গকে নির্ব্বাসিত করেন, কাহাকে কাহাকে জলমগ্নও করিয়াছিলেন। এই সময়ে সাজাদা-আলি গহর (যিনি পরে বাদসাহ সাহআলম হইয়াছিলেন) অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলার সহিত মিলিয়া বিহার প্রদেশ অধিকারের জন্য অগ্রসর হন। মীরণ ইংরেজদিগের সাহায্যে তাঁহাকে বিতাড়িত করার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় সহসা মীরণের মৃত্যু সংঘটিত হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু আজিও রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। মীরণ ইংরেজদিগের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে শীঘ্রই এ জগৎ হইতে বিদায় লইতে হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। মীরণের মৃত্যুর পর মীরজাফর রাজ্যশাসনে অক্ষম হওয়ায়, এবং সে সময়ে তাঁহার বন্ধু ক্লাইব সাহেব বিলাত চলিয়া যাওয়ায়, তদানীন্তন গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের চেষ্টায় মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন ও তাঁহার জামাতা মীরকাশীম মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন।

মীরকাশীম অত্যন্ত সুচতুর ও তেজস্বী ছিলেন। যদিও তিনি ইংরেজদিগের অনুগ্রহে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ইংরেজদিগের প্রভুত্ব হইতে আপনাকে স্বাধীন রাখিবার জন্য তিনি যার পর নাই চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেখানে ইউরোপীয় প্রণালীতে কামান ও গোলাগুলিনির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপিত করেন। আর্ম্মানীয় ও ইউরোপীয় সেনাপতিদিগকে তিনি সামরিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গর্গিন খাঁ নামে আর্ম্মানীয় তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। বাণিজ্যঘটিত শুল্ক ব্যাপার লইয়া ইংরেজদিগের সহিত মীরকাশীমের বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরেজেরা স্বয়ং ও তাঁহাদের অনুমতি-পত্র লইয়া অনেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করায়, অন্যান্য বণিকেরা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে। তজ্জন্য রাজস্বের ক্ষতি হওয়ায় মীরকাশীম রাজ্যমধ্যে শুল্ক উঠাইয়া দেন। কাজেই ইংরেজদিগের মহা ক্ষতি উপস্থিত হয়। ইংরেজদিগের মধ্যে

সে সময়ে দুইটি দল ছিল, একদলে গবর্ণর ভান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি ও অন্য দলে আমিয়ট ও এলিস প্রভৃতি কাউন্সিলের সভ্যগণ ছিলেন। ভান্সিটার্টের দল মীরকাশীমের পক্ষপাতী, অন্য দল তাঁহার ঘোরতর বিরোধী ছিল। কিন্তু ভান্সিটার্টের দল জয় লাভ করিতে পারে নাই। ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে মীরকাশীমের আদেশে এলিস ও আমিয়ট নিহত হয়। তাহার পর মেজর আডাম্‌স ইংরেজ সৈন্য লইয়া মীরকাশীমের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কাটোয়ার নিকটে, মুর্শিদাবাদে গিরিয়া ও উধুয়ানালায় ইংরেজেরা জয়ী হইয়া মুঙ্গের অধিকার করেন। মীরকাশীম তথা হইতে পলায়ন করিয়া সাহআলম ও সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হন, পরে তাঁহাদের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি ফকিরী অবলম্বন করিয়া চলিয়া যান। অবশেষে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা ও সাহআলম পরাস্ত হন।

মীরকাশীমের পর ইংরেজেরা আবার মীরজাফরকে নবাবী প্রদান করেন। মীরজাফর আপনার শাসনকার্য্যের সহায়তার জন্য ইংরেজ কাউন্সিলকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। নন্দকুমার রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া অনেক আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কুষ্ঠরোগে মীরজাফরের মৃত্যু হয়। তিনি অন্তিমকালে নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়া নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নজমউদ্দৌলা নবাব নাজিম নিযুক্ত হন। নজমউদ্দৌলা মণিবেগমের গর্ভসম্ভূত। নজমউদ্দৌলা নন্দকুমারকে দেওয়ান রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ কাউন্সিলের তাহাতে মত না হওয়ায় মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব সুবা নিযুক্ত হন। ইঁহার সময় ১৭৬৫খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট ক্লাইব সাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য বাঙ্গলা বিহারের দেওয়ানী গ্রহণ করেন। নবাব নাজীমের জন্য ৫৩৮৬১৩১।৵৹ বৃত্তি মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। ক্লাইব নজমউদ্দৌলার সহিত মতিঝিলে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ করিয়াছিলেন।

নজমউদ্দৌলার পর তাঁহার সহোদর সৈফউদ্দৌলা নিজামতের গদী প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় ৪১৮৬১৩১ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। সৈফউদ্দৌলার সহিত গবর্ণর ভেরলেষ্ট মতিঝিলে পুণ্যাহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপস্থিত হয়। সৈফউদ্দৌলা সেই দুর্ভিক্ষ সময়ে বসন্তরোগে জীবন বিসর্জ্জন দেন। তাহার পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও বব্বুবেগমের গর্ভজাত মোবারক উদ্দৌলা নবাব নাজিমী গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা বিদ্যমান থাকিলেও মণিবেগম তাঁহার অভিভাবক নিযুক্তা হইয়াছিলেন। মোবারক উদ্দৌলার সময় নিজামতী বৃত্তি প্রথমে ৩১৮১৯৯১ টাকা পরে ১৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। উক্ত ষোল লক্ষ টাকা অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। মোবারক উদ্দৌলার পর তাঁহার পুত্র বাবরজঙ্গ, বাবরজঙ্গের পর তাঁহার পুত্র আলিজা ও তৎপরে আলিজার ভ্রাতা ওয়ালাজা নবাব নাজিম হন। ওয়ালাজার পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুজার নিজামতী কালে মুর্শিদাবাদের

বর্ত্তমান প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদ নির্ম্মাণে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। হুমায়ুঞ্জার পুত্র মনসুরআলি ফেরদুঞ্জা মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব নাজিম। ইঁহার সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজামতের বৃত্তি ও সম্মানের লাঘবের চেষ্টা করিলে, তিনি তাহার আবেদনের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু তথায় অবশেষে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিমি উপাধি বিক্রয় করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইঁহার পর হইতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিমবংশীয়েরা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর মাত্র উপাধি লাভে সক্ষম হইয়াছেন। প্রথম নবাব বাহাদুর আলি কাদের হাসেন আলি মির্জ্জা গত বৎসর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর।

আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসোপলক্ষে উপরে নবাববংশীয়দিগেরই বিবরণ প্রদান করিয়াছি। কিন্তু মুর্শিদাবাদের অন্যান্য সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐতিহাসিকযুগে যে সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, আমরা এস্থানে তাহারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। মুর্শিদাবাদের মধ্যে জগৎশেঠবংশীয়েরা বাদসাহ ও নবাব দরবার হইতে সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ধন-সম্পত্তিতে কোন বংশই তাঁহাদের সমকক্ষ ছিল না। এইজন্য তাঁহারা জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। শেঠবংশের আদি পুরুষ হীরানন্দ পাটনায় প্রথমে গদী স্থাপন করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠবংশের আদিপুরুষ। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলী খাঁর যত্নে আপনার গদীর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় ফতেচাঁদ প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। ফতেচাঁদের সময় সরফরাজ ও আলিবর্দ্দির মধ্যে গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ব্যাপারে ফতেচাঁদ অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতাপচাঁদ সিরজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি অবশেষে মীরকাশীম কর্ত্তৃক মুঙ্গের দুর্গে বন্দী হইয়া গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হন। তাহার পর হইতে ক্রমে শেঠদিগের অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে তাঁহাদের বংশধর সামান্য অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন। বঙ্গাধিকারিগণ বাদসাহের প্রধান কানন্‌গো পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজস্ব বিভাগের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় দর্পনারায়ণ মুর্শিদকুলীর সমসাময়িক। তাঁহার পৌত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদিগের সন্ধিপত্রে সাক্ষী হইয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা শোচনীয়। মহারাজ নন্দকুমার ফৌজদারী দেওয়ানী প্রভৃতি কার্য্য করিয়া শেষে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কোপানলে পড়িয়া ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে বাধ্য হন। তাঁহার দৌহিত্রবংশীয়েরা এক্ষণে সৈদাবাদ কুঞ্জঘাটায় বাস করিতেছেন। কান্তবাবু কুঠীর সরবরাহকার হইতে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বেনিয়ান ও পরে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া অনেক ভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। জীবনদানব্রত হইতে যে বংশের উৎপত্তি, সেই বংশ চিরদিনই তাহা প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী হইতে তাহা আরও প্রমাণীকৃত হয়। তাই মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম আজ বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে শুনিতে পাওয়া

যায়। আর যিনি তাঁহার পর কাশীমবাজারের রাজাসনে বসিয়াছেন, সেই ব্রতের জন্য তিনি যে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন তাহার বোধ হয় নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় কোম্পানীর দেওয়ানী করিয়া বলে ও কৌশলে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশীয়েরা তাহা ভোগ করিতেছেন। এই বংশের লালাবাবুর কীর্ত্তি আজিও উত্তরভারতে বিদ্যমান। আর সেই অর্থলোভী অত্যাচারী দেবী সিংহের বংশ আজিও নশীপুরে রহিয়াছে; যদিও দেবীর ধারা বহুদিন এ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মানসিংহের আনীত সবিতা রায়ের বংশ জেমুয়াতে বিরাজ করিতেছে। তদ্ভিন্ন লালগোলার রাজবংশ, কাশীমবাজারের ছোট রাজবংশ, বহরমপুরের সেনবংশ প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদের অনেক ব্যাপারের সহিত লিপ্ত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে দুইটি বিপ্লবের অবতারণা হইয়াছিল। একটি সাঁওতাল বিদ্রোহ, দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতালেরা সাঁওতাল পরগণা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি প্রদেশে ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক ব্যক্তি হত এবং অনেকের গৃহাদি লুণ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ প্রদেশে পর্য্যন্ত তাহার স্রোত আসিয়াছিল। নবাব নাজিম মনসুর আলি খাঁ ইহার শান্তির জন্য অনেক প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৫৭ সালে যে সিপাহী বিদ্রোহ উত্তর ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়, বহরমপুর হইতে তাহার সূচনা হয়। বহরমপুরে তখন ১৯ সংখ্যক একদল সিপাহী পদাতিক সৈন্য অবস্থিতি করিত। তাহারা চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা কাটিতে অসম্মত হওয়ায় ক্রমে অশান্তির ভাব প্রকাশ করে। তাহাদের অধ্যক্ষ কর্ণেল মিচেল সাহেব তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অবশেষে তাহাদিগকে ভুলাইয়া বারাকপুরে লইয়া গিয়া বিদায় দেওয়া হয়। নবাব নাজিম মনসুর আলি এই বিদ্রোহ শান্তির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন।

সমগ্র ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলা হইতে রাজনৈতিক বিপ্লবের শান্তি হইলে মুর্শিদাবাদও শান্তভাব ধারণ করে। তাহার পর বঙ্গদেশে যে সমস্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হইয়াছিল মুর্শিদাবাদে তাহারও তরঙ্গ আসিয়া পৌঁহছিয়াছে। এখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা, ধর্ম্মসভা ও থিওসফি সভা হইয়াছিল। বিবেকানন্দী সম্প্রদায়ের অনাথাশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনেও মুর্শিদাবাদ পশ্চাৎপদ নহে। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের যত্নে এইখানে প্রথম প্রাদেশিক সমিতির এবং গত বৎসরেও তাহার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্ত্তমান স্বদেশী-আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ অল্প বিস্তর আন্দোলিত হইয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের চেষ্টায় স্বদেশীদ্রব্য প্রচারের সুযোগও ঘটিয়াছে। অতঃপর মুর্শিদাবাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের

সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়। কারণ বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতেই বাঙ্গলায় প্রাচীন সাহিত্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর পর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীনিবাসাচার্য্য বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময়ে তিনি মুর্শিদাবাদেও হরিনামের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের অনেক স্থান তখন হরিনাম স্রোতে ভাসমান হইত। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্যদ্বয় রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয় ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের তেলিয়া বুধুরিতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। রামচন্দ্র কবিত্বের জন্য উপাধি পাইয়াছিলেন। পদকল্পলতিকায় তাঁহার কোন কোন পদের উল্লেখ দেখা যায়। স্মরণদর্পণ নামে তাঁহার এক গ্রন্থ ছিল, এবং বঙ্গজয় নামক গ্রন্থে তিনি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকটিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজ পদ রচনার জন্য অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা বর্ণনা করিয়া কবিরাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত পদাবলী বৈষ্ণব গায়কগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র গীত হইত। বাঙ্গলা পদাবলী ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব নামক নাটক ও কর্ণামৃত নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ ব্যতীত মুর্শিদাবাদের বংশীদাস, চৈতন্য দাস, গোকুল দাস ও হরিরামাচার্য্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদের মালিহাটিবাসী যদুনন্দনদাস পয়ার রচনায় সকলের নিকট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচিত কর্ণানন্দ, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের পয়ারই প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন তাঁহার সুললিত পদাবলী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথ অনেক সময় সৈদাবাদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ সৈদাবাদে লিখিত হয়। বিশ্বনাথ শেষজীবন বৃন্দাবনে ধর্ম্মালোচনায় ও গ্রন্থলিখনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত, তবে তাঁহার রচিত অনেক বাঙ্গলা পদাবলীও আছে।

নববৈষ্ণবধর্ম্ম যখন বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হয়, তখন ইহা মুসল্মানগণকেও আকর্ষণ করিয়াছিল। মুর্শিদাবাদের এক জন ফকীর এই ধর্ম্মের রসাস্বাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সৈয়দ মর্ত্তুজা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে সমাগত হন। মর্ত্তুজা জঙ্গীপুরের বালিঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসল্মান ফকীর হইয়া হিন্দু বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক সুন্দর সুন্দর পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, একটি পদের ভণিতা এই—

"সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে, নিবেদন শুন হরি। সকল ছাড়িয়া, রহিনু তুয়া পায়ে, জীবন মরণ ভরি॥"

ইহা কোন মুসলমানের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। ছাপঘাটিতে মর্ত্তুজার সমাধি আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদ প্রদেশে দুই জন বৈষ্ণব মহাপুরুষ অপার কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম নরহরি দাস, দ্বিতীয় রাধামোহন ঠাকুর। নরহরি জঙ্গীপুর উপবিভাগের পাঁচিশালা নশীপুর নামক স্থানে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। নরহরি বিশ্বনাথের পবিত্র চরিত অনুসরণ করিয়া আপনাকে ধন্য করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের পর এমন সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নরোত্তম-বিলাসও উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন গৌরচরিতচিন্তামণিতে তিনি মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। গীতচন্দ্রোদয়ের সুললিত গীতাবলী তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। রাধামোহন শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মালিহাটিতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে দুর্লভ। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পদামৃতসমুদ্র তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে অন্যান্য কবির পদাবলীর সহিত তাঁহারও অনেকগুলি পদাবলী গ্রথিত হইয়াছে। রাধামোহন পদামৃতসমুদ্রের সংস্কৃত টীকা করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহনের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি নন্দকুমারকে শ্রীনিবাসের পূজিত মহাপ্রভুর তৈলচিত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাহা কুঞ্জঘাটার রাজধানীতে বিদ্যমান আছে।

ইহার পর মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় না। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হইলে ক্রমে যে নব বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়, মুর্শিদাবাদেও তাহা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, আমরা প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহার নাম "The Murshidabad News, তাহার পর রাজা কৃষ্ণনাথের যত্নে মুর্শিদাবাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে উহা উঠিয়া যায়, পরে আবার পুনঃপ্রকাশিত হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার পর ভারতরঞ্জন ও মধুকরী নামক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধিও অনেক দিন চলিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রতিকার ও মুর্শিদাবাদহিতৈষী প্রকাশিত হইতেছে। সংবাদপত্রের পর মাসিক পত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে। আচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক সমালোচক কয়েক বৎসর বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইত। সেই সময়ে খেয়াল নামে একখানি পাক্ষিক পত্রও বাহির হইত। এক্ষণে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের ঐকান্তিক যত্নে উপাসনা প্রকাশিত হইতেছে। আচার্য্য চন্দ্রশেখরই উহার সম্পাদক। কণিকা নামে আর একখানি মাসিক পত্রও চলিতেছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুর্শিদাবাদে নব সাহিত্যচর্চ্চারও অভাব ছিল না। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুরে এই সাহিত্যচর্চ্চার অত্যন্ত ধূম পড়িয়া যায়। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"তখন বহরমপুরে বাঙ্গলা সাহিত্যচর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেই খানে, তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল, আর ভারতবর্ষের সংস্পৃষ্ট ইংরেজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গলার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতী করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর আমি আসার কিছুকাল পরেই—পিণ্ডাস্তপিণ্ডশেষ স্বয়ং বঙ্কিম চন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এসময়ে বহরমপুরে বাঙ্গলাচর্চ্চার মাহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।

"আমি বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই জজ কাছারির সেরেস্তাদার মহাশয়ের ঘরে একটি নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। * * * এই সভায় বিক্রমাদিত্য ছিলেন—জজ সাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগ। সে ঘরটি তাঁহারই ঘর। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্যামাচরণ ভট্ট বেতাল ভট্ট, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন (জাতিতে বৈদ্য) সুতরাং ধন্বন্তরি, বহরমপুরের সরকারী উকীল দীননাথ গাঙ্গুলী ক্ষপণক, বোধ করি তিনি একটু রাগী ছিলেন মনে করিয়া তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইবে। স্বনামপ্রসিদ্ধ গুরুদাস বাবু তখন বহরমপুরের আইনাধ্যাপক ছিলেন, অবশ্য ওকালতীও করিতেন, তিনি ছিলেন বররুচি, আর পিতৃদেব—কালিদাস। ভোরপুর আসরে যখন নবরত্ন সভা জমকাইয়া বসিয়া আছেন, তখন আমি ওকালতি করিতে গেলাম। কোন বেকান্সি ছিল না যে আমি প্রবেশ করিতে পারি, অথচ নবরত্ন সভা আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে উৎসুক হইলেন। আমাকে উৎকট বিকট সম্মানের পদ প্রদত্ত হইল, আমি হইলাম—রাক্ষস, আমি সমস্যা দিতাম, নবরত্ন পূরণ করিতেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিলে রামদাস ও অক্ষয়চন্দ্রের চেষ্টায় বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়। তৎসম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন—

"মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা প্রচারের সূচনা হইতেই 'বঙ্গদর্শন' প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কত দিন কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খৃষ্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশকরূপে বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন।

লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র

,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

,, জগদীশনাথ রায়

,, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

,, রামদাস সেন

এবং ,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার

এই বঙ্গদর্শনে ও অন্যান্য পত্রিকার লিখিত প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সংকলিত হইয়া রামদাসের ঐতিহাসিক রহস্য, ভারতরহস্য, রত্নরহস্য নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রত্নতত্ত্বে তিনি যে ভারতে ও ইউরোপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় এ স্থলে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তৎপূর্ব্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতালহরী, চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার পরই আর একজন মুর্শিদাবাদ হইতে বীণাঝঙ্কারে বঙ্গসাহিত্যলক্ষ্মীকে পুলকিত করিয়া তুলেন। তাঁহার নাম আচার্য্য চন্দ্রশেখর। যাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম জগতের অনেক সাহিত্যের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, যাঁহার সারস্বত-কুঞ্জের যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্যরত্ন, তাঁহার পরিচয় কি নূতন করিয়া দিতে হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আচার্য্য আজিও মুর্শিদাবাদে তাহার ভগ্নস্তম্ভরূপে বিরাজ করিয়া আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যের যে ইতিহাসালোচনার যুগ আরম্ভ হইয়াছে, মুর্শিদাবাদও তাহাতে নীরব নহে। এই খান হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস ও আরও কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্রের চেষ্টায় বৈষ্ণব সাহিত্যও প্রচারিত হইতেছে। পূর্ব্বে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। মহারাজা তাঁহারই অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি বিধান করুন।

প্রবন্ধ (৬)

মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচনা

(প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ রায় বি, এল)

পুস্তক গত বঙ্গ-ভাষা বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ ; সাধারণতঃ কথাবার্ত্তায় যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায়, এবং প্রতি জেলার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় যেরূপ পার্থক্য, পুস্তক গত ভাষায় এবং প্রচলিত কথার ভাষায়ও সেইরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত কথার ভাষার (Colloquial language) ও স্থান বিশেষে উচ্চারণ ও স্বরের বিভিন্নতা আছে। এবং একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এবং এক জেলার ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আমরা নিম্নে, যথাসম্ভব ঐরূপ বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত দিতে এবং তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্বিভাগে প্রচলিত ভাষাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। নিরক্ষর গ্রাম্যলোকে এবং কৃষকেরা যেরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন এবং যে ভাষায় গীতি, ছড়া, কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়া থাকেন আমরা এই প্রবন্ধে কেবল সেই ভাষারই আলোচনা করিব।

মহারাজ বল্লাল সেন বাঙ্গলাদেশ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগ্ড়ী, মিথিলা এবং বঙ্গ ; তন্মধ্যে এই মুরশীদাবাদ জেলায় রাঢ় ও বাগ্ড়ীর কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। বরেন্দ্র, বঙ্গ এবং মিথিলার কোন অংশ এই জেলায় না থাকায় ঐ সকল বিভাগের আলোচনার কোন আবশ্যকতা নাই, সুতরাং তাহা পরিত্যক্ত হইল। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গলার ইতিহাসে বল্লাল সেনের সময়ে "রাঢ়" ও "বাগড়ীর" যে সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। "'রাঢ়' ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে ভাগীরথী ও পদ্মানদী, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে অন্যান্য রাজগণের অধিকার।" কিন্তু মুরশীদাবাদ জেলায় রাঢ়ের যে অংশ দৃষ্ট হয়, তাহার পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম, এবং দক্ষিণে বর্দ্ধমান।

"বাগড়ী" এই দেশ ত্রিকোণ, সমন্তাৎ জল দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহাকে দ্বীপও বলিত, ইহার পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্ব্বে পদ্মা, দক্ষিণে সমুদ্র। কিন্তু মুরশীদাবাদ জেলায় বাগড়ীর যে অংশ আছে তাহার দক্ষিণে নদীয়া। বাগড়ী কথার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ বলেন "বকেরি" কথা হইতে "বাগড়ী" কথার উৎপত্তি হইয়াছে। "বকেরি" অর্থে "বকচর" গঙ্গানদীর যে পরিত্যক্ত স্থানে "বক চরিত" তাহাকেই "বকেরি" বলিত। এই "বকেরি" এক্ষণে "বাগড়ী" রূপে পরিণত হইয়াছে।

কাহার কাহার মতে বাগড়ীপ্রদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের "ব" দ্বীপাংশে জলঙ্গী ও মেঘনা নদীর অন্তর্নিহিত একটি প্রাচীন জনপদ, ইহার দক্ষিণে সমুদ্র। হিউএন্ সিয়াং এই স্থানকে সমতট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিক্রমপুর নগর এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। এক্ষণে বিক্রমপুর গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত, কিন্তু ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণদিক্ দিয়া উক্ত নদী প্রবাহিত ছিল। কৃষ্ণনগর, মুরলী (যশোহর) ও বর্ত্তমান কলিকাতা এই প্রাচীন সমতটপ্রদেশের অন্তর্গত।

আমাদের মতে "বাগড়ী" শব্দটা "বাকারী" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাগড়ী দেশটা একটা "ব"-দ্বীপ, যাহাকে ইংরাজীতে △ Delta ডেল্টা বলে, যেহেতু উহা দেখিতে গ্রীক্ অক্ষর △ ডেল্টার ন্যায়। "ব"এর ন্যায় আকার যার সে "ব"-আকারী, সন্ধি করিয়া "বাকারী" হইয়াছে। তার পর ক্রমে কথোপকথনের ভাষায় "বাকৃরী" হইয়াছে যথা বাতাসার স্থানে "বাৎসা"। "বাকৃরীর" বাক্ স্থানে "বাগ্" হইয়াছে, যথা "শাক্" স্থানে শাগ্; তার পর "রী"-র স্থান "ড়ী" হইয়াছে যেহেতু অনেকে "র"এর স্থানে "ড়" উচ্চারণ করেন যথা "হরি" নামক চাকরকে ডাকিবার সময় ডাকেন—"ওরে হড়ি"—"হড়্যারে"—ইত্যাদি। এইরূপে "বাকারী" শব্দ হইতে "বাগ্ড়ী" শব্দ উৎপন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক, এবং আমরা তাহাই বিশ্বাস করি।

"রাঢ়" কথাটার ব্যুৎপত্তি লইয়া এতদ্দেশে নানা জনের নানা মত প্রচলিত আছে, কেহ কেহ বলেন ইহা বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশ। কাহার কাহার মতে এই শব্দ সংস্কৃত "রাষ্ট্র" শব্দের অপভ্রংশ। আবার কেহ বা "লাউ" হইতে "রাঢ়" শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত কল্পনা, এত জল্পনা ও এত অনুমানের পরেও কেহ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

কেহ কেহ বলেন "রাঢ়" শব্দ সংস্কৃতমূলক নহে, ইহা খাঁটি দেশী শব্দ। সাঁওতালী ভাষায় "রাঢ়ো" শব্দ আছে, তাহার অর্থ নদীগর্ভস্থ শৈলমালা বা পাথুরিয়া জমি। এই সাঁওতালী বা দেশ্য শব্দ হইতে "রাঢ়" শব্দ সম্ভবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দে মাগধীভাষায় রচিত জৈন অঙ্গ মধ্যে "রাঢ়" দেশের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশ এই স্থান "লার" নামে, খৃষ্টীয় ৯ম

শতাব্দে উৎকীর্ণ ধর্ম্মপালের সংস্কৃত তাম্রশাসনে "লাট" নামে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তামিলগ্রন্থ ভাষায় উৎকীর্ণ রাজেন্দ্রচোলের শৈললিপিতে "লাড়" নামে এবং ঐ সময়ের সংস্কৃত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে "রাঢ়" নামে এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মুরশীদাবাদ জেলার উত্তরাংশে যেখানে ভাগীরথী দক্ষিণমুখী হইয়াছেন, সেই স্থান হইতে হাবড়া জেলা পর্যান্ত ভাগীরথীর সমুদায় পশ্চিমাংশ এক সময়ে "রাঢ়" নামে খ্যাত ছিল।

খৃষ্টীয় ১২ শ শতাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের পরিচয় প্রদানকালে বর্ণনা করিয়াছেন,—"গঙ্গার দুই ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি পক্ষ। গঙ্গার পশ্চিম দিকে "রাল" (রাঢ়) এই ধারেই লখ্‌ণোর নগরী এবং পশ্চিম (বা উত্তর ধার) বরিন্দ (বরেন্দ্র) নামে খ্যাত।

মিন্‌হাজের বর্ণনায় মনে হয় যে, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় বর্ত্তমান বীরভূম, বর্দ্ধমান্ বাঁকুড়া ও সাঁওতাল পরগণা ও হুগলী জেলা "রাঢ়" নামেই প্রসিদ্ধ এবং "লখ্‌ণোর" বা লক্ষ্মণ নগরে "রাঢ়" দেশের রাজধানী ছিল। সেই লক্ষ্মণনগর এখন বীরভূমের মধ্যে কেবল "নগর" নামেই খ্যাত।

(বিশ্বকোষ ১৬শ ভাগ, ৪১৩ পৃঃ।)

যাহা হউক—"রাঢ়" এই শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে—"মহাজনো যেন গতঃ সঃপন্থা" প্রবচনটির অনুসরণ করাই যুক্তি যুক্ত মনে করিতেছি। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার "বঙ্গদর্শনে" একবার "রাঢ়" কথাটার উৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহারই পুনরুল্লেখ করিব। তাঁহার মতে সংস্কৃত "গঙ্গারাষ্ট্র" কথা হইতে "গঙ্গারাট্" "গঙ্গারাট্" হইতে "গঙ্গারাঢ়্" অবশেষে পূর্ব্ববর্ত্তী "গঙ্গা" শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া "রাঢ়" রূপে পরিণত হইয়াছে। "গঙ্গা" শব্দ পরিত্যক্ত হইবার অনুকূলে তিনি এই যুক্তি দিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তিকে "গঙ্গা তীরস্থ" করিল না বলিয়া যেমন "তীরস্থ" করিল বলিলেই যথেষ্ঠ হয়, এও তদ্রূপ। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক, মিগাস্থেনিস্ (Megasthenes) তৎকৃত গ্রীক্ ইতিহাসে "রাঢ়" কে "গঙ্গা রেঢ়ী" (Ganga rari) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই মুরশীদাবাদের গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থান গুলি "রাঢ়" এবং পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী স্থান গুলি সাধারণতঃ "বাগ্‌ড়ী" নামে অভিহিত। সুতরাং, আজিমগঞ্জ অঞ্চলে অবস্থিত স্থানগুলি সমগ্র, লালবাগ ও জঙ্গীপুরের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী স্থানগুলি 'বাগ্‌ড়ী' ও পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থানগুলি "রাঢ়" নামে পরিচিত। এই "রাঢ়" ও "বাগড়ীর" প্রচলিত ভাষায় স্বর, উচ্চারণ এবং শব্দগত অনেক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। রাঢ়ের যে সকল স্থান সাঁওতাল পরগণার নিকটবর্ত্তী, সে সকল স্থানে রাঢ়ীয় বঙ্গভাষায় সাঁওতালদিগের অনেক কথা স্থান লাভ করিয়াছে, এবং যে সকল স্থান পশ্চিম বঙ্গের নিকটবর্ত্তী বা পশ্চিম দেশীয় ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত, সে সকল স্থানের বঙ্গভাষায় অনেক হিন্দিকথা, পশ্চিমদেশীয় উচ্চারণ প্রণালী ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম রাঢ়।	পূর্ব্ব রাঢ়।	বাগ্‌ড়ী।	পুস্তক গত বাঙ্গলা।
হামি	আম্হি	আমি	আমি
হামাকে, মোকে	আম্হাকে	আমাকে	আমাকে
তুম্হি	তুমি	তুমি	তুমি
তুম্হাকে	তুমাকে	তুমাকে	তোমাকে
ছে	ছে	সে	সে
কহিছ	বুল্‌ছো	বুল্‌ছো	বলিতেছ, কহিতেছ
যেছো	যেছো	যাইছ	যাচ্ছ, যাইতেছ
গেল্‌ছিলা	গিয়াছিলা বা যেয়াছিলা	গিয়াছিল্যা বা যেয়াছিল্যা	গিয়াছিলে
কত্তি	কত্তি, কুন্‌ঠিঁয়ে	কুঠে, কত্তি	কোথায়
গাহন	ঘাঁটা	পথ	পথ
ওসারা	ওসারা	পিঁড়্যা	বারান্দা
আগীনা	আগ্‌নে	আগ্‌নে, আঙ্গ্‌নে	আঙ্গিনা
লক্ষ্যাৎ	মতন	মুতন	মত
হামার ঘের মোর ঘের	হামারদের	আমাধেরে	আমাদিগের
নাছ	নাছ	নাছ, বাটির সম্মুখীন স্থান।	বাটীর সম্মুখীন স্থান
মাহা	মাছ	মাছ	মৎস্য
বিক্যা	কিকা	বড্ডা	বড়
ব্যাখিল্	বুঝিন্	বুজিন্	বুঝি
ত্যাঁদড়্	ত্যাঁদড়	কল্লা, দুষ্টু	দুষ্ট
সান	সান	গিয়ান, সান	জ্ঞান
দোহন	দুধ্যাল	দুধ্যাল্	দুগ্ধবতী
মেয়্যা	সী	চী	স্ত্রী

পশ্চিম রাঢ়।	পূর্ব্ব রাঢ়।	বাগড়ী।	পুস্তকগত বাঙ্গলা।
ভ্যাংরা	খাচরা	খাচড়া	দুশ্চরিত্র
বাহিন্নালা	”	”	গালিবিশেষ
চোঁহা	চোঁহা	চুম্যা	চুমো, চুম্বন
চিক্যাস্	চিক্যাস্	চিক্যাস্	আলো
গোড়্যা	গোড়্যা	গাড়্যা	গর্ত্ত
রোক, এখে,	কুশুর, কুশাইর	আক্, কুশোর	ইক্ষু
ওঝা	রোঝা	রোঝা ও ওজা	কবিরাজ
গুধ্যা	ছাইলা বা গুধ্যা	গোদা, ছেল্যা	ছেলে
গুধী	ছাইলা	গুদী, মেয়্যা	মেয়ে
ওটে	ওটে	ওরী বা ওরীএ	ওলো, ওলা (স্ত্রীলোকের সম্বোধন বিশেষ)
গাজর	গাজল্	গাজল্, বাদল	বাদলা বা বর্ষা
এওরে	এওরে	এদিক্	এদিকে
ওঁরে	ওঁরে	উদিক্	ওদিকে
সরম্	সরম্	নজ্জা	লজ্জা
ডর	ডর	ভয়, ডর	ভয়
ওখনি	ওখনি	ওখ্নি, পরে	ভবিষ্যতে
ভোইঁড়্	পা	পা	পা, বা পদ
পৌহাতে	পোহাতে, শোনকালে	বিহ্যানে, বড়্ভ্যানে	প্রাতঃকালে
ছেল্যা (পুত্র কন্যা উভয় অর্থে)	ছেল্যা (পুত্র কন্যা উভয় অর্থে)	ছেল্যা (পুত্রার্থে)	ছেলে
ওঁতাল	ওঁতা'ল	উরালী	অপদার্থ
লিতুই	লিথ্ুই	নিত্তি	নিত্য, রোজ।

(ক) রাঢ় অঞ্চলে 'শ' ও 'স' এর স্থানে প্রায়শয়ই 'ছ' (১) উচ্চারণ করিয়া থাকে 'বোছেছিচ্' অর্থাৎ বসেছিস্। 'ছিথানে দিবার বালিছ নাই' অর্থাৎ সিতানে দিবার বালিস নাই। ছামছুন্দর ঠাকুর অর্থাৎ শ্যামসুন্দর ঠাকুর।

(খ) কতকগুলি শব্দের অন্তস্থ 'ল' এর স্থানে 'ছ' অন্ত্য 'আ'কারের ও 'এ'কারের স্থানে 'য-ফলা-আকার' ব্যবহার করিয়া থাকে যথা:—কুল্যা (কুলা), বুন্যা (বুনা), বিহ্যা (বিয়ে) বুঢ়্যা (বুড়া), তুল্যা (তুলা)।

(গ) 'ড়' এর স্থানে 'ঢ়' যথা বুঢ়্যা (বুড়া), কুঢ়্যা (কুড়ে) ইত্যাদি।

(ঘ) কতকগুলি অকারান্ত ক্রিয়া পদের 'অ'কার স্থানে 'উ'কার ব্যবহার করিয়া থাকে যথা:—বুল (বল), বুল্‌ছি, বুল্‌বো ইত্যাদি।

(ঙ) 'ও'কারাদ্য ক্রিয়া পদের 'ও'কার স্থানে 'উ'কার ব্যবহার করিয়া থাকে যথা—বুঝ অর্থাৎ বোঝ, চুষ অর্থাৎ চোষ, পুষ অর্থাৎ পোষ ইত্যাদি।

(চ) অসমাপিকা ক্রিয়ার অন্ত্যভাগে 'ইকার' ও (ং) সংযোগ করিয়া থাকে যথা—করিং (করিয়া) যাইং (যাইয়া) ডুবিং (ডুবিয়া) বসিং (বসিয়া) ইত্যাদি যথা—রাম গাছতলায় বসিং গপ্প কর্‌ছিল। 'চক্যাছ ডুবিং গ্যাল হামরাও ঘরকে গেলাম' ইত্যাদি। আম-গাছ তলায় বসে গল্প কচ্ছিল, সূর্য্যও ডুবে গেল, আমরাও ঘরে গেলাম।

(ছ) কতকগুলি ক্রিয়াপদের ভূতকালে প্রথমবর্ণের পরে একটি হসন্ত 'ল'কারের আগম করিয়া থাকে যথা—'তুমাকে জ্বর হোল্‌ছিল?' অর্থাৎ তোমার কি জ্বর হয়েছিল? 'তুমি কতি গেল্‌ছিলা?' অর্থাৎ তুমি কোথায় গিয়াছিলা? ইত্যাদি।

(জ) কতকগুলি স্বরাদ্য বিশেষ্য পদের স্বরবর্ণের স্থানে 'র' উচ্চারণ করিয়া থাকে যথা—'রাম' (আম্ বা আঁব), রুকীল অর্থাৎ উকীল।

(ঝ) কতকগুলি বিশেষ্য পদের অন্ত্য 'র'কারের স্থানে অকার উচ্চারণ করিয়া থাকে যথা আত্তিরে অর্থাৎ রাত্তিরে, অসিক লোক অর্থাৎ রসিক লোক ইত্যাদি।

বাকপ্রণালী (IDIOM)

(ক) পুস্তকগত ভাষা—'দুই দলে বড়ই মারামারি হয়েছিল।' রাঢ়ের ভাষা—'দোন দলে বড্ডা মারিমারা হোল্‌ছিল। ঐরূপ 'গালাগালি'র স্থানে রাঢ়ে 'গালি-গালা' বলিয়া থাকে।

রাঢ়ের ভাষা—'আমার কেতাব খান নিয়া আন তো', পুস্তকের ভাষা নিয়ে এসো তো।

---

(১) 'ছ' বলিলেও প্রকৃত উচ্চারণ হয় না, সংস্কৃত ভাষায় 'স' এর যেরূপ উচ্চারণ এখানে তাহাই হইবে' পাছে লোকে 'স' এর ন্যায় উচ্চারণ করে এই ভয়ে আমরা উহার উচ্চারণ 'ছ' এর মত লিখিলাম।

(খ) রাঢ়ের লোকেরা 'গম' প্রভৃতি গত্যর্থবোধক ধাতুকে সকর্ম্মকরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু পুস্তকগত বাঙ্গালা ভাষায় উহা অকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত হয় যথা :—রাঢ়ে— জলকে চল, ঘরকে যাও, ধান্‌কে গেল্‌ছিলাম, এখানকে এস ইত্যাদি অর্থাৎ জল আন্‌তে চল, ঘরে যাও, ধান আন্‌তে গিয়াছিলাম, এখানে এসো ইত্যাদি।

একটি রাঢ়ের কবি লিখিয়াছেন—

"একি জ্বালার উপর জ্বালা, জলকে যেতে আঁচল ধরে কালা ?" (১)

(গ) বোধ হয় ইঁহারা সংস্কৃত বাক্‌প্রণালী (Idiom) বজায় রাখিয়াছেন, যথা গৃহং গচ্ছ ইত্যাদি। পুস্তক গত বাঙ্গালায় যে স্থানে 'আচ্ছা' কথা ব্যবহৃত হয় সে স্থানে রাঢ়ের লোকেরা 'হো'ক্' কথা ব্যবহার করিয়া থাকে যথা 'কাল তুমি হামার বাড়ীকে যাইও, হো'ক'— উত্তর 'হো'ক' অর্থাৎ কাল তুমি আমার বাড়ী যেও আচ্ছা—উত্তর—আচ্ছা।

এটিও বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে সংস্কৃত 'তথাস্তু' 'তাহাই হউক' এইখানে 'তাহাই' কথাটার লোপ হইয়া কেবল হো'ক (হউক) কথাটা রহিয়া গিয়াছে।

রাঢ়ীয় ভাষায়, পুস্তকগত বাঙ্গলার অস্মদ্, যুষ্মদ্, তৎ ও অদস্ শব্দের রূপগত পার্থক্য লক্ষিত হয় এখানে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অস্মদ্-শব্দে।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা (কর্ত্তৃকারকে)	হামি বা আমি।	হামরা বা আমরা।
দ্বিতীয়া (কর্ম্মকারকে)	হামাকে, মোকে	হাম্‌রাকে, আমাদিগে।
তৃতীয়া (করণ)	হামাকে বা মোকে দিয়া	হামরাকে বা মোঘের দিয়া।
চতুর্থী	হামাকে,	হামারঘেরকে।
পঞ্চমী	আমাহেঁাৎকে	আমারঘের হেঁাৎকে।
ষষ্ঠী (সম্বন্ধ)	হামার, মোর,	হামারঘের, মোঘের।
সপ্তমী	হামাতে, মোতে,	হামরাতে।

যুষ্মদ্-শব্দে।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	তুমি, তুই,	তুমরা, তোরা।
দ্বিতীয়া	তুমাকে, তোমাকে,	তোম্‌রাকে, তোরাকে।
তৃতীয়া	তুমাকে বা তোকে দিয়া,	তোম্‌রাকে বা তে-

(১) আমাদের প্রসিদ্ধ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্"।

চতুর্থী	তুমাকে, তোকে,	তোমরাকে, তোরাকে।
পঞ্চমী	তুমা বা তোকে হোঁৎকে,	তোমরাকে বা তোরাকে হোঁৎকে
ষষ্ঠী	তুমার, তোর,	তোমারঘের।
সপ্তমী	তুমাতে, তোতে,	তোম্‌রাতে।
সম্বোধন	তুমি, বা তুই।	তোম্‌রা বা তোরা।

তৎ ও অদস্‌-শব্দ।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	ছে, ও	অরা।
দ্বিতীয়া	তাকে, অকে,	অরাকে।
তৃতীয়া	তাকে দিয়া,	অরাকে দিয়া।
চতুর্থী	তাকে, অকে,	অরাকে।
পঞ্চমী	তাকে হোঁৎকে, অকে হোঁৎকে,	অরাকে হোঁৎকে।
ষষ্ঠী	তার বা অর,	তার ঘের, অর ঘের।
সপ্তমী	তাতে, অতে,	তাঘেরে, অঘেরে।
সম্বোধন	০	০

নিরক্ষর কৃষকদিগের এবং গ্রাম্যলোকদিগের ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, তাহাদের সাংসারিক অবস্থা, অবস্থা বিশেষে মনের ভাব এবং সংসর্গাদি জানিতে হইলে তাহাদের রচিত ছড়া, কবিতা, গ্রাম্যগীতি ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা এই প্রবন্ধে রাঢ় অঞ্চলের সেইরূপ কতকগুলি ছড়া কবিতা ও গানের উল্লেখ করিয়া তাহাদের অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। রাঢ় অঞ্চলের গ্রাম্য কবিতার একটা নমুনা দেখুন।—

১। "চঠুইয়েরে (১) মটুইটি (২) দুয়ারে বসো সা (৩)।
হাপুত মালার (৪) কাণফুড়নের (৫) লাড়ু বাঁধসা (৬)।
ছোট ছোট লাড়ু গালা (৭) গালে ভরসা।
বড় বড় লাড়ু গালা তেলেয় (৮) ভরসা।
সব্‌ জামাই এলো আমার ল্যাতাড় বাঁধিয়ে (৯)
ছোট জামাই এলো আমার ডুগডুগী বাজিয়ে (১০)।

---

(১) চঠুইটি—চড়ুই পাখী। (২) মঠুইটি—চঠুইটির অনুশব্দ যথা ঘোড়া টোড়া, গরু টরু ইত্যাদি। (৩) সা—বসো সিয়ে বা বোস এসে। (৪) হাপুত মালা—ছোট ছোট ছেলের প্রতি স্নেহসূচক সম্বোধন (৫) কাণ ফুড়নের—কর্ণবেধের (অর্থাৎ কর্ণবেধ ব্যাপারের)। (৬) বাঁধো সা—বাঁধো এসে। (৮) তেলেয়—বড় হাঁড়ীতে। (৯) ল্যাতাড় বাঁধিয়ে—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া। (১০) ডুগ্‌-ঝাঁক জমকের সহিত।

ভাঙ্গা ঘরে শুয়োনা জামাই ইঁদুরে নিবে কাণ।
ভাল ঘরে শুয়ো জামাই, কন্যা পাবে দান।
কন্যার কপালে উঠে দুতীয়ার (১) চাঁদ।"

উপরের উদ্ধৃত কবিতাটি একটি ছেলে ভুলানো ছড়া, ইহার অর্থ এই :—হে চড়াই পাখি! আমার দুয়োরে এসে বোসো, আমার ছোট খোকার কর্ণবেধ হবে, তুমি আসিয়া লাডু বাঁধিয়া দাও। ছোট ছোট লাডুগুলি তুমি নিজে খাইও, বড় বড় লাডুগুলি বড় হাঁড়িতে পুরিয়া রাখিও। আমার সকল জামাতা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিল, ছোট জামাইটি বড় জাঁক জমকের সহিত আসিতেছে। হে জামাতৃগণ তোমরা ভাঙ্গা ঘরে শুইও না ইঁদুরে কাণ কাটিয়া লইবে, ভাল ঘরে শুইও তাহা হইলে কন্যাদান পাইবে। আর কন্যার কপালেও দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠিল অর্থাৎ জামাই আসিয়াছেন, অতএব আশার ক্ষীণালোক দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় তাহার অদৃষ্টাকাশে দেখা দিতেছে।

পাঠক, এখন দেখুন, স্বভাব সরলা গ্রাম্যসীমন্তিনীর এই ছড়াটি কেমন নগ্ন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; কোকিল, পাপিয়া বা ময়ূর তাহার সহচর নহে, তাহার স্নেহের খোকাটির কর্ণবেধ উপলক্ষে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ না করিয়া সে তাহার চিরসহচর চড়াই পাখী যাহারা সর্ব্বদা তাহার খড়ের চালের বাতায় বাতায় বেড়ায় তাহাদিগকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছে। তাহার খোকার কর্ণবেধ ব্যাপারে বাহ্যাড়ম্বর কিছুই নাই, ছানাবড়া, পানিতোয়া, রাতাবি বা লুচি মণ্ডার কোন ব্যবস্থা নাই, আছে কেবল লাডুর ব্যবস্থা। রাঢ়ে সে লাডুগুলিও মুড়ী ও গুড়দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনি একা সেই লাডু প্রস্তুত করিতে অক্ষম, তাই তাঁহার নিত্য সহচর চড়াই পাখীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিতেছেন। তাহাদিগকে এই ব্যাপারে যে বেগার খাটিতে হইবে তাহা নহে তাহারা ছোট ছোট লাডুগুলি অগ্রে খাইতে পাইবে, কেবল বড় বড় লাডুগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত বড় হাঁড়ীতে তুলিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার প্রিয় পুত্রের কর্ণবেধ-ব্যাপারে জামাতৃবর্গের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন করিতেছেন, ছোট জামাইটি বোধ হয় বড়লোক হইবেন, তাই ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে জাঁক জমকের সহিত আগমন করিতেছেন। রাঢ়ের গৃহস্থগণের যে গৃহে শস্যাদি রক্ষিত হয় সে গৃহে প্রায়শই ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, ইন্দুরেরা ঘরের মেজে, মাটির দেয়াল খুঁড়িয়া এবং চালের বাতী কাটিয়া সে ঘর খানিকে শীঘ্রই ভগ্ন ও নষ্ট করিয়া ফেলে। জামাইগণ আদরের পাত্র, তাই তাঁহাদিগকে ভগ্ন গৃহে শয়ন করিতে নিষেধ করা হইতেছে এবং বিদ্রুপচ্ছলে ইন্দুর কর্ত্তৃক কর্ণচ্ছেদের ভয়ও প্রদর্শন করা হইতেছে। জামাতৃগণকে ভাল গৃহে শয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে, [illegible] শয়ন করিলে কন্যাগণ কর্ত্তৃক উপসেবিত হইবেন এ প্রলোভনও দেখা[illegible] [illegible]গণের

(১) দুতীয়ার—দ্বিতীয়ার।

হৃদয়াকাশে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় পতিমিলনাসার ক্ষীণ কৌমুদী প্রতিভাত হইল তাহাও সূচিত করা হইতেছে।

২। রাঢ়দেশের একজন কৃষকের গীত শুনুন :—

"হেঁড়ে (১) কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে—দাদারে!
ঘুরে এসো বাড়ী।
তুমার জন্য,—দাদারে।—
ভেবে আমি মরি।
ত্যানা (২) ভিজ্যা যাইবে—দাদারে!
জাড় (৩) লাগ্‌বে গায়,
কত ধান হবে,—দাদারে!—
কিন্‌বো দুধ্যাল (৪) গাই।"

বায়ুকোণে মেঘ উঠিয়াছে, দাদা, তুমি বাড়ী ফিরে এসো, দাদা, তোমার জন্য আমি ভেবে ভেবে মরি। জলে নেংটি ভিজে যাবে এবং গায়ে শীত লাগ্‌বে। এবার কত ধান হবে আমরা দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিব।

বৈশাখ মাস, ভূমি কর্ষণের সময় আগত, আকাশে, বায়ুকোণে নব-কাদম্বিনীর সঞ্চার হইয়াছে, কৃষকের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না—সে ভূমি কর্ষণের নিমিত্ত হল স্কন্ধে করিয়া ক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু কৃষকের কনিষ্ঠ ভ্রাতার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ভ্রাতৃপ্রেমে কাণায় কাণায় পূর্ণ, "স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে," সুতরাং তাহার ভয় হইল, পাছে বৃষ্টির জলে তাহার দাদার ক্ষুদ্র ছিন্ন বস্ত্রখানি ভিজিয়া যায় এবং সে শীতে পাছে কষ্ট পায়, তন্নিমিত্ত দাদাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ডাকিতেছে, দাদা, তোমার বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাঠে যাইবার প্রয়োজন নাই, বাড়ী ফিরিয়া এসো, ঈশ্বরের কৃপায় এবার প্রচুর পরিমাণে ধান্য হইবে, তদ্দ্বারা আমরা দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিব। দেখুন সরল স্বভাব কৃষকের হৃদয়ে কেমন ভ্রাতৃস্নেহ,—মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গলানুষ্ঠানের উপর কেমন দৃঢ় বিশ্বাস, কেমন নির্ভর।

৩। তারপর একটি যুবতী কৃষক-রমণীর গীত শুনুন :—

"আল্‌গা কোর্‌যা বাঁধিনিখো,—
বেঁধ্যাছিলাম দোড়্যাতে। (৫)
পড়াণ্‌-নাথ (৬) ছেড়্যা গ্যালা সই,—
সন্ধ্যাব্যালার ঝট্‌কাতে (৭)"

...ণ। (২) ত্যানা—ছেঁড়া ছোট কাপড়, ন্যাকড়া। (৩) জাড়—শীত। (৪) ... দোড়্যাতে—মোটা কাছি দ্বারা। (৬) পড়ান নাথ—প্রাণনাথ।

সই ! আমি ত ঢিল্ করিয়া বাঁ[illegible]

আমার প্রাণনাথ সন্ধ্যাকালীন প্রবল ঝটি[illegible]

অভাগিনী কৃষক-রমণী তাহা[illegible]

কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না, কিন্তু নির্দ্দয় বিধাতার কি অখণ্ডনীয় নিয়ম, যে প্রবলরোগের যন্ত্রণায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার হৃদয়বল্লভ ইহ জন্মের মত তাহার প্রণয়পুত্তলীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অনাথিনী কৃষক-রমণীর আশার দীপ নিভিয়া গেল, সংসারের সকল বন্ধন ছিঁড়িল। বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায়শই আকাশে মেঘের সঞ্চার হয় এবং ঐ সময় প্রবল ঝটিকাও উত্থিত হইয়া থাকে। এখানে ভীষণ-রোগ যন্ত্রণাকে, ঐ ঝটিকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ঝটিকা যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে জগৎ সংসার উড়াইয়া লয়, সেই ভীষণ রোগও সেইরূপ তাহার হৃদয়ের অধীশ্বরকে উড়াইয়া লইয়াছে, এবং তাহার সহিত তাহার সকল আশা, ভরসা নির্মূল হইয়াছে।—অহো! অনাথিনী পতি-বিয়োগ-বিধুরা কৃষকরমণীর কি মর্ম্মস্পর্শী ভীষণ শোকোচ্ছ্বাস। এই উচ্ছ্বাসের প্রতি তরঙ্গ আমাদিগের হৃদয়ে গভীর সমবেদনা জাগরিত করিতেছে।

আর একটি :—

৪। "দুখের কথা বুলবো কি সই !—
মনে পাই যে ব্যাথা।
প্যাটে খাইতে না পাই ভাত,
জাড়ে জাড়ের কাঁথা।
শাগ্ তুল্লাম, পাতা তুল্লাম—
চিরোল্ চিরোল্ (১) পাতা।
ব্যাঁতে (২) দিতে পেল্যাম নারে—
আমি যাব কুথা ?
না দিলে মা চূণ খড়কী (৩)—
না দিলে প্যাটারি ; (৪)
বুঢ়ার সঙ্গে বিহ্যা দিলে
ব্যাতার(৫) ঘরে ভারি।
লদীকার (৬) লোকে বুলে
এটা তুমার কে ?
লাজের ভয়ে বুলি আমি
ঠাকুর বাবা (৭) হে !"

(১) চিরোল চিরোল পাতা—টাটকা বড় বড় পাতা। (২) ব্যাঁতে—মুখে। (৩) চূণ খড়কী—চূণ মাখান পানের বোঁটা। (৪) প্যাটারি—বেতের ঝাইল। (৫) ব্যাতার—বে-বন্দোবস্ত। (৬) লদীকার—নদীর অপর পারের। (৭) ঠাকুর বাবা—ঠাকুর্দ্দা।

একটি কৃষক বালিকার এক বৃদ্ধ বরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ভাগ্যে দাম্পত্য প্রেম ঘটে নাই। সংসারে দাম্পত্য প্রণয়ের অভাব হইলে যে সকল বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে তাহা এই ক্ষুদ্র সংসারে ঘটিয়াছিল; তাই কৃষক বালিকা দুঃখে পড়িয়া গাহিতেছে:—সই দুঃখের কথা আর কি বলিব? বলিতে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাই। পেটে অন্ন মিলে না, শীতকালে শীতবস্ত্র (কাঁথা খানাও) পাই না; খাইবার জন্য টাটকা বড় বড় পাতা বিশিষ্ট কিছু শাক সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাও মুখে দিতে পাইলাম না—হায়! আমি কোথায় যাইব? মা আমাকে কাপড় রাখিবার জন্য একটা বেতের পেটরা দেন নাই, পান খাইবার নিমিত্ত চূণ তুলিবার একটা খড়কীও দেন নাই। তাহার উপর বৃদ্ধ বরের সহিত বিবাহ দিয়াছেন, সংসারে দিন রাত বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছে। স্বামী এত বৃদ্ধ যে লোকের নিকট তাহাকে স্বামী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের বাড়ীর নীচে একটা ক্ষুদ্র নদী আছে, ঘাটে গেলে যখন নদীর অপর পারের কোন লোক জিজ্ঞাসা করে যে ও তোমার কে হয়? তখন আর কি উত্তর দিব, লজ্জায় পড়িয়া বলি "আমার ঠাকুরদা হয়"। বাস্তবিক "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" হইলে বৃদ্ধপতি স্ত্রীর যতই আদর করুন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম সম্ভবে না। কালে দম্পতীর মধ্যে কলহ ও বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং সে সংসারে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। ক্রমে সেই বিষবৃক্ষ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া সংসার অশান্তিময় করিয়া তুলে। গৃহিণী সংসারের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না, কর্ত্তারও সংসারে বড় একটা স্পৃহা থাকে না, সংসারের দ্রব্যজাত স্থানভ্রষ্ট ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, চির অভাব ও চির-অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে। দেখুন, এই কৃষক বালিকার শোকগাথা অশান্তিময় কৃষক সংসারের কি জ্বলন্তচ্ছবি আমাদিগের সম্মুখে ধরিয়াছে।

রাঢ়ীয় কৃষকদিগের পূর্ব্বরাগ গীতি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি শুনুন,—

"দাঁড়িং নাছে কল্‌সী কাঁখে আড় নয়ানে চায়।
লাকে ললক্ পৈঁছে হাতে আটবেঁকি তার পায়।
পড়নে তার নীলাম্বড়ী করবী খোঁপায়
পড়ান্ মন মোর লিলে কাড়িং সাঁজেরো বেলায়।"

কৃষকের প্রেমাস্পদ একদিন সন্ধ্যাকালে বাটীর সম্মুখীন পথে কলসী কক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং কৃষকের প্রতি কুটিল কটাক্ষবাণ হানিতেছেন, তাঁহার নাকে নোলক, হাতে পৈঁছে, আর পায়ে আটবেঁকি, (একরূপ বেঁকা মল) পরিধানে নীলাম্বর এবং খোঁপায় করবী পুষ্প শোভিতেছে এবং রূপে কৃষকের মন-প্রাণ হরণ করিতেছেন।

দেখুন প্রেমের কি মোহিনী শক্তি, প্রেম কুৎসিৎকেও সুন্দর করে, নরককেও স্বর্গ করিয়া তুলিতে পারে। ঐ পল্লী-বিহারিণী কৃষকযুবতীর সামান্য বেশ ভূষাই তাহার প্রণয়পাত্রের মন প্রাণ হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রেম যখন প্রণয় প্রণয়ীর মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে, তখন কোনরূপ কৃত্রিম বেশ ভূষার আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই বনচারিণী বল্কল-

পরিধানা, বনকুসুমালঙ্কৃতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত কহিয়াছিলেন :—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপিরম্যম্।
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি॥
ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।
কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"

জঙ্গীপুর অঞ্চলের রাঢ়দেশের কৃষকগণ—ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া কিরূপ গীত রচনা করিয়াছেন দেখুন। এটি মুসলমানী ভাষা।

সহর হ'তে বাহির হ'লো নবাব সহর কোরে খালি,
দিনে দিনে সোণার বরণ হ'য়ে গেল কালি।
মার লাগিল রে গিরিয়ার ময়দানে। (ধুয়া)
পূর্ব্বেতে করিল মানা, নানা জাফর খাঁ,
ভাল মন্দ হ'লে নবাব (১) সহর ছেড়োনা।
নবাবের তাম্বু পড়িল ব্রাহ্মণের স্থলে,
আলিবর্দ্দীর তাম্বু তখন পড়িল রাজমহলে।

* * * * * * *

* * * * * * *

গোয়াস্ খাঁ বলিল তখন শুন নবাব তুমি,
আলিবর্দ্দীর শির এনে দিব আমি।
শুন, শুন, ওরে গোয়াস খাঁ, তুমি পাঠানের জাতি।
ময়দানে পড়িল যেন মার আর কাটি।
শুন, শুন, ওরে গোয়াস খাঁ বলি যে তোমাকে,
ভাই জান মিলিতে আসে লড়াই দিব কাকে। (২)
খোজা বসন দুই ভাই ইমানের পোয়া,
জল্দী করে খবর নেহ সুতীর দরগা গিয়া।
লাখ টাকার সিন্নি পেয়ে মর্ত্তুজা (৩) দিল বর,
তোমার মহিম (৪) ফতে হবে কাল সওয়া প্রহর।
জল্দী করে হুকুম দেরে নবাব জল্দী করে,
ঘোড়া চড়ে যাব আমি সুতীর দরগাতে।

---

(১) নবাব সরফরাজ খাঁ। (২) আলিবর্দ্দী চাতুরী করিয়া সরফরাজকে লিখিয়াছিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, এখানে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। (৩) সুতীতে মর্ত্তুজা নামক এক প্রসিদ্ধ ফকিরের সমাধি ছিল, তথাকার দরগা মুসলমানদের বিশেষ পূজ্য ছিল। (৪) মহিম—যুদ্ধ।

সোওয়া সের আটার নোয়া, পোওয়া ভর্ ঘী,
একা লবে গোয়াস খাঁ সকলের—জী।
গোয়াস খাঁর ঘোড়া দেখে পান তৈয়ার করিল,
সওয়া শত টাকার সিন্নি গোয়াস খাঁরে দিল।
হায় গো আল্লা বারিতালা, খোয়াব (১) দিল রেতে,
গোয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দ্দীর সাথে।
মার মার করে গোয়াস খাঁ লড়াই করিল,
কলার বাগান যেন ঝুড়িতে লাগিল।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রহে,
একেলা করিল লড়াই গোয়াস খাঁ ঢাল মুড়ি দিয়ে।
ভাল ভাল কামান সাজায়ে কামান করিল বিলি,
নবাবের কামানে ভরে ইঁট আর বালি। (২)
কালিয়া মেঘের আড়ে যেন মেঘ চিক্‌চিকে,
গোয়াস খাঁর তরবারি যেন বিজলী চটকে।
দশ কাঠা নিয়ে গোয়াস খাঁর ঘোড়া ফিরে,
হাজার হাজার পল্টন কাটে এক এক চক্করে।
হাজার হাজার পল্টন কেটে ময়দান করিল,
ভাল ঘোড়ায় চড়াইয়ে নবাবকে বিদায় দিল।
হাতী প'ড়ল তুলতুল্‌লিতে, ঘোড়া প'ড়ল রণে,
পাঞ্জাদার ডুবাইল সাহস বিলের ঘোনে।

জঙ্গীপুর অঞ্চলের রাঢ়ের আলকাপের গান ঃ—

(মুসলমানী ভাষা)

জামাই, শাশুড়ী এবং বৌএর উক্তি।—

১। জামাই—

আমি তো ছেড়ে যাব না ঠাকুরান্ ফট্ করে দেন বিদায় করি।
গেখ্‌না (১) করো না, আমি তো ছেড়ে যাবনা।

শাশুড়ী—

যারে যা গোলামের বেটা, জামাই গাট্টা হাঁটাস্ না থানা।
ছোটতে বিদায় কোরব না, ছোটতে বিদায় কোরব না।

---

(১) খোয়াব—স্বপ্ন। (২) সরফরাজ খাঁর কোন কর্ম্মচারী বারুদ ও গুলির পরিবর্ত্তে ইঁট ও বালি কামানে পুরিয়াছিলেন।

জামাই—

ছোট ছোট বল ঠাকুরাণ্ আধেক মেয়ে হ'লো,
ঘর কোরবার বাঞ্ছা আছে তো মায়ে বেটীতে চলো।

"বৌ"এর উক্তি—

মা গে মা, লিতে এসেছে আমাকে তোর জামাই প্যাত্না।
আমি যাব না, এবে শুন বলি মা তোরে,
ছেঁচা মিছে ঝগড়া ক'রে, উঠ্‌তে দিসনাকো দুয়ারে,
তেড়ে দিস মা পোড়ামুখার কপালে বাড়ুন্ মেরে।
যদি পাঠিয়ে দিস্ আমাকে, দেখ্‌তে আর পাবিনে চোখে
পাঠিয়ে দিলে তোর শোগে মা,—দুদিন বাঁচিবো না।
মা—গে—মা, আমি যাব না।

জামাই—

আহা মেরি দুখের আগুণ অন্তরে,
থাকি মাওড়া হ'য়ে ঘরে, মন্‌টা উড় পালা করে,
চাট্টি দানা খাই বাদুরের মতন দিনান্তরে।

বৌ—

রেঁধে বেড়ে খেতে মরা, তোর কি হাতে পোকা ধরে?

জামাই—

আবার বল্‌ছিস মাগি, মুখ বাড়িয়ে
তু বেড়াবি ঘোড়া চড়িয়ে,
তোর উল্টা হাঁটন, আল্‌গা লাচন
আমার ত প্রাণে সহে না।
আমি তো ছেড়ে যাব না—
ঠাকুরান্, চট্‌কোরে দাও বিদায় কোরে
প্যাথ্‌না কোরো না।—
আমি তো ছেড়ে যাব না।

শাশুড়ী—

আহা, ঘর করবার যোগ্য হো'লে,
রেখে আস্‌বো মাথায় কোরে,—
আমার ছোট ছেলে, দুধের বালক,
ঘর করবার কিছুই জানে না।
তু, যারে গোলামের ব্যাটা, হাঁটাস্ না থানা
আমি বিদায় কোরব না।

দক্ষিণ রাঢ় অর্থাৎ কাঁদি অঞ্চলে উত্তর রাঢ় অর্থাৎ জঙ্গীপুর অঞ্চল হইতে কতকগুলি শব্দ ও ধাতুরূপের পার্থক্য আছে এবং উচ্চারণ ও স্বরেরও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি। যথা—

সর্ব্বনাম (অস্মদ্ শব্দ)।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	আমি	আমরা
দ্বিতীয়া	আমাকে, আমাই	আমাদিকে
তৃতীয়া	আমা বা আমাকে দিয়ে	আমাদের দিয়ে
চতুর্থী	(দ্বিতীয়ার ন্যায়)	
পঞ্চমী	আমা হোতে বা হোৎকে	আমাদের হ'তে বা আমাদের হ'ৎকে
ষষ্ঠী	আমার	আমাদের
সপ্তমী	আমার, আমাতে	আমাদিকেতে

যুস্মদ্ শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুমি, তুই, তু,	তোমরা, তোরা
দ্বিতীয়া	তোমাকে, তোকে	তোমাদিকে, তোদিকে
তৃতীয়া	তোমাকে বা তোকেদিয়ে	তোমাদিকে বা তোদিকেদিয়ে
চতুর্থী	তোমাকে, তোকে	তোমাদিকে, তোদিকে
পঞ্চমী	তোমা বা তোকে হতে বা হোৎকে	তোমাদিকে হ'তে বা কোৎকে তোহ'তে বা হৎকে
ষষ্ঠী	তোমার, তোর	তোমাদিগের বা তোদিগের
সপ্তমী	তোমাতে, তোতে	তোমাদিগেতে বা তোদিগেতে
সম্বোধন	তুমি বা তু।	

অদস্ শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ও	ওরা
দ্বিতীয়া	ওকে	ওদিকে
তৃতীয়া	ওকে দিয়ে	ওদিকে দিয়ে

চতুর্থী	ওকে	ওদিকে
পঞ্চমী	ও হোতে বা হোৎকে	ওদিকে হোতে বা হোৎকে
ষষ্ঠী	ওর	ওদিগের
সপ্তমী	ওতে	ওদিকেতে

তৎ শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	সে	তারা
দ্বিতীয়া	তাকে	তাদিকে
তৃতীয়া	তাকে দিয়ে	তাদিকে দিয়ে
চতুর্থী	তাকে	তাদিকে
পঞ্চমী	তোহোতে বা হোৎকে তাকে হোতে বা হোৎকে	তাদিকে হোতে বা হোৎকে
ষষ্ঠী	তার	তাদিগের
সপ্তমী	তাতে	তাদিগেতে।

কান্দী অঞ্চলে পদের আদ্য 'ন'কারের স্থানে 'ল' ব্যবহার করে যথা—নূতন স্থানে স্থানে লতুন, নোবো স্থানে লোবো, নীল স্থানে লীল, নল স্থানে লল ইত্যাদি।

'ড়' এর স্থানে 'র' ও 'র' এর স্থানে 'ড়' ব্যবহার করে যথা নারা, দরি, লরি, খরি, বর. মোরা। মড়া, সড়া, গড়ম, পড়াণ ইত্যাদি। ভরতপুর থানার ব্যাড়াকে বলে বেড়া, ব্যালাকে বলে বেলা ইত্যাদি।

কাঁদী অঞ্চলে বাউরী জাতি ও অন্যান্য ছোট জাতির মধ্যে যেরূপ বিবাহ-সঙ্গীত, বোলান-সঙ্গীত ও ছড়া আদি প্রচলিত আছে আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইব।

কয়েকটি বিবাহ-সঙ্গীতের নমুনা দেখুন, এই সঙ্গীতগুলি বাউরী প্রভৃতি ইতর জাতির মধ্যে প্রচলিত।

১। "ফলের মধ্যে গুপারি, পাতের মধ্যে পান লারীর (১) মধ্যে চী (২) রাধিকা, পুরুষ ভগবান্।" "জানকী, জানকী বলে রাম(৩)-বনে কাঁদে কেরে?" বর-যাত্রী এবং কন্যা-যাত্রী উভয় দলে মিলিয়া যখন মদ্যপান করে সেই সময়ে এই সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে; এই গীতের সহিত যে বিবাহের কি সম্বন্ধ তাহা শ্রোতৃবর্গ মাত্রেই বেশ বুঝিতেছেন, তবে যে সময়ের গীত তাহাতে অর্থসঙ্গতি ও ভাব যে এইরূপই হইবে তাহা স্বাভাবিক।

২। তোরে আমি মল পরাব পিয়সি, হাতের শোভা সরু-শাঁখা, কুন কুন (৪) আর বালাকাটা, এনে দিবো মাথার কাঁটা, মন হবে খুসি। আমি তোরে মল ইত্যাদি—

(১) স্ত্রীজাতির। (২) স্ত্রী। (৩) রাম-আম বা আম্র—কথায় অপভ্রংশ। (৪) কঙ্কণ।

এ গীতটির কতকটা অর্থ সঙ্গতি আছে। কন্যা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন সে খানে সকলেই তাঁহার অপরিচিত, পিতার অবস্থা যেরূপই হউক তাহাতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, এক্ষণে অচেনা, অজানা স্থানে যাইতেছেন, সেখানে কি রূপ অবস্থায় পড়িবেন তাহা অনিশ্চিত সুতরাং তাঁহার মনে নানা বিষয়িনী চিন্তা উদিত হইয়া তাঁহার মন ক্লিষ্ট করিতেছে। অতএব বর তাঁহাকে আশ্বাসবাণী প্রদান করিতেছেন, প্রেয়সি! তুমি কোন বিষয় চিন্তা করিও না—আমি তোমাকে মল পরাইব, হাতের শোভা সরুশাঁখা দিব, কঙ্কণ ও বালা-কাটা দিব এবং মাথার কাঁটাও আনিয়া দিব।" অলঙ্কারের নাম শুনিলেই স্ত্রীলোকের মন খুসি হয়, সুতরাং তাঁহার নবোঢ়া-প্রণয়িণীর মন যে তাহাতে খুসি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

৩। তোমরা বেরেও গো বিনোদিনি রাই! মদনমোহন (১) চলে যায়, ওরে আমার গোরাচাঁদ (২), (পথে) চলে যেতে ঢো'লে পড়ে মুখের ঘাম।

এস্থলে বরকে "মদন-মোহন" ও "গোরাচাঁদের" সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এবং কন্যাকে "বিনোদিনী রাই" এর সহিত উপমিত করা হইতেছে। অর্থ এই যে বর রাগ করিয়া যাইতেছেন, হে কন্যে, তুমি বাহিরে আইস এবং তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর। কিন্তু বিবাহ করিতে আসিয়া বরের রাগ করিয়া যাইবার কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। নিম্নের গীতটাও ঐ রূপ মানভঞ্জনের গীত বলিয়া বোধ হয় যথা :—

৪। "শ্যামচাঁদ যেছে (৩) লো বেরিয়ে,
কেউ কিছু জানিস্ যদি আন্‌গে ফিরিয়ে।"

৫। বিবাহের পর পাত্র যখন কন্যা লইয়া আলয় গমন করেন তখন এই গীতটি গীত হইয়া থাকে, যথা :—

"লিল, (৪) লিল, লিল জাতি-কুল;
ফুলের মালা গলায় দিয়ে লিল জাতিকুল।"

এই গীতটির মধ্যে একটু গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, জাতিকুল দেওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মবিক্রয় করা। যে বিবাহে বর এবং কন্যা উভয়ের প্রতি উভয়ের হৃদয় আকৃষ্ট হয়, সেই বিবাহই প্রকৃত বিবাহ, সেরূপ বিবাহে কন্যা মকর-কেতুর আয়ুধ-স্বরূপ কুসুমমালার বিনি-ময়েই আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকে, বল, বা অর্থের বিনিময়ে নহে।

উল্লিখিত গীত কয়েকটিতে নিরক্ষর কৃষক-সুলভ উচ্চারণের অপকৃষ্টতাই পরিলক্ষিত হয়, পুস্তকগত বাঙ্গলার সহিত ভাষাগত কোনরূপ পার্থক্য বুঝা যায় না। নিম্নে যে বোলান-সঙ্গীত, কবি-সঙ্গীত, পাঁচালী ও ছড়া উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতেও আমার উক্ত সমালোচনা প্রযোজ্য।

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ। (২) গৌরাঙ্গ। (৩) যাইতেছে। (৪) লইল।

বোলান-সঙ্গীত।

(শিবপূজার সময় গীত হইয়া থাকে)

(ক) তবে এসো গো মা সরেসতি, (১) তুমি আমার মা,
তোমারে সরণ (২) কোরে গো বাড়াইচি পা।
গণেশদেব থাকৃতে যেবা অন্য দেবে পোজে (৩),
নানা বেগ্ন (৪) হয় যে তার গো সেদ্ধো (৫) না হয় কাজে।

(খ) ঘরে থেকে বেরিয়ে, বাইরে দিলাম পা,
হায় গো বাইরে দিলাম পা;
বেরিয়ে এসে কোলে কর, কোঁক-ধরণী মা,
হায় গো কোঁক-ধরণী মা (৬)।
যত গুলি বোলান্ বুল্লাম, আরোও বুল্‌তে পারি।
আমার ওস্তাদের নাম ঈশ্বর ঠাকুর
চুম্‌রি গাছায় বারী।

কবির গান।

তুমি জগত-জননি, যগ্‌গেশ্বরি (৭) মা;—
দীন তারিণি তারা, জানি মনে, অসাধনার মা,
মিছে ভরসা করা।
ভবে জন্ম নিলাম যখন, কিস্তিবন্দী কল্যাম তখন,
হল্যাম নিধন, আপন কর্ম্ম-দোষে—
কিস্তি আমার খেলাপ হোলো, পাপে দেহ তলিয়ে গ্যালো,
অ্যাত দিন্‌তো ছিলাম ভালো—চরণ পাবার আশে এ—এ—এ।
সদানন্দ চরণ ধরে, লিলে চরণ দখল করে,
আমি কি লইয়ে যাই ভবের পারে এ, এ, এ—
পারের আশা ঘুচে গ্যালো,
তারা, তোর চরণে কিস্তিবন্দী লেখ্যা দিলাম,
কিস্তি খেলাপ্ হোলো ও—ও—ও।
চরণতরী—বিনা—তরি—ই—ই—ই, কি রূপে তাই বুলো—ও—ও।

---

(১) সরস্বতী (২) স্মরণ। (৩) পূজা করে। (৪) বিঘ্ন। (৫) সিদ্ধ। (৬) কুক্ষি-ধারিণী। যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। (৭) যজ্ঞেশ্বরী।

শোমন (১) ভয়ে হোল্যাম স্থস্থির (২) নেখ্যা দিল্যাম্
তিন্‌টা কিস্তি, কিস্তির কিস্তি, পরিশোধ করিবো ও—ও—ও।
আবাল্ বিদ্দো (৩) যুবাকালে, সাদন (৪) কল্ল্যাম কালী বোলে,
কালি তোমার চরণ পেলে, ভব পারে যাবো—ও—ও।
এবার আমি নাবে (৫) মুলে হারাইলাম,
মায়ের চরণতরী হ্যালা করি, আপন দোষে খোয়াইলাম।
কালী বোলে ডাক্‌তাম্ যোদি, (হোতো) ছরজনায়(৬) ছয় দিকে বাদী,
কমন্তনা (৭) দিয়ে-এ-এ-এ-এ।
তারা সবাই মেলে, গ্যালো ফেলে, একলা পড়ে ভেকো(৮) হল্যাম,
এবার আমি ইত্যাদি।
তুমি অগতির গতি মা, দীনতারিণী তারা,
ভক্তি কোরে ডাক্‌লে পরে মা,—তরাও অপহেলে।
ভজন সাধন তোমায় হোলে, ভক্তি মুক্তি তাও জানিনা,
নিজের গুণে দয়া কি আর হবে ?—
কথায় কাজে নাই মা সত্য, সকলি হোলো অসত্য,
সত্য জন্যে পরমাত্ত, তত্ত্ব ঘুচে গ্যালো-ও-ও-ও
সদানন্দ চরণ ধোরে ইত্যাদি।

পাঁচালী।

ওমা ভবানি, ভবপারে যে দিন যাব আমি,
কালীর ঘাট, চণ্ডীর পাঠ মা, কৈলাসের ভবানী-ই-ই
চন্দনে মাখিয়ে জবা, পদে দিবো আমি-ই-ই-ই।
ওমা ভবানি ইত্যাদি।
মাগো, তারা তারা বোলে, ডাকি ভবের কূলে,
নিজের গুণে তরান্ গো আপনি-ই-ই-ই।
কে জানে মা তোমার লীলে, জলেতে ভাসালে শিলে,
নিজ গুণে তরাও গো ভবানি-ই-ই ইত্যাদি।

---

(১) শমন। (২) আড়ষ্ট। (৩) বৃদ্ধ। (৪) সাধন। (৫) লাভে। (৬) ষড়-রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। (৭) কুমন্ত্রণা। (৮) ভেকো—বেকুব, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়।

কবির ছড়া।

যে জন কালী কালী বলে, কষ্ট নাইখো তার কপালে
জন্মেছে পাষাণ কুলে, হয়েছে পাষাণ।
কালী বোলে, দ্রুগ্গা(১) বোলে যায় আমার প্রাণ।
যে জন "কালী কালী" বলে তার ডিঙ্গা(২) ড্যাঙ্গায়(৩) চলে,
অনাসে পার হয় ভব নদী।
কালী নামে কাটে কাল ফাঁস(৪), কালী তার হন নিজোদাস,
কালী নামে মন তার থাকে যদি।
কালী ফুলের মালা গেথে, রিদয়ো(৫) মাঝারে থুব।
কালী নামের জোর(৬) ডঙ্কা, আছে গো তার কিসের শঙ্কা,
কালী নামে ডঙ্কা মেরে যাবো।
চীমন্ত(৭) সওদাগর, পেয়েছিলেন কালীর বর,
তারে করিয়ে রাজা।
কাটিয়ে গুজরাতী বন(৮), সহর কল্লেন্ সিরজন,
জঙ্গলেতে তুল্লে রথের ধ্বজা। ইত্যাদি

বাগড়ী।

বাগড়ীর সহিত রাঢ়ের ভাষাগত বেশি পার্থক্য নাই, তবে উচ্চারণ, বর্ণ বিশেষের উপর জোর (Accentuation) শেষ স্বরের প্লুতত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন শব্দ এমনও আছে যাহা, কেবল "রাঢ়" অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় "বাগড়ী" অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না, (ক) এবং বাগড়ী অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় "রাঢ়" অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না। (খ) সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে দক্ষিণবঙ্গে অর্থাৎ কলিকাতা ইত্যাদি স্থানে শব্দের প্রথম বর্ণের উপরে (গ) এবং রাঢ় অঞ্চলে শব্দের শেষ বর্ণের উপরে (ঘ) জোর প্রয়োগ করা হয়। বাগড়ী অঞ্চলে পদের শেষ স্বর প্লুত করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। (ঙ) যথা:—

কতি গিয়াছিল্যা-া-া। আমি বাড়ী যাব যে-এ-এ এ-ইত্যাদি।

১। পদের অন্ত—"আ"কারের স্থানে "্যা" ব্যবহার করিয়া থাকে যথা:—হু ক্যা, কোল্ক্যা, মূল্যা, তুল্যা, কুল্যা, ইত্যাদি।

---

(১) দুর্গা। (২) নৌকা। (৩) শুষ্ক-স্থান। (৪) যম-বন্ধন। (৫) হৃদয়। (৬) জোড়।
(৭) শ্রীমন্ত। (৮) নিবিড় বন।

(ক) যথা—"বিকা" অর্থাৎ বড়। "নাছ"-অর্থাৎ বাটীর সম্মুখীন স্থান। ওঁতাল, অর্থাৎ অপদার্থ।

(খ) যথা—মেকুর-বিড়াল। "ওরালী"-অপদার্থ (গ) ভাত খেতে এসো। (ঘ) ভাত খেতে এসো।

(ঙ) ভাত খা'তে আইসো না ক্যানে এ-এ-এ-এ।

২। শব্দের আদ্য "ও"-কারের স্থানে "উ"-কার ব্যবহার করে যথা :—দুকান (দোকান), বুকা (বোকা), বুদাম (বোতাম), তুমার (তোমার), খুকা (খোকা), ভুলা (ভোলা), ঘুঁড়া (ঘোড়া), রুগা (রোগা), ইত্যাদি।

৩। পদের অন্তস্থ "য়"এর স্থানে "হ" যথা :—বিহ্যা, কুহ্যা, ইত্যাদি।

"মাহৈ! দুয়্যারটা খুলোতো কুহ্যার জল লিবো।"

অনেক শব্দের মধ্যে অনর্থক একটা "হ" আনয়ন করে যথা অন্‌হেক (অনেক), চিন্‌হি (চিনি), চুল্‌হ্যা (চুলা বা চুলো), আড়্‌হোল্ (অড়োল বা অরহর), বাম্‌হুন্ (বামুন বা ব্রাহ্মণ)।

৪। "ড়" স্থানে "ঢ়" ব্যবহার করে যথা :—বুঢ়্যা, কুঢ়্যা, ইত্যাদি।

৫। আদ্য একারের স্থানে 'য্যা' ব্যবহার করিয়া থাকে যথা—ত্যাল্, ব্যাল, ত্যাঁতোল্ (তেঁতুল্), ল্যাপ্ (লেপ) ইত্যাদি।

৬। অনেকস্থলে আদ্য 'এ'কারের স্থানে আকার উচ্চারণ করে এবং পদের শেষ স্বর প্লুত করিয়া ফেলে যথা—'তোখে বাগুণ (বেগুণ) আন্‌তে বুল্যাছিলাম্ আনিস্ নি ক্যানে-এ-এ-এ-এ।"

৭। পদের আদ্য 'ন'কারের স্থানে 'ল'উচ্চারণ করে যথা:— লৈক্যা (নৌকা), লতি (নতি), লতুন (নতুন), লবীন (নবীন), লীল (নীল), লিবো (নিবো), লারকোল (নারকেল) ইত্যাদি।

৮। কোন কোন স্থানে আদ্য 'ল'কারের স্থানে 'ন'কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা :—নক্ষী (লক্ষ্মী), নলিত (ললিত), নাগে (লাগে) ইত্যাদি।

৯। শব্দসংক্ষিপ্ত করিবার প্রবৃত্তি এ অঞ্চলে খুব কম যথা :—কলিকাতার লোক বলিবে "কোথা", ইহা 'কোন স্থানে' কথার সংক্ষিপ্ত 'কোন'এর কো, এবং 'স্থানে'র 'থা'। বাগড়িতে বলিবে কুন্‌ঠিঁয়ে।

সর্ব্বনাম।

বাগড়ীতে 'ও' স্থানে 'উ', আর 'টা' স্থানে 'ডা' ও 'হ' স্থানে 'য়' ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা :—'এটা', 'সেটা'র স্থানে বলে এডা, সেডা। 'উহাই' স্থানে বলে 'ওয়াই' যথা আমি ওয়াই চাই।

সর্ব্বনামের রূপ।

(অস্মদ্ শব্দ)

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	আমি	আমরা
দ্বিতীয়া	আমাকে	আমাহেরকে, আমাধেরকে

তৃতীয়া	আমাকে দিয়া	আমাহের বা আমাধের দিয়া
চতুর্থী	আমাকে	আমাহেরকে, আমাধেরকে
পঞ্চমী	আমাহ'তে	আমাহেরে হ'তে বা হোৎকে (rare)
ষষ্ঠী	আমার	আমাহের বা আমাধের
সপ্তমী	আমাতে	আমাহের মধ্যে

যুষ্মদ্ শব্দের রূপ অস্মদ্ শব্দের ন্যায় কেবল 'আমি' স্থানে 'তুমি' ও 'আমা' স্থানে 'তোমা' করিলেই হইল।

অদস্ শব্দ।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	উ	উয়ারা
দ্বিতীয়া	উয়াকে	উয়াহেরকে,উয়াধেরকে
তৃতীয়া	উয়াকে দিয়া	উয়াহের বা উয়াধের দিয়া
চতুর্থী	উয়াকে	উয়াহেরকে, উয়াধেরকে
পঞ্চমী	উয়া হ'তে	ওয়াহের বা ওয়াধের হ'তে
ষষ্ঠী	উয়ার	উয়াদের, উয়াহের
সপ্তমী	উয়াতে	উয়াধের মধ্যে

তৎশব্দ।

এই সর্ব্বনামের রূপে অন্য কোন পার্থক্য নাই, তবে দ্বিতীয়ার একবচনে 'তাকে' স্থানে 'তাখে' বলিয়া থাকে।

ক্রিয়া।

১। ক্রিয়ার আদ্য 'অ'কার বা 'ও'কার স্থানে 'উ'কার ব্যবহার করিয়া থাকে যথা :—বুল (বল), তুল (তোল), শুনো (শোন), চুষ (চোষ ইত্যাদি।

২। ক্রিয়াপদের অন্ত্য 'চ্ছ' স্থানে 'ছ' উচ্চারণ করে যথা :— যা'ছো (যাচ্ছো), দিছো (দিচ্ছো) ইত্যাদি।

৩। কোন কোন ক্রিয়াপদের মধ্যে একটা হসন্ত 'ল' কারের আগম করিয়া থাকে। যথা গেল্‌ছিলো (মুশলমানী)।

৪। ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের ভূত-কালে অন্ত্য'ছিলাম' স্থানে 'ছিনু' বা 'ছুনু' বলে যথা—আমি গিয়্যাছিনু, আমি কর্‌য়াছিনু, আমি বল্যাছিনু, আমি খায়্যাছুনু, আমি দিয়্যাছিনু বা ছুনু এবং তৃতীয় পুরুষের অতীতকালে 'ছিল' স্থানে 'ছল' বলে যথা—সে বুল্যা ছল, হরি গিয়াছল রাম বল্যা ছল ইত্যাদি।

৫। বর্ত্তমান সামীপ্যে ক্রিয়ার অন্তে একটা 'নু' বলিয়া থাকে যথা :—কন্নু, খান্নু, গেন্নু, বুল্‌নু। এ নিয়মটি কেবল উত্তম পুরুষেই খাটে।

নিম্নে কতকগুলি শব্দ দেওয়া গেল তাহা কেবল "বাগড়ী" অঞ্চলেই চলিত আছে, "রাঢ়" অঞ্চলে তাহাদের ব্যবহার দেখা যায় না যথা :——

ছেঁচ্‌কি—ছ্যাঁচাইকি, সত্যই কি ?

ছেলে—পুত্র এবং কন্যা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

"বাম্‌হন, বাম্‌হন্ বুনিকে বুলো কুলির ব্যাটা হয়্যাছে" উত্তর "ছেঁচ্‌কি বাম্‌হন কুলির ব্যাটা ? ছ্যাঁচাইকি অর্থাৎ সত্যই কি বামন কুলির ব্যাটা ? (হয়েছে)

বেছনা অর্থাৎ বিছানা।

শিথান—বালিস, বোধ হয় সংস্কৃত শিরোধান হইতে উৎপন্ন।

কুহ্যারা—তামাসা, "কুহ্যারা করিস্‌ত্যা বুলছি"।

বাপ্তাল, বাসক্যাল্—বিস্ময়সূচক অব্যয় শব্দ যথা :—অ্যাতো বড় মাছ ধর্যাছিস, বাসক্যাল্‌রে বাপ্তালরে !

নড়ি—লাঠি বা ছড়ি। লঘ্‌ঘী—প্রস্রাব।

ধিড়ক্যান—ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাওয়া। যথা, গরু গালা ধিড়কিয়্যা গ্যালো।

কড়ে—এই শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।। যথা, ১ম—দিকে "একড়ে এসো—এদিকে এস।" ২য়—ক্রমে, "কড়ে কড়ে ব্যালা হোলো, বাড়ী যাওয়া হোলনা।"

কলা—কাপ, যথা কলা কর্যা শুয়্যা আছে অর্থাৎ নিদ্রার ভাণ করিতেছে।

খুয়ার—নাকাল, কষ্ট। উয়্যাদের সাতে গিয়ে আমার এই খুয়ার হ'লো।

ঘাঁটা—পথ।

ফুসি—কিছুই না, অপদার্থ। যথা, "নির্ধনো পুরুষো ফুসি" এই প্রবচনটি বাগড়ীতে চলিত আছে।

হ্যারায়—হের, এসো, অর্থাৎ নিকটে এসো।

ভুজ্যা—ভাজা, যেমন চাল্‌ভাজা, মুড়ীইত্যাদি।

হুনে—হইতে, যেমন কুণ্ঠে হুনে আলি ? (কোথা হইতে এলি ?)

তামুক—তামাক।

নিম্নে বাগড়ী দেশের প্রভু ও ভৃত্যের একটি কথোপকথন (Conversation) উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা বোধ হয় বিরক্তিকর হইবে না।

প্রভু। ওরে কিষ্ট্যা, শীগগির তামুক সাজ্যা আন্‌তো।

ভৃত্য। এই যাছি-ই-ই-ই। (ভৃত্যের তথাকরণ)।

প্রভু। আরে হুঁক্যাডায় জল ভরিসনি, জল ভোর্যা আন্, জল ভোর্যা আন্ ; আগ্নে কল্ক্যাডাতেও যে ঠিকুরি দিসনি, তুই ব্যাটা কুণ্ঠেকার উরালী রে ? বুকা ব্যাটা।

ভৃত্য। আমি বাড়ী ছিনুন্তা, কাম্‌হারের বাড়ী দা গড়াতে গিয়াছুনু, বুল্যাছল আজ্ দিবে তা দিল না।

প্রভু। আজ যে সত্তিনারাণ পূজ্যা, জানিস্ স্যা, গুয়াল বাড়ী হুনে পাঁস্সের দুধ্ আন্‌তে হবে। বাম্‌হুন খাবে যে-এ-এ-এ।

ভৃত্য। এই যাছি. গুয়াল ব্যাটার কুহ্যারা দেখ্যা মনু, ব্যাটা বাড়ীতে দুধ দিয়া যা'তে পারে না? ইত্যাদি

বাগড়ী অঞ্চলে ইতর লোকের ছেলেরা পৌষপার্ব্বণের সময় পৌষঃ নিম্নোদ্ধৃত গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহাকে "ভারবোল" বলে :—

ভারবোল(১) ভারবোল, ছতর(২) ছতর,
সোনারায়ের বানা(৩) এলো বাড়ীর ভিতর।
সোনারায়ের সোনা, দৈ দিয়্যাছে তারা,
ছকুড়ি বুনের বাঘ, গরু খালো মরা।
ছুট্যা গরু কড়কড়ায়, ছড়া গরু কড়মড়ায়,
বল ভাই শিবো, একসের চা'ল নড়া বড়ী লিবো।
যে দিবে থেলে থেলে, তার হবে সোনার চাঁদ ছেলে।
যে দিবে কাঠা কাঠা, তার হবে নাক কাটা ব্যাটা।
যে দিবে মুঠি মুঠি, তার হবে নাক কাটা বিটী।

উপরি উক্ত গীতটি অর্থহীন অসম্বদ্ধ চরণচয়ে রচিত, ইহা ... কৃষকগণ, [redacted] অনেক শব্দের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গত ১৩০৪ সালের ভূমিকম্প উপলক্ষে বাগড়ীর একটি কৃষক নিম্নলিখিত গীতটি রচিত করেন :—

"চোখেতে হেরি নাই কভু, কর্ণেতে শুনি নাই মোরা,
অতি অশুভ, অসম্ভব, ভূমিকম্প এমন ধারা।
কি কাল হয়্যা আস্যাছিল, চারি সালের ২৯ শে জ্যেষ্টি,
ভেবেছিল্যাম কলির চরম, রসাতলে গ্যালো ছিষ্টী।
ছিল না পরাণের আশা, কে তখন ডাকে কাহারে,
লজ্জা ভয় সব তেজ্যা কোরে, কুলবালা হয় গৃহ ছাড়া।
অকস্মাৎ(৪) পাঁচটা বেলাতে, হুঁহুঙ্কার শব্দ হোলো,
তুফানের(৫) লৈকার (৬) মত পিথিমী(৭) করে টলমল।
ভয়ে পরাণ হোলো আকুল, দুটি চক্ষে পড়ে জল, ধারার ওপরে ধারা।

---

(১) ভারবোল, ইহার অর্থ পাওয়া গেল না। (২) ছতর, ছতর, পংক্তিতে পংক্তিতে, লাইনে লাইনে। (৩) বানা—নিশান, পতাকা। (৪) অকস্মাৎ। (৫) তুফানের—ঝড়ের। (৬) নৌকা। (৭) পৃথিবী।

বড় বড় জাহাদ(১) কত, উবুদ(২) হয়্যা মারা গেছে,
মান্দ্রাজ সহর ওয়াক্ক (৩) হয়্যা, মক্কাতে মজিদ ভাঙ্গ্যাছে।
ফাট্যাছে ঘর কালেক্টরি, মাহারাণীর নতুন বাড়ী,
বাণারসে গিয়্যাছে পড়্যা, বিশ্বনাথের মঠের চূড়্যা।
বেছাপ্পর হয়্যাছে শুনি, হুগলী কলকাতা সহর,
রামপুর্যা, বর্দ্দমান, দম্‌কা(৪) বীরভূমি আর দিল্লীসহর।
জগন্নাথ জানো ঐ সরকার, মুর্শীদাবাদে হাহাকার,
বড় বড় ধনী এবার ভাব্যা পায়না কূল কেনারা।
অতিথ্‌ অভ্যাগত, আহুতি (৫) ও বে-আহুত (৬),
মচ্ছবেতে (৭) হয়্যা ছিলো, বহরমপুরে উপস্থিত.
তারা খা'তে বস্যা পা'লো না খা'তে কতেক হাতে, কতেক পাতে,
সে সমাতে (৮) পোলো মাথে, ছাত ভাঙ্গ্যা ভাই, ইঁটের ভারা।
এক মুখে বলিব কত, একথা অতি বিষম,
বড় বড় অট্টালিক্যা হ'য়ে গেছে সমভূম।
ঢাকা ... বাড়ী, বরিশাল গিয়াছে মাটি
...ায় হ'লো ভাব্‌না ভারি পাকা ঘরে বসৎ করা।
দীন হীন বিপিনের কথা, রৈ'ল এবার মনে মনে,
কর্ণ ছুড়ি বধির হ'লো মরার কথা শুন্যা শুন্যা।
অবাক্‌ হয়্যা বস্যা আছি, সন্তরে প্রাণ গেলে বাঁচি,
শেষেতে আরোও হবে কি, ভাব্যা ভাব্যা হ'ল্যাম্‌ সারা।

দেখুন এই কৃষক কবির গীতটিতে কিরূপ সম-বেদনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমতঃ তিনি এরূপ ভূমিকম্প কখন দেখেন নাই, বা এরূপ ভূমিকম্পের কথাও কখন শুনেন নাই, তজ্জন্য বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন। তার পর ভূমিকম্পের সুন্দর একটি চিত্র আমাদিগের সম্মুখে ধরিয়াছেন ; এইরূপ অকস্মাৎ বিপৎপাতে জনসমূহ যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিল এবং কুল-বনিতারা যেরূপে লজ্জা ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহাও সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বারাণসী, হুগলী, রামপুর, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভূমিকম্পে যেরূপ অনিষ্ট সাধিত করিয়াছিল, আমাদের কৃষক কবি তাহারও সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তার পর বহরমপুরের বিখ্যাত জমীদার স্বর্গীয় রাধিকা চরণ সেন মহাশয় দিগের ঠাকুর বাটিতে ঐ ভূমিকম্পের সময় যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বহরমপুর অধিবাসিবর্গের অবিদিত নাই, আমাদের সূক্ষ্মদর্শী কৃষক কবি তাহাও উপেক্ষা করেন

(১) জাহাজ। (২) উল্টাইয়া যাওয়া। (৩) বিনষ্ট। (৪) দুম্‌কা।
(৫) নিমন্ত্রিত। (৬) রবাহুত। (৭) মহোৎসব-উপলক্ষে। (৮) সময়েতে।

নাই ; ঐ ঠাকুর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ও রবাহুত যত লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভোজন করিতে বসিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে ; কতক লোকের ভোজন সমাপ্ত হইয়াছিল, কতক লোকের ভোজন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের মস্তকে ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টকরাশি নিপতিত হয়, এবং তাহাতে কোন কোন ব্যক্তিকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা খাইতে বসিয়া খাইতে পাইলেন না, খাদ্যদ্রব্য কতক হাতে কতক পাতে রহিল, তজ্জন্য আমাদের কৃষক কবির দুঃখের আর সীমা নাই। তার পর জগতের দুঃখ তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক হইতে মনুষ্যের মৃত্যু সম্বাদ তাঁহার কর্ণ বধির করিয়া তুলিল, অবশেষে তাঁহাকে জগতের আর কত অমঙ্গল দেখিতে হইবে বলিয়া ভীত হইলেন এবং তদ্দুঃখে আপনার মৃত্যু কামনা করিলেন। দেখুন দেখি এই গীতটি নিরক্ষর কৃষকটির হৃদয়ের কি সদাশয়তা ও মহত্বের পরিচয় দিতেছে। রচনার মধুরতাও বেশ আছে, স্থানে স্থানে অনুপ্রাসেরও অভাব নাই যথা :—পাবনায় হো'ল ভাবনা ভারি ; ঢাকাতে নাই পাকা বাড়ী ইত্যাদি।

বাগড়ীতে প্রচলিত বালালখীন্দরের গীত।

"বালালখীন্দরের কাহিনী বা বেহুলা সংগীত" বঙ্গদেশের সকলেই জ্ঞাত আছেন। পুরাকালের সাবিত্রী ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক বেহুলা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন বলিয়া আজ তাঁহারা হিন্দুদিগের পূজ্যা দেবতা। বেহুলা সাবিত্রী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, বরং মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বেহুলাকে যত কায়িক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, যত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, যত বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে, সাবিত্রীকে তত করিতে হয় নাই। সাবিত্রী আমাদের নিকট যেরূপ ভক্তি ও পূজা পাইয়া থাকেন, বেহুলাও তদ্রূপ ভক্তি ও পূজা পাইবার যোগ্যা। বেহুলা সংগীত যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা যেরূপই হউক, তাঁহার সঙ্গীতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন করুণরসের স্রোতঃ (Pathos) প্রবাহিত হইতেছে, এবং সেই প্রবাহ আমাদিগের হৃদয়ে প্রবল সমবেদনা জাগরিত করিতেছে। প্রথমতঃ দেখুন, কালসর্প লখীন্দরকে দংশন করিতে গিয়া, তাহারও হৃদয়ে করুণরসের আবির্ভাব হইয়াছে, লখীন্দরকে দংশন করিতে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই, কি করে? মনসা-দেবীর আদেশও লঙ্ঘন করিতে অক্ষম, সুতরাং অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হইয়া তাহাকে লখীন্দরকে দংশন করিতে হইতেছে। দংশন করিবার সময় সর্প ভাবিতেছে :—

"কালো নয়ান জলে আমার বক্ষ ভেসে যায়;
কোন খানে ডংশিবো রে আমি লখীন্দরের গায়?
ওরে কোন খানে ইত্যাদি।
কপালে ডোংশিবো (১) আমি বিধির হাতের লিখন।

(১) দংশিব।

পরে শোক প্রকাশ করিতেছে ঃ—

চোখেতে ডোংশিবো রে আমি, ওনা আশমানের তারা (১)
মুখেতে ডোংশিবো আমি, ওযে পুন্নিমারো শশী, (২)
নাকেতে (৩) ডোংশিবো রে আমি, ওরে কিষ্টোর হাতের বাঁশী (৪)
প্যাটেতে ডোংশিবো রে আমি, সারিন্দারি খোল (৫) ইত্যাদি।

* * * * * *

সর্প এইরূপে শোক করিয়াও অবশেষে দংশন করিল, তখন বেহুলা জাগ্রত হইলেন, এবং স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঔষধি তল্লাশ করিতে লাগিলেন ঃ—

বালা, খস্তি, (৬) বাতি লয়্যা হাতে
ওরে ওষুদ্ তুল্‌তে গ্যালো, নিশিভাগ (৭) রাতে,
ওষুধ্ তুল্যা পাঁজারে পাঁজা, (৮) ঝাড়্যা বাঁধে বুঝা রে।
কুন্ বা ওষুদ্ জানিরে আমি, কুন্ বা ওষুদ্ চিহ্নি,
আর কুন্ বা ওষুদ্ তুলি ?
কুন বা গাঁছের শিঁয়াড়্ (৯) রে ধর্যা টানাটানি করি ?
তাবদ্ মুলুক্ খুজ্যারে আল্যাম্, না পাল্যাম্, রুঝারে।

বালা (বা বেহুলা) ঔষধি চিনিতে পারিলেন না। দৈব দুর্ব্বিপাকে সমস্ত দেশ খুজিয়া ওঝাও পাইলেন না, বিধিলিপি কে খণ্ডন করিতে পারে ? লখীন্দরের মৃত্যু হইল, তখন সতী-শিরোমণি বেহুলা, শোকে নিতান্ত অধীরা না হইয়া প্রাণেশ্বরের জীবন ভিক্ষার জন্ত দেবতাগণের আশ্রয় লইতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন ঃ—

আমি যাবো যে দেবলা-পুরে, (১০) ঘরে রবো নারে—
আমি, ঘরে রবো নারে।
শ্বশুর ঠাকুর বিদায় দ্যাও, আমার হাতের শ্যাখা (১১)
খস্যা যে পোলো যবুনারো জলেরে——
আমার সিঁথ্যার (১২) সেঁদুর (১৩) খস্যা যে পোলো—ইত্যাদি
আহারে নিদারুণ বিধি, আমার এই ছিলোকপালেরে——
ওরে কি কোরিব, কুথারে যাবো, আমার—
কত উঠে মুনেরে—(১৪)

---

(১) নখীন্দরের চক্ষু দুটি আমাদের তারার ন্যায় উজ্জল। (২) পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মনোহর।
(৩) নাকে—নাসিকায়। (৪) শ্রীকৃষ্ণের হস্তের বংশীর ন্যায় সুন্দর। বংশীর সহিত নাসিকার উপমা (৫) সারিন্দা একরূপ স-তার বাদ্য যন্ত্র, তাহার আকার উদরের ন্যায় কৃশ।
(৬) খন্তা। (৭) নিশীথ সময়ে। (৮) বোঝা বোঝা। (৯) শিঁকড়, মূল।
(১০) দেবতাদের রাজ্য-স্বর্গে। (১১) শঙ্খ।(১২) সিঁথীর। (১৩) সিন্দুর (১৪) মনেরে।

গাড়াপরশী বিদায় দ্যাও, ঘরে রবোনা রবোনারে—
ওরে ভাশুর ঠাকুর বিদ্যায় দ্যাও, ঘরে রবোনা রবোনারে—
আমার হাতের নুয়া(১) খস্যা যে গেলো,—যবুনারো জলেরে
ওরে বিধাতা বৈমুখো হো'লো, আমি কাঁচা চুলে(২) আঁড়িরে।(৩)

এই মর্ম্মস্পর্শী শোকোচ্ছ্বাসে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? তারপর বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ "দেবলাপুরে" লইয়া যাইবার জন্য কলার উড়ুপ প্রস্তুত করাইলেন এবং তাঁহার বিশেষ পরিচয়ের জন্য ঐ উড়ুপে তাঁহার ছয় ভাশুরের নাম, শাশুড়ীর নাম, নিজের বাপ্ মার নাম এবং স্বীয় স্বামীর নাম লিখাইয়া লইলেন—

ওরে, হরি হরি বোলোরে তুমরা নগরের লোকে,
কুন কারিকোর (৪) বাঁধ্যাছে মাড়ৈ, (৫) মাড়ের নাইকো ওড়ো রে। (৬)
মাড়ের পিষ্টে নেখ্যারে দিবো—
ছয় ভাশুরের নামোরে
মাড়ের পিষ্টে নেখ্যারে দিবো—
শাশুড়ীরো নামোরে।
মাড়ের পিষ্টে নেখ্যারে দিবো—
বাপো মায়ের, নামোরে,
মাড়ের পিষ্টে নেখ্যারে দিবো—
নিজো পতির নামোরে ইত্যাদি—

এই শোকগাথার প্রতি পংক্তি যেন আমাদের হৃদয় বীণার মর্ম্মবেদনার তার ঝঙ্কৃত করিয়া বিষাদ সঙ্গীত তুলিতেছে।

বাগড়ীর কবির ছড়া। (হিন্দুদের ভাষা)

গাধার বাচ্চা আচ্ছা হ'লে চলেনাখো আস্তাবলে
ছাগলে কুনকালে "য" মাড়ে?
যোগে যাগে হয় কি যাগ, বিড়ালের
ছারপোকায় কি সা

ছোট ছোট তেলেঙ্গা গুলি লাল কুর্ত্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
কি হলোরে জান,
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে, আর কাঁদে হাতী,
কল্‌কাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান,—
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানীর নিশান!
মীর্জ্জাফরের দাগাবাজী নবাব বুঝতে পাল্লে মনে,
সৈন্য সমেত মারা গেল পলাশীর ময়দানে।
নবাব বড় শোহদা(১) ছিল আর লম্পটে,
ইতিমধ্যে গালেব(২) এসে পৌঁছিল সে ঘাটে।
কি হলোরে জান,
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানীর নিশান।
ফুলবাগে মল নবাব, খোসবাগে মাটি,
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।(৩)
কি হলোরে জান,
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানীর নিশান।

বাগড়ীর মুসলমানী ভাষায় রচিত আর একটি গ্রাম্যগীত শুনুন :—

ভরা সাঁজে আউল্যা ক্যাশে সাহেব, যা'ছো কার বাড়ী ?
কাঁচা দুধে, মাথার ক্যাশে, সাহেব, মুছাই তোমার চরণ!
জোরে জোরে হাজোত্(৪) দিব, সাহেব, আইসো আমার বাড়ী।
জোড়ে জোড়ে খাসী দিব, সাহেব আসো আমার বাড়ী।
বস্‌তে দিব শীতল পাটী, আসো আমার বাড়ী।

এটি বোধ হয় কোন খণ্ডিতা মুসলমান পত্নীর গান।

আর একটি :—

কুসুম কাঠের ঢেঁকি বানাসুরে—ধুৎর্‌্যা কাঠের পুয়া আ-আ-আ।
ছকুড়ি ছডা থুপ্‌ন্থা, কুল্যার আগায় থুয়্যা-য্যা-য্যা-
আগে যায় ঢুলি বাজ্‌ন্যারে, পাছে যায় মোর কুল্যা-য্যা-য্যা,

(১) দুষ্ট, লম্পট। (২) শত্রু। (৩) মোহনলালের বেটী সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যার আবশ্যক। ফৈজী নামে মোহনলালের এক ভগ্নীকে সিরাজ স্বীয় অন্তপুরবাসিনী করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকে সেই ভগ্নীকে বেটী করিয়া লইয়াছে। (৪) সিন্নি, উপঢৌকন।

ঐ গাঁয়ের জমীদার যায়, ডহর বহ্যারে, কুল্যার ঝম্ ঝমি গুন্থা-া-া।
ঐ গাঁয়ের গোমস্তা যায় সরাণ বহ্যারে, কুল্যার ঝম্ ঝমি গুন্থা-া-া।

সূতিকাঘর বন্দ করিবার মন্ত্র।

(বাগড়ী)

আশ বন্দ, পাশ বন্দ, বুজরুবি খিলান বন্দ,
কাঁওরূপীবন্দ, আশে পাশে দিয়্যা তালি।
লোহার কল্যাম ব্যাড়, পড়রে পড়রে বন্দ,
আমার সগ্গ, মত্ত, পাতাল, সগ্গেরো দেবীবন্দ,
ঘরেরো কুঁওর।
অন্দ্বীর বন্দ বাল্যেরনন্দন,
আমার এই গড় কুণ্ড আট্দিন আটরাত রক্ষ্যাকরবেন্-
শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আমার এই গড় কুণ্ডে যে কর্বেন ঘা,
শিক্ষাগুরু উস্তাদের মাথায় একলা গাড়ে বাম পা,
কামরূপ কামিখ্যা মা, হাড়ীঝীর আজ্ঞা গুরুজীর পা।
স্ফটিকেরো চৈতন্ পাথরের বাড়,
হুহঙ্কারে বন্দ কল্যাম বজুর কপাট।
কহেন মাতৃ চৌষট্টি ডাকিনী—

ভূত, প্রেত, কুজ্ঞান, বিজ্ঞান, যিনি আশমানে চন্দ্র ধরতে পারে, ধম্মের মাথায় কোটি প্রণাম করে, সেই ত আমার গড় কুণ্ডের মধ্যে আস্তে পারে; সে কার আজ্ঞা, বাপ্ বীর হনুমানের আজ্ঞা, বজ্র হুহঙ্কারে দেবী কালিকার আজ্ঞা হনুমান্কে যে মার্তে পারবে, নোসিংকে যে বাঁধতে পার্বে, সেই ত আমার গড় কণ্ডুর মধ্যে আস্তে পার্বে।

স্তন কাঁচা, মোল কাঁচা, কাঁচা আদ্দি মোল্।
চন্দ্র কাঁচা, সুয্যু কাঁচা, কাঁচা মাথার চুল।
চোক কাঁচা, ভোক কাঁচা, কাঁচা পান, পানি,
আল্লার দোহাই।
মহম্মদের বরে কাঁচা দেহ খানি।
অমর, অমর, অমর বন্দ, অমর তিন্শ ষাট্,
বন্দ অমর, কহেন গঙ্কুবালা, কুল্যার আগে ষোল কলা।
অমরি সমরি, তুমাকে খায়্যা, আমি হল্যাম অমরি,
উল্ট্যা ছাড়ল্যাম কায়, আমাকে যমের নাইকো দায়

ভর কণ্ঠা ভর, মিন্নতের আজ্ঞা, গফুনাতের বর।
পিও যাদা, পিও আমার যাদা পিও,
মুখখানি পুন্নিমার চাঁদ যোগে, যোগে জিও।

সাপের মন্ত্র।

ডিম্ ডিম্যাকির বাড়ী, ঘন ঘনায়ে বাঁশি যায়।
গাড়্ শব্দে রোলা বিষ খেয়্যা নাগাল্ না পায়।
গাড়্ ভাঙ্গো, মুট্ ভাঙ্গো, লুহার চামোটি ভাঙ্গো,
হাতে কোর্য়া নিল্যাম বালি, বিষ মর্যা গ্যালো চুণ্যাখালী।
নন্দো বুলে হরিণ্যা বাড়ীতে আছো ঝি!
শ্মশান ঘাটে ডঙ্কা ফির্য়া আস্যাছি।
আড়ে ডঙ্কা, পাড়ে ডঙ্কা, মুড়া করে রা;
ঘাট্ সত্তর গ্যাড্ গুড্ সিঙ্গাড়ু ভাঙ্গ্যা আয়, বিষ তু ঘা মু খু ধা।
তোলে হাঁক্ ডাল, পরসাদ্যার মা, পোরসিলো
পরসাদ্যার মা, ঘাটে যাতে ভাঙ্গ্লো ঘুম,
ঘুম এড়্যা ছাড়াল্যাম বালি যতো বিষের
নাড় ভাঙ্গালি, আয় বিষ তুই সুনালে, সুচালে,
মারি মোচরে কাঁদে বিষ, করুণা করে
পুঁকার আগে, সে বিষ মরে, সে বিষ মরে।
নাই বিষ বিষোহরির আজ্ঞায়।
আন্ক্যার আজ্ঞায় বিষ নাই আর।

এই মন্ত্র গুলির কোন অর্থ নাই। তবে বাগড়ী অঞ্চলের ভাষা ইহাতে বিদ্যমান। এই নিমিত্ত উক্ত মন্ত্র দুটি উদ্ধৃত করা গেল।

শাস্ত্রে আছে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" আমরাও এই শাস্ত্রাদেশের অবমাননা করিতে অক্ষম, সুতরাং সৈদাবাদের কিছু বোল্ চাল সভ্য মণ্ডলীকে উপহার দিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহৃত করিব।

সৈদাবাদ বাগড়ীর অন্তর্গত, এবং এই বহরমপুর সহরের উত্তরাংশে অবস্থিত। এখানকার কথা বার্ত্তা উচ্চারণপ্রণালী, হাব ভাব সমস্তই উল্লেখ যোগ্য। সৈদাবাদের যে সময়ের এবং যে সকল ব্যক্তির বিষয় আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা এক্ষণে অতীতের বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন; এখন কচিৎ দুই একটি লোক বর্ত্তমান আছেন, যাঁহাদের নিকট ঐসকল বিষয় অবগত হওয়া যায়।

সৈদাবাদের ভাষা ও মানব প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সৈদাবাদের তাৎকালীন অবস্থা এস্থলে বর্ণনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে যে সময়ে রেশমের ব্যবসায় মুরশীদাবাদ জেলায় খুব ধুমধামের সহিত চলিতে ছিল, তখন এ সহরের লোক বেশ সম্পত্তিপন্ন ছিল। যাঁহাদের অর্থ ছিল তাঁহারা রেশমের কুঠী করিয়া এবং রেশম ক্রয় বিক্রয় করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেন এবং ঐ ব্যবসায়ে অনেকে প্রভুত অর্থশালী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের তাদৃশ অর্থবল ছিল না, তাঁহারা গদীয়ানের গদিতে রেশমের দালালি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এরূপ লোকের সংখ্যাও বিস্তর ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্য্যন্ত সকলেই রেশমের দালালি করিতেন। ব্রাহ্মণ দালালগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর গদীয়ানদিগের গদিতে গিয়া বসিতেন, আশীর্ব্বাদ করিতেন, দুই চারিটা খোস্‌গল্প করিতেন। তখন ব্রাহ্মণগণের উপর সকলের ভক্তিও ছিল, গদিয়ানগণ পাইকারগণের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া ব্রাহ্মণ দালালগণকে দিতেন, এইরূপে ব্রাহ্মণ দালালগণ প্রত্যেকে প্রতিদিন এক টাকা হইতে চারি পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেন। ইতর শ্রেণীর দালালেরা ঐ সকল মহাজনদের গদীতে গ্রাহক ডাকিয়া আনিত এবং প্রত্যেক গ্রাহকের নিমিত্ত গদীয়ানের নিকট কিছু কিছু পাইত; এইরূপে তাহারা প্রত্যেকে প্রতিদিন এক টাকা, দুই টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিত। তখন আহার্য্য দ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্র এত দুর্ম্মূল্য ছিল না, বাবুগিরিও এরূপ বেশি ছিল না; যে যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতেই তাহার জীবনোপায় হইত। তখন এক টাকায় এক মণ চাউল, চারি সের ঘৃত, আট সের তৈল পাওয়া যাইত সুতরাং যে প্রতিদিন আট আনা উপার্জ্জন করিত তাহারও সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। প্রায় লোকেই প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা—১টা পর্য্যন্ত ব্যবসায়ের কার্য্য করিত, তার পর স্নানাহার সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্বশান্তিবিধায়িনী নিদ্রাদেবীর কোমল অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিদ্রোত্থিত হইয়া নানাবিধ গীত, বাদ্য, আমোদ প্রমোদে সময়াতিবাহিত করিত। সে দিন বাঙ্গলার পক্ষে বড় সুখের দিন ছিল। তখন উদরান্নের জন্য লোকে ভাবিত না, আর এখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্নচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও লোকে অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। বড় দুঃখেই কবি গাহিয়াছিলেন :—

"Time there was ere England's grief began,
When every acre of land maintained its man.

আমরাও কবির সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতেছি :—

Time there was ere Bengal's grief began;
When every *bigha* of land maintained its man.

হায়! সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে? সুখ সৌভাগ্যের অঙ্কে লালিতপালিত হইলে এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের দ্বারা বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত এবং স্বভাব সংগঠিত না হইলে লোকে

যেরূপ অলস হয় এবং অলস হইলে যে যে দোষ মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে সৈদাবাদবাসিগণের তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহারা অধিকাংশই গঞ্জিকা ও অহিফেনসেবী ছিলেন। তখন মদ্যের বেশি প্রাদুর্ভাব ছিল না। ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটিরে পর্য্যন্ত গঞ্জিকা ও অহিফেন প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

সুতরাং ঐ সকল মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইলে মনুষ্যের যেরূপ আকার, প্রকৃতি, হাব ভাব, কথা বার্ত্তা, চাল চলন হইয়া থাকে ইহাদেরও তাহাই হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহাদের কথা, বার্ত্তা, সুর, চাল, চলন ইত্যাদির যে উল্লেখ করিব তাহাতেই তাহা সপ্রমাণ হইবে।

১। সৈদাবাদের একজন লোক বহরমপুরের সবজজ আদালতে এক নালিশ করিয়াছিল, সে মোকর্দ্দমা তাহার অনুকূলে ডিক্রি হয়, কিন্তু হাকিম ভুল ক্রমে সুদের ডিক্রি দেন নাই। বাদী জোড় হাত করিয়া হাকিমের নিকট দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ওরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছ কেন?" তাহাতে বাদী উত্তর করিল "হুজুর, আমার একটা আরজী আছে, ভয়ে বুলবো না লিপ্‌ভয়ে বুলবো?" হাকিম কহিলেন, "নির্ভয়েই বল" বাদী কহিল "হুজুর অনেক ডিগ্রী দেখ্যাছি, কিন্তু অ্যামন নপুংছক ডিগ্রী ত কখন দেখিনি।" অর্থাৎ সুদের ডিক্রি দিলে ডিক্রী প্রাপ্ত টাকার বংশ বৃদ্ধি হইত, তাহা না দেওয়ায় ডিক্রীকে নপুংসক বলা হইল।

সৈদাবাদে স্থানে স্থানে বহুলোক একত্রিত হইয়া গাঁজা ও গুলি সেবন করিত, তাহাকে আড্ডা বলিত। ঐ আড্ডার লোকেরা পরস্পর "ইয়ার" বলিয়া ডাকিত। এক ইয়ার আর এক ইয়ারের নিকট কয়েকটি টাকা কর্জ্জ লয়, কিছুদিন পর উভয় ইয়ারে বিবাদ হওয়ায় উত্তমর্ণ ইয়ার অধমর্ণ ইয়ারের নিকট ঐ টাকা চায়, সে তাহা না দেওয়ায় উক্ত ইয়ার অপর ইয়ারের নামে আদালতে নালিশ করে ও টাকা ডিক্রী পায়, ডিক্রীদার দেনদারের নামে ডিক্রীজারি করিয়া অন্য উপায়ে টাকা আদায় হইবার উপায় না থাকায় তাহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির করে। আদালতের পদাতিক দেনদারকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছে, ডিক্রীদারও সঙ্গে যাইতেছে, আদালতে যাইবার সময় তাহারা বিশ্রামার্থ ভাগীরথী তীরে দেবদারু বৃক্ষমূলে বসিয়াছে। গাঁজা এবং কল্‌কে সর্ব্বদা সঙ্গেই থাকিত, ডিক্রীদার গাঁজা প্রস্তুত করিল, কিন্তু পান করিল না। কারণ গাঁজেলদের নিয়ম (Etequette) এই যে গাঁজা যে সাজিবে সে আগে পান করিবে না, অন্য ইয়ারদের মধ্যে দুই এক জন খাইলে পরে সে খাইবে। সুতরাং ডিক্রীদার গাঁজা সাজিয়া থাকিলেও এবং তাহার পান-প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইলেও সে এই চিরন্তনী প্রথার অন্যথা করিতে সমর্থ নহে। দেনদারের সহিত তাহার উপস্থিত মোকর্দ্দমা লইয়া বিবাদ, বাক্যালাপ নাই, সুতরাং তাহাকে খাইতে অনুরোধ করিতে পারিতেছে না, অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া কহিতেছে :—"ছালা মানুছে মানুছে ঝগড়া হয়, মালের ছঙ্গে কিছের ঝগড়া? যে ছালা ইয়ার হবে ছে তুল্যা লিবে।" এই কথা বলিতেই দেনদার কলিকাটী

তুলিয়া লইল যেহেতু তাহারও পান করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, সে দুই এক টান্ টানিয়াই পুনরায় কলিকাটি পূর্ব্ববৎ মাটিতে রাখিয়া দিল, ডিক্রীদার পুনরপি পান করিল, এইরূপে উভয়ের বিবাদ মিটিয়া গেল, তখন উভয় ইয়ারে একত্রে পদাতিককে বলিল :—"ছালা, ইয়ারে ইয়ারে মামলা তার মধ্যে পিয়াদা ক্যানো রে ছালা ?" এই বলিয়া পিয়াদাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল।

২। একবার একজন বহরমপুরের কোন আদালতে একটি সত্বের মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাতে তাহার বিপক্ষে একজন অল্পবয়স্ক যুবক জবানবন্দী দিতেছিল, কিন্তু যে ঘটনার বিষয় জবানবন্দী দিতেছিল, তাহা তাহার জন্মের বহুকাল পূর্ব্বের কথা। তাহাতে বাদী বিরক্ত হইয়া ঐ সাক্ষীকে বলিয়া ছিল :—"তুই যখনকার কথা বুল্‌ছিচ্ তখন কি তুই তোর বাবার মগজে (১) ছিল্বি ?" এই কয়টি গল্প নহে, সত্য ঘটনা।

৩। একজনের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহাতে যে নিমন্ত্রণ পত্র বাহির হইয়াছিল তাহার মুসাবিদা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাবাজীবন ! রোকায় জানিবা আচ্ছীন্ মাছের পাঁচহি তারিখে তিনকড়্যা(২) ত লাট্ খেয়্যাছে, (৩) তুমি ঐ মাছের পনরহিঁ তারিখে আমার সয়দাবাদ ভবনে আছিয়া লুচি আর গোল্লা লুছ্বা। (৪) বলা বাহুল্য এই মুসাবিদা সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির জন্যই হইয়াছিল।

৪। একজনের বাটিতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হইবে তাহার ফর্দ্দ ধরা হইতেছে, অন্যান্য দ্রব্যের পূর্ব্বে প্রথমে বৃষই ধরা হইয়াছে, এমন সময় কৃতীর একজন ইয়ার সেখানে উপস্থিত ছিল, সে বলিল "বৃছ কিন্‌তে হবে না, বৃছ আমি দিব, কাট্ ছালা বৃছ কাট্।" ইয়ারের কথা অনুসারে "বৃষ" কাটিয়া দেওয়া হইল। ক্রিয়ার দিন বৃষের আবশ্যক, তখন কৃতী ইয়ারকে ডাকিয়া বলিল ইয়ার "তুমি যে বৃছ দিতে চেহাছিল্যা তা দ্যাও," ইয়ার কহিল "তুমি আমার বাড়ী লোক পাঠিয়্যা দ্যাও, আমার ব্রাহ্মণী বৃছ দিবে।" লোক গিয়া দেখিল তাহার গো-শালায় যে কয়টি বৎস ছিল সকল গুলিই বকন, এঁড়ে অর্থাৎ বৃষ একটিও নাই তখন সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল কৈ ঠাকুর বৃষ ত নাই, যে কটি আছে সবই যে বকন, তখন ব্রাহ্মণ রাগান্বিত হইয়া কহিল, "ছালা, কে বুল্লো যে বৃছো নাই ? চল্ আমি গিয়া বৃছো দিছিগা।" তখন চাকরকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণ গোয়ালঘরে গিয়া দেখেন যে বাস্তবিক যে কয়টি বৎস আছে সে সব গুলিই বকন, তখন রাগান্বিত হইয়া ইয়ারের বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং কহিলেন, "ছালা খেঁতোছ্ দেতোছ্ কুদ্যা(৫) ব্যাড়াতোছ্ আমি জান্‌তাম ছালা বৃছ, ওয়াখন কামের ছময় যে ছালা বকন হ'য়্যা বছ্যা আছে, তার আর আমি কি কচ্ছি ?" তাঁহার বিশ্বাস

(১) মস্তিষ্কে। (২) শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতার নাম। (৩) মরিয়াছে, রেশমের পোকা গুটি কাটিয়া বাহির হইলে সেই নষ্ট গুটিকে "লাট" গুটি বলে। তাহাতে লাট খাওয়া কথার সৃষ্টি, ইহার অর্থ নষ্ট হওয়া বা মরিয়া যাওয়া। (৪) খাইবা। (৫) লাফিয়ে।

এই যে বাস্তবিক ওটা বুষই ছিল, এক্ষণে শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত হইবার ভয়ে বজ্জাতি করিয়া "বকন" হইয়া বসিয়া আছে।

৫। একদিন দুই গুলিখোর নৌকাযোগে চকে "ব্যারা" ভাসান দেখিতে গিয়াছিল। উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে হয়ত কেহ কেহ "ব্যারা" কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তাঁহাদিগকে আমরা Mazoomdar's "Musnad of Murshidâbâd" বা নিখিল বাবুর "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এস্থলে "ব্যারা"র বিবরণ দিতে গেলে অনর্থক পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। গুলিখোরেরা যেখানেই যাউক, তাহাদের গুলি খাইবার সরঞ্জাম সমস্ত সঙ্গেই থাকে, উভয়ে গুলি খাইতে খাইতে "মজগুল্", একজন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঝিমাইতেছে, এমন সময় "বেরা" ভাসান হইল, অপর জন কহিল "ভাই দ্যাখ্ দ্যাখ্ ব্যারা আসুছে"। দ্বিতীয় ব্যক্তি চক্ষু মেলিতে পারিল না, কহিল "যা ছালা, উহ্যার আর কি দেখ্ব? একটা দিগম্বর মিস্তির ভেছে যেছে।" দিগম্বর মিস্তিরের সহিত "ব্যারা"র সম্বন্ধ এই যে ব্যারা ভাসান ব্যাপারে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইত, আর দিগম্বর মিস্তিরও কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের নিকট একলক্ষ টাকা পাইয়া বড়লোক হইয়াছিলেন। সেদিন দৈব-দুর্যোগ ছিল, হঠাৎ তুফান উঠিয়া গুলিখোরদিগের নৌকাখানি জলমগ্ন হয়, তখন একজন গুলিখোর তীরস্থ এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ডাকিতেছে—"আমি ডুব্যাছি হে, ছয়দবাদের কেউ থাকত তুলহে-এ-এ।" তখন তীরস্থ ব্যক্তি তাহাকে তীরে আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, তুমি জলে ডুবিতেছিলে, আমি তোমাকে তুলিলাম, কিন্তু আমি সয়দাবাদের লোক নহি; তুমি সয়দাবাদের লোক ডাকিতেছিলে কেন? গুলিখোর উত্তর করিল—"কি জানি কোন ছালা দেহাত্যাকে ডাক্ব, আর ছালা ডুবিয়ে মারবে?" "দেহাত্যা" অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে।

৬। একদিন এক গুলির আড্ডায় কে কেমন চাট্ ব্যবহার করে তাহার সমালোচনা হইতেছে, কেহ কহিল অমুক ক্ষীর দিয়া চাট্ করে, কেহ কহিল অমুক কাঁচাগোল্লা দিয়া চাট্ করে। তন্মধ্যে একজন কহিল "ছে যে রেধ্যাছেলো, ছালা, ত্যাপাল্ঠ্যা (১) টালাকুমড়্যা (২), ছালা ছ্যানাবড়ার ছিল্কে ফেলে খেতোছ্।" মুর্শিদাবাদের ছানাবড়া পূর্ব্বে বড়ই উপাদেয় বস্তু ছিল, দুঃখের বিষয় এখন আর তেমন ছানাবড়া দেখা যায় না। এমন ছানাবড়ার ছিল্কে ফেলে খাওয়াটা "রেধোর" সৌখিনত্ব ও বাবুগিরির পরিচায়ক।

৭। একদিন এক গাঁজার আড্ডায় গল্প হইতেছে। একজন কহিতেছে "দ্যাখ্ ভাই ছেদিন কিষ্টার গোহাল ঘরে একটা বাঘ ঢুক্যাছিল, ছালা বাছুর ল্যায় আর কি? অ্যামন ছময় কিষ্ট্যা এছ্যা বাচ্ ছালা বাঘের ন্যাজ ধর্যা ফেলে, ন্যাজ আর খাল, বাচ্ কিষ্ট্যার হাতে থাক্যা গ্যাল, ছালা বাঘ পলিয়্যা গ্যাল।" ইহাই সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিল।

(১) (২) গালি মাত্র=ত্রিজাতক।

৮। একদিন একজন বয়োবৃদ্ধ মৃতদার ব্যক্তি তাহার ইয়ারকে কহিল "ভাই অ্যাখন আ্যাক্‌টা বিহ্যা কোল্লে হয় না"? ইয়ার উত্তর করিল, "তোর আবার অ্যাখন বিহ্যা হয়"? তাহাতে সে ব্যক্তির প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল, সে তখন আর কিছু বলিল না, কিছুকাল পরে সে বিবাহ করিয়া নব-বধূ লইয়া তাহার ইয়ারের দোকানের নিকট দিয়া যাইতেছে, তখন তাহার ইয়ার কাঁচাগোল্লার ভিয়ান করিতেছিল, সে জেতে ময়রা ছিল ও তাহার নাম ছিল কাশী, সেখানে পাল্কী থামাইয়া কহিল—"দ্যাখ্‌ ছালা কেছ্যা, বিহ্যা হোচ্ছে কিনা দ্যাখ্‌"।

৯। একদিন একটি দ্বিতল গৃহে একটি গঞ্জিকাসেবী বসিয়া আছেন, শরৎকালের রজত ধবল চন্দ্রকিরণ তাঁহার বাতায়নের লোহিত-কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া তাহার উপাধানের উপর পতিত হইয়াছে; তিনি উহাকে অগ্নি মনে করিয়া তাহাতে টিকা ধরাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এবং টিকা ধরান ব্যাপারানুকূল হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তাল দিয়া মনের আনন্দে গাহিতেছেন—

"আকাছে উঠ্যাছে চাঁদ তৃণবৎ হ'য়ে,
হর-পতি গুণ-গান ছামের লাগিয়ে,
বাবা, এতো রা'তের কথা।
বাবা, কিছের লাগিয়ে— বাবা,
এতো রা'তের কথা?"

এই গানটির যেমন বা ভাষা, তেমনি উপমার পারিপাট্য, তেমনি অর্থ সঙ্গতি; একাধারে সকল গুণই বর্ত্তমান!

একদিন শীতের সময় গাঁজার আটচালার(১) নিকট বসিয়া কয়েকজন গাঁজাখোর সূর্য্যোত্তাপে শরীর গরম করিবার আশায় কথোপকথনে মগ্ন ছিল, তাহার অনতিদূরে একটি পুরাতন শিবমন্দির ছিল, সূর্য্যোত্তাপ তাহাদের গায়ে না লাগায় তাহারা মনে করিল যে, ঐ মন্দিরটাই উত্তাপ প্রতিরোধ করিতেছে অতএব মন্দিরটা সরাইয়া দেওয়া যাউক, এই পরামর্শ স্থির হইলে, তাহারা কয়েকজন নৌকা ঠেলার ন্যায় মন্দিরে পৃষ্ঠ বাধাইয়া দিয়া ঠেলিতে লাগিল, কিছুকাল পর সূর্য্যদেব দিগ্‌বলয় অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিলে আপনাআপনি তাহাদের গায়ে সূর্য্যোত্তাপ লাগিল; তখন তাহারা মনে করিল যে তাহাদের চেষ্টাতেই মন্দির সরিয়া গিয়াছে এবং রৌদ্র আসিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। একজন হাতকাঠি দিয়া মাপিয়া কহিল—"ছালা মন্দির চার হাত ছর্যা গিয়্যাছে।" সকলে অম্লান বদনে তাহাই বিশ্বাস করিল।

---

(১) "গাঁজার আটচালা" শুনিয়া বোধ হয় পাঠকবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, সে সময়ে সৈদাবাদে বাস্তবিক শিবপূজা উপলক্ষে গাঁজার আটচালা নির্ম্মিত হইত। ঐ আটচালা জন সাধারণের নিকট চাঁদা তুলিয়া প্রস্তুত করা হইত। তখন অর্থের অভাব ছিলনা, লোকে আমোদ করিয়া এই সকল ব্যয়ভার বহন করিত। উক্ত আটচালাতে শিবপূজা হইত। পূজান্তে শিবের বিসর্জ্জন হইলে, শিবসহচরগণ ঐ আটচালার গাঁজা খুলিয়া সেবন করিতেন।

এক গুলির আড্ডায় নানা রকম গল্প চলিতেছিল, ইয়ারদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল ভাই, নেজামতের যে ময়ূরপঙ্খী নৈক্যা(১) আছে, ঐ মতন অ্যাকৃথান নৈক্যা কত হ'লে হ'তে পারে? অন্য একজন বলিল বিছ পঁচিছ টাকা হ'লেই হ'তে পারে। তার মধ্যে একজন কর্ম্মকার ছিল, সে বলিল, ভাই "যত নুহা(১) নাগে২) ছব্ আমি দিব"। আর একজন সূত্রধর ছিল, সে বলিল ভাই, "যত কাঠ নাগে ছব্ আমি দিব"। তৎক্ষণাৎ মানসী নৌকা প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন একজন বলিল, "বাঁহিচের ছময় আমাকে লিবি না"? উত্তর, "তুই ইয়ার আছিচ্ তোখে লিবনা"? আর একজন বলিল, "আমাকে লিবিনা"? উত্তর, "তোখেও লিব", আর একজন বলিল "আমাকে"? উত্তর, "তোখেও লিব"। এইরূপে পাঁচ, সাতজন জিজ্ঞাসা করিতেই মানসী নৌকার কল্পিত মালিক মহা চটিয়া গেল, এবং বলিল—"একি গুজ্যারের(৩) না(৪) পায়্যাছিচ্, যে যার মুন(৫) ছেই চড়্যা(৬) বছ্বি(৭)।" তারপর পরস্পর বাক্‌বিতণ্ডা, অবশেষে মারামারিতে শেষ হইল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঐ সৈদাবাদেই বঙ্গবিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয়ের বাস ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেবের রচিত নহে, উহা আধুনিক এবং বোপদেব গোস্বামীর রচিত, এই কথা অবলম্বন করিয়া উক্ত সৈদাবাদনিবাসী বংশে নাপিত একটি কবির গান রচনা করিয়াছিল, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। ঐ বংশে নাপিত নিরক্ষর ছিল, কিন্তু তাহার কবিতা, ছড়া প্রভৃতি রচনা করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। গানটি এই——:

"ছুন কবিরাজ মাহাছয়, তোমার বুদ্ধি অতিছয়,
বুলছো তুমি ভাগবত টা ব্যাছের কৃত নয়,
ছুনে তোমার কথা এখন পড়্যা গেলাম গোলে,
তুমি "মুকুন্দং ছচ্চিদানন্দং" পড়্যাছিল্যা কার টোলে?

এই মুরশীদাবাদের ভাষাতত্ত্বের প্রবন্ধে মুরশীদাবাদের ফেরিওয়ালা (Town criers) দিগের ডাক গোটা কয়েক সভামণ্ডলীকে উপহার দিলে বোধ হয় অপ্রীতিকর বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহা এই———

আমবিক্রেতার ডাক শুনুন :—

(ক) গুধ্যা কাঁকসার (১) রাম (২) লিব্যা—্যা—্যা?
চূণ্যাখালীর (৩) রাম লিব্যা।

(১) আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নেজামতের পেন্সন অনেক বেশী ছিল, ময়ূরপঙ্খী নৌকাগুলিও বহুব্যয়ে নির্ম্মিত হইত। দাঁড়ী ও মাঝির পোষাক ও অন্যান্য আসবাবে প্রতি নৌকাতে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইত।

(১) লোহা। (২) লাগে। (৩) খেওয়ার। (৪) নৌকা। (৫) মন। (৬) চড়ে। (৭) বসবি।

(১) গুধিয়া ও কাঁকসা দুইটা গ্রামের নাম। (২) রাম—আঁম।

লালন পালন করিয়া বর্দ্ধিত, পুষ্টাঙ্গ ও কার্য্যক্ষম করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করা যায়। বঙ্গভাষায় লিখিত বৈষ্ণবসাহিত্য বঙ্গভাষার প্রধান, তাহা পরে আলোচ্য হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ, যে সকল মূল তত্ত্ব লইয়া পরমারাধ্য জ্ঞানে সাহিত্যকানন নির্ম্মাণ করিয়াছলেন তাহার উল্লেখ প্রথমে আবশ্যক।

ধরিয়া লইলাম। এবং গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থকারগণের শাক হিসাবে যাহা সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিকগণের মীমাংসিত বিবরণ হইতেই সংগৃহীত। বর্ত্তমান কালে ইতিহাসের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ হওয়া অসম্ভব মনে করি না। অপিচ যথাসম্ভব সময়ের পূর্ব্বাপরতা অনুসারে গ্রন্থ বিবরণ লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ এক সময়ে দর্শন, ধর্ম্ম, কাব্য অলঙ্কার যাহা কিছু প্রচারিত, তাহা তৎকালেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

অপিচ, গোস্বামী ও তদনুগত মহাজনদিগের যাবতীয় গ্রন্থ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ভক্তি-রসের ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ। সে অংশে ধরিতে গেলে সমস্ত গ্রন্থকেই অলঙ্কারের শ্রেণীবিশেষে প্রবিষ্ট করিতে হয়। কারণ (২) ঈশ্বরে পরমানুরাগের বা পরম প্রেম অর্থাৎ প্রীতির নাম ভক্তি, সেই পরমানুরাগ শান্তরসের ব্যাপারবিশেষ। শান্ত, শৃঙ্গার হাস্য করুণাদির অন্তর্গত একটি রস। রস অলঙ্কার শাস্ত্রের বর্ণনীয়। এইরূপ ভাবে মীমাংসা করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থকে অলঙ্কারমধ্যে ধরিলে অবান্তর পারিপাট্য থাকে না, সুতরাং যে যে অংশে যে যে গ্রন্থ প্রধান বা প্রয়োজনীয় তাহা ধরিয়াই পুরাণ, ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য ইত্যাদি শ্রেণীভাগ করা হইল। আরও এক কথা—বৈষ্ণবসাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে তত্তৎ গ্রন্থকর্ত্তৃগণের জীবনেতিহাস ঘনসন্নিবিষ্ট। এজন্য তাঁহাদিগের যে সকল সময় উল্লেখ করা হইয়াছে, অনেক স্থলে তাহাই গ্রন্থের সময় ধরিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে—বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে পুরাণ বা তৎসদৃশ প্রাচীন গ্রন্থকে ধরিলাম না, কারণ তাহা কেবল বৈষ্ণবসাহিত্যের নহে, যত কিছু অতীত ও বর্ত্তমান শাস্ত্র আছে, সমস্তই পুরাণের অন্তর্গত। যে যে বৈষ্ণবসাহিত্য যে সমস্ত প্রধান আর্ষগ্রন্থের নিকট বিশেষ ঋণী, তাহার মধ্যে কতিপয়ের নাম ও সামান্য পরিচয়মাত্র উল্লেখ করিলাম। আর্ষগ্রন্থ-মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই প্রধান। তৎপরে হরিবংশ, ব্রহ্মসংহিতা, হরিভক্তিসুধোদয় প্রভৃতি। ভাগবত বৈষ্ণবসাহিত্যের সর্ব্বাংশেই প্রধান, ইহাই রামানুজ হইতে বর্ত্তমানকালের বৈষ্ণব

কাব্যকে বিশ্লেষণ করিলে ব্যাকরণ, অলঙ্কার রস এই গুলি পৃথক্ হইয়া পড়ে। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মহামহোপাধ্যায় সুধীবর্গের উল্লিখিত প্রণালীতে কাব্য ও সাহিত্যের ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে, অলঙ্কারযুক্ত বাক্য, লালিত্যপূর্ণ বাক্য, বহু বিষয় ও বৈচিত্র সম্বলিত বাক্য এবং ছন্দ, অলঙ্কার ও রসময়ী রচনাকে সাহিত্য বলা হইতেছে। সুতরাং সাহিত্যের বিষয় ব্যাপক, অনেক প্রকারেই সাহিত্য হইতে পারে, আর রসাত্মক অর্থাৎ আস্বাদন বা চমৎকারিতাপূর্ণ বাক্যই কাব্য, ইহা সাহিত্যাপেক্ষায় ব্যাপ্য। ভাগবতের বোপদেব-কৃত তিন খানী টীকা। পরমহংসপ্রিয়া, হরিলীলা ও মুক্তাফল। এখানে ভাগবতের তত্ত্ব বিচারকে সাহিত্য বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বহু বিষয়ের একত্র সমন্বয়কে সাহিত্য শব্দে প্রয়োগ করা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। পরন্তু বর্ত্তমান কালের প্রথা অনুসারেও পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, অলঙ্কার ছন্দ, কাব্য, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়কেই এক মাত্র সাহিত্যশব্দে উল্লেখ করিলাম। কেহ যদি ইহার সুমীমাংসায় অগ্রসর হয়েন সুখের কথা। আমি মীমাংসার সূচনা করিলাম মাত্র।

(২) সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা। (নারদ ও শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র)

পর্য্যন্ত সকলের ধ্রুবতারা বা একমাত্র লক্ষ্যস্থল। হরিবংশ ভাগবতের মীমাংসাপক্ষে টীকা-কারগণের উপজীব্য। ব্রহ্মসংহিতা ১০০ অধ্যায়ে বিভক্ত, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণকালে মল্লার দেশের পয়স্বিনী নদীতীরে আদি কেশবের মন্দির হইতে একটি মাত্র অধ্যায় আনয়ন করেন, তাহাই জীব গোস্বামী বিস্তৃত টীকাদ্বারা উজ্জ্বল করেন। ইহা বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত-রক্ষাবিষয়ে স্তম্ভস্বরূপ। এই গ্রন্থের পূর্ণাংশ বৃন্দাবনে রঙ্গনাথজীর মন্দিরে (শেঠের বাড়ীতে) আছে (৩)। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণং।" এই ইহার প্রথম শ্লোক। ১ হইতে ২৮ শ্লোকে কৃষ্ণ ও ধামতত্ত্ব। ২৯ হইতে ৫৬ শ্লোকে ব্রহ্মার ভগবৎস্তব। ৫৭ হইতে ৬২ শ্লোকে উপসংহার। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে এই অংশ ৫ম অধ্যায়। হরিভক্তিসুধোদয় ২৫০০০ হাজার শ্লোকাত্মক নারদ পুরাণের অন্তর্গত। ধ্রুব প্রহ্লাদাদির উপাখ্যানে সুন্দরভাবে ভক্তিযোগ বুঝান হইয়াছে। ইহাতে ২০টী অধ্যায় ও তাহাতে ১৬৩২টী শ্লোক আছে। রসামৃত সিন্ধু, চৈতন্যচরিতামৃত এবং হরিভক্তিবিলাসকার তথা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন এই গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার অশ্বত্থ ও তুলসীমাহাত্ম্য এবং জ্ঞান ও ভক্তিযোগের বর্ণনা বড়ই মনোরম। কার্ত্তিকমাহাত্ম্য ও ক্রিয়াযোগসার (পদ্মপুরাণের অন্তর্গত) স্কন্দ পুরাণীয় উৎকলখণ্ডের ক্ষেত্রমাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ বিভব, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, রাম-গীতা, রামার্চ্চন ও কৃষ্ণার্চ্চন চন্দ্রিকা, গোপাল ও বিষ্ণু সহস্র নাম। অষ্টক বা স্তোত্র গ্রন্থ (যথা—জগন্নাথাষ্টক, যমুনাষ্টক, কৃষ্ণাষ্টক, কৃষ্ণতাণ্ডব স্তোত্র) ইত্যাদি। কংসবধ, হরিবিলাস, হরিবিজয় ইত্যাদি ও মাঘকৃত শিশুপালবধ প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন নারদ ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র। এই দুইখানি গ্রন্থই ভক্তিসম্বন্ধে আদি,"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা" ইত্যাদি সূত্রোক্ত ভক্তির মর্ম্ম লইয়াই গোস্বামিগণ ভক্তির লক্ষণ ও তাহার নানা প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। আরও গোপালতাপনী, রামতাপনী ও নৃসিংহতাপনী নামক তাপনীত্রয়কেও অন্যতম বেদপ্রমাণস্থলে গোস্বামিগণ স্বীকার করিয়াছেন। উহা অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত। কিন্তু কোন কোন লোকের তাহাতে অবিশ্বাস আছে। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার টীকাকার। ঈশ্বরতত্ত্বে বিশেষতঃ দ্বৈতবাদের পক্ষে গোপালতাপনী প্রামাণিক। ক্রম-দীপিকা এবং ইতিহাসসমুচ্চয় নামক আর্ষগ্রন্থ ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থার মূল। শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-নির্ণয় বিষয়ে কতিপয় গ্রন্থ দেখা যায়, যথা—চৈতন্যোপনিষদ্, ঈশানসংহিতা, ঊর্দ্ধাম্নায়সংহিতা ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী।

এখন প্রকৃত বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ঃ—পশ্চিম দেশে নিম্বার্ক বা নিমান্বত সম্প্রদায়ের যে সমস্ত মঠ আছে তাহার প্রধান প্রধান গুলি চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া

(৩) বোম্বে মুদ্রিত ভাগবতভূষণে জানা যায়।

কিম্বদন্তী দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে ৫ম শতাব্দীতে বেদান্তসূত্রের নিম্বার্কীয় ভাষ্যের সত্তা উপলব্ধ হয়। এই ভাষ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ পূর্ণ। অতি প্রাচীন শ্রীনিবাস ও কেশবকাশ্মীরি-কৃত টীকাদ্বয়যুক্ত নিম্বার্কভাষ্য বৃন্দাবনে মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থ মথুরাতে আরঙ্গজেবের সময়ে নষ্ট হয়, এজন্য তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে বহুদিন পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে আচার্য্য শ্রীবিঠ্ঠল ভক্ত দ্বারা এই মত পরিস্ফুট হয়। সে সব কথা পরে বক্তব্য। এই নিম্বার্কের চলিত নাম নিমার্গী বা নিমানন্দী। রামানুজের পূর্ব্বে এই নিম্বার্ক ভাষ্যের সত্তা সম্বন্ধে অনেক আপত্তি আছে। কেহ কেহ রামানুজের পর অর্থাৎ ৮ম শতাব্দীতে ইহাকে ধরিয়া থাকেন, কিন্তু পশ্চিমের কতিপয় প্রাচীন বৈষ্ণবের কথাতে আমি নিম্বার্ক ভাষ্যের সত্তা ৫ম শতাব্দীর বলিয়া বিশ্বাস করি। নিম্বার্ক নামের উপাখ্যান এই—জৈন সন্ন্যাসীর জীবহিংসা-ভয়ে রাত্রিভোজন নিষিদ্ধ। অপরাহ্ণ কালে একজন জৈন সন্ন্যাসী ভাস্করাচার্য্যের আশ্রমে নিম্বতলে উপস্থিত। অতিথি ক্ষুধাতুর, আচার্য্য আহার্য্য সঞ্চয়ের জন্য বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন, এদিকে সূর্য্যকে অস্তোন্মুখ দেখিয়া অতিথি ভোজনে নিবৃত্ত হইলেন, আচার্য্য যোগবলে সূর্য্যদেবকে অতিথির ভোজনকাল পর্য্যন্ত নিম্ববৃক্ষে আনিয়া প্রস্ফুট দিবালোক প্রদর্শন করিলেন, অতিথির ভোজন হইল, পরে সূর্য্য অস্তগত হইলে অন্ধকার হইল। এই ঘটনাই ভাস্করাচার্য্যের নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নাম হইবার কারণ।

নিম্বার্ক বেদেরও একখানি টীকা রচনা করেন। পশ্চিমে অনেক স্থানে নিমার্গীদিগের মঠ আছে তাহাতে বহুতর সাধু বাস করেন। মথুরার ধ্রুবঘাট, বৃন্দাবনের রাধাবাগ ইত্যাদি স্থানের মঠ অনেকেই দেখিয়া থাকেন।

ইঁহাদের শাস্ত্রীয় মত বল্লভাচারী সম্প্রদায় হইতে তত বিভিন্ন নহে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপই ইঁহাদের উপাস্য, তবে বল্লভাচারীদিগের ন্যায় বিধি হইতে তাদৃশ শিথিল নহে।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী।

৭ম শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্মণকুলপ্রদীপ অশেষশাস্ত্রজ্ঞ বোপদেব স্বামীকে ধরিতে পারি। পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য (৪) প্রভৃতি প্রবল দার্শনিক তত্ত্বের পর বৈদিকাংশ ত্যাগ

---

(৪) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক নবীন পুস্তকে ১৪ পৃষ্ঠায় বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"বিলুপ্ত মাহেশ ব্যাকরণের পর পাণিনি, তৎপরে বররুচি, পুরন্দর, যাস্ক, ইঁহাদের পর রূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বর, শাকল্য, ভরত কোহল, ভামহ, বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর, মৌদ্গাল্যায়ন, শিলাবংশ" এই তালিকাতে নবীন ক্রমদীশ্বরকে দেখিলাম কিন্তু প্রাচীন বোপদেবকে দেখিলাম না। বামন পাণিনির এক মহাভাষ্য রচনা করেন, তৎপরে বোপদেবও এক মহাভাষ্য রচনা করেন। মাধবাচার্য্য মহাভাষ্যের স্বকৃত টীকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

"বোপদেবমহাগ্রাহগ্রস্তো বামনদিগ্‌গজঃ।
কীর্ত্তিরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন বিমোচিতঃ॥"

ভাবার্থ—বোপদেব বামন দিগ্‌গজকে আক্রমণ করেন। মাধবাচার্য্য বোপদেবের হাত হইতে বামনকে মুক্ত করেন। ইহা দ্বারাও বোপদেব যে ক্রমদীশ্বরের পূর্ব্বেকার তাহাতে সন্দেহ নাই।

করিয়া লৌকিক নিয়মে ইনি অতি সংক্ষেপে ব্যাকরণের সারমর্ম্ম জানিবার পথ প্রদর্শন করেন। এই বোপদেবের জীবনী অতি বৃহৎ, তাহা এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইতে পারে না, এজন্য সামান্য মাত্র উল্লিখিত হইল।

হায়দ্রাবাদ হইতে ২৮০ মাইল পশ্চিমে, বোম্বাই হইতে ১৭০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে নিজামরাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরিস্থিত মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধিকরণের পণ্ডিত বোপদেব স্বামী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রণেতা। হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণির দানখণ্ডের ভূমিকায় পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার সময়সম্বন্ধে নানা মত। প্রাচীন নন্দ পণ্ডিত, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, উইলসন্, স্মৃতিকাল তরঙ্গের প্রণেতা, ভক্তমাল প্রণেতা, ডাক্তার ৺রামদাস সেন, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত, ইত্যাদি অনেক জনের অনেক মত দৃষ্ট হয়। আমি ভক্তমালের কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি, বোপদেব কাশীরাজ শূরের ও শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক। সুতরাং, ইনি ৭ম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক। এবং রামানুজাচার্য্যের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম গুরুস্থানীয়। বোপদেব বহুশাস্ত্রজ্ঞ, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও তাঁহার কৃত নয়খানি গ্রন্থ ছিল, ইহা তদীয় পরিচয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান দেখিয়া এবং "ভিষক্ কেশবনন্দনঃ" এই পদ্যাংশ দেখিয়া অনেকে বোপদেবকে বৈদ্যজাতি বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। বস্তুতঃ উক্ত পদ্যের শেষাংশেই "বিপ্রো বেদপদাস্পদং" এই অংশে ব্রাহ্মণত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিম্নলিখিত মুগ্ধবোধের শেষ পদ্য দ্বারা বোপদেবের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—

"যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাস্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।
সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবততত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য ভু-
ব্যন্তর্বাণিশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ॥

যাঁহার দশাধ্যায়ীসম্পন্ন সুন্দর প্রণালীবিশুদ্ধ মুগ্ধবোধ, বৈদ্যকগ্রন্থ ৯ খানি, তিথি নির্দ্ধারণ বিষয়ে একখানি, ভাগবতের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় সাহিত্যগ্রন্থ ৩ খানি আছে, সেই পণ্ডিতশিরোমণির কোন্ কোন্ গুণ না অলৌকিক ?

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে যদিও দুর্গা, মায়া, অম্বিকা, শিব, কালী ইত্যাদি শব্দ আছে তথাপি কৃষ্ণনামের বাহুল্য এবং গ্রন্থকারের স্বকৃত পরিচয় দৃষ্টে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বৈষ্ণব—সাহিত্যের মধ্যে একখানি রত্ন। স্বকৃত মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥

গ্রন্থশেষের পরিচয় এই—

গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসঙ্কীর্ত্তনঞ্চেত্যুভয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধাল্লভ্যতেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ॥

সংস্কৃত ভাষায় বাক্যকথন ও মুকুন্দসঙ্কীর্ত্তন এই দুইটিই লোকে সুদুর্লভ, তাহা মুগ্ধবোধ ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ, অতএব মুগ্ধবোধ অবশ্য পাঠ্য। এই দেখিয়া আমার বোধ হয়—

শাস্ত্রবোধহরিনামকীর্ত্তনং এতদেব নরজন্মসাধনং।
তচ্চ সর্ব্ববুধচিত্তবোধনং, মুগ্ধবোধপঠনপ্রয়োজনং ॥

শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিতে কাশীরাজ নানা স্থান হইতে ভাগবতগ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে পর বোপদেব বহু কষ্টে তাহার উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তিন খানী টীকা বা সমন্বয় গ্রন্থ রচনা করেন (৫)। তাহার নাম—হরিলীলা, মুক্তাফল, পরমহংসপ্রিয়া। বোপদেবের পূর্ব্বে প্রক্রিয়ারত্ন নামে এক ব্যাকরণ ছিল তাহা মুগ্ধবোধে স্বীকার করিয়াছেন এবং ধাতুর গণবোধক গ্রন্থ কবিকল্পদ্রুমে লিখিয়াছেন যে, ইনি ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, পিশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর, জৈনেন্দ্র এই ৮ জন শাব্দিকের মত লইয়া ধাতুপ্রকরণের সুপ্রণালী রচনা করেন। এই মুগ্ধবোধের পর বৈদিক প্রকরণ বা স্বরশিক্ষাদির পদ্ধতি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। "বহুলং ব্রহ্মণি" বেদের প্রয়োগ বহু প্রকারে হয় এবং "নাম্ন্যন্তে তিক্চ" সংজ্ঞা অর্থে আরও কৃদন্ত প্রত্যয় হইতে পারে। এই দুই সূত্র দ্বারা বৈদিক প্রকরণ ও উণাদি প্রকরণের সম্মানমাত্র রক্ষা করিয়াছেন। তবে বিদ্যানিবাস, শ্রীরামতর্কবাগীশ ও দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি টীকাকারগণ অনেক অভাবের পূরণ করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধে অতি অল্প অক্ষরের মধ্যে, এমন কি একটী মাত্র চ, তু, বা, শব্দের দ্বারা এবং সাকাঙ্ক্ষ উহ্য শব্দের দ্বারাও বহুল অর্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রচলিত ব্যাকরণের মধ্যে এমন পরিপাটী, বিশেষতঃ ধাতুপ্রকরণের মত সম্যক্ বিস্তৃতি কোনও ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় না। যে কালে মুগ্ধবোধ রচিত হয়, তখন হয় ত লোকে বুঝিতে সমর্থ হইত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে সাধারণ বালকগণ সহজে বুঝিতে পারে না। যাহারা অপর ভাষায় ব্যুৎপন্ন তাহাদিগকে সূত্রের

---

(৫) ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভাগবতং নাম অন্যৎ ইত্যপি নাশঙ্কনীয়ং" অর্থাৎ ইহা ছাড়া অপর ভাগবত আছে বলিয়া কেহ যেন আশঙ্কা না করেন। বস্তুতঃ স্বামিপাদ আশঙ্কা দূর করিতে গিয়া আশঙ্কার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে স্বামিপাদের পূর্ব্বেও ভাগবত লইয়া মতভেদ ছিল।

ভাগবতের গোলযোগ দুই প্রকার। প্রথম—ভাগবত ব্যাসকৃত কি বোপদেবকৃত। দ্বিতীয়—দেবীপুরাণ বা দেবী ভাগবতই ভাগবত কি অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শুকপ্রোক্ত ও হয়গ্রীববধ ও ব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত ভাগবতই ভাগবত।

উভয় সংশয়ের মীমাংসা এই প্রবন্ধে হইবার নহে, তথাপি এই মাত্র বলি যে—বোপদেবের বহু পূর্ব্বেও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত ভাগবতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং দেবীপুরাণের ও দেবীভাগবতের সঙ্গে এই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেকাংশেই সঙ্গতি নাই। কতিপয় জিগীষু ও ভাগবতদ্বেষী পণ্ডিতগণ এই তর্কের জন্মদাতা। দ্বিতীয়তঃ বোপদেব ভাগবতের অনেক গুলি গ্রন্থের উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া লোকের এক বৃথা ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে। (এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ বোম্বে মুদ্রিত ভাগবতভূষণ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

বর্ণে বর্ণে ছেদ করিয়া বুঝাইলে বুঝিতে পারে। এই মুগ্ধবোধ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়া বড় কঠিন। অপর সংস্কৃত ব্যাকরণে জ্ঞান থাকিলেও বিনা উপদেশে ইহার অনেক সূত্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার এবং ইহার ধাতুপরিচায়ক গ্রন্থ কবিকল্পদ্রুমের ভাষা সমধিক শ্রুতিকটু দোষের উদাহরণ তাহাতে সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ সে সব দোষ পরিহারের উপায় নাই। তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া গেল, যথা—

"ড্রো ট্রি র্ষশ্চানুঃ। শ্নুধ্বোরন্বচীযুব্র্বোর্ব্যৌ ত্বস্তানৈকাচোর্ব্যোঃ। থ্যাষাযুস্যামা-মীযুসীয়ম্। ইত্যাদি।"

"দ্রুড্ দ্রুভ্ শি মজ্জনে দ্রাড, ধাড়ৃ ঙ্ শীর্ণৌ শি নুড্ বধে (ইত্যাদি কবিকল্পদ্রুম)। বস্তুতঃ মুগ্ধবোধের ধাতুগণ এবং সূত্র বৃত্তি সম্পূর্ণ আয়ত্ত থাকিলে, অতিগহন ধাতুমার্গ তাহার পক্ষে যে সুগম হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ধাতুগণের রচনা পারিপাট্য এমন কি প্রত্যেক ধাতু অকার ও ককারাদি এবং অকারান্ত ও ককারাদ্যন্তরূপে সজ্জিত আছে এবং অন্তস্থ ও বর্গীয় ব ভেদ করিয়া ধাতুর সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

টীকাকার দুর্গাদাস মুগ্ধ শব্দে মূঢ় ও সুন্দর অর্থ করিয়া মুগ্ধবোধ মূঢ়েরও জ্ঞানদাতা বলিয়া অর্থ করেন। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা উপক্রম-ণিকার ভূমিকাতে অনেকেই জানেন। সত্যসত্যই মুগ্ধবোধ সুন্দর জ্ঞানদাতা বটে, কিন্তু মূঢ় দূরে থাক, বহুদর্শী হইয়াও ভাবাগত জ্ঞান না থাকিলে তাহার পক্ষে কখনই সুখপাঠ্য নহে।

অন্য বিষয় অপেক্ষা ধাতুসাধন প্রণালী ইহার অনন্যসাধারণ। কবিকল্পদ্রুম গ্রন্থে ধাতুর অর্থের সহিত সাঙ্কেতিক অনুবন্ধ-বর্ণের যোজনা করিয়া ধাতুপদ সাধনের অতীব সহায়তা করিয়াছেন। একটি মাত্র গণ উচ্চারণ করিলে অত্যতি সংক্ষেপে তাহাতে সমস্ত নিয়ম পরি-স্ফুট হয় অর্থাৎ ধাতুটি কোন গণীয়, সেট্ কি অনিট্, অপর নিয়ম কি কি তাহাতে খাটিবে, এ সমস্তই উচ্চারণমাত্র জানা যায়। এজন্য তাহার একটি পরিভাষা গণের প্রথমে করিয়া দিয়াছেন।

বৈদিক যুগের পর সাধারণের লৌকিক সংস্কৃত জ্ঞান পক্ষে মুগ্ধবোধ যে প্রথম উপ-যোগী তাহা কে না স্বীকার করিবে! ইতঃপূর্ব্বে পাদটীকা ও প্রবন্ধ মধ্যে বোপদেবকৃত ৩ খানী ভাগবত-টীকায় উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে মুক্তাফল খানী ভাগবতের সারসঙ্কলন রূপ, পরম-হংসপ্রিয়া খাঁটি টীকা। হরিলীলা খানী সমগ্র ভাগবতের সূচীবিশেষ। দেবগিরির হেমাদ্রির কৃত হরিলীলাবিবেক নামক হরিলীলার টীকাতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। হরিলীলার প্রথম দুইটী শ্লোক এই—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥
আনন্দস্য হরের্লীলাং বক্তা ভাগবতাগমঃ।
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিঃ শাখাঃ প্রতন্বন্ দ্বিজসেবিতাঃ॥"

শেষ শ্লোকদ্বয় যথা—

"ইতি ভাগবতস্যানুক্রমণী রমণীকৃতা।
বিদুষা বোপদেবেন বিদ্বৎকেশবসূনুনা॥
হরিলীলেতি নামেয়ং হরিভক্তৈর্বিলোক্যতাং।
অস্যা বিলোকনাদেব হরৌ ভক্তির্বিবর্দ্ধতে॥"

টীকার প্রথম তিনটী শ্লোক এই—

"নমঃ কৃষ্ণায়ঃ নিত্যৈক সচ্চিদানন্দরূপিণে।
জগৎসর্গবিসর্গাদিসাক্ষিণেঽনন্তশক্তয়ে॥
জয়ন্তি বোপদেবস্য বাচো বিবুধসংস্তুতাঃ।
ঘনসারোজ্জ্বলাভাসঃ ক্ষীরোদস্যেব বীচয়ঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতস্যানুক্রমণী তদ্বিনির্ম্মিতা।
হরিলীলাভিধানেয়ং, যথাবুদ্ধি বিবিচ্যতে॥

শেষ শ্লোক এই—

"অতত্ত্বে তত্ত্বধীর্যেষাং তত্ত্বে চাতত্ত্বধীর্নৃণাং।
ন তানানন্দয়ন্ত্যেতা বোপদেবস্য সূক্তয়ঃ॥"

অর্থাৎ অতত্ত্বে তত্ত্বদর্শী এবং তত্ত্বে অতত্ত্বদর্শী জনগণ এই হরিলীলাতে আনন্দানুভব করিতে পারিবে না। সপ্তম শতাব্দীতে বোপদেবের মহিমায় লৌকিক ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও ভাগবতের আলোচনা হইয়াছে এই তথ্যটি জানিতে পারি।

যাহাহৌক এই বোপদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীধরস্বামী ভাবার্থদীপিকা নামক টীকাদ্বারা ভাগবতকে সুন্দর ও সরলভাবে বুঝাইয়া ছিলেন। মল্লিনাথদ্বারা কাব্যচর্চ্চার মত শ্রীধরদ্বারাই ভাগবত, গীতা ও বিষ্ণুপুরাণের চর্চ্চা সুগম হয়। পরবর্ত্তী গোস্বামিগণ এই স্বামীর টীকাকেও মীমাংসাগ্রন্থমধ্যে প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইনি পরমানন্দ পুরীর নিকট নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত হন, ইনি গুর্জ্জরদেশে বলভীনগরে জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহার পুত্রই ভট্টিকবি। গুজরাটের ভাগবতচর্চ্চার পথ শ্রীধরস্বামীর কৃপায় সুগম হয়। ব্রজবিহার নামক কাব্য গ্রন্থও শ্রীধরকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শ্রীধরস্বামীর অপর গ্রন্থ মহিম্নঃ স্তবের টীকা, ভগবদ্গীতার টীকা ও বিষ্ণুপুরাণের টীকা, ইহার নাম আত্মপ্রকাশ। ভাগবতের টীকায় তিনি যেমন পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন বিষ্ণুপুরাণের টীকায় তেমন পাণ্ডিত্য লক্ষিত হয় না। আরও বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতের মত বহুতর দার্শনিক ভাবে পরিপূর্ণও নহে। সুতরাং তাহাতে অধিক পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় নাই। শর্ম্মণ্যদেশোদ্ভব মহাত্মা ম্যাক্সমুলার কহেন যে—"১৩৮০ সম্বতে ভট্টি বা ভট্ট নামক কবি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা গুর্জ্জরপতি বীতরাগের পুত্র প্রশান্তরাগকর্ত্তৃক খোদিত নন্দিপুরীর সনন্দন পত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারাও সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।" এই মতে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক

৬০০ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধরস্বামীর পুত্রের সত্তা উপলব্ধ হয়। ভক্তমালের মতেই ভট্টিকাব্যের প্রণেতা ভট্ট বা ভট্টি কবিকে শ্রীধর স্বামীর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা যায়। উক্ত প্রমাণে ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালই যে শ্রীধরের টীকার সময়, তাহা নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হয়। এই শ্রীধর স্বামীর এবং মধুসূদন সরস্বতীর টীকা ভক্তিপক্ষের বিশেষ অনুকূল। কোন কোন নবীন শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত এই টীকাদ্বয়ে অদ্বৈতবাদের গন্ধ ও চরমে কল্যাণাভাব অনুভব করিয়াছেন। সর্ব্বশেষকার বিশ্বনাথী টীকাই ভক্তবরের মতে সর্ব্বাংশে বৈষ্ণবমতের অনুকূল। আমি এই নবীন সমালোচনাতে কি সার আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

নবম শতাব্দী।

ইহার পর নবম শতাব্দীতে বৈষ্ণবকাব্যের একটি সুদৃঢ় মূল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার নাম কৃষ্ণকর্ণামৃত, প্রণেতা বিল্বমঙ্গল। কোন কোন মতে শান্তিশতকপ্রণেতা শিহ্লণ মিশ্রই বিল্বমঙ্গল। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরস্থ পাণ্ডুরপুর সন্নিহিত কোন এক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। চিন্তামণিনাম্নী এক বেশ্যার উপদেশমতে সংসারত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনযাত্রা করেন। সেই বৈরাগ্যের ফলই কৃষ্ণকর্ণামৃত। দক্ষিণ দেশের তীর্থভ্রমণকালে মহাপ্রভু এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। বিল্বমঙ্গলের অপর গ্রন্থ "গোবিন্দদামোদর স্তোত্র"। কর্ণামৃতখানি কোষকাব্যের অন্তর্গত (৬)। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার এবং কৃষ্ণের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠার বর্ণনাই অধিক। শ্লোক সংখ্যা ১১২। যদুনন্দন দাস নামক এক কবি ইহার সমস্তাংশ সুমধুর ছন্দ ও অলঙ্কারযুক্ত বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। যে অংশ মহাপ্রভু আনয়ন করেন, তাহারই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সারঙ্গরঙ্গদা নামে এক বিস্তৃত টীকা করেন। বোম্বে নগরের মুদ্রিত গ্রন্থমধ্যে আরও দুইটি অধ্যায় দৃষ্ট হয়। তাহার শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ১০৯ ও ১১১। গ্রন্থের প্রথম পদ্য এই—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

বালকরূপী গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে অযাচক ধরাতলশায়ী বিল্বমঙ্গলকে দুগ্ধ দিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিলে পর তিনি বলিলেন—

"হস্তমাচ্ছিদ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্ যদি যাতোঽসি পৌরষং গণয়ামি তে॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, বিল্বমঙ্গল দ্বিতীয় শুকদেব, সুতরাং লীলাশুক। মহাপ্রভুর মুখে গ্রন্থের প্রশংসা এইরূপ—

---

(৬) অনন্যনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহের নাম কোষ। (দর্পণ)

"কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি—।
সে জানে, যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)।

বিল্বমঙ্গলের সময়ে আমি গঙ্গাদাস কবিকে ধরিলাম। গঙ্গাদাস নিজ গুরুর নাম পুরুষোত্তম ভট্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এদিকে বিল্বমঙ্গলের অন্যতর গুরুও পুরুষোত্তম। সোমগিরি নামা সন্ন্যাসী তাঁহার অপর গুরু। যাহা হউক, গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরী এতদ্দেশের মহোপকারক।

বৈষ্ণবসাহিত্য মধ্যে আমরা গঙ্গাদাস কবির ছন্দোমঞ্জরীকে ধরিতে পারি। ইনি বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র, জননীর নাম সন্তোষা। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার পিঙ্গলসূত্র অতি-কঠিন, বৃত্তরত্নাকর এবং কালিদাসের শ্রুতবোধও তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নহে, এজন্য গ্রন্থকর্ত্তা বাল-বোধের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সঙ্কল্প করিয়াছেন—

"সন্তি যদ্যপি ভূয়াংসশ্ছন্দোগ্রন্থা মনীষিণাং।
তথাপি সারমাকৃষ্য নবকার্য্যে মমোদ্যমঃ॥
ইয়মচ্যুতলীলাঢ্যা সদ্বৃত্তা জাতিশালিনী।
ছন্দসাং মঞ্জরী কান্তা সভ্যকণ্ঠে লগিষ্যতি॥"

যদিও প্রাচীন পণ্ডিতগণের বহুতর ছন্দোগ্রন্থ আছে তথাপি সারসংগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই উদ্যম বালকগণের জন্য। সদ্বংশীয়া সচ্চরিত্রা কমনীয়া বিলাসবতী কামিনী যেমন সভা-কণ্ঠেই লগ্না হয়, তেমনি অচ্যুতলীলা, বৃত্ত ও জাতি সম্পন্না এই ছন্দোমঞ্জরী সভ্য পণ্ডিতগণের কণ্ঠহারস্বরূপ হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

বর্ত্তমানকালে এই ছন্দোমঞ্জরী ব্যতীত বহুবিধ ছন্দঃসম্পন্ন আর দ্বিতীয় গ্রন্থ দেখা যায় না, সুতরাং সংস্কৃতশিক্ষার্থীর সবিশেষ উপযোগী। গ্রন্থের পরিপাটী এইরূপ—

চতুষ্পদীর নাম পদ্য, তাহা বৃত্ত ও জাতিভেদে দুই প্রকার, অক্ষরের গুরুলঘু ভেদে ৪ চরণ গণিত হইলে তাহা বৃত্ত এবং মাত্রা বা স্বর দ্বারা ৪ চরণ গণিত হইলে তাহাকে জাতি কহে। সম, অর্দ্ধসম ও বিষম ভেদে চতুষ্পদী ৩ প্রকার। ৪ চরণ সমান হইলে সম, প্রথমে তৃতীয়ে এবং দ্বিতীয়ে চতুর্থে সমান হইলে অর্দ্ধসম। ৪ চরণ প্রত্যেকে ভিন্ন হইলে বিষম। ম ত্রিগুরু, ন—ত্রিলঘু, ভ—আদিগুরু, য—আদিলঘু, জ—গুরুমধ্যগত, র—লঘুমধ্য, স—অন্তগুরু, গ—একগুরু, ল—একলঘু। ইহাই স্বরের গুরু লঘুর সঙ্কেত। এইরূপে সঙ্কেতও তাহার মত ভেদ, যতি অর্থাৎ পদ্য মধ্যে জিহ্বার বিশ্রাম। উক্থা, অত্যুক্থা, গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, বৃহতী ও পংক্তি প্রভৃতি ২৬ প্রকার বৈদিক ছন্দ দেখাইয়া মুখবন্ধ শেষ করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তবকে একাক্ষর হইতে ২৬ অক্ষরের পর্য্যন্ত ছন্দ দেখাইয়াছেন এবং দণ্ডক নামক সুবৃহৎ ২৭ অক্ষরের ছন্দেরও প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। তৃতীয় স্তবকে অর্দ্ধসম, চতুর্থ স্তবকে বিষম,

পঞ্চম স্তবকে মাত্রা বৃত্তের এবং ষষ্ঠ স্তবকে গদ্যের নিয়ম ও উদাহরণ দিয়া লৌকিক ব্যবহারোপযোগী সমস্ত ছন্দের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। কৌতুকজনক প্রস্তারাদি ছন্দ অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে অনেক উদাহরণ নিজকৃত ও অপর গ্রন্থ হইতেও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি ১৬ সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য অচ্যুতচরিত ও কংসারিশতক, সূর্য্যশতক নামক কোষকাব্যদ্বয়ের প্রণেতা। ইহার এক হইতে ২৭ পর্য্যন্ত প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ কৃষ্ণবিষয়ক এবং রচনাও সুমধুর। তাহার ২১ টী দেখান হইল। ইহার প্রতি উদাহরণে ভঙ্গীতে ছন্দের নাম আছে, ইহা সুন্দর বৈচিত্র্য। তোটক ও পঙ্‌ক্তি ছন্দের ২ টী উদাহরণ দেখান গেল।

যমুনাতটমচ্যুতকেলিকলা,—লসদঙ্ঘ্রি সরোরুহসঙ্গরুচিং।
মুদিতোঽটকলেরপনেতুমঘং, যদি চেচ্ছসি জন্ম নিজং সফলং॥

পঞ্চম অক্ষরে পঙ্‌ক্তি ছন্দ যথা—

কৃষ্ণসনাথা তর্ণকপঙ্‌ক্তিঃ। যামুনকচ্ছে চারু চচার॥ ইত্যাদি

একাদশ শতাব্দী।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামানুজাচার্য্যের গুরু শ্রীনাথ মুনির পৌত্র যামুন মুনি (আলমন্দারু) 'যামুনাচার্য্য স্তোত্র' নামে দ্বৈতবাদের উপযোগী এক গ্রন্থ লেখেন। ইহাতে ৬৮টী শ্লোক আছে। গ্রন্থোক্ত স্তোত্রগুলি অভেদবাদের নিরাসক ও ভেদবাদের পরিপোষক।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল বেদান্তের ভাষ্য। তাহা দর্শনশাস্ত্রের শিরোমণি। সমস্ত প্রধান আচার্য্যগণই বেদান্তের এক এক খানি ভাষ্য রচনা করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়কে দুর্ভেদ্য দুর্গবেষ্টিত করিয়া যান। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান রামানুজ সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণবভাষ্যের মধ্যেও রামানুজের শ্রীভাষ্য সকলের আদর্শ, ইত্যাদি কারণে তাহার কিঞ্চিৎ উপক্রম লিখিত হইল—

দর্শনশাস্ত্র বেদ ও উপনিষদের সার মর্ম্ম লইয়া আর্যযুগে অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ দ্বারা রচিত হয়। অতি ক্ষুদ্র এক একটী সূত্রে জগতের নিখিলতত্ত্ব তাহাতে গ্রথিত। অল্পাক্ষরে অনেক বিষয় জানাইবার এমন শাস্ত্র পৃথিবীতে আর নাই। ঐ সকল সূত্রের তাৎপর্য্য, ভাষ্য টীকা ভিন্ন কখনই কলিকলুষিত অল্পবুদ্ধি মানবের বোধগম্য হইতে পারে না। এজন্য পূর্ব্বকালের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাহার এক একখানি ভাষ্য রচনা করেন, সেই সকল ভাষ্য ও আবার টীকার সাহায্য ভিন্ন বুঝিতে পারা যায় না, এজন্য তাহারও টীকা করিতে হইয়াছে।

দর্শনশাস্ত্র প্রধানতঃ তিনখানি। ন্যায়, সাঙ্খ্য, মীমাংসা। ন্যায় ২ প্রকার গৌতম ও বৈশেষিক। সাঙ্খ্য ২ প্রকার কাপিল ও পাতঞ্জল। ইহাদের মধ্যে কাপিল (৭) নিরীশ্বর

(৭) সাঙ্খ্যভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মীমাংসা দৃষ্টে খাঁটি নিরীশ্বর বলা যায় না। তবে সাধারণ প্রতীতি অনুসারে কাপিলকে নিরীশ্বর বলিলাম।

সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল সেশ্বর সাঙ্খ্য। সেশ্বর পাতঞ্জলের নামান্তর যোগদর্শন। মীমাংসাও দ্বিবিধ। পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। প্রথম জৈমিনির, দ্বিতীয় ব্যাসদেবের রচিত। সাকল্যে দর্শন ছয় খানী। ন্যায়দর্শন প্রমাণ প্রমেয়াদি পদার্থের বোধক। সাঙ্খ্য প্রকৃতিপুরুষবোধক, মীমাংসা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ডবোধক। সাঙ্খ্যদর্শনে আংশিক পরমাত্মতত্ত্ব থাকিলেও তাহা প্রধান নহে, সে অংশে বেদান্তই প্রধান, ইহাই উত্তর মীমাংসা। এজন্য পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চয়-পক্ষে বেদান্তদর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। পূর্ব্ব মীমাংসাতে জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করেন, উত্তর মীমাংসাই জ্ঞানকাণ্ড পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

এই জ্ঞানকাণ্ডের মূল বেদান্ত নামক শারীরক সূত্রের উপর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ৮ম শতাব্দীর প্রথমাংশে এক ভাষ্য করেন তাহাই আদি। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধ্যে প্রথম শ্রীরামানুজ ১১শ শতাব্দীতে শৈবধর্ম্ম নিরাকরণে সচেষ্ট হইয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহার জন্ম ভারতের দক্ষিণখণ্ডে। এই খণ্ডে বৈষ্ণবাদি অন্যান্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। স্মৃতি-কালতরঙ্গের মতে ১০৪৯ শকাব্দে রামানুজ বর্ত্তমান ছিলেন।

পঞ্চরাত্র এবং বৃহৎ ব্রহ্মসংহিতার দ্বিতীয় পাদের ৭ অধ্যায়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের বর্ণনপ্রস্তাবে, তথা হরিবংশীয় বাক্যের তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, রামানুজ সঙ্কর্ষণের অবতার। ইহাঁর ৫ খানী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—

"বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
শ্রীভাষ্যঞ্চাপি গীতায়া ভাষ্যং চক্রে যতীশ্বরঃ॥"

বেদার্থসংগ্রহে উপনিষদের তাৎপর্য্য বর্ণন, গীতাভাষ্যে গীতার তাৎপর্য্য, অপর তিন খানীতে বেদান্তসূত্রের অর্থ বর্ণন। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীভাষ্যই বৃহৎ। বেদান্তসারে অতি সংক্ষেপে ব্যাসসূত্রের আন্তরিক অর্থ প্রকটিত আছে। ভগবানাজ্ঞায় কল্পিত ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতে যাঁহারা হতচৈতন্য হইয়াছেন তাঁহারা যেন বেদব্যাসের প্রিয় শিষ্য বৌধায়ন মহর্ষিকৃত বেদান্ত-বৃত্তি ও সেই বৃত্তির অনুগত রামানুজের বেদান্তগ্রন্থ পর্য্যালোচনা করেন। তাহাতে ব্রহ্ম সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ, এবং নির্ব্বিশেষত্ববোধক শ্রৌত ও স্মার্ত্ত বাক্যেরই বা অন্তর্গত তাৎপর্য্য কি? ইত্যাদি সমস্তই বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য বেদান্ত সূত্রের যে ভাষ্য করেন। তাহার নামান্তর শ্রীভাষ্য। কারণ রামানুজ শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর পারম্পরিক শিষ্য বলিয়া তন্নামেই ভাষ্যের নামকরণ করেন। এই ভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতপর। ইহা অতি বৃহৎ। নিখিল বিশ্বের মূলে এক ধর্ম্ম, স্বভাব বা শক্তি আছে, সেই শক্তি একাই কার্য্য করে কি কোন শক্তিমান্ আছে? এই তথ্য লইয়াই নানা মতভেদ। কেহ শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ, কেহ ভেদ, কেহ বা ভেদ অভেদ দুই স্বীকার করেন। ভেদশব্দে দ্বৈত, অভেদশব্দে অদ্বৈত। রামানুজ অপ্রাকৃত রূপ গুণাদিযুক্ত অদ্বৈত-তত্ত্ব স্বীকার করেন, এজন্য ইঁহার মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা যায়।

রামানুজ ভাষ্যে প্রসঙ্গতঃ আর্হত বা জৈনদিগের মত খণ্ডিত হইয়াছে। আর্হত মতে পঞ্চ, সপ্ত ও নবতত্ত্বের উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না, পরন্তু তত্ত্বভেদ-দর্শনে সন্দেহই হইতে পারে। জীবের পরিমাণ মানবদেহের অনুরূপ এই আর্হত মতও খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ তাহা হইলে ঘটাদি জড়বস্তুর ন্যায় জীব পরিমিত হয় এবং একদা নানা দেশে থাকা অসম্ভব হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকথিত জন্মান্তরীয় গজ ও পিপীলিকাদি শরীরেই বা মানবদেহানুরূপ জীব কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে। দীপের আলোক যেমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় গৃহে থাকে জীবকে তদ্রূপ বলা যায় না, সঙ্কোচ বিকাশশীল হইলে জীব বিকারী এবং অনিত্য হয়। অনিত্য হইলেই কৃতকর্ম্মের নাশ ও অকৃতকর্ম্মের আগম এই দোষ ঘটে। ভোগকর্ত্তা জীব না থাকিলে স্বকৃতকর্ম্মের বিনা ভোগে নাশ, এবং যে পুণ্য পাপাদি কিছুই করে নাই, তাহাকেও তাহার ফল সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে হয়, অন্যথা অভিনব জাত বালকের সুখ দুঃখ কিছুই হয় না, কারণ তখন তাহার পাপ পুণ্য কিছুই নাই। জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকারে এ সকল দোষ ঘটে না, কারণ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য পাপেই সুখ দুঃখ হয়।

রজ্জুতে সর্পভ্রম যেমন মিথ্যা, ব্রহ্মে এই জগৎ তদ্রূপ মিথ্যা। ইহা অবিদ্যার কার্য্য। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, তখন জগৎ প্রপঞ্চও নিবৃত্ত হয়, ইত্যাদি শঙ্করমতও ইহাতে খণ্ডিত হইয়াছে। শঙ্কর মতে অবিদ্যা ভাব পদার্থ কিন্তু সৎও নহে অসৎও নহে বলিয়া উহা সদসদনির্ব্বনীয়। অদ্বৈতবাদিগণ অবিদ্যাসিদ্ধির জন্য যে শ্রুতি উদ্ধার করেন তাহাতে ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি হয় না, কারণ শ্রুত্যুক্ত অনৃতশব্দে সাংসারিক অল্প ফলজনক কর্ম্ম এবং মায়া শব্দে বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সুতরাং শ্রুতিদ্বারা অবিদ্যাসিদ্ধি হইল না। "আমি জানিনা" এই অনুভবেও অবিদ্যা সিদ্ধ হয় না, কারণ ঐ বাক্যে জ্ঞানাভাবের বোধ হয় কিন্তু ভাবরূপ অবিদ্যার বোধ হয় না। যুক্তিতেও অবিদ্যা সিদ্ধ হয় না—কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ তাহার আশ্রয়ে অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না। ইত্যাদি নানাবিধ বিচারমালা এই শ্রীভাষ্যে আছে।

রামানুজ মতে চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর এই তিন পদার্থ। চিৎশব্দে জীব, সে কর্ম্মফল-ভোক্তা অসঙ্কুচিত অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য, অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যা বেষ্টিত। ভগবদারাধনা ও তৎপদ প্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার একাংশকে পুনশ্চ শতভাগ করিলে যেমত সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু অনন্ত। অচিৎ শব্দে ভোগ্য ও দৃশ্য পদার্থ, ইহা অচেতন জড়াত্মক জগৎ। এই অচিৎ,ভোগ্য ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন ভেদে ত্রিবিধ। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক হরিপদবাচ্য। ইনি জগৎ-কর্ত্তা, উপাদান, সর্ব্বান্তর্য্যামী, অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজ প্রভৃতি গুণাস্পদ, চিৎ ও অচিৎ সমুদায় তাঁহার শরীরস্বরূপ। পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরমদয়ালু ভক্তবৎসল ও উপাসকগণের যথোচিত ফল দানের জন্য লীলাবশতঃ পঞ্চমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। প্রথম অর্চ্চা প্রতিমাদি, দ্বিতীয় রামাদি অবতার স্বরূপ বিভব, তৃতীয় বাসুদেব

সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহ, চতুর্থ সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম, পঞ্চম সর্ব্বনিয়ন্তা অন্তর্য্যামী। ইহার মধ্যে পুর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনাতে পাপক্ষয় হইলে পর পর উপাসনাতে অধিকার জন্মে। চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ আছে। বিভিন্ন স্বভাবাক্রান্ত পশু মানবাদির মত ভেদ। "আমি সুন্দর, আমি কৃশ" ইহাতে যেমন আত্মার সহিত অভেদ দৃষ্ট হয়, তেমনি চিৎ অচিৎ সকলেই তাঁহার শরীর, এই শরীর ও আত্মসম্বন্ধে অভেদ বলিতে হয়। এক মৃত্তিকার ঘট শরাবাদি নানারূপ ভেদ, মৃত্তিকাংশে তাহাদের অভেদ, তদ্রূপ ঈশ্বর চিৎ ও অচিতের সহিত নানারূপে ভেদবিশিষ্ট ও অন্তর্য্যামী বলিয়া অভেদ-বিশিষ্ট। বেদোক্ত নির্গুণ শ্রুতি ঈশ্বরের প্রাকৃত জনের ন্যায় রাগদ্বেষাদি গুণ নিষেধ করেন।

ইত্যাদি নানা তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া রামানুজ শারীরিক সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। ব্যাসশিষ্য বৌধায়নাচার্য্য মহোপনিষদের মতে শারীরিক সূত্রের এক বৃত্তি করেন, তাহা অতি বৃহৎ এজন্য রামানুজ ঐ বৃত্তির মতানুসারে তদপেক্ষা সংক্ষেপে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্যই রামানুজসম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী।

দ্বিতীয় মূল সম্প্রদায়ের নাম মাধ্ব সম্প্রদায়। মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মার শিষ্য বলিয়া নামান্তর ব্রহ্মসম্প্রদায়। মধ্বাচার্য্যস্বামী দক্ষিণাপথে (৮) উড়ুপকৃষ্ণ নামক স্থানে ১১২১ শাকে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম মধিজি ভট্ট। মাধবাচার্য্যসংগৃহীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মধ্বের নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ ও মধ্যমন্দির বলিয়া উক্ত আছে। শ্রীচৈতন্যের বহুপরবর্ত্তী বলদেববিদ্যাভূষণের লিখিত প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে ও তাহার টীকাতে মধ্বের আনন্দতীর্থ নামও দেখা যায়।

মধ্বাচার্য্য কৃত বেদান্তভাষ্যের নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন। এই দর্শন দ্বৈতবাদপর। এই মতে জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বরসেবক, বেদ অপৌরুষেয় সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃপ্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণ। এই মতে জগৎ সত্য। এ বিষয়ে রামানুজ ও মধ্ব একমতাবলম্বী। মধ্ব কহেন যে—রামানুজ ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়া শঙ্করমতের পোষকতা করিয়াছেন। ইনি "তত্ত্বমসি" শ্রুতিতে "তস্য ত্বং" অর্থাৎ তাহার তুমি (ভেদ্য ভেদক বা সেব্য সেবক সম্বন্ধে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)। তৎপদে ঈশ্বর, ত্বং পদে জীব। ঈশ্বর সেব্য, জীব সেবক। এইরূপে জীবেশ্বরের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই মতে তত্ত্ব দুইটি। স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা ভগবান্ তিনি সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত নিখিল সদ্‌গুণাশ্রয় বিষ্ণু। জীব অস্বতন্ত্র বা ঈশ্বরাধীন। ভৃত্যের রাজপদ প্রার্থনার মত জীবের ঈশ্বরস্বরূপ অভেদবাদ

---

(৮) মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত উইলসন্ কৃত গ্রন্থানুসারে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় লিখিয়াছেন, সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থ না দেখিয়া উড়ুপকৃষ্ণকে উদুপকৃষ্ণ করিয়াছেন। কারণ ইংরাজীতে উডুপকৃষ্ণ ছিল। বাঙ্গলাতে 'ড' কে 'দ' করিয়াছেন।

নিন্দনীয় ও অশেষ পাপের নিদান, ইত্যাদি রূপে তিনি অভেদবাদকে অশ্রদ্ধা করিয়াছেন। এই মতে ভগবৎসেবা ত্রিবিধ। অঙ্গে বিষ্ণুচক্রাদি অঙ্কন, নামকরণ অর্থাৎ পুত্রাদির বিষ্ণু-প্রতিপাদক নাম স্থাপন, এবং দান পরিত্রাণাদি কায়িক, সত্য হিত ও প্রিয়বাক্য এবং শাস্ত্রপাঠ-রূপ বাচিক ও দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধাদি মানসিক সেবা।

"সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ।"

শূদ্র ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণপূজা করিলে ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদি-সদ্‌গুণশালী হয়। এখানে যেমন "শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত হয়, সেইরূপ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হয়" অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত হয়।

এই মতে মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা, বেদোক্ত এই ছয়টি শব্দের অর্থ অদ্বয়বাদীর কল্পিত অজ্ঞান নহে, উহাদের অর্থ ভগবানের ইচ্ছা। আর প্রপঞ্চ-শব্দেও জগৎ নহে, প্রকৃষ্ট পঞ্চ ভেদ। সেই পঞ্চ ভেদ যথা—জীবেশ্বর ভেদ, জড়েশ্বর ভেদ, জড়জীব ভেদ, জীব ও জড়ের পরস্পর ভেদ। উক্ত প্রপঞ্চ সত্য এবং অনাদিসিদ্ধ। বিষ্ণুর পরমোৎকর্ষপ্রতিপাদন সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে মোক্ষ স্থায়ী অপর তিনটি অস্থায়ী। বিষ্ণুর পরমোৎকর্ষ বোধই জ্ঞান, ঐ জ্ঞানেই মোক্ষ। শ্রুতিতে আছে "ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত জানা যায়" ইহার অর্থ এই যে, যেমন গ্রামের অধ্যক্ষকে জানিলে গ্রামকে ও পিতাকে জানিলে পুত্রকে জানা হয়, মৃৎপিণ্ড জলবিন্দু, ঘটাকাশ জানিলে পৃথিবী, মহাসাগর ও মহাকাশ জানা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিলে সব জানা হয় অর্থাৎ অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। অদ্বৈতবাদিগণ ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের লক্ষণা শক্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া কূটার্থ করেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ, শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তত্তু সমন্বয়াৎ।" ইত্যাদি সমস্ত সূত্রে মধ্বাচার্য্য সহজ অর্থই করিয়াছেন, কূটার্থের দিকে যান নাই। ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হয়, সেই নারায়ণই ব্রহ্ম। বেদ, ভারত, নারদ পঞ্চরাত্র, রামায়ণ এবং তৎপরিপোষক সকল শাস্ত্রই সেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন। শাস্ত্রসকলের উপক্রম উপসংহারে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হওয়ায় কোন সংশয় করা যায় না। ইহাই সূত্র কয়টির ক্রমিক ফলিতার্থ। ইত্যাদি নানা তত্ত্বে মাধ্বভাষ্য পরিপূর্ণ।

এই মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ী কেশবভারতীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদেব। সে সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ পরে লেখ্য।

মধ্বাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ আছে, যথা—ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, অনুরাগানুনয়বিবর্ণ, অনুবেদান্তরস প্রকরণ, ভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবত-তাৎপর্য্য, গীতাতাৎপর্য্য, কৃষ্ণামৃতমহার্ণব, তন্ত্রসার, মায়াবাদশতদূষণী সংহিতা ইত্যাদি। "মাধ্বদিগ্বিজয়" গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐখানি কাব্য গ্রন্থ। মধ্বাচার্য্যের শতদূষণী গ্রন্থখানি দ্বৈতবাদিগণের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র বিশেষ অতিবৃহৎ গ্রন্থ, বিবিধ বিচার-

পূর্ণ। এজন্য গৌড়দেশবাসী পূর্ণানন্দস্বামী উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ১১৯ শ্লোকে তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী নামে প্রচার করেন। ইহার শ্লোকগুলি বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী এবং সঙ্ক্ষেপে অনেকার্থ-প্রতিপাদক। শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদের উপর একশতটী দোষ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম শতদূষণী। ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এবং আরও কয়টী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

১। অনুগতজনপালঃ ক্রূরভূপালকালস্তরুণতরতমালশ্যামলো নন্দবালঃ।
বহুকিরণবিশালঃ সর্ব্বশক্ত্যা বিশালঃ, স জয়তি ধৃতমালঃ পুণ্ড্রকোদ্ভাসিভালঃ॥

২। সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ত্ততে
ত্বস্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিদ্ ভেদেঽর্পয়িত্বা মতিং।
তচ্ছব্দোঽব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বত্ত্র ভেদো যতঃ
ষষ্ঠী লোপমিতা ত্বমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ॥

৩। ব্রহ্মাহমস্মীতি যদন্তি বাক্যং, জ্ঞেয়া ন ষষ্ঠী প্রথমৈব তত্র।
দৃষ্টান্তবাক্যে কথমন্যথা চেৎ, ষষ্ঠীতু বহ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥

৪। যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেত্তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব॥

৫। মায়াবাদমতান্ধকারমুষিতপ্রজ্ঞোঽসি যস্মাদহং-
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র, কুত্র বিভুতা, সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ॥

ইহার উপান্ত্য শ্লোক এই—

৬। পূর্ণানন্দকবেঃ কৃতির্ভগবতো জীবস্য ভেদাশ্রিতা
তত্ত্বাতত্ত্ববিবেকবাক্যসুভগা শ্রীবিষ্ণুভক্তির্মতা।
সাধ্বী মুগ্ধপদপ্রবন্ধমধুরা তৎ পঠ্যতাং শ্রূয়তাং
ভো ভো ভাগবতোত্তমা মনসি চেদ্ ভক্তির্ভবেদ্ বাঞ্ছিতা॥ ইত্যাদি !!!

এই গ্রন্থ অপ্রকাশিত ছিল, স্বর্গীয় মাহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কারের পর তাঁহার বিরুদ্ধে জিরাট বলাগড়ি নিবাসী পূজ্যপাদ ৺জগদানন্দ গোস্বামী স্বকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করেন। উক্ত গদ্য বঙ্গানুবাদ রাজা রামমোহনের বাঙ্গলার মত প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

ইতঃপর অনুমান, ১১৫০ হইতে ১২০০ শকাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন এক সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী গোস্বামীর সংগৃহীত বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী উল্লেখযোগ্য। অনুমানে ইহাও স্থির হয় যে, বিষ্ণুপুরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু সে সময়ের কোন গ্রন্থাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। যাহাহৌক উক্ত গ্রন্থে শ্রীধরস্বামির মতে তাঁহার কতিপয় স্বকৃত শ্লোক

আছে, অপর শ্লোক অধিকাংশই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত। অদ্বৈতপ্রভুর সমকালিক লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থের একখানি বাঙ্গলা গদ্যানুবাদ করেন। তাহাতে জানা যায় যে ভাগবতের ১৮ হাজার শ্লোক হইতে ৪ শত শ্লোকে সারোদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীহট্টে লাউড় নামে একটি স্থান আছে, ন্যূনাধিক ৪৫০ বৎসর হইল তথায় দিব্যসিংহ নামে এক রাজা ও অদ্বৈতপিতা কুবের তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। কুবের সপরিবারে গঙ্গাবাসের জন্য শান্তিপুরে আসিলে রাজাও পুত্রকে রাজ্য দিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। এই সময়ে (বৈষ্ণবাবস্থায়) রাজার নাম কৃষ্ণদাস হয়। যাহা হউক ভাগবতপুরাণ সত্ত্বে বিষ্ণুপুরীর এতাদৃশ গ্রন্থসঙ্কলনের উদ্দেশ্য গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই বিবৃত করিয়াছেন—

নিখিলভাগবতশ্রবণালসা বহুকথাভিরথানবকাশিনঃ।
অয়ময়ং ননু তানমুসার্থকো ভবতু বিষ্ণুপুরীগ্রথনশ্রমঃ॥

ভাগবত বহুবিধ কথাতে পরিপূর্ণ, অতএব নিখিল ভাগবত শ্রবণে যাহারা অলস, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুপুরীর এই শ্রম সার্থক হউক।

নিখিল পুরুষার্থ মধ্যে ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ, অতএব সেই ভক্তির জন্যই পুরুষের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেই অহৈতুকী অর্থাৎ ফলাভিসন্ধানরহিতা ভক্তি বাসুদেব ভগবানে প্রযোজিত হইলেই বৈরাগ্য, অহৈতুক অর্থাৎ শুষ্ক তর্কাদির অগোচর উপনিষদ্‌প্রতিপাদ্য জ্ঞান এবং আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়।

সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥

এই সমস্ত বিষয়দ্বারা ভক্তির পরতমত্ব স্থাপনপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাঙ্গা অনুষ্ঠান-লক্ষণা সাধনভক্তির পর প্রেমভক্তিতে পর্য্যবসান করিয়াছেন। সংক্ষেপে ভাগবতার্থবোধের প্রতি এই গ্রন্থ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সবিশেষ অনুকূল। ইহার প্রথম শ্লোক এই—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতঃ শ্রীমুখেন, ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥

শেষ শ্লোক এই—ইত্যেষা বহুযত্নতঃ খলু কৃতা শ্রীভক্তিরত্নাবলী।
তৎশ্রীত্যৈব তথৈব সম্প্রকটিতা তৎকান্তিমালা ময়া॥
অত্র শ্রীধরসন্তমোক্তিলিখনে ন্যূনাধিকং যদ্ভবৎ।
তৎ ক্ষন্তুং সুধিয়োঽর্হত স্বরচনালুব্ধস্য মে চাপলং॥

ইহার এক একটি অধ্যায়ের নাম বিরচন। সেই বিরচন ইহাতে ১৩টী আছে। মাধ্ব-সম্প্রদায় অনুসারে মহাপ্রভু হইতে ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ গুরু পুরুষোত্তম। বিষ্ণুপুরী ও পুরুষোত্তম জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্য। বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ৭ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত

হয়। বৈষ্ণববন্দনায় ও বৈষ্ণবাভিধানে দৈবকীনন্দন দাস, চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস, গৌরগণোদ্দেশে কর্ণপূর, হিন্দী ভক্তমালে নাভাজী, ভক্তিরত্নাকরে নরহরি দাস এবং রত্নাবলীর বঙ্গভাষার অনুবাদে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস বিষ্ণুপুরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব বাস মিথিলা বা ত্রিহুতের তরৌণী গ্রামে ছিল, পূর্ব্ব নাম বিষ্ণুশর্ম্মা। ত্রিহুতের চলিত নাম তীরভুক্তি এজন্য সেই গ্রামস্থ বলিয়া তাঁহার সাধারণ নাম তৈরভুক্ত।

ভাগবতের নানা প্রকরণের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিকে ইনি এমন সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিলে ক্রমহীন বলিয়া বোধ হয় না। সমগ্র ভাগবতের সারসংগ্রহ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানলক্ষণা বা সাধনভক্তির ক্রমবিকাশ করিয়া তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কেবল ইহাই নহে, অর্থবোধের সুগমার্থে স্বয়ং তাহার কান্তিমালানামক টীকাও রচনা করিয়া দিয়াছেন। নানা স্থানের নানা উপাখ্যানের শ্লোকাবলী একত্র কৌশলক্রমে গ্রন্থন করায় ক্রমভঙ্গের লেশও লক্ষিত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম জেলার কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি গ্রামে ব্রাহ্মণ ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে মহাকবি জয়দেব গোস্বামী ১৩০৭ শাকে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভ্য ছিলেন (১)। গীতগোবিন্দ, প্রসন্নরাঘব নাটক, রতিমঞ্জরী ও চন্দ্রালোক এই চারি খানি গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। চন্দ্রালোক খানি অলঙ্কার গ্রন্থ, সহজে অলঙ্কারের লক্ষণ ও উদাহরণ আয়ত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অনুষ্টুপ ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধে লক্ষণ শেষার্দ্ধে উদাহরণ দিয়া জটিল অলঙ্কারকে বেশ সুবোধ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ এই :—

"শুদ্ধাপহ্নুতিরন্যস্যারোপার্থো ধর্ম্মনিহ্নবঃ।
নায়ং সুধাংশুঃ কিং তর্হি ব্যোমগঙ্গাসরোরুহম্॥"

৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহোদয় স্বপ্রকাশিত কাব্যপ্রকাশের ভূমিকাতে চন্দ্রালোককে "পীযূষবর্ষের কৃত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ "পীযূষবর্ষঃ কৃতী" বলিয়া শেষে একটি পদ্যাংশ দৃষ্ট হয়, আমি ঐ অংশকে বিশেষণ বলিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ "সুধাবর্ষী জয়দেব" ইহাই উহার অর্থ। ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন বৈষ্ণবদার্শনিক বলদেববিদ্যাভূষণ

---

(১) নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায়, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতিধর, শ্রুতিধর, ভূপতি ধোয়ী কবি, এই কয়জন সভাপণ্ডিত ছিলেন। হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী বৈষ্ণবসাহিত্যের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্তিনিধি হারাধন দত্ত মহাশয় বলেন, উক্ত উমাপতি ধর ভবেশ দত্তের শ্যালক ও ভবেশ দত্ত নিত্যানন্দভক্ত প্রসিদ্ধ সুবর্ণবণিক্ উদ্ধারণ দত্তের আদিপুরুষ। হারাধন দত্ত মহাশয় উদ্ধারণের বংশধর।

(বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য ৩৩৪ পৃঃ।)

মহাশয় "জয়দেবাদৈাশ্চন্দ্রালোকাদিষু" বলিয়া স্বীকার করায় পূজনীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতের অনুসরণ করিতে পারিলাম না।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটীর ভাব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে সংগৃহীত(১০)। শ্রীরাধা আদ্যা প্রকৃতি, তাঁহার জন্ম শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে। একদা নন্দ মহারাজ বালক কৃষ্ণকে লইয়া গোষ্ঠে (বাথানে) উপস্থিত, পরে রাধাও তথায় যাইয়া পৌঁছিলেন। এমন সময়ে নিবিড় ঘনঘটার পূর্ব্বচিহ্ন দেখিয়া রাধার কোলে কৃষ্ণকে দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। পথি মধ্যে যমুনাতটে কৃষ্ণ কৈশোর ভাব ধারণপূর্ব্বক নানাবিধ লীলা বিলাস অনুভব করিয়া পুনশ্চ বালকভাবে গৃহে গমন করিলেন। এতদ্বারা জানা যায় যে, বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা বাল্যলীলা মাত্র, যৌবনবিলাস স্বতঃসিদ্ধ বালকের নহে, তাহা ঐশ্বর্য্য-শক্তিদ্বারা সমানীত যৌবনভাবের। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা ১২৫ বৎসর, তন্মধ্যে বৃন্দাবন বাস ১১ বৎসর(১১)।

যাহা হউক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুগত গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক এই—

"মেঘৈর্ম্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইথ নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥"

ভূমণ্ডলের কেন্দ্র ভারতবর্ষমধ্যে ধন্য পশ্চিম বঙ্গ, যাহার মধ্যে বীরভূমিতে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ধন্য, যেহেতু জয়দেব আমাদের স্বদেশীয় এবং তাঁহার অমৃতধারার কণাস্বাদে কথঞ্চিৎ অধিকারী।

"স্মরগরলখণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং
ধেহি পদপল্লবমুদারম্।"
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে, শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং॥
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুরাঃ
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।

---

(১০) জয়দেবের গীতগোবিন্দের একখানি প্রাচীন বাঙ্গলা পদ্যানুবাদেও জানিলাম গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটীর মর্ম্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতেই অবলম্বিত।

(১১) "শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং বিভোঃ।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ।"
ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে ঐ কথা সপ্রমাণ হয়।

নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-

প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥

জয়দেব মহাশয়ের ইত্যাদি সুধাস্রাবিণী কবিতাবলী কাহার না হৃদয় কন্দরে স্বর্গীয় সুধা বর্ষণ করে? জয়দেবের গীতগোবিন্দের রচনাতে গৌড়ীয় কবির স্বভাবসিদ্ধ অনুপ্রাস সমধিক লক্ষিত হয়। অপিচ উদ্ধৃত রচনাবলী বঙ্গীয় গীতিকাব্যের ও ত্রিপদী ছন্দের আদর্শ এবং "চল সখি কুঞ্জে, সতিমির পুঞ্জে" ইত্যাদি অর্দ্ধসংস্কৃত ভাষা অনেকাংশে দৃষ্ট হয়। গীতগোবিন্দের গৌরবসূচক অনেক অলৌকিক গল্প শুনা যায়, যথা—বার্ত্তাকুক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালের মুখে গীতগোবিন্দের গীত শুনিতে জগন্নাথের গমন ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ঝাঁপের রজ্জুগ্রন্থি উত্তোলন ও "ধেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ লিখিয়া দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গীতগোবিন্দে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা বর্ণনীয়। চৈতন্যদাস নামক পণ্ডিত ইহার বালবোধিনী নামে টীকা করেন। ইউরোপের মুদ্রিত গীতগোবিন্দের ভূমিকাতে আরও কয়টি টীকার উল্লেখ আছে এবং তাহাতে জয়দেবকে মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বোম্বে মুদ্রিত গীতগোবিন্দে কুম্ভনৃপতিকৃত রসিকপ্রিয়া ও শঙ্করমিশ্রকৃত রসমঞ্জরী টীকা দৃষ্ট হয়।

গীতগোবিন্দ মহাকাব্য ১২সর্গে বিভক্ত। পূর্ব্বরাগ, অভিসার হইতে সম্ভোগ মিলন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে একটি জয়দেবের গৌরববর্ণনা দৃষ্ট হয়—

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভরতঃ শর্করে কর্করাসি

দ্রাক্ষে দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত মৃতমসি ক্ষীর নীরং রসস্তে।

মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণিতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্-

ভাবং শৃঙ্গারসারস্বতমিহ জয়দেবস্য বিষ্বগ্ বচাংসি ॥

জয়দেবের বাক্যাবলী যতকাল জগতে শৃঙ্গার রসের ভাব বিতরণ করিবে, ততকাল তোমাদের আর গতি নাই, সুতরাং হে মধু তোমাকে আর কেহ ভাল বলিয়া ভাবিবে না, হে শর্করে তুমি কর্করা হও, হে আম্র তুমি ক্রন্দন কর, হে কান্তাধর তুমি পাতালে যাও।

যতিদোষযুক্ত এই পদ্যটীকে অনেকে জয়দেবের শিষ্যরচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু জয়দেব নিজেও বলিয়াছেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।

মধুরকোমলকান্তপদাবলীং, শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং ॥"

যদি হরিকে স্মরণ করিবার জন্য মনে অনুরাগ থাকে, যদি বিলাস কলা জানিতে কুতূহল থাকে, তবে মধুর, কোমল ও কমনীয় পদাবলীসমন্বিত জয়দেববাণীকে শ্রবণ কর। বস্তুতঃ জয়দেবের এই গৌরব সত্যসত্যই শোভা পায়।

গীতগোবিন্দের প্রত্যেক সর্গের আরম্ভে ও শেষে কয়টি করিয়া চতুষ্পদী পদ্য এবং মধ্যস্থলে গীত আছে। তাহা নানাবিধ রাগরাগিণী ও তালসমন্বিত। একজন নব্য কবি জয়দেবের রচনায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন :—

"শ্রুত্বা তু জয়দেবস্য গোবিন্দানন্দিনীর্গিরঃ।
বালিশাঃ কালিদাসায় স্পৃহয়ন্তু বয়ং নতু॥"

গোবিন্দানন্দপ্রদায়িনী জয়দেব-বাণী শ্রবণ করিয়াও কালিদাসের প্রতি মূর্খলোকে স্পৃহা করিতে পারে, কিন্তু আমরা পারি না। জয়দেবের পক্ষে ইহাও বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। প্রাচীন বাঙ্গলা পদ্যে গীতগোবিন্দের অনেকগুলি অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

এই সময়ের কিছু পরে বিদ্যাপতি উপাধিভূষিত বসন্তরায় ১৩৫৫ শাকে যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শুটুর গ্রামে ব্রাহ্মণজাতি ভবানন্দ রায়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মসময়, বাসস্থান ও পিতৃনাম লইয়া মতভেদ আছে। এবং চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই দুই জনের মধ্যে বিদ্যাপতির মৈথিল, বাঙ্গলা, ব্রজভাষা ও হিন্দী-মিশ্রিত গান, চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা গান বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির সূত্রপাত করে। ইঁহাদের গান বহুতর। তাহার অধিকাংশই বিবিধ রস,ভাবও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। চণ্ডীদাস ১৪৯৫ শাকেও বর্ত্তমান ছিলেন। গানমধ্যে কৃষ্ণলীলাই বর্ণনীয় এবং তাহাতে কতই যে কবিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীত শুনিয়া মনে হয়—

"সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ
খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ॥"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ঠিক সময় নির্দ্দেশ বড়ই কঠিন, তবে ২।১টী বিশেষ ঐতিহাসিকের মতে ঐ আনুমানিক সময়াঙ্ক নির্দ্দেশ করিলাম। বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে সময়সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াও ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিদ্যাপতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে তাঁহার জীবন শেষ হয়। বিদ্যাপতির গানে তদীয় পিতৃনাম গণপতি ঠাকুর বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এবং মিথিলাপতি শিবসিংহ তাঁহাকে নিজের নিকটে লইয়া গিয়া বিসপি গ্রাম দানপূর্ব্বক স্থাপন করেন। ভবানন্দ রায় ও গণপতি যে এক ব্যক্তি বটে কি না তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। যাহা হউক উভয়ের সুমধুর গীতমালা ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থও ছিল। গীতমালা যে কত মধুর ও কত সুললিত ও অসংখ্য গুণালঙ্কারভূষিত তাহা ক্ষুদ্র লেখনীতে ব্যক্ত হইবার নহে। তাহা সর্ব্বসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞের পরিজ্ঞাত, সে সব গীতের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইলেও ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কুলায় না অতএব তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া গেল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময়ে চৈতন্যদেবের তাদৃশ সম্পর্ক হয় নাই, এজন্য তাঁহাদের গানে চৈতন্যের নামোল্লেখ নাই। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তৃগণ গৌরচন্দ্রিকার গান রচনা করিয়া প্রত্যেক রস ও রসগত প্রত্যেক প্রভেদের মূলে ভক্তিরস সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে শঙ্করদেব নামে একজন আসামদেশীয় ভক্ত আসামী ভাষায় বৈষ্ণবসাহিত্যের এক অঙ্গ পুষ্ট করিয়া যান। ইহার জন্ম ১৩৭১ শাকে। জন্মস্থান বড়দুয়ার।

পশ্চিম হইতে আসাম-সমাগত কায়স্থবংশে ইহার উৎপত্তি। এককালে ইনি অবতার বলিয়া সমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নিকট বঙ্গীয় বৈষ্ণবসাহিত্য অল্পবিস্তর ঋণী। ইঁহার ভাষাতে আসামী কথাই অধিক। অর্দ্ধ হিন্দী, উড়িয়া ও বাঙ্গলা সামান্য। ইঁহার "সঙ্কীর্ত্তন-ঘোষা"ই গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ পদাবলী ও স্তোত্রই অধিক।

শঙ্করকৃত একটি নূতন পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

রাগ—ধানশ্রী।

"নারায়ণ কাহে ভকতি করোঁ তেরা।
মোর পামর মন, মাধব ঘনে ঘন,
ঘাতুক পাপ ন ছোরা॥
যত জীব জঙ্গম, কীট পতঙ্গম,
অগণন জগতে বিকারা।
সব কছু মারি, পূরত ওহি উদর,
নাহি করত ভূত দারা॥
ঈশ স্বরূপে হরি, সব ঘটে বৈঠহ,
যৈছন গগন বিয়াপি।
নিন্দাবাদ পিশুন, হিংসাব সহয়ে
তেরি করহ হাম পাপী॥
বল কু-শঙ্কর, করু করুণা নাথ,
বোলদা রহু রামরাণী।
সব অপরাধক, বাধক তুয়া নাম,
তাহে শরণ লেহু জানি॥"

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী।

তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়। ইহার নামান্তর রুদ্রসম্প্রদায়, কারণ বিষ্ণুস্বামী রুদ্রের পরম্পরাশিষ্য। বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি করেন বলিয়া ইহার প্রচলিত নাম বল্লভাচারী। এই বিস্তৃতির সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। শেষে গোকুলস্থ গোস্বামিগণই ইহার প্রচারক হয়েন। মথুরার ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে মহাবনের ১।০ ক্রোশ পশ্চিমে যমুনাতীরে গোকুল অবস্থিত। তৈলঙ্গদেশীয় লক্ষ্মণভট্টের ঔরসে ১৪০১ শাকে বল্লভাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। "দোসাহ্নভবান্ বার্ত্তা" নামক হিন্দী পুস্তকে ইহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিষ্ণুস্বামী বেদভাষ্যকার বলিয়া প্রবাদ আছে, বস্তুতঃ ঐ ভাষ্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু বল্লভাচার্য্যই বেদান্তের কিয়দংশের এক ভাষ্য এবং ভাগবতের এক টীকা করিয়াছিলেন। এই টীকাই এতৎ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন সংস্কৃতে সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবত-লীলা-রহস্য এবং হিন্দীতে বিষ্ণুপদ, ব্রজবিলাস অষ্টছাপ ও বার্ত্তা নামে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথ। ইহার প্রথম পুত্র গিরিধারী রায় ভাগবতের বালপ্রবোধিনী নামে টীকা রচনা করেন। এই গিরিধারী ২৫২টী দলভুক্ত লোককে স্বমতে আনয়ন করেন। ৭০ বৎসর বয়সে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে ইনি দেহত্যাগ করেন। সুতরাং তৎপূর্ব্বে তাহার গ্রন্থ রচিত হয়। এই বল্লভাচারী বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ নিজ নিজ ভাষ্য টীকাদির সাহায্যে পশ্চিমভারতের অনেক স্থলে বিশেষতঃ গুজ্রাট্ ও মালোয়া দেশে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রচার করেন। ইহাঁদিগের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তফল গোস্বামিগণের পথ হইতে কিছু পৃথক্ বলিয়া ইহারা চিরদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ হইয়া আছেন। গোস্বামীরা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিধির দাস, বল্লভাচারীরা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের মতে ভোগবিলাসপূর্ণ হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিবে, ব্রতোপবাসাদির তাদৃশ সম্মান নাই। অনেকে বলেন ঐ বিধিশৈথিল্যই উক্ত ধর্ম্মবিস্তারের নিদান, কারণ, সংসারে শৈথিল্যের প্রশ্রয় পাইলে কেহ বন্ধনে যাইতে ইচ্ছা করেন না। মেরতার রাজকন্যা ও উদয়পুরের রাণার পত্নী প্রধান বিদুষী মীরাবাইর কড়চা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের সহজ ও শেষ গ্রন্থ। ইহাতে বাৎসল্যভাবে সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতরূপে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। নিজে খাইয়া আস্বাদ বুঝিয়া পরে কৃষ্ণকে দেওয়া হয়। ইহাও এই সম্প্রদায়ে শুনা যায়। মোগল সম্রাট্ আকবরকে ইনি কৃষ্ণগুণগানে মুগ্ধ করেন। এজন্য আকবরের সময়ে মীরাবাইর কড়চার সত্তা প্রমাণিত হয়।

এই পঞ্চদশ শতাব্দীতেই প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্নতি। এই শতাব্দীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীর কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত সময়মধ্যেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিষ্যানুশিষ্য সুধীবর্গ সংস্কৃত ও বাঙ্গালাতে ভক্তিরস-সমন্বিত নানাবিধ কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যকাননকে সুসজ্জিত করিয়া যান।

এই পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণের মধ্যে কাহারও জন্ম-কাল, কাহারও যৌবন বা বার্দ্ধক্যাদির স্থিতিকাল, কাহার কোন ঘটনাসম্বলিত কাল অর্থাৎ যাহার যে প্রকারে সময়নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই অগ্র পশ্চাৎ ধরিয়া সেই অনুসারে পূর্ব্বাপর সংক্ষিপ্তভাবে গ্রন্থকারগণের এবং যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে গ্রন্থাদির উল্লেখ করা হইল। পঞ্চদশশতাব্দীর মধ্যেকার গ্রন্থাবলীর প্রায় যথাক্রমেই উল্লেখ করা হইল, তবে গ্রন্থের ও গ্রন্থ-কারের গৌরবানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই হিসাবে মহা-প্রভু, মাধবমুকুন্দ ও লোকনাথগোস্বামীকেই পূর্ব্বে ধরা হইল। মহাপ্রভু ১৪০৭ শাকে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাবলীর মর্ম্মে লোকনাথকে মহাপ্রভুর সমবয়স্ক বলিয়া স্থির করা যায়, এজন্য প্রথমে মহাপ্রভুর গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম।

বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের প্রমুখাৎ জানা যায় যে, মহাপ্রভুকৃত প্রথম গ্রন্থ ন্যায়দর্শনের

টীকা, তাহার সত্তার কোন প্রমাণ হয় না, তবে ঘটনাবলী দেখিয়া বোধ হয়, যিনি নবদ্বীপের তাৎকালিক ছাত্র ও অধ্যাপক এবং রঘুনন্দনবন্দ্য ও রঘুনাথশিরোমণির সহাধ্যায়ী, তাঁহার ন্যায়গ্রন্থের টীকা থাকা তত অসম্ভব নহে। প্রবাদ এই যে, তার্কিকচূড়ামণি রঘুনাথশিরোমণির গৌরবরক্ষার্থে মহাপ্রভু স্বকৃত টীকা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।" ধর্ম্মনীতির এই চরম মহাবাক্যের জনয়িতা প্রেমধর্ম্মের দীক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহা অপেক্ষা স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

মহাপ্রভুর "শিক্ষাষ্টক" বলিয়া ৮টী শ্লোকরত্ন দৃষ্ট হয় ও বৈষ্ণবগণ তাহাকে কণ্ঠহাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই শ্লোক এবং "প্রেমামৃত" নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রন্থ মহাপ্রভুর লিখিত বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রকৃত পক্ষে, তাঁহার প্রেমোন্মত্ত মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার গ্রন্থাদি লেখার সময়ই দুর্লভ হইয়াছিল, শক্তিসঞ্চার করিয়া গোস্বামিপাদগণের দ্বারা গ্রন্থের অভাব রাখেন নাই। তবে কদাচিৎ মনের আবেগে দুই চারিটী শ্লোক উচ্চারণ করিতেন। এই কারণে অনেক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃত বলিয়া দুই চারিটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। শিক্ষাষ্টকটী এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং ॥১॥
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিভাবয় ॥৫॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥
যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৭॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাগরঃ ॥৮॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিগলিতং শিক্ষাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।”

উক্ত আট শ্লোকে যথাক্রমে নামমাহাত্ম্য, নিষ্কাম ভক্তি, দৈন্যাত্মিকা শরণাগতি, নামজনিত প্রেম প্রার্থনা, মহাভাবজনিত বিপ্রলম্ভ রস, অনন্যশরণতা বা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর বর্ণিত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে এই আটটী শ্লোকেই সমস্ত বৈষ্ণবশাস্ত্রের বীজ অস্ফুট ভাবে নিহিত আছে।

এতদ্ভিন্ন চৈতন্যচরিতামৃতে, কাশীস্থিত প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের সহিত নীলাচলে থাকিয়া পত্রদ্বারা বিচার, এবং কেশবকাশ্মীরী নামক দিগ্বিজয়ীর সহিত আলাপপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুর স্বকৃত কয়টি কবিতা দৃষ্ট হয়। তাহা প্রবোধানন্দের প্রসঙ্গে দেখান হইবে।

মহাপ্রভুর প্রকটাবস্থার সময়সূচী এইরূপ, ১৪০৭ শাকে নবদ্বীপে জন্ম, ১৪০৭ হইতে ১৪৩০ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর নবদ্বীপে কীর্ত্তনবিহার, ইহাই আদিলীলা বা গৃহবাস। ১৪৩১ শাকে মাঘ মাসে সন্ন্যাস। ১৪৩২ শাকে নীলাচল হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের তীর্থভ্রমণ। ১৪৩৩ শাকে রথযাত্রাদর্শন। ১৪৩৪ শাকে বৃন্দাবনযাত্রা ও গৌড় হইতে ফিরিয়া যাওয়া। ১৪৩৫ শাকে বনপথে বৃন্দাবনযাত্রা। ১৪৩৬ শাকে প্রয়াগ ও কাশী হইয়া বনপথে নীলাচলে আগমন। ১৪৩১ হইতে ১৪৩৬ পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসর দক্ষিণ, গৌড় ও বৃন্দাবনভ্রমণ ইহাই মধ্যলীলা। শেষ আঠার বৎসর নীলাচলে বাস, তন্মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর গৌড়ের শিবানন্দ ও রাঘবাদি ভক্তগণের সহিত আনন্দোৎসব। শেষ বার বৎসর কেবল প্রেমোন্মত্ততা, এই অংশ অন্তলীলা। সাকল্যে আটচল্লিশ বৎসর গৌরলীলা।

পরপক্ষগিরিবজ্র বা অধ্যাসগিরিবজ্র—বেদান্তসূত্রে বেদব্যাসের মনের ভাব কিরূপ প্রকটিত ছিল, তাহাই এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহার নামান্তর শারীরকহার্দ্দ-সঞ্চয়, এখানি দার্শনিক সংস্কৃত বৃহৎ গ্রন্থ, প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মাধবমুকুন্দ।

ইহার পরিচয় পাওয়া অতি দুষ্কর, তবে বহুযত্নে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই প্রকটিত হইল। নিম্বার্কমুনির বেদান্তভাষ্যের টীকাকার নিম্বাদিত্যের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য। এই ভাষ্য ও টীকার মত লইয়া বেদান্তসূত্রের একটী বৃত্তি রচিত হয়, তাহার রচয়িতা দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরী। এই কেশব নিম্বার্কমতানুযায়ী এবং উক্ত মাধবমুকুন্দকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এদিকে ঐ কেশবকাশ্মীরী দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হয়েন, সে প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতে সুন্দর বর্ণিত আছে। মহাপ্রভুর-সঙ্গে যাঁহার বিচার হয় ও তাঁহার যিনি গুরু, তিনিও মহাপ্রভুর সমকালিক, এজন্য মহাপ্রভুর পরেই কেশবের গুরু মাধবমুকুন্দের গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম। এই মাধবমুকুন্দের বাসস্থান বঙ্গদেশান্তর্গত অরুণঘাটা নামক গ্রাম। এই গ্রামের পরিচয় অবগত নহি, কেহ অনুসন্ধান করিতে পারিলে ক্রমে মূলতথ্যের প্রচার হইতে পারে। কেশবকাশ্মীরী শ্রীমহাপ্রভুর যৌবনকালের

প্রতিদ্বন্দ্বী, শেষ বয়সের প্রবোধানন্দ সরস্বতী। পূর্ব্বাপর ভাবে উভয়ের পরিচয় প্রদত্তহইল।

যাহা হউক উক্ত পরপক্ষগিরিবজ্র গ্রন্থখানিতে বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া শাঙ্কর মত খণ্ডনপূর্ব্বক দ্বৈতমত স্থাপিত হইয়াছে। বিপক্ষগণের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের নিরাসপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। যেমন বজ্রাঘাতে পর্ব্বতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপে এই গ্রন্থের নাম ও প্রকরণ কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ পরপক্ষদিগের মত সকলকে গিরি, শিখরী ও শৃঙ্গনামে কল্পনা করিয়া নিজ মতকে বজ্ররূপে কল্পিত করা হইয়াছে। ইহাতে চারিটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বেদাদিবাক্যের সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি, স্মৃতি ও তর্কের বিরোধখণ্ডন। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন ও চতুর্থ অধ্যায়ে বেদান্তের ফল নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের মধ্যে গিরিবজ্রনিপাত, শৃঙ্গনিপাত ইত্যাদি রূপকে পরমত খণ্ডিত হইয়াছে। যেমন, বিষয়সম্বন্ধ গিরিনিপাত, অধ্যাসগিরিনিপাত, আরোপ ও উপসত্তি শৃঙ্গনিপাত, প্রমাণ গিরিনিপাত ইত্যাদি। শ্রীজীবকৃত সন্দর্ভটীকা সর্ব্বসম্বাদিনী অপেক্ষাও অনেক গুণে এই গ্রন্থ পরমত-খণ্ডনে সমর্থ, এক কথায় এরূপ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বৈতমতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

সীতামাহাত্ম্য—শ্রীলোকনাথগোস্বামিকৃত। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর চরিত্র ইহাতে বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে অনেক প্রাচীন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকনাথ মহাপ্রভুর পরমবন্ধু ও ও সমবয়স্ক। প্রবাদ এই যে, ইনিই বৃন্দাবনে যাইয়া প্রথমে গোকুলানন্দ নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ের গুরু বলিয়াই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অধিক পরিচিত। যশোহরের অন্তর্গত তালগড়িয়া গ্রামে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পদ্মনাভচক্রবর্ত্তীর ঔরসে সীতাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। গোস্বামিবর্য্য প্রাচীন সনাতনগোস্বামীও ইহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। মুর্শিদাবাদ দৌলতাবাদ সন্নিহিত সাদিপুরস্থ মদীয় বাল্য বন্ধু পণ্ডিত শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থের গৃহে এই প্রাচীন ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত—মুরারিগুপ্তকৃত মহাকাব্য। শ্রীচৈতন্যের লীলাসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমের মূল গ্রন্থ। চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে যত গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থ হইতেই সকলে তাহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার অধ্যায়ের নাম প্রক্রম। এই গ্রন্থে অন্যত্র দুর্ল্লভ বহুতর তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, রচনা অতি সরল। দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

"নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরমবৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ॥
মহান্তঃ কর্ম্মনিপুণাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্ শূদ্রবণিগ্ জনাঃ॥
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবরুচঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে॥"

মহাকবি কর্ণপূর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে মুরারিগুপ্তকৃত চৈতন্যচরিতের কেবল রামাষ্টকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বহু পরবর্ত্তী নরহরিদাস ভক্তিরত্নাকরে চৈতন্যচরিতের তৃতীয় প্রক্রম হইতে ঐ অষ্টক অবিকল এবং অন্যান্য অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই অষ্টকের প্রথম পদ্য এই—

"রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ-
মুদ্যদ্‌বৃহস্পতিকবিপ্রতিমেব হন্ত।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥" ইত্যাদি।

(ভক্তিরত্নাকর ১২। ৮৮৬ পৃঃ)

চৈতন্যচন্দ্রামৃত—প্রণেতা প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, কাবেরীতীরস্থ রঙ্গক্ষেত্রে জন্ম, গোপালভট্টের পিতা বেঙ্কটাচার্য্যের সহোদর ভ্রাতা, শেষজীবনে কাশীবাসী হয়েন। মহাপ্রভু তথায় গমনাকরিলে পর অবিশ্বাসী হইয়া প্রথমে বাদানুবাদ, কিন্তু পরে প্রভুর ভক্ত হইয়া তাঁহার অনেক স্তব ও নিজের দোষ প্রকাশ করেন। সেই স্তবই চৈতন্যচন্দ্রামৃত। ইহার কোন শ্লোকের সহিত কোন শ্লোকের সম্বন্ধ নাই এজন্য ইহা কোষকাব্যের অন্তর্গত। ইহার ১২টী বিভাগ আছে। যথা—স্তুতি, প্রমাণ, আশীর্ব্বাদ, গৌরভক্তমহিমা, অভক্তের নিন্দা, নিজদৈন্য, উপাস্যনিষ্ঠা, লোকশিক্ষা, গৌরোৎকর্ষ, অবতারমহিমা, রূপোল্লাস নৃত্যাদি এবং শোক। ইহার সবগুলিতেই গৌরাঙ্গসম্বন্ধ আছে। সমষ্টিতে শ্লোক সংখ্যা ১৪৩। ইনি এক স্থানে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ॥
দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্‌ গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগং॥"

আনন্দীনামক জনৈক ভক্ত এই গ্রন্থের টীকাকার, টীকার নাম রসিকাস্বাদিনী। কাশী হইতে এই প্রবোধানন্দ বহুপূর্ব্বে মহাপ্রভুকে কটাক্ষ করিয়া নীলাচলে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

মুণ্ডান্তোমণিকর্ণিকা কিল সরঃ সন্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা
মার্গং তারকমোক্ষকং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতস্মিন্নপি শম্ভুনাথনগরে নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

ইহাতে নীলাচল অপেক্ষা কাশীবাসের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু উত্তর দিলেন :—

মুণ্ডান্তোমণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বুভাগীরথী
মার্গস্তারকমোক্ষকস্তনুভৃতো যত্তারকং তারকং।

কাশীনাং পতিরেষ তচ্চ ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ং
তস্মাদস্য হরেঃ পদং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদং ॥

ইহাতে হরিপদভজনের শ্রেষ্ঠতা ও তৎপাদসম্ভূতা গঙ্গার অংশ বলিয়া মণিকর্ণিকার গৌরব বর্ণিত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী মহাপ্রভু উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর বস্তু ভোজন করেন শুনিয়া সরস্বতীপাদ লিখিয়া পাঠাইলেন :—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা-
স্তেঽপি স্ত্রীমুখদর্শনেন মুমুহুর্মোহং গতা মানবাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদিন্ধ্যো প্লবেৎ সাগরং ॥

প্রভুর ভক্তগণ বলিয়া পাঠাইলেন—

সিংহো বলী দ্বিরদশূকরমাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ ॥

এইরূপ তার্কিক সরস্বতীপাদ এক কালে প্রভুর বিদ্বেষ করিয়া শেষে ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে যে স্তবাবলী নির্গত হইয়াছিল তাহা তাঁহার হৃদয়ের কথা, সুতরাং শঙ্করানুগত মহাবৈদান্তিকের মুখের ভক্তিকথাতে অনেক জ্ঞাতব্য আছে।

শ্রীসনাতনগোস্বামীর হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি বলিয়া চিরবিখ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশানুসারে তিনি সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় ব্রত, পূজা, দীক্ষা বিষ্ণুস্থাপন, সন্ধ্যাবন্দন, পূজোপকরণ, বৈষ্ণবাচার, ভক্তমাহাত্ম্য, ভক্তিমাহাত্ম্য, দ্বাদশ মাসিক কার্য্য, মালাজপ, মন্ত্রবিচার, বাস্তুযাগ প্রভৃতি সঙ্কলনপূর্ব্বক তাহা গোপালভট্টগোস্বামীকে প্রদান করেন। তিনি ঐ সমস্ত বিধিগুলির মাহাত্ম্যাদিসূচক নানাপুরাণের বচনদ্বারা মূল গ্রন্থকে বৃহৎ করিয়া প্রচার করেন। ইহার নামান্তর ভগবদ্ভক্তিবিলাস। এই বৈষ্ণবস্মৃতির সমস্ত বিষয় গুলি প্রাচীন পুরাণ তন্ত্রাদির বচনদ্বারা প্রমাণিত করা হইয়াছে, কৃষ্ণদেবাচার্য্যকৃত নৃসিংহপরিচর্য্যা, পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার, ক্রমদীপিকা ও রামার্চ্চনচন্দ্রিকাদি বিবিধ গ্রন্থের অনুসারে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত। অন্যত্র দুর্লভ এমন অনেক বিষয় ইহাতে বিশেষরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। স্মার্ত্তচূড়ামণি ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইহার অনেক ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ের নাম বিলাস। ২০টী বিলাসে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। বৈষ্ণবগণের আচাররক্ষা বিষয়ে এই গ্রন্থই রাজদণ্ড স্বরূপ। ইহাকে অমান্য করিলে বা আচারচ্যুত হইলে গোস্বামিসম্প্রদায়ে তাহার স্থান নাই। যে সকল কার্য্য ভক্তির সাধক ও বাধক কিছুই নহে সেই সকল কার্য্য অপর স্মৃতির মতে সাধারণনিয়মে কর্ত্তব্য, এইরূপ বরাত দেওয়া আছে,

যেমন বিবাহ, যাত্রা, ক্ষৌর ইত্যাদি। এই গ্রন্থের মীমাংসিত কয়েকটী বিষয় লইয়া বঙ্গদেশ-প্রচলিত রঘুনন্দনবন্দ্যের সংগৃহীত নব্যস্মৃতির সহিত চিরদিন মতভেদ আছে, যেমন শ্রাদ্ধ ও একাদশ্যাদি ব্রত।

ইঁহারা একাদশীর উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ সর্ব্বথা নিষেধ করেন, রঘুনন্দন কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীতে তাহার ব্যবস্থা দেন। গোস্বামিমতে একাদশীর অন্ন গর্হিত, তাহা পিতৃগণ বা দেবগণ গ্রহণ করেন না। দ্বিতীয়তঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ৪ দণ্ড অরুণোদয়কালেও দশমী থাকিলে একাদশী পরাহে হইবে, কারণ আদি অন্ত ৪ দণ্ড বাদ দিয়া রাত্রি ত্রিযামা। ঐ প্রথম ৪ দণ্ড দিনের মধ্যে গণ্য, অপিচ তৎকালের সন্ধ্যাবন্দনা আরভমাণ দিনের কৃত্য, ইহা উভয়পক্ষের সম্মত, কিন্তু অরুণোদয়ে দশমী যোগ হইলে সেই দিনে একাদশী হইবে না, ইহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মানেন না। তাঁহার মতে সূর্য্যোদয়কালে দশমীযোগ সেই দিনের ব্রতনাশক। আরও ব্রতের দিনে প্রত্যেক পূর্ব্ব তিথির যোগ থাকিলে সেই দিনে ব্রত হয় না, তাহা পরাহে হয়, যেমন সপ্তমীযুক্তা জন্মাষ্টমী, অষ্টমীযুক্তা রামনবমী ইত্যাদি। ইহাতে স্মার্ত্তের অমত।

অপিচ,

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥
অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে নারকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥

ইত্যাদি পাদ্ম ও কাত্যায়নপ্রোক্ত বচনের বলে ব্রহ্মচারী আদি ৪ আশ্রমী এবং স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ৮ বৎসর হইতে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমে একাদশীর উপবাস কর্ত্তব্য। ইহাই মুখ্য কল্প। তবে অনুকল্প অর্থাৎ পাশ্চাৎ বিধি অন্য প্রকার তাহা অশক্তপক্ষে। যেমন ব্রতে প্রতিনিধিকল্পনা ও ফলমূলাদিভোজন প্রভৃতি।

গোস্বামিদিগের উদ্ধৃত বচনে স্ত্রী, পুরুষ, সধবা, বিধবা, প্রৌঢ় ও যুবা সর্ব্বনির্ব্বিশেষে ব্রতবিধি, কিন্তু বঙ্গদেশের দেশাচারে সধবা একাদশী করেন না, করিলেও তাহা অমঙ্গলের কার্য্য বলিয়া অজ্ঞ লোকে বোধ করে। উহা যেন বিধবাদিগেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ অনেকানেক গোস্বামিগণ নিজের বিধবাকেও গোস্বামিমতে একাদশ্যাদি করাইয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাহা বিরলপ্রচার।

আর এক কথা—

পত্যৌ জীবতি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী।
আয়ুঃ সংহরতে ভর্ত্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ পতি বর্ত্তমানে উপবাস করিয়া যে নারী ব্রত করেন, তিনি পতির আয়ুঃক্ষয়ের কারণ ও নরকগামিনী হয়েন। ইত্যাদি বচন পতির অনুমতি ব্যতীত যে স্ত্রী ব্রত করেন, তাহার পক্ষে জানিতে হইবে।

শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন—

কামং ভর্ত্তুরননুজ্ঞয়া ব্রতোপবাসাদীনাচরেৎ।

ইত্যাদি অনেক বিচার এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। হরিভক্তিবিলাসের অনেক স্থল মূলে মীমাংসিত হয় না বলিয়া সনাতনগোস্বামী নিজে তাহার দিক্‌প্রদর্শিনী টীকা করিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত কি গৃহী কি উদাসীন, সকলেরই নিত্য নৈমিত্তিক সকল কার্য্যের ব্যবস্থা এই গ্রন্থে নখদর্পণের ন্যায় প্রতিভাত। নিবন্ধকার মহামহোপাধ্যায় সনাতন ও গোপালভট্ট-গোস্বামী এই গ্রন্থে ভগবানে পরমা ভক্তি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম, এমন কি প্রাতঃকৃত্যের একটী দন্তকাষ্ঠ হইতে পরমা ভগবদ্ভক্তিপর্য্যন্ত সাঙ্গোপাঙ্গ ভাবে ইহাতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাপ্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত বোধ হয় অনেকের অজ্ঞাত। এতাদৃশ ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক গ্রন্থ অতি বিরল। গোলোকবস্তুবর্ণন নামে গোপালভট্টের একখানি গ্রন্থ ছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়।

বৃহদ্ভাগবতামৃত—শ্রীসনাতনগোস্বামির প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবগণের উপাস্যনির্ণয় বর্ণিত আছে। ইহার টীকার নাম দিগ্‌দর্শিনী। গ্রন্থকর্ত্তাই নিজে এই টীকা লিখিয়াছেন। ইহার দুইটী খণ্ড। প্রথমটীর নাম ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধার, দ্বিতীয়টীর নাম গোলোকমাহাত্ম্য। প্রথম খণ্ডে ৭অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ডেও ৭অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায় অতি বৃহৎ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদায়িনী ভক্তিই ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য, সেই ভক্তিতে ব্রহ্মানন্দানুভব অপেক্ষাও মহান্ সুখরাশি সম্পন্ন হয়। সেই ভক্তি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে অধিকার করিয়াই অনুষ্ঠেয় এবং সেই ভক্তিই প্রেম। সেই প্রেম আবার সর্ব্বনিরপেক্ষ ও শ্রীনন্দাদিব্রজজনের প্রেম, সুতরাং তাহা অতি মহান্। এতাদৃশী ভক্তিকে যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠোপরি গোলোকধামে নন্দকিশোরের সহিত স্বেচ্ছাবিহাররূপ প্রেমফল প্রাপ্ত হয়েন। এই তথ্যটী নানাবিধ উপাখ্যান ও যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার এক এক অধ্যায়ে ভগবৎকৃপাসার, কৃপাভরনির্দ্ধারণ, ভক্ত, প্রিয়, প্রিয়তম, পূর্ণ, গোলোকমহিমা, বৈরাগ্য, এবং উত্তরোত্তর ভাবে স্বর্গাদির মহিমার কীর্ত্তনপূর্ব্বক ধাম ও উপাস্যশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের উপাসনাকাণ্ডে এই গ্রন্থই মুখ্য ও রাজপথ স্বরূপ। এই গ্রন্থের রচনা বড়ই হৃদয়াকর্ষিণী এবং উপাখ্যান গুলি সাজাইবার কৌশলে বড়ই মনোরম হইয়াছে, অতি বৃহৎ হইলেও তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না।

অতি শ্রুতিমধুর ও প্রসাদগুণগুম্ফিত দুইটীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"গৌড়ে গঙ্গাতটে জাতো মাথুরব্রাহ্মণোত্তমঃ।
জয়ন্তনামা কৃষ্ণস্যাবতারস্তে মহান্ গুরুঃ॥ (২।৩।১২২)
মাতা স্নেহাতুরা মন্নান্ পঠন্তী ভুক্তজারকান্।
বামপাণিতলেনাস্যোদরং মুহুরমার্জ্জয়ৎ॥" (২।৬।১৩৫)

এই বৃহৎ ভাগবতামৃতকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করিয়া শ্রীরূপগোস্বামী "লঘু ভাগবতামৃত" সঙ্কলন করেন। ইহাতে উপাখ্যানাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য সত্য, কিন্তু তাঁহার নানাবিধ অবতার আছে, সেই সকল অবতারমধ্যে কোন্ অবতার কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট, তাহা এই ভাগবতামৃত হইতেই অবগত হওয়া যায়। ইহার দুইটী খণ্ড। প্রথমটী কৃষ্ণামৃত, দ্বিতীয়টী ভক্তামৃত।

ইহাতে স্বয়ংরূপ তদেকাত্ম, বিলাস, স্বাংশ, আবেশ, প্রকাশ, অবতার, তাহার নানারূপ প্রভেদ। লীলাবতার, কল্পাবতার, যুগাবতার, প্রাভব, বৈভব, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব ভ্রমনিরাস, তেজোময় ব্রহ্ম ও পুরুষাবতার অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা এবং নিত্যমূর্ত্তিত্ব। প্রকট লীলা, অপ্রকট লীলা, বসুদেব পুত্র হইতে নন্দপুত্রের ক্রিয়াশক্তিগত পার্থক্য, প্রকট লীলায় মথুরাগমন ও ধামনিরূপণ। এই গুলি কৃষ্ণামৃতখণ্ডে বিস্তৃত হইয়াছে। এই প্রকরণের দুইটী সিদ্ধান্তের কথা লেখা যাইতেছে।

প্রাভব দ্বিবিধ। প্রথমটী অল্পকালীন স্থিতিযুক্ত, যেমন মোহিনী, হংস ও শুক্লাদি অবতার। দ্বিতীয় অল্পবিস্তৃত কীর্ত্তিযুক্ত, যেমন ধন্বন্তরি, ঋষভদেব, ব্যাস ও কপিল প্রভৃতি।

বৈভব এক প্রকার গুণযুক্ত যথা—কূর্ম্ম, মৎস্য, নরনারায়ণ, বরাহ, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ, বলরাম ও যজ্ঞ। দ্বিতীয় ভক্তামৃতখণ্ডে বিষ্ণুভক্তের পূজা না করিলে শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ লাভ করা যায় না এই কথা এবং সাধারণ ভক্ত, প্রহ্লাদ, পাণ্ডবাদি, যাদবগণ, উদ্ধব ও ব্রজদেবী ইহাদের পর পর শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। অপিচ শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত পুষ্পাদিদ্বারা ব্রজদেবীগণের পূজা ও গোপীমধ্যে রাধার প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুষ্ক তার্কিকের অধোগতি। গোপীগণের কৃষ্ণগত বিরহের মীমাংসা। সমস্ত অবতার নিত্য ও অপ্রাকৃত। সাঙ্খ্যযোগের পরমাত্মাই মহাপুরুষ। চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবাদি মূল বাসুদেবের অংশ। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি সহস্রশব্দ অনন্তবাচী। মহাসঙ্কর্ষণের যে বীজশক্তি তাহার ২০ হাজার অংশের এক অংশের শক্তিতে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়। পুরাণান্তরোক্ত শিবের অষ্টমূর্ত্তি। চতুর্ভুজ শিব। হ্লাদিনী প্রভৃতি মহাশক্তি ভগবান্ হইতে অভিন্ন, সন্ধিনী আদি মহাশক্তি ভগবান্ হইতে ভিন্ন। মন্বন্তরান্তে সিদ্ধ প্রলয় ও আকস্মিক প্রলয়।

কাম, ক্রোধ, যে কোন ভাবে অথবা শত্রু মিত্রভাবে ঈশ্বরকে ভজিলেই মুক্তি, এই সাধারণ সিদ্ধান্তেরও একটী সুমীমাংসা ইহাতে আছে। বৈরানুবন্ধের তন্ময়তা ও ভক্তিযোগের তন্ময়তা পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণের শত্রুগণ কৃষ্ণরূপী ভগবানে শত্রুভাব থাকিতে তাহাকে প্রাপ্ত হয় না, জন্ম জন্ম কেবল অন্যের না হইয়া শ্রীকৃষ্ণেরই শত্রু হয়, পরে যখন তাহাকে পূর্ণতমরূপে জানিতে পারে তখন মুক্তিলাভে অধিকারী হয়। অতএব বৈর না করিয়া মৈত্রী করাই সঙ্গত। চিরবৈর থাকিলে আসুরী ও অধম গতি ভিন্ন সদ্গতির আশা পরাহত।

বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে পুরাণ অসম্ভব বলিয়া পুরাণ অর্থে পুরাণের টীকাকে ধরিলাম। প্রথমতঃ পুরাণশাস্ত্রের টীকাতে বৈষ্ণবগণ কতদূর অগ্রসর তাহাই দ্রষ্টব্য—

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ভিন্ন অপর পুরাণের টীকা করেন নাই। কেবল শ্রীজীবগোস্বামী অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীর টীকা করিয়াছেন। ঐ টীকাতে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী জগচ্চক্ষু ভগবত্তেজেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩২ খানি টীকার উল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে শাঙ্করীনামে ভগবান্ শঙ্করের টীকা বলিয়া এক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ শঙ্করকৃত টীকা অনেকের মতে প্রবাদবিরুদ্ধ, কারণ তিনি ভাগবতের বিরোধী ছিলেন ইহা চিরপ্রথা। বস্তুতঃ ভক্তমালেও দেখা যায় যে, কাশীস্থ শূররাজকে শিক্ষা দেন, তিনি দেশের অনেক ভাগবতগ্রন্থ গঙ্গায় ডুবাইয়া ফেলেন, পরে বোপদেব তাহার উদ্ধার করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে রক্ষা ও হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংসপ্রিয়া নামে টীকা করেন। এই টীকার মধ্যে সব গুলিই প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। স্থলবিশেষের শ্লোক লইয়া পরস্পর সামঞ্জস্যমাত্র। ইতঃপর শঙ্কর ভাগবতের মহিমা অবগত হইয়া এবং ব্রহ্মসূত্রের তুল্য মনে করিয়া তাহার টীকা করেন। ইহা প্রবাদবাক্য। শাঙ্করী টীকা প্রকৃত হইলেও তাহা অদ্বৈতবাদ-পূর্ণ, দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাতে আস্থা করেন না।

আমার পরিজ্ঞাত ৩২ খানি টীকার নাম এই—

হনুমতী, চিৎসুখী, মধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবততাৎপর্য্য, বল্লভাচার্য্যকৃত সুবোধিনী, রামানুজীয়া, বীররাঘবীয়া, নিম্বার্কীয়া, হরিলীলা, মুক্তাফল, পরমহংসপ্রিয়া, বিদ্বৎকামধেনু, সম্বন্ধোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহৃদয়া, সুদর্শনী, মুনিভাবপ্রকাশিকা, প্রহর্ষিণী, শ্রীধরী (ভাবার্থ-দীপিকা), বিজয়ধ্বজী, যাদুপতী, শ্রীনিবাসী, সত্যধর্ম্মতীর্থী, বৃহত্তোষণী, লঘুতোষণী, বিশ্বনাথী (সারার্থদর্শিনী), ক্রমসন্দর্ভঃ, তোষণীসার, মাধবী, বামনী, একনাথী, শাঙ্করী ও পুরুষোত্তমী।

এই সকল টীকার মধ্যে চিৎসুখ, মধ্বাচার্য্য, রামানুজ, শুকহৃদয়া, শ্রীধরী, তোষণী-দ্বয়, বিশ্বনাথী ও ক্রমসন্দর্ভ, এই কয়খানী গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয়। ইহার মধ্যে মধ্বাচার্য্যকৃত টীকা সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদপূর্ণ, রামানুজকৃত টীকা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপূর্ণ এবং শ্রীধরী টীকাই সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শিরোমণিস্বরূপ। সর্ব্বত্রই শ্রীধরস্বামীর টীকাকে সম্মান করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত টীকামধ্যে অধিকাংশই ১৪শ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বের, তবে তাহার সময়নির্দ্দেশ সহজসাধ্য নহে, এজন্য ভাগবতের টীকাপ্রসঙ্গেই নামমাত্র উল্লিখিত [illegible]। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ও বর্ত্তমান কালেও অনেক পণ্ডিত ভাগবতের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

নীলাচলে থাকিয়া একদিন শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—স্বামীকে না মানিলে [illegible]গিনী যেমন ব্যভিচারিণী হয়, সেইরূপ কেহ যদি শ্রীধরস্বামীর টীকা না মানিয়া ভাগবত [illegible] করেন তাহা ব্যভিচারদোষদুষ্ট। তোষণীতে আছে—

"স্বামিপাদৈর্ন যদ্ব্যক্তং যদ্ব্যক্তং চাস্ফুটং ক্বচিৎ।
টিপ্পনী দশমে তত্র সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী॥"

স্বামিপাদ যাহা ব্যক্ত করেন নাই, অথবা ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু পরিস্ফুট হয় নাই, দশমস্কন্ধে তাহাই পরিস্ফুট করিয়া ব্যাখ্যা করিব। তোষণীকারের এই সঙ্কল্প বহুস্থানে প্রমাণিত হইয়া থাকে। এই তোষণী প্রথমে শ্রীসনাতনগোস্বামী বৃহদাকারে রচনা করেন, শ্রীজীব-গোস্বামী তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করিয়া লঘুতোষণী নাম প্রদান করেন। বৈষ্ণবতোষণী নামের কারণ এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই টীকাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন।

"শাকে ষট্সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা॥"

১৪৭৬ শকাব্দ বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর রচনার শেষ কাল। শ্রীজীব তাহাকে ১৫০০ শকাব্দে সংক্ষিপ্তাকারে শেষ করেন। বর্ত্তমান ১৮২৯ শকাব্দের (কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক) ৩শত বৎসর পূর্ব্বে আমরা তোষণীর রচনার শেষকাল বলিয়া স্থির করিতেছি।

তোষণীর প্রারম্ভে লেখকের নিজ লিখিত শ্লোকাবলী হইতে আমরা এই তথ্যগুলি জানিতে পারি—

গ্রন্থকারের উক্তি—এই দশমস্কন্ধের মধ্যে বৈষ্ণবগণের যে যে স্থলে নিগূঢ়ার্থ বশতঃ তাদৃশ পরিতোষ হয় না, আমি সরলভাবে তাহার কিছু কিছু মীমাংসা করিব। ভাগবতে পরা ভক্তি বা প্রেমই জীবের পুরুষার্থ, ইহা চৈতন্যমতমঞ্জুষা গ্রন্থে কথিত আছে—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ রামচন্দ্রাদি যত অবতার আছে, তন্মধ্যে সকলে অংশ কলা, ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং ভগবান্, তিনিই উপাস্য। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও মথুরাদি বিভিন্ন ধাম থাকিলেও গোলোকের বৈভব বা প্রকাশবিশেষ বৃন্দাবনই লব্ধব্য ধাম। সনক, সনন্দ, হনুমান্, অর্জ্জুনাদির শান্ত দাস্যাদি নানাভাবে উপাসনা থাকিলেও ব্রজবধূবর্গের রচিত পতি পুত্রাদি ভাবে উপাসনাই রমণীয় উপাসনা। এই প্রেমময়ী উপাসনার মূল শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত, ইহা সমস্ত পুরাণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সাত্ত্বিকপুরাণ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ও মোক্ষনামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে প্রেম নামক পঞ্চম পুরুষার্থই প্রার্থনীয়। এই পুরুষার্থ ভগবৎসেবা এবং ইহাই পুত্র, সখা ও পতি ভাবে বৃন্দাবনের শুদ্ধভক্তি। বৈষ্ণবগণ যখন এই ভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করেন, এই তোষণীতে আমি অদ্বৈতবাদ লিখিব না, এই বিষয়ে পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করি[illegible] এই তোষণী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আমি নিজে লিখিয়াছি এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুযোগ্য বৈষ্ণ[illegible] লেখাইয়াছি। ইহাতে কোন দোষ থাকিলে বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ শোধন করিবেন। শ্রীচৈ[illegible]

রূপাতে পরিব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যাঁহারা লোলুপ, তাঁহারাই এই বৈষ্ণবতোষণীর রসাস্বাদের যোগ্য পাত্র। এই তোষণীতে ভাগবতের নানা দেশীয় পাঠ সন্নিবিষ্ট। তন্মধ্যে গৌড়ীয় পাঠ প্রথম এবং কাশীস্থ পাঠ দ্বিতীয় শ্রেণীতে। গুর্জ্জরাদি অন্যান্য পাঠ শেষ শ্রেণীর। এই তোষণীতে নানাদেশীয় গ্রন্থের ও টীকার অনুসরণ করা হইয়াছে। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ" এই গীতোক্তসিদ্ধান্ত ভাগবতের ব্রহ্মস্তবে সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভারতের পূর্ব্বাংশস্থ বঙ্গদেশের কিয়দংশ গৌড় নামে পরিচিত। ভারতের পশ্চিম সীমায় গুর্জ্জর বা গুজরাট্। তোষণীতে গৌড়, কাশী ও গুর্জ্জরাদি দেশীয় পাঠের উল্লেখে বোধ হয়, বর্ত্তমানকালে যেমন সর্ব্বত্র গীতার প্রসার প্রতিপত্তি, পূর্ব্বকালে ভাগবতের তদ্রূপ প্রসার ছিল, ইহা ৪ শত বর্ষ পূর্ব্বের তোষণীর লেখাতে অনুমান করা যায়। সমস্ত পুরাণ লিখিয়া বেদব্যাসের চিত্ত প্রসন্ন না হওয়াতে তিনি ভাগবত লিখিয়াছেন, ইহা শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন। আমি মনে করি সমস্ত ভারতবাসী এককালে এই ভাগবতের মহিমা অবগত হইয়াছিলেন। তবে বিভিন্ন লোকের হস্তলিখিত বলিয়া পাঠভেদ অনিবার্য্য। তোষণীকার সিদ্ধান্তমীমাংসার জন্য নিস্তা গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক, তবে হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শান্তিপর্ব্ব প্রভৃতির সংখ্যাই অত্যধিক। দুঃখের বিষয় এতাদৃশ ভূয়োদর্শনের পরিচায়িকা তোষণী টীকা কেবল দশম স্কন্ধ ভিন্ন অন্য অংশের নাই। গ্রন্থকার বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্বাদ করিবার জন্যই অন্যাংশের টীকা করেন নাই। বস্তুতঃ ইহার "লীলাস্তবটিপ্পনী" এই নামান্তর দ্বারাও আমরা ঐ মতে অগ্রসর হইতেছি। লঘু বৈষ্ণবতোষণী টীকার শেষে শ্রীজীব একটি নিজের বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহারা ভরদ্বাজগোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ, মূল পুরুষ কর্ণাটরাজ জগদ্‌গুরু, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ, ইনি নবহট্ট অর্থাৎ নৈহাটীতে গঙ্গাবাস করেন। ইঁহার পাঁচ পুত্রমধ্যে পঞ্চম মুকুন্দ, তৎপুত্র কুমার, ইনি বঙ্গদেশে বরিশালের মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ফতোয়াবাদে বাস করেন। এই কুমারের পুত্র প্রথম সনাতন, দ্বিতীয় রূপ, তৃতীয় বল্লভ। মহাপ্রভু বল্লভের অনুপম নাম রাখেন, এই বল্লভের পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী।

ক্রমসন্দর্ভনামক শ্রীজীবকৃত ভাগবতের টীকা নাতিবৃহৎ, কারণ তিনি ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যেই ভাগবতের অধিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন এজন্য ষট্‌সন্দর্ভের অতিরিক্ত নাম ভাগবতসন্দর্ভ, সুতরাং ইহাতে বিস্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই, তথাপি মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি যাহা স্বল্লাক্ষরে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অতীব উপাদেয় এবং স্বসিদ্ধান্তপরিপোষক, ইহা বৈষ্ণবতোষণী দেখিয়াই লিখিত হয়।

বিশ্বনাথকৃত টীকাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে, তাহা তদীয় গ্রন্থপ্রসঙ্গে প্রদর্শন করিব। "দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং" এই রাসের উদ্দীপনবিভাবের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথের ঔপপত্য যেন রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। সনাতন, রূপ ও জীব প্রভৃতি আচার্য্যগণ ঔপপত্যকে সত্য না বলিয়া মিথ্যাই বলিয়াছেন।

দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ গোপালচম্পূতে শ্রীজীব সুস্পষ্ট লিখিয়াছেন "যত্তু মধ্যে মায়য়া প্রত্যায়িতং ঔপপত্যং, তৎ খলু অবাস্তবত্বাৎ (মিথ্যাত্বাৎ) অধ্যস্তং" অর্থাৎ লীলার মধ্যস্থলে যে মায়া-বোধিত ঔপপত্য ভাব, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা, কারণ পরে তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল।

হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। অলঙ্কারশাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থবিশেষ। অলঙ্কার শাস্ত্রের দশটি অবশ্যলেখ্য বিষয়মধ্যে কৌস্তুভ অলঙ্কারে শান্তরসের মুখ্য ভক্তিরসকে কর্ণপূর পল্লবিত করিতে পারেন নাই। এজন্য শ্রীরূপগোস্বামী পৃথক্ অলঙ্কার না লিখিয়া সর্ব্বসাধারণ ভক্তিরসের শাখা প্রশাখার বিস্তৃতিজন্য "হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামে এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীরূপ গোকুলে অবস্থান করিয়া ১৪৬৩ শকাব্দে এই গ্রন্থ শেষ করেন। ইহার শ্রীজীব-কৃত টীকা দুর্গমসঙ্গমনী। এই সিন্ধুর পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চারিটি ভাগ। পূর্ব্বভাগে ৪ লহরী, দক্ষিণে ৫, পশ্চিমে ৫ এবং উত্তরভাগে ৯টি লহরী অর্থাৎ সাকল্যে চারিভাগে ২৩টি পরিচ্ছেদ আছে। পূর্ব্বভাগে ভক্তির সামান্য লক্ষণ ও সাধনভক্তি রাগানুগা, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। দক্ষিণভাগে আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। পশ্চিমভাগে শান্ত, প্রীত, গৌরব ও বৎসল ভক্তিরস। উত্তরভাগে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, ভক্তিরস ও রসাভাস বর্ণন। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক বিষয়ের অঙ্গ উপাঙ্গ ও মতভেদকে বিভিন্ন শাস্ত্রের সংবাদদ্বারা সমর্থন ও উদাহরণযুক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বভাগের প্রথম লহরী অর্থাৎ ভক্তির সামান্যলক্ষণপ্রসঙ্গে ভক্তিস্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া অনেক দার্শনিক তথ্যের আলোচনা করিতে হইয়াছে। ইহার মঙ্গলাচরণ এইরূপ—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ, প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো, রাধা-প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥"

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ এই রূপ—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং, জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অনভিজ্ঞ লোকে এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ লইয়া জ্ঞানকর্ম্মকে ভক্তি বিরোধী বলিয়া নাসিকাসঙ্কোচ করে। বস্তুতঃ অভেদব্রহ্মপর জ্ঞান, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মই এখানে পরিহার্য্য, ভজনীয় ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান ও ভজনীয় ভগবানের পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম গ্রাহ্য। যে ভক্তি এই লক্ষণের প্রতিপাদ্য তৎকালে সেই ভক্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদিকর্ম্মের অতীত, ইহা "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" এবং আনুকূল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যাবতীয় রুচিজনিকা প্রবৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরের কথাতেই বেশ বুঝা যায়।

"রসামৃতশেষ" নামে একখানী শ্রীজীবকৃত রসামৃতের পরিশিষ্ট আছে। তাহা দ্বিতীয় সাহিত্যদর্পণাংশ বলিলেই চলে। কর্ণপূরকৃত অলঙ্কারকৌস্তুভের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ নিজ সম্প্রদায়ে বর্ত্তমান থাকায় শ্রীরূপগোস্বামী পৃথক্ অলঙ্কার লেখেন নাই, ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে ভক্তিরসের বিস্তার করিয়াছেন। ভক্তি আবার বহুবিধ তন্মধ্যে, শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল-

রসাত্মিকা ভক্তি বিশেষ গোপনীয় এজন্য এবং গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে রসামৃতে তাহার বিস্তৃতি না করিয়া "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে উজ্জ্বলরসের অঙ্গ উপাঙ্গ বহুলভাবে বিস্তৃত করিয়াছেন, এ কারণ রসামৃত ও উজ্জ্বলকে এক "হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীজীবও ইহা লঘুতোষণীর শেষে শ্রীরূপের গ্রন্থপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।"

সমষ্টি ভাবে ধরিতে গেলে কর্ণপূরের অলঙ্কারকৌস্তুভ, শ্রীরূপের নাটকচন্দ্রিকা, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি, এই চারিখানিকে একমাত্র অলঙ্কারশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। এতন্মধ্যে প্রথম খানিতে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত সর্ব্বসাধারণ বিষয়ের সমন্বয়, দ্বিতীয় খানিতে নাট্যাঙ্গের বহুলীকরণ, তৃতীয় খানিতে সর্ব্বসাধারণ ভক্তিরস, শেষ খানিতে কেবল রসরাজ শৃঙ্গার বা উজ্জ্বলরসের বহুবিস্তারমাত্র। উজ্জ্বলের কৃষ্ণপ্রকরণে নায়কভেদ, নায়কসহায় ভেদ। রাধা ও সখীপ্রকরণে নায়িকা দূতী, যূথেশ্বরী, সখী। হরিবল্লভাপ্রকরণে স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ, প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ ইত্যাদি ভেদ। উদ্দীপনপ্রকরণে যৌবনভেদ, রূপভেদ, বেণুবাদন, কৃষ্ণোদ্দীপক অপর লীলা। অনুভাবপ্রকরণে ভাব, হাব, হেলা, কান্তি ইত্যাদি। সাত্ত্বিকপ্রকরণে ভীতি, বেপথু ইত্যাদি। ব্যভিচারিপ্রকরণে ভ্রম, মদ, শঙ্কা ইত্যাদি। স্থায়িভাবপ্রকরণে সমঞ্জসা ও সমর্থাদি প্রসঙ্গে রতি, স্নেহ, প্রণয়, মৈত্রী, সখ্য ইত্যাদি। তৎপরে শৃঙ্গারভেদপ্রকরণে সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, তাহার মান প্রবাস ইত্যাদি প্রভেদ কথিত হইয়াছে। ইহাও বক্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ের ভেদ, অবান্তর ভেদ ও মতভেদের নানাবিধ উদাহরণ দেওয়াতে গ্রন্থখানি অতিবৃহৎ হইয়াছে। ইহার দুইটি টীকা প্রচলিত আছে। শ্রীজীবগোস্বামীর লোচনরোচনী, শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর আনন্দচন্দ্রিকা। বলা বাহুল্য যে এই উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে জ্ঞান না থাকিলে রসকীর্ত্তনের গানে ও শ্রবণে সম্পূর্ণ অধিকার হইতে পারে না। ইহাতে ৬৪টি রসের প্রকারভেদ আছে। ইহার প্রথম শ্লোক এই—

"নামাকৃষ্টরসজ্ঞঃ শীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দং।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥"

ইহার শেষ শ্লোক এই—

"অয়মুজ্জ্বলনীলমণির্গহনমহাঘোষসাগরপ্রভবঃ।
ভজতু তব মকরকুণ্ডলপরিসরসেবৌচিতীং দেব॥"

প্রসঙ্গে যে নাটকচন্দ্রিকার কথা বলা হইল ঐখানি শ্রীরূপের কৃত। এখানি স্বকৃত ললিতমাধব নাটকের জন্যই যেন রচিত বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার ললিতমাধব নাটকের কেবল নাট্যাঙ্গ গুলি বুঝাইবার জন্য নাটকচন্দ্রিকা রচনা করেন। ইহার সমস্ত উদাহরণ ললিতমাধবের। বিদগ্ধমাধব, রসসুধাকর, কংসবধ, বীরচরিত, হরিবিলাস ও কেশবচরিত গ্রন্থের উদাহরণ অতীব সামান্য। নাট্যাঙ্গের লক্ষণ বলিতে যে ইনি যুক্তি প্রাপ্তি, সমাধান, বিমর্শ, উপগূহন, প্রগ্রন্থন বিধান ইত্যাদি বহু বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অভিধানশাস্ত্রের কার্য্যও নিষ্পন্ন হয়

অর্থাৎ ঐ সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ লক্ষণদ্বারা প্রকাশ করিয়া পাঠকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। নাটকচন্দ্রিকাতে গ্রন্থারম্ভ এই ভাবে করিয়াছেন—

"বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং, রসপূর্ব্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ং।
লক্ষণমতিসঙ্ক্ষেপাদ্বিলিখ্যতে নাটকস্যেদম্ ॥১॥
নাতীব সঙ্গতত্বাদ্ভরতমুনের্মতবিরোধাচ্চ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ ॥২॥

প্রাচীন নাট্যসূত্রকার ভরত মুনির শাস্ত্র অর্থাৎ ভরতসূত্র এবং রমণীয় রসসুধাকর গ্রন্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক অতি সঙ্ক্ষেপে এই নাটকলক্ষণ লেখা যাইতেছে ॥১॥

নব্য অলঙ্কারমধ্যে সাহিত্যদর্পণই বিখ্যাত কিন্তু তাহা তত সঙ্গত নহে এবং ভরতসূত্রের মতের বিরোধী সুতরাং এই গ্রন্থে সাহিত্যদর্পণের প্রক্রিয়া প্রায় পরিগৃহীত হয় নাই ॥২॥

শ্রীরূপপ্রভৃতির মহাকাব্য নাই সুতরাং তাঁহার কৃত অপর গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—

বিদগ্ধমাধব—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত নাটক (১২)। সপ্ত অঙ্কে বিভক্ত। ইহার প্রথম মঙ্গলাচরণের শ্লোক দুইটি এই—

---

(১২) প্রবন্ধারম্ভে সাহিত্য-বিচারপ্রসঙ্গে কাব্যের কথা পূর্ব্বেও হইয়াছে পরেও হইবে, এজন্য শ্রীরূপের নাটকপ্রসঙ্গে কাব্যশাস্ত্রের মূলতত্ত্বসম্বন্ধে প্রাচীন মতানুসারে কাব্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল :—

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদকদম্বকে বাক্য বলে। সেই বাক্য রসাত্মক হইলেই কাব্য হয়। এসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, কেহ গুণযুক্ত, কেহ রীতিযুক্ত, কেহ সালঙ্কার বাক্যকে কাব্য বলিয়া থাকেন। সেই কাব্য দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে দ্বিবিধ। অভিনয়দ্বারা যাহা প্রদর্শিত হয় তাহা দৃশ্য। ইহাতে গ্রন্থোক্ত নায়কাদির রূপ নট নিজে আরোপ করেন বলিয়া ইহাকে রূপক কাব্যও বলাযায়। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, অঙ্কবীথীও প্রহসনভেদে নাটক ১০ প্রকার। ইহাতে নায়কচরিত্র ইতিহাসসিদ্ধ, বিলাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক গুণ, সুখ দুঃখাদি অবস্থা, ৫ হইতে ১০টী অঙ্ক, দিব্য অদিব্য ও দিব্যাদিব্য নায়ক, শৃঙ্গার বা বীররস অঙ্গী অন্য রস অঙ্গ। এবং গোপুচ্ছের মত প্রথমে সূক্ষ্ম, মধ্যে বিস্তৃত, শেষে সূক্ষ্ম, এইমত বিবরণটী বিন্যস্ত হইবে।

শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। যাহার পরিচ্ছেদ গুলি সর্গনামে খ্যাত, সেই সর্গ অষ্টসংখ্যার কম হইবেনা এবং নাতিক্ষুদ্র ও নাতিদীর্ঘ হইবে, প্রতিসর্গে নানারূপ ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ও সর্গান্তে ভিন্ন ছন্দের শ্লোক থাকিবে, সর্গান্তে ভাবী সর্গের সূচনা থাকিবে। নায়ক দেব বা সদ্বংশ ক্ষত্রিয়াদি ধীরোদাত্তাদি গুণসম্পন্ন হইবে, ইহাতে শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত মধ্যে একটী রস প্রধান ও অন্যগুলি অপ্রধান রস, চরিত্র ইতিহাসসিদ্ধ অথবা কোন সজ্জনাশ্রিত হইবে। মঙ্গলাচরণে নমস্কার, আশীর্ব্বাদ বা বস্তুনির্দ্দেশ থাকিবে, গ্রন্থের নাম কবির নামে, প্রতিপাদ্য ঘটনার নামে, নায়কের নামে বা অপরের নামেও করা যাইতে পারে। ইত্যাদি গুণসম্পন্ন কাব্যকে মহাকাব্য বলাযায়। মহাকাব্যের একদেশানুগত কাব্যই খণ্ডকাব্য। পরস্পর অপেক্ষাবিহীন স্বস্বপ্রধান বিভিন্ন ভাবের শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলাযায়। যে বাক্যসমূহ ছন্দোবদ্ধ নহে তাহার নাম গদ্য। যাহা ছন্দোবদ্ধ তাহা পদ্য। গদ্যকাব্য অনেক প্রকার। কথা, আখ্যায়িকা, চম্পূ, বিরুদ, করম্ভক

"সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা শিখরিণী॥

অপিচ—অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

বৃন্দাবনস্থ কেশীতীর্থে নানা দিগ্দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশবশতঃ এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়, ইহা গ্রন্থকারেরই সূচনা।

কবি স্বাহঙ্কারের পরিহার করিয়া বলিয়াছেন—

"মমাস্মিন্ সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতিললিতা
মুদং ধাস্যন্ত্যেচ্চৈস্তদপি হরিগন্ধাদ্বুধগণাঃ।
অপঃ শালগ্রামস্নপনগরিমোদ্গারসরসাঃ
সুধীঃ কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥"

ইহার এক হইতে সাত অঙ্কে বেণুনাদবিলাস, মন্মথলেখ, রাধাসঙ্গমীলন, বেণুহরণ, রাধাপ্রসাদন, শরদ্বিহার ও গৌরীতীর্থবিহার, যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে বিদগ্ধ-মাধবের রচনারম্ভ করিয়াই ঘটনাচক্রে অনুজ বল্লভের সহিত নীলাচলযাত্রা করেন, পথি মধ্যে নাটকের বিষয় চিন্তা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রে লিখিতেন, নীলাচলে আসিয়া সেই অসম্পূর্ণ নাটক মহাপ্রভুকে প্রদর্শন করান। এদিকে মহাপ্রভু একটী প্রাচীন শ্লোক প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাধুর্য্য দেখিয়া হৃষ্ট কিন্তু কৃষ্ণবিষয়ক নহে ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ প্রভুর মনের ভাব জানিয়া তদনুরূপ একটী শ্লোক রচনা করিয়া দেখাইলেন, প্রভু অপার আনন্দ লাভ করিলেন যথাক্রমে শ্লোক দুইটী এই—

১। "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

ইত্যাদি। যে গদ্যকাব্যে সরস বস্তু পদ্যদ্বারা গ্রথিত থাকে, আর্য্যাদি ছন্দ থাকে, প্রথমে নমস্কারাদি থাকে তাহাকে কথা বলে। আখ্যায়িকা প্রায় কথার তুল্য, ইহাতে কবির বংশবর্ণনা থাকে, স্থলবিশেষে পদ্য থাকে, কথাংশের শেষে ভাবিকথার সূচনা থাকে। গদ্যপদ্যময় কাব্যকে চম্পূ কহে। গদ্যপদ্যময়ী রাজ-স্তুতিকে বিরুদ কহে। নানাবিধ ভাষার গদ্য কাব্যকে করম্ভক কহে। বৈষ্ণবসাহিত্যমধ্যে চম্পূ ও কথার গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

২। প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

শ্রীরূপের অমৃতায়মান নাটকশ্রবণে নীলাচলের ভক্তমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই নাটকে নাটকীয় সমস্ত বিষয়ের বিন্যাস এবং নায়কনায়িকাগত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ, নানাবিধ ছন্দ, ভাব ও অলঙ্কার থাকায় চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রজলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। ১৫৮৯ সম্বতে এই নাটক সমাপ্ত হয়, সমাপ্তিস্থান গোকুল। ইহার টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। পদ্যানুবাদক যদুনন্দন দাস। অনুবাদের নাম "রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব"। ইহাঁর দ্বিতীয় নাটক ললিতমাধব। এ খানি বিদগ্ধমাধব হইতে বৃহৎ। দশটী অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম হইতে ১০ অঙ্কে যথাক্রমে সান্দ্রোৎসব, শঙ্খচূড়বধ, রাধিকোন্মাদ, রাধিকাভিসার, চন্দ্রাবলীলাভ, ললিতাপ্রাপ্তি, নববৃন্দাবনসঙ্গম, নববৃন্দাবন-বিহার, চিত্রদর্শন, এবং মনোরথপূরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণনীয় দ্বারকালীলা। প্রথম শ্লোক এই—

"সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্, মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ॥"

নাটকাংশের শেষ শ্লোক এই—

"সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা
যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূস্ত গোষ্ঠেশ্বরী
বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্
সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে॥

তথাপীদমস্তু—(ভরতবাক্যং)

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো-
বিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে
প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ॥"

(নাট্যাংশের উপান্ত শ্লোক)

নাটকীয় অন্যান্য অংশে বিদগ্ধমাধব ললিতমাধব, দুই সমান। কল্পনাংশে ললিত-মাধবে কিছু আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। দ্বারকাপুরে নববৃন্দাকর্ত্তৃক নববৃন্দাবনের সৃষ্টি, তাহাতে ব্রজ হইতে সমাগত সমস্ত সখা সখী গোপ গোপী লইয়া আনন্দোৎসব, এগুলি বড়ই মনোরম। বৃন্দাবনের গৌরব দেখাইতেই শেষে শ্রীরাধার মুখে বলিয়াছেন "চিরদিনের আশাধারী মাধুর্য্যময় মাথুরভূখণ্ডবাসী জনগণের নিকট কৈশোরকালীন সেই ভালবাসা মনে

করিয়া একবার মুরলীবদনে সাক্ষাৎ করিবে" ইহাই উদ্ধৃত শেষ শ্লোকের অর্থ। গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন, এই নাটক চতুঃষষ্টিকলাতে পরিপূর্ণ, সমস্ত লক্ষণ ও ভূষণে ভূষিত, গান্ধর্ব্ব বিদ্যায় বা গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধারগুণগ্রামে সম্বলিত। এই নাটক বৃন্দাবনের ভদ্রবনে ১৪৫৯ শকাব্দে শেষ হয়। ইহার টীকাকার শ্রীজীবগোস্বামী। ইহার প্রথমাভিনয় রাধাকুণ্ড-তীরে মাধবমন্দিরের সম্মুখে সম্পন্ন হয়।

দানকেলীকৌমুদী—দৃশ্য কাব্যের অন্তর্গত "ভাণ" নামক রূপককাব্য। স্ত্রীলিঙ্গ-কৌমুদী শব্দ থাকায় ভাণিকা বলা হইয়াছে। প্রণেতা শ্রীরূপগোস্বামী। টীকাকার শ্রীজীব-গোস্বামী। বৃন্দাবনান্তর্গত নন্দীশ্বরে বাস করিয়া ১৪৭১ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। "নানাবস্থাসমন্বিত ধূর্ত্তচরিত্রকে ভাণ কহে," ইহার অঙ্ক একটী মাত্র। বর্ণনা কবিকল্পিত, ইতিহাসসিদ্ধ নহে। (নিত্যসিদ্ধ লীলাকে রসাস্বাদের জন্য কল্পিত মনে করিয়া রূপকলক্ষণের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। লীলাংশেই তাদৃশ কল্পনা, নায়কাংশে নহে।) শ্রীকৃষ্ণ, সুবল, মধু-মঙ্গলাদি ইহার নট এবং রাধা, বৃন্দা ও ললিতাদি নটী। শ্রীকৃষ্ণের ধূর্ত্ততাই ইহার বর্ণনীয়। রাজধানীস্থ নদীর ঘাটে বা রাজপথে পল্লী হইতে দ্রব্যাদিবিক্রয়ার্থে সমাগত লোকজনের কর আদায়ের নাম দান। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটে সখীসমন্বিতা শ্রীরাধাকে সেই করগ্রহণের জন্য অবরোধ করিয়া যে কৌতুকবিস্তার করিয়াছিলেন তাহাই গ্রন্থের বর্ণনীয়। সুবল, মধুমঙ্গল, রাধা ও ললিতাদির উক্তি অধিক থাকায় ইহাতে প্রাকৃতভাষার সংখ্যা অধিক। ইহার প্রথম শ্লোকেই ধূর্ত্ততা সূচিত এবং শ্রীরাধার রোদন, হাস্য ও ভয়ব্যাকুল লোচনেরই বর্ণনা আছে—

"অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥"

প্রাচীন কাব্যমধ্যে "বসন্ততিলক" নামে ভাণ কাব্য দেখা যায়, তাহা অতি ক্ষুদ্র, তদ্ভিন্ন ভাণ প্রায় দৃষ্ট হয় না। শ্রীরূপের এই ভাণিকা বিস্তৃত এবং নানাবিধ কল্পিত ভাব-বর্ণনে পরিপূর্ণ।

স্তবমালা—শ্রীরূপগোস্বামিকৃত। টীকাকার শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ। ইহাতে ৫১টী স্তব আছে। পৃথক্ ভাবে ধরিলে প্রত্যেকে এক একখানী গ্রন্থ। এ খানী প্রথমে বিচ্ছিন্নভাবে ছিল, শ্রীজীব তাহাকে সংগ্রহ করিয়া একত্র করেন। ইহাতে প্রথমে শ্রীচৈতন্যের, পরে শ্রীকৃষ্ণের, তৎপরে শ্রীরাধার নানা স্তব আছে। তৎপরে গোবিন্দবিরুদাবলীতে ছন্দ ও রচনার অশেষ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য টীকাকার এখানে শ্রীরূপকে "কবি বিশ্বকর্ম্মা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন দাক্ষিণাত্য কবি দেববিরুদাবলী পাঠ করিলে গোবিন্দদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ কণ্ঠ হইতে মালাদান করিয়া শ্রীরূপকে নিজ বিরুদাবলী রচনা করিতে বলেন, পরে শ্রীরূপ চণ্ডকাদি নানাবিধ ছন্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ

কেহ গোবিন্দবিরুদাবলীকে জীবকৃত বলেন, কিন্তু টীকাকার টীকারম্ভে সুস্পষ্ট রূপকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ছন্দঃশাস্ত্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বিরুদাবলীতে অচ্যুত, বীরদেব ও উৎকলাদি শব্দান্ত এক এক কলিকা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্তবমালার অন্তর্গত গীতাবলীনামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে, তাহা সনাতনকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রত্যেক গীতের শেষে শ্রীকৃষ্ণবোধক "সনাতন" শব্দ আছে। শ্রীরূপ ইহার সংগ্রাহক। ইহার গান গায়কসম্প্রদায়ে অনেকে ব্যবহার করেন। স্তবমালার চিত্রকবিত্ব গুলি অতি-নিগূঢ়ার্থ। ইহা প্রাচীন মহাকাব্যেও প্রসিদ্ধ আছে। ইহার গোমূত্রিকাবন্ধ, মুরজবন্ধ, পদ্মবন্ধ ইত্যাদি বহু প্রভেদ।

কতিপয় শ্রুতিমধুর কবিতা উদ্ধৃত হইল—

"সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং,
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ১ ॥
নবপ্রিয়কমঞ্জরীরচিতকর্ণপূরশ্রিয়ং,
বিনিদ্রতরমালতীকলিতশেখরেণোজ্জ্বলং।
দরোচ্ছ্বসিতযূথিকাগ্রথিতবল্গুবৈকক্ষকং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥ ২ ॥

জয় জয় সুন্দর, বিহসিতমন্দর, বিজিতপুরন্দর, নিজগিরিকন্দর, রতিরসশঙ্কর, মণিযুতকন্ধর, গুণমণিমন্দির, হৃদি বলদিন্দির, গতিজিতসিন্ধুর, পরিজনবন্ধুর ॥" ইত্যাদি।

বৈষ্ণবগণ এই স্তবমালার অনেক স্তব আহ্নিক পূজাদির সঙ্গে ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকেন। স্তবমালার প্রত্যেক অংশ বিভিন্ন, কেবল একত্র সংগৃহীত মাত্র। স্তবমালার চাটু-পুষ্পাঞ্জলি ও মুকুন্দমুক্তাবলীর আদর ও স্থান অনেকের আছে, বস্তুতঃ সেরূপ স্তব স্তবমালাতে প্রচুর পরিমাণেই আছে।

পদ্যাবলী—শ্রীরূপের অপর সংগ্রহগ্রন্থ। প্রবাদ আছে যে, শ্রীরূপ যৎকালে রাম-কেলীতে গৌড়বাদসাহের মন্ত্রিত্ব কার্য্যের জন্য বাস করিতেন, তখন তাঁহার নিকট নানাদেশীয় বুধমণ্ডলী উপস্থিত হইতেন, সেই সমস্ত বুধমণ্ডলীর নিকট হইতে এই পদ্যাবলী সংগৃহীত। ইহার প্রতিপদ্যের শেষে রচয়িতার যে নামনির্দ্দেশ আছে, তাহাতেও ঐরূপ প্রবাদ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পরস্পর অনপেক্ষ বলিয়া এখানীকে কোষকাব্য বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের টীকাকার বর্দ্ধমানপ্রদেশীয় মাড়গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লোকান্তরিত পণ্ডিত বীরচন্দ্র গোস্বামী। টীকার নাম রসিকরঙ্গদা। গ্রন্থের ১ম ও ২য় শ্লোক এই—

"পদ্যাবলী বিরচিতা রসিকৈর্মুকুন্দসম্বন্ধবন্ধুরপদা প্রমদোর্ম্মিসিন্ধুঃ।
রম্যা সমস্তজনসাং দমনী ক্রমেণ সংগৃহ্যতে কৃতিকদম্বককৌতুকায় ॥

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে ॥"

নানা কবির শ্লোক হইলেও তাহা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াই সজ্জিত আছে যথা—কৃষ্ণমহিমা, ভজনমাহাত্ম্য, নন্দপ্রণাম, ভক্তগরিমা, সখীর উক্তি, অষ্টবিধ নায়িকা, দানলীলা, গোপী-সন্দেশ ইত্যাদি। ঐরূপ শ্রেণী ইহাতে ১১১টী দেখা যায়। এই সংগ্রহগ্রন্থে রামকেলীতে অনাগত এমন অনেক কবির কবিতাও লিখিত হইয়াছে, তবে জয়দেব, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি কবির পদ্য পৃথক্ গ্রন্থরূপে অবস্থিত থাকায় সংগৃহীত হয় নাই। ইহা গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থশেষে উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন লেখকের লিখিত বলিয়া এই গ্রন্থে একাধারে নানা রস, নানা ভাব, নানা ছন্দ, নানা অলঙ্কার ও নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ কবিতা দৃষ্ট হয়। কবিতার সংখ্যা সমষ্টিতে ৩৯২।

হংসদূত—শ্রীরূপকৃত। এখানী খণ্ডকাব্য। শ্লোকসংখ্যা ১৪২। ইহার টীকাকারের পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। সমস্ত শ্লোক শিখরিণীনামক ১৭শ অক্ষরের ছন্দে গ্রথিত। টীকার প্রথম শ্লোকটীও শিখরিণী ছন্দের। ইহাতে বিরহকাতরা শ্রীরাধা হংসকে দূত কল্পনা করিয়া মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিজের দুরবস্থা ও শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যসুখ, ইত্যাদি বিষয় ইহার বর্ণনীয়। চির উত্তপ্ত বৈষ্ণবজগৎকে যিনি মাধুর্য্যস্রোতস্বিনীর মধুরধারায় প্রথম পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সুকবি শ্রীরূপের লেখনীপ্রসূত হংসদূত একখানী অমৃতসাগরের রত্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে অনেক রস আছে, কিন্তু দোষস্পর্শ নাই। প্রথম শ্লোক এই—

"দুকূলং বিভ্রাণো দলিতহরিতালদ্যুতিহরং
জবাপুষ্পশ্রেণীরুচিরুচিরপাদাম্বুজতলং।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঙ্কিতমুখঃ
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ ॥"

টীকাকার বলেন, বিপ্রলম্ভরসের গ্রন্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ যুক্তিসিদ্ধ নহে, সুতরাং "কোঽপি পুরুষঃ" বলিয়া বিশেষণ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাচীন মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের কথা বলিব না, তবে অর্ব্বাচীন কবির মধ্যে যত গুলি দূতকাব্য হইয়াছে, কেহই এই মাধুর্য্যের স্পর্শও করিতে পারেন নাই।

শ্রীরূপের অপর দূতকাব্য "উদ্ধবসন্দেশ" বা "উদ্ধবদূত"। উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আগমন করিলে পর তদ্দ্বারা গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাই ইহার বর্ণনীয়।

মথুরামাহাত্ম্য—শ্রীরূপ এই গ্রন্থে প্রাচীন পৌরাণিক বচনাবলীর দ্বারা মথুরার সংস্থান ও গৌরব বর্ণন করিয়াছেন। উপদেশামৃত—এগারটি শ্লোকে বৈষ্ণবগণের প্রতি উপদেশ দান। তাহাতে ইন্দ্রিয়সংযম এবং মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডের উত্তরোত্তর মহিমা ঘোষিত আছে। কেহ কেহ ইহাকে রূপকৃত বলিতে অনিচ্ছুক। রূপচিন্তামণি—শ্রীরূপ ইহাতে,

শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন বর্ণন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা—এই গ্রন্থ বৃহৎ ও লঘুভেদে দুইখানী। রচয়িতা শ্রীরূপগোস্বামিপাদ। রচনার শেষ সময় ১৪৭২ শকাব্দ, তাহা গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। এখানীও রাগানুগামার্গীয় উপাসনার পক্ষে সবিশেষ অনুকূল। ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বংশাবলী, সখা, সখী, দাস, দাসী, বসন, আভরণ, স্থান, ভবন, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে। প্রেমেন্দুসাগর ও বৃন্দাদেব্যষ্টক নামে দুইখানী গ্রন্থও শ্রীরূপকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, উক্ত কয়খানী গ্রন্থই ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। শ্রীরূপের গ্রন্থোপসংহারে একটী বক্তব্য আছে—

"লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাসবর্ণন।"

(চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য। ১)

"চারি লক্ষ সংগ্রহ গ্রন্থ দুঁহে বিস্তার করিল।"

(ঐ। অন্ত। ৪)

(দুঁহে অর্থাৎ রূপ ও সনাতনে)। সাধারণ সরল বৈষ্ণবগণ এই লেখাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ ইহা গোস্বামিগণের গৌরবপ্রকাশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ—মেদিনী অভিধানে গ্রন্থশব্দের শ্লোকার্থ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে শ্রীরূপের লক্ষ শ্লোক। উভয়ের সংগৃহীত শ্লোক চারি লক্ষ। ইহাই মীমাংসিত হয়। বস্তুতঃ ইহাও বড় সহজ কথা নহে।

বৈষ্ণবসাহিত্যের মূল চারি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ও তৎপ্রসঙ্গে অনেক বিষয় বিবৃত হইল। এখন বর্ত্তমান বৈষ্ণবসাহিত্যের অবান্তর মূল শ্রীজীবগোস্বামীর অক্ষয়কীর্ত্তি ষট্‌সন্দর্ভের কথার উল্লেখ করা যাইতেছে—

ভাগবতসন্দর্ভ—ইহার নিবন্ধকার মহামহোপাধ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের মুকুটমণি মহামনাঃ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ। ইহার প্রধান আশ্রয় মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং অধিক বিষয় ভাগবতোক্ত প্রমাণে সমর্থিত বলিয়া নাম ভাগবতসন্দর্ভ। তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভ, এইরূপ ৬ ভাগে বিভক্ত বলিয়া নামান্তর ষট্‌সন্দর্ভ। ১৫০০ শকাব্দে শ্রীজীব লঘুতোষণী শেষ করেন, সুতরাং ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ে ষট্‌সন্দর্ভের রচনাকাল ধরা যাইতে পারে, কারণ অশেষ দার্শনিক বিচার ও বহুদর্শিতাপূর্ণ গ্রন্থকে শেষ গ্রন্থ বলা অসঙ্গত নহে, তবে গোপালচম্পূ সন্দর্ভের পরে লিখিত।

গ্রন্থারম্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন। শ্রীরূপ ও সনাতনের প্রবর্ত্তনাতে এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। তাঁহাদের পরমবন্ধু দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গোপালভট্ট, প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদির লিখিত গ্রন্থ হইতে সারভাগ সংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের প্রথম রচনা করেন। আমি সেই গোপালভট্ট-বিলিখিত পুরাতন গ্রন্থ দেখিয়া ও ক্রম পরিপাটীতে সজ্জিত করিয়া লিখিলাম। সেই পুরাতন লেখায় কোথায় ক্রম ছিল, কোথাও ছিল না কোন অংশ খণ্ডিত বা ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহা দ্বারা শ্রীজীবের পরিশ্রমের সার্থকতা অনুভূত হইতেছে। এই গ্রন্থে স্থলবিশেষে শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বভাষ্য এবং শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা অবিকল উদ্ধৃত

হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ভজনে যাঁহাদের অভিলাষ আছে তাঁহারাই যেন এই গ্রন্থ দর্শন করেন, অন্যের প্রতি শপথ থাকিল।" শ্রীজীবের এই সঙ্কল্প এখন কতদূর কার্য্যে পরিণত তাহা জানি না। গীতার শেষেও আছে—

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
নচাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

তপশ্চর্য্যাবিহীন, অভক্ত, শ্রবণেচ্ছাহীন এবং ভগবানে অসূয়াকারী ব্যক্তিকে গীতা-শাস্ত্র কখনই বলিবে না। এই গীতার শপথবাক্যও সর্ব্বাংশে প্রতিপালিত হয় না।

সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ ও উল্লিখিত ভূমিকার পর মঙ্গলাচরণ বা গ্রন্থসূচনার শ্লোক এই—

"যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাং॥"

ইহার কোন্ সন্দর্ভে কি কি বিষয় বিচারিত হইয়াছে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

(১) তত্ত্বসন্দর্ভে—সর্ব্বপ্রমাণের মধ্যে অভ্রান্ত বেদবাক্যের প্রামাণ্য, পঞ্চমবেদ স্বরূপ ভাগবতপ্রমাণের সর্ব্বপ্রমাণমধ্যে শ্রেষ্ঠতা। গ্রন্থের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য। সামান্যাকারে তত্ত্ব-নিরূপণ। সর্গ ও বিসর্গাদির ব্যাখ্যা।

(২) ভগবৎসন্দর্ভে—ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক বিশেষরূপে তত্ত্বনির্ণয়। ব্রহ্মা প্রভৃতির আবির্ভাবযোগ্যতা, আবির্ভাবভেদ, এবং বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধসত্ত্বনিরূপণ। স্বরূপের শক্তিবিশিষ্টতা স্থাপন। সেই স্বরূপ বিরুদ্ধশক্তির আশ্রয়। শক্তি অচিন্ত্যা। স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা স্বাভাবিক নানাত্বস্থাপন। শক্তির অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গাদি ভেদনির্ণয়, মায়া ও স্বরূপশক্তি নিরূপণ। গুণ সকল স্বরূপভূত। শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা, বিভুত্ব ও সর্ব্বাশ্রয়ত্ব। তাহা স্থূল সূক্ষ্মের অতিরিক্ত। শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপতা। তাঁহার পরিচ্ছদ সকল স্বরূপের অংশ। বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদ্ বিভূতির অপ্রাকৃতত্ব। সনকাদির অনুভব-প্রামাণ্যে পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহানন্দের ব্রহ্মানন্দ হইতে উৎকর্ষ। বিশেষরূপে ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য অর্থাৎ অনাবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তি বা সামান্যসত্তা ব্রহ্ম, আর আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তি বা বিশেষ-সত্তা ভগবান্। ভগবানের যে পূর্ণ তত্ত্বাকারত্ব তাহাই সর্ব্ববেদের অভিধেয়, ইহাতে শ্রুতি স্মৃতির সঙ্গতি। স্বরূপশক্তি বিবরণ ও সর্ব্ব প্রকরণের সংগ্রহপূর্ব্বক তাদৃশ ভগবানের বেদ-বোধিত ভক্তিগম্যতা।

(৩) পরমাত্মসন্দর্ভে—পরমাত্মা, তাহার ভেদ, গুণাবতার, তাহার ভেদ ও তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ। পরিণামবাদস্থাপন, বিবর্ত্তবাদসমাধান, পরমাত্মা হইতে জগতের অনন্যত্ব, জগৎসত্যত্ব, নির্গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বযোজনা, কেবল ভক্তের জন্যই ভগবানের লীলাবতারের

প্রবৃত্তি। উপক্রম সহ উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি, এই ছয় প্রকার লিঙ্গের ভগবানেই তাৎপর্য্য।

(৪) কৃষ্ণসন্দর্ভে—শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব, অংশত্ব বাক্য সকলের সমাধান, মহাকাল-পুরাণের কেশাবতারত্ব ও নৃসিংহাদি সাম্যত্বের সমাধান। লীলাবতার,গুণাবতার ও পুরুষাবতারের কর্ত্তা বলিয়াও কৃষ্ণের পূর্ণত্ব। সমস্ত শ্রোতা ও বক্তার কৃষ্ণেই তাৎপর্য্য। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই আশ্রয় বাক্যের ও তদীয় প্রতিনিধি বাক্যের এবং সর্ব্বশাস্ত্রের কৃষ্ণেই সমন্বয়। এতদ্বিষয়ে মতান্তরখণ্ডন, নামমহিমা ও গীতাদিশাস্ত্রের কৃষ্ণপরতা। বলদেবাদির মহাসঙ্কর্ষণতা, শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বাংশের প্রবেশযুক্তি। রূপের নিত্যস্থিতি। এতদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ বাক্য সকলের কৃষ্ণবিভুত্বদ্বারা সমাধান। উল্লিখিত বিষয়ে মূল প্রমাণপ্রদর্শন। যাদব ও গোপগণের নিত্য তৎপরিকরতা। প্রকট ও অপ্রকট লীলার ব্যাখ্যা। বিভুত্ব দ্বারাও সর্ব্বত্র স্থিতি। উক্ত উভয় লীলার সমাধান। সর্ব্বধামাপেক্ষা গোকুলে অতিশয় প্রকাশ। পট্টমহিষীগণ স্বরূপশক্তি, তদপেক্ষা গোপীগণের উৎকর্ষ তন্মধ্যে শ্রীরাধার উৎকর্ষ।

(৫) ভক্তিসন্দর্ভে—নিখিল সম্বাদদ্বারা ভগবান্ই যে ভক্তির একমাত্র গম্য, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রের শ্রবণফল, বর্ণাশ্রমের আচারফল, কর্ম্মের ত্যাগ, যোগত্যাগ, জ্ঞানমার্গের শ্রম ইত্যাদি সমস্তই ভক্তির অঙ্গ হইলে আদরণীয়। ভক্তি সর্ব্বফলদাত্রী, নির্গুণা, এবং স্বপ্রকাশ ও পরমসুখরূপা। ভক্তির আভাস, ভক্তিগত অপরাধবিচার, নিষ্কাম ভক্তিপ্রশংসা, ভক্তির অধিকারিগত ভেদ—ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ণ নিষ্কাম ভক্তি স্থাপন। সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্য লাভের নিদান বা আদি কারণ। মহতের প্রভেদ, বিশেষ মহৎ। গুর্ব্বাশ্রয় বিচার। ভক্তিভেদ-নিরূপণের মধ্যে জ্ঞানলক্ষণ। অহংগ্রহ উপাসনা, ভক্তিলক্ষণ, আরোপসিদ্ধ, বৈধী ভক্তি, শরণাগতি, গুরুশুশ্রূষা, মহাভাগবতপ্রসঙ্গ। শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবধাঙ্গা ভক্তি। তদন্তে রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণভজনের বিশিষ্টতা ও সিদ্ধিলাভ।

(৬) প্রীতিসন্দর্ভে—নানাবিধ প্রমাণদ্বারা ভগবৎপ্রীতিই পরমপুরুষার্থ এবং পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার মাত্রের মুক্তিত্ববিচার। প্রসঙ্গতঃ—সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্তি উৎক্রান্ত মুক্তি ইত্যাদি সর্ব্বমুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির আধিক্য। ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত মুক্তি। বহিঃসাক্ষাৎকার, অন্তঃসাক্ষাৎকার। ইহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেও পরম তত্ত্ব। সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য ও সামীপ্যের বর্ণন। সামীপ্যের আধিক্য। ভগবদ্ভক্তিই মুক্তি ও উপাদেয়। ইহাতে যুক্তিপ্রদর্শন। ভগবৎপ্রীতির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ। প্রীতিতেই কৃষ্ণের পূর্ণাবির্ভাব। অতঃপর প্রীতির রতিপ্রভৃতি ভেদ। ব্রজদেবীগণের কামের শুদ্ধ প্রেমত্ব-স্থাপন। জ্ঞানভক্ত্যাদির মিশ্রতা। জ্ঞানিভক্তে রত্যাদিব্যবস্থা। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যানুভাবের তারতম্য। গোকুলবাসী, সখা, মাতা, পিতা, গোপী, শ্রীরাধা ইহাদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা। প্রীতিগত রসবিচার। আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন বিভাব, নায়ক, নায়িকা, রস, রসাভাস,

অনুভাব, ব্যভিচারী ভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ইত্যাদি রসগত বিচার। সর্ব্বরসে শৃঙ্গারের শ্রেষ্ঠতা। সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ ও তদ্‌গত মান প্রবাস করুণাদিভেদ। সর্ব্বশেষে শ্রীরাধার মহিমা।

উপরিলিখিত ছয়টি সন্দর্ভের মধ্যে তত্ত্ব, ভগবৎ ও পরমাত্মসন্দর্ভকে প্রমাণভাগে এবং কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতিসন্দর্ভকে প্রমেয়ভাগে ধরা যাইতে পারে। কারণ সর্গ, বিসর্গ (মহদাদি সূক্ষ্ম ভূত ও স্থূল ভূত), স্থান, পোষণ, উতি (কর্ম্মবাসনা), মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয়। এই দশ পদার্থ ভাগবতের বর্ণনীয়, তন্মধ্যে ১ম, ২য় স্কন্ধে গ্রন্থসূচনা। ৩য় স্কন্ধে সর্গ। ৪র্থ স্কন্ধে বিসর্গ। ৫ম স্কন্ধে স্থান অর্থাৎ ভূগোল ও খগোলের অবয়বসংস্থান। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে পোষণ। ৭ম স্কন্ধে উতি। ৮ম স্কন্ধে মন্বন্তর। ৯ম স্কন্ধে ঈশানুকথা। ১০ম স্কন্ধে নিরোধ দুষ্টনিগ্রহ, প্রাকৃতাদি চারি প্রকার প্রলয়, ইহার সহিত আশ্রয়। ১১শ স্কন্ধে মুক্তি। ১২শ স্কন্ধে শুদ্ধ আশ্রয়। ভাগবতের একমাত্র আশ্রয় দশম পদার্থ বলিবার জন্যই অপর নয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। অপরগুলি প্রমাণস্থানীয় দশম পদার্থ কৃষ্ণই প্রমেয়। সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত-প্রণালীও সর্ব্বাংশে ভাগবতের অনুগত, এজন্য সন্দর্ভের শেষ তিনটি সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ও তাহার প্রাপ্ত্যুপায় ভক্তি এবং তাহার পরাবস্থা যে প্রীতি তাহার বিচার করিয়াছেন। তত্ত্বসন্দর্ভে মূল শ্লোক ২৫, লেখ্য শ্লোক ৪৭৫। ভগবৎ—মূল ১১২, লেখ্য ২৭৪০। পরমাত্ম—মূল ১০৯, লেখ্য ২৭৫৮। কৃষ্ণ—মূল ১৮৯, লেখ্য ৩১৭৫। ভক্তি—মূল ৩৪০, লেখ্য ৪৬২৬। প্রীতি—মূল ৪২৯, লেখ্য ৪৩০০। সাকল্যে লেখ্য শ্লোক ১৮০৭৪। এই গ্রন্থের বিচারপ্রণালী অতি সুন্দর। শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব সর্ব্বপ্রকারে স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পর এতাদৃশ বহুদর্শী বিচারশীল একাধারে দার্শনিক ও কবি জন্মিয়াছিলেন কি না জানিনা। অথচ এরূপ দার্শনিক গ্রন্থ নব্য ন্যায়শাস্ত্রের মত কঠিন নহে, সরল সংস্কৃতে পূর্ব্বাপর সমন্বয় করিয়া বিচারপদ্ধতি প্রকটন করিয়াছেন।

সর্ব্বসম্বাদিনী—ইহা ষট্‌সন্দর্ভের টীকা, নামান্তর অনুব্যাখ্যা। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীজীবের নিজ-লিখিত। এই টীকাতে তত্ত্ব ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ এই চারিটী সন্দর্ভের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। টীকা খানী নামে টীকা, কিন্তু একখানী পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতে প্রতিপদের ব্যাখ্যা নাই। সন্দর্ভেরই কথাকে বিভিন্নাকারে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন—

পঞ্চলক্ষণী ব্যাখ্যা—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা।
আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণং॥"

পদচ্ছেদ করিয়া, পদার্থের প্রকাশ করিয়া, সমাস করিয়া, পরস্পর বাক্যের যোজনা অর্থাৎ অন্বয় করিয়া এবং অনুক্ত অথচ আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সমাধান করিয়া, এই পাঁচ প্রকারে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। সর্ব্বসম্বাদিনীতে ইহার দুইটী প্রক্রিয়া অর্থাৎ পদার্থোক্তি এবং আক্ষেপের সমাধান অধিকাংশ লক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য যে এই টীকা সার্থনামা, ইহাতে সর্ব্বদর্শনেরই সংবাদ দেওয়া আছে এবং সর্ব্বদর্শন হইতে কোন মতকে অবজ্ঞা না করিয়া স্বমতস্থাপন করিয়াছেন।

বলদেবাদি পণ্ডিত "মায়ী শঙ্কর" বলিয়া অনেক স্থানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে কটাক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু ইনি শঙ্করাচার্য্যের প্রধান বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদকেও আংশিক স্বীকারপূর্ব্বক তাহার অবস্থা, অধিকারও প্রণালীভেদ করিয়া ব্যাখ্যা করতঃ স্বমতের পোষণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা অল্প পাণ্ডিত্যের কথা নহে।

গোপালচম্পূ—শ্রীজীবকৃত সুবৃহৎ গ্রন্থ। শ্রীজীবের সমস্ত গ্রন্থমধ্যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোস্বামিগণের গ্রন্থমধ্যে, সমস্ত বৈষ্ণবসাহিত্য ও প্রাচীন সাহিত্যরাজ্যে শ্রীজীবকৃত গোপালচম্পূ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার সমষ্টিতে শ্লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ২২ হাজারের কম নহে। সুতরাং এক পুরাণ ব্যতীত আর কোন গ্রন্থই এত বৃহৎ আছে বলিয়া অবগত নহি। ইহা গদ্য ও পদ্য উভয় মিশ্রিত। কিন্তু সাকল্যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের সংখ্যাই অধিক। ইহার পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ দুইটি ভাগ। ভাগবতের সমস্ত দশমস্কন্ধের লীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বচম্পূতে গোলোকলীলা, বাল্যলীলা ও কৈশোরলীলা এবং উত্তরচম্পূতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিলাস কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তরভাগে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি খণ্ড আছে। ইহার এক এক খণ্ডই এক এক গ্রন্থ। ষট্ সন্দর্ভের অন্তর্গত কৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত দার্শনিক আকারে মীমাংসিত আছে, ইহাতে তাহাই কাব্যাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতন রূপক।
গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং॥"

এই মঙ্গলাচরণের শ্লোকটীতে গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই স্বতন্ত্ররূপে তিন পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই তিনটী পক্ষ এই—ইষ্টদেবের ভক্তগণ, ইষ্টদেব এবং ইষ্টদেবসহিত ভক্তগণ।

এই গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, এজন্য এই প্রবন্ধে অতিসঙ্ক্ষেপে দুই একটি কথা বলা হইল। ইহাতে অলঙ্কার ও ছন্দঃশাস্ত্রলিখিত সমস্ত অলঙ্কার ও সমস্ত ছন্দ ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অনুপ্রাসের সংখ্যাই অধিক। অনুপ্রাসের দিকে কবির দৃষ্টি অধিক বলিয়াই বোধ হয়। পর্ণশব্দের খাতিরে চূর্ণ, স্বর্ণ, বর্ণ এবং অম্বরের জন্য শম্বর, আড়ম্বর, স্বয়ম্বরকে আনিতে হইয়াছে। অপিচ প্রচলিত শব্দাপেক্ষা ইহাতে আভিধানিক শব্দঘটা অনেক। যেমন গর্ত্তের স্থলে অবট, অগ্নির স্থলে কৃপীটযোনি, ঝটিতি স্থলে মঙ্ক্ষু ইত্যাদি। ইহার পরিচ্ছেদের নাম পূরণ, পূর্ব্বচম্পূতে ৩৩ এবং উত্তরচম্পূতে ৩৭ পূরণ আছে। পূর্ব্বচম্পূর শেষে গ্রন্থকার গ্রন্থের সময়নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৬৪৫ সম্বতে অর্থাৎ ১৫১০ শাকে এই পূর্ব্বচম্পূ এবং ১৬৪৯ সম্বতে অর্থাৎ ১৫১৪ শাকে বৈশাখ মাসে উত্তরচম্পূ লেখা সম্পূর্ণ হইয়াছে। গোলোকাদি ধাম, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব, পরিবারের তদ্রূপত্ব, বলদেবাদির তত্ত্ব, কৃষ্ণের নিত্যরূপ এবং গোপীও শ্রীরাধাদির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ, এই সকলস্থলে দার্শনিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষাকৃত অধিক। পূর্ব্বচম্পূর প্রথম পূরণে ধামাদিতত্ত্বের বিচারপূর্ব্বক, দ্বিতীয় পূরণ হইতে নন্দরাজের রক্তচূড় নামক কোন আত্মীয়লোকের মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ নামক ভাগীনেয়দ্বারা এই চম্পূকথার সূচনা হইয়াছে। তাহাদের মুখেই কবির এই বৃহৎ চম্পূ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাদম্বরীতে যেমন

শূদ্রকসভাতে শুকপক্ষী, ইহাতে সেইরূপ মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠকে কল্পিতকথক বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বচম্পূর ২য় হইতে ৩৩পূরণে বাল্যচরিত, বংশাদিবর্ণন, কংসপ্রেরিত দৈত্যাদিবধ, কালিয়দমন, পূর্ব্বরাগ, ঋতুবর্ণন, গোবর্দ্ধনধারণ, গোপগণের গোলোকদর্শন, লিপিপ্রেরণ, অন্নভিক্ষা, রাসলীলা, শঙ্খচূড়বধ, হোড়ীক্রীড়া ইত্যাদি লীলা বর্ণিত আছে। উত্তরচম্পূর প্রথম পূরণ হইতে শেষ পূরণ পর্য্যন্ত ব্রজানুরাগ, অক্রূরের ক্রূরতা, অধ্যয়ন, গুরুপুত্রদান, উদ্ধবসংবাদ, জরাসন্ধাদি-বধ, বলভদ্রবিবাহ, নরকবধ ও পারিজাতহরণাদি দ্বারকালীলা, ব্রজে আগমন, শ্রীরাধাদির বিবাহসূচনা, তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা, বিবাহনির্ব্বাহ, মিলন, সর্ব্বসুখসম্পদাবলোকন এবং সকলের গোলোকে প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সমস্তসিদ্ধান্ত পৌরাণিক বাক্যে সমর্থিত। এই মহাগ্রন্থের একমাত্র টীকা শব্দার্থবোধিকা। পূর্ব্বোক্ত পদ্যাবলীর টীকাকার ৺বীরচন্দ্র গোস্বামীই এই চম্পূর টীকা করেন, অন্য টীকার নাম শুনি নাই।

সঙ্কল্পকল্পদ্রুম—শ্রীজীবকৃত। এখানী গোপালচম্পূনামক বৃহৎ গ্রন্থের একপ্রকার অনুক্রমণিকা ও দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ। চম্পূর তুল্য ইহাতেও লীলা ও সিদ্ধান্ত দুইই আছে। মূল-স্বরূপ জন্মাদিলীলা, স্কন্ধস্বরূপ নিত্যলীলা, শাখাস্বরূপ সর্ব্বর্তুলীলা ও প্রেমরূপ ফলনিষ্পত্তিই ফল। এই কয়টি অংশ এবং সাকল্যে ৭২৮টি শ্লোক দৃষ্ট হয়। কল্পদ্রুমের নিকট যেমন সমস্ত প্রার্থনীয় লাভ হয়, সেইরূপ এই গ্রন্থে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সমস্ত তথ্যই সঙ্ক্ষেপে পাওয়া যায়, ইহাই গ্রন্থনামের সার্থকতা। ইহার দুইটী তথ্য এই—"রাধাদি কৃষ্ণপত্নীগণ কৃষ্ণের ন্যায় নিত্য, তাঁহাদের লীলাও নিত্য, কিন্তু অনুরাগবৃদ্ধির জন্য নিজ লীলাশক্তিবশতঃ এবং শক্তি শক্তিমানের বিকাশরূপ অর্থাৎ নিত্যপতি কৃষ্ণকে প্রথমে উপপতি বলিয়া অস্ফুটভাবে জানিলেও শেষে নিজপতিরূপেই জানিয়াছিলেন।" অর্থাৎ ঔপপত্য মায়িক, ইহা চম্পূতেও স্পষ্ট লিখিত আছে। অপিচ "বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, এই বীজাঙ্কুর প্রবাহ যেমন অনাদি ও নিত্য, সেইরূপ প্রকটলীলা হইতে নিত্যলীলা ও নিত্যলীলা হইতে প্রকটলীলা হয়।" তথা দুইটির শ্লোক এই :—

মূলং জন্মাদিলীলাস্তু স্কন্ধঃ স্যান্নিত্যলীলতা।
শাখাস্তত্তদৃতুশ্লোকাঃ ফলং প্রেমময়ী স্থিতিঃ॥ (১। ১১)
সাচ জন্মাদিকা সাচ নিত্যলীলা শ্রুতীরিতা।
মিথঃ পূর্ব্বা পরাচ স্যাদ্বীজবৃক্ষপ্রবাহবৎ॥ (৩। ১)

সমস্ত বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অতিসঙ্ক্ষেপে জানিবার পক্ষে গ্রন্থখানী অতিশয় উপযোগী।

মাধবমহোৎসব—এখানি শ্রীজীবকৃত মহাকাব্য। ইহাতে নানা ছন্দেব কবিতা আছে। পরিচ্ছেদের নাম উল্লাস। বৃন্দাবনে শ্রীরাধার ঔৎসুক্য এবং বসন্তকালের পুষ্পশোভিত কাননে শ্রীকৃষ্ণসমীপে শ্রীরাধার অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইলে এই উৎসব সম্পন্ন হয়, এই ব্যাপার শ্রীনন্দ ও যশোদার অভিপ্রেত। ইহার শ্লোকবিন্যাস ছন্দোবিন্যাস ও অন্যান্য পারিপাট্য মহাকাব্য হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে, তবে পরিচ্ছেদের নাম সর্গ নহে।

যোগসারস্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীর টীকা, শ্রীরাধাপাদচিহ্নের টীকা এবং ভাবার্থসূচক চম্পূ, এই গুলিও শ্রীজীবগোস্বামীর প্রণীত।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ—ইহার প্রণেতা শ্রীজীবগোস্বামী। পাণিনীয়, মুগ্ধবোধ সংক্ষিপ্তসার, কলাপ, সুপদ্ম, প্রয়োগরত্নমালা, চান্দ্র, লঘুকৌমুদী, প্রক্রিয়াকৌমুদী, সারস্বত ইত্যাদি সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের শেষ গ্রন্থ হরিনামামৃত। সুতরাং ইহাতে অধিকাংশ প্রাচীন ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লঘু ও বৃহৎ ভেদে দুইখানী। ইহাতে প্রচলিত পদ ব্যতীত অনেক অপ্রচলিত পদ সাধিত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামী বৃন্দাবনবাসী সংসারত্যাগী উদাসীন বৈষ্ণব, সুতরাং ব্যাকরণশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিযাজন হয় এই ভাবিয়া ব্যাকরণের সমস্ত সংজ্ঞা, উদাহরণ ও সূত্রগুলি ভগবন্নামাত্মক করিয়া সাহিত্যরাজ্যে এক নূতনত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—চটতকপ হরিকমল, অনুস্বার-বিষ্ণুচক্র, বিসর্গ-বিষ্ণুসর্গ, অর্দ্ধচন্দ্র-বিষ্ণুচাপ, হ্রস্ব বামন, দীর্ঘ-ত্রিবিক্রম। কার-শব্দে রাম, যেমন ককার স্থলে করাম। পদ—বিষ্ণুপদ, শ ষ স—হরিগোত্র। স্বর বর্ণ—সর্ব্বেশ্বর, করাদি ব্যঞ্জন-বর্ণ বিষ্ণুজন ইত্যাদি। গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থোপক্রম পাঠ করিলেই তাঁহার সঙ্কল্প বুঝা যায়—

"কৃষ্ণমুপাসিতুমস্থ স্রজমিব নামাবলীং তনবৈ।
ত্বরিতং বিতরেদেষা তৎসাহিত্যাদিজামোদং॥ ১॥
আহত জল্পিত-জটিতং, দৃষ্ট্বা শব্দানুশাসনস্তোমং।
হরিনামাবলীবলিতং, ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমারচিম্॥
ব্যাকরণে মরুনীবৃতি জীবনলুব্ধাঃ সদাঘসংবিগ্নাঃ।
হরিনামামৃতমেতৎ, পিবন্তু শতধাবগাহন্তাং॥
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যম্বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন উদ্দেশে মালার মত এই হরিনাম মালা গাঁথিলাম। ইহা সত্বরেই হরিসাহিত্যাদিজন্য আমোদ (আনন্দ বা সৌরভ) বিতরণ করিবে। অপরাপর কলাপাদি ব্যাকরণে অর্থশূন্য জল্পনা দেখিয়া বৈষ্ণবগণের জন্য এই হরিনামযুক্ত ব্যাকরণ রচনা করিলাম। জীবনলুব্ধ অর্থাৎ জলপানার্থী লোক মরুভূমিতে জলার্থ গমন করিলে জল প্রাপ্ত হয় না, অন্ততঃ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, সেইরূপ মানবজীবনের সাফল্যকামী লোক ব্যাকরণরূপ মরুভূমিতে না গিয়া এই হরিনামসুধার পান ও তাহাতে যথেচ্ছ অবগাহন করুন। সঙ্কেত, পরিহাস গীতালাপ অথবা অবহেলা পূর্ব্বক ও বিষ্ণুনাম গ্রহণ করিলে তাহার অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়।

গ্রন্থকর্ত্তার এই সঙ্কল্প সত্য। বৈষ্ণবের প্রিয় এমন ব্যাকরণ আর নাই। দুঃখের বিষয় এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাকরণ বঙ্গদেশে নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, পশ্চিমে বৃন্দাবন ব্যতীত কোথাও পঠিত হয় না। সেই স্থানেও দুই চারিটি উদাসীন জ্ঞানার্থী বৈষ্ণব ব্যতীত কাহাকেও পড়িতে দেখা যায় না।

এই গ্রন্থে পাণিনীয়ের মহাভাষ্য (ফণিভাষ্য), সিদ্ধান্তকৌমুদী, কাশিকা, ব্যাড়ি, গালব প্রভৃতি বহুতর প্রাচীনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের চলিত ব্যাকরণে যে সকল পদ উপেক্ষিত হইয়াছে তাহাও বহুতর এই গ্রন্থে দেখা যায়—যেমন "ত্রিয়ম্বক,ভুবাদি" ইত্যাদি। ইনি উক্তবিধ পদও "ব্যাড়িগালবয়োর্মতে মধ্যএব যবরলা ভবন্তি" ইত্যাদি রূপে সাধন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মুগ্ধবোধের "লেলস্তোঃ" সূত্রে ল-কার পরে থাকিলে ত-বর্গ স্থানে ল হয়। কিন্তু "তল্লয়ঃ, বিদ্বাঁল্লিখতি" উদাহরণে ত,দ,ন স্থানে ল ব্যতীত থ, ধ এই দুই বর্ণের উদাহরণ পাওয়া যায় না। "তরামঃ দরামঃ নরামশ্চ লরামে পরে লরাম এব স্যাৎ" বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণকৌমুদীতে অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীরূপকৃত বাখ্যান চন্দ্রিকা, শ্রীজীবকৃত সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ গ্রন্থও ব্যাকরণাংশ বলিয়াই উল্লেখযোগ্য। হরিনামামৃতের প্রণালীতে অন্য বৈষ্ণবব্যাকরণ দেখা যায় না। ৺গোবিন্দকান্তবিদ্যাভূষণনামক জনৈক ইদানীন্তন পণ্ডিত "গোবিন্দনামামৃত" নামে একখানা অতিক্ষুদ্র ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে ওরূপ সঙ্কেত নাই, তবে কৃষ্ণাদিনামের উদাহরণ আছে মাত্র। এই বিদ্যাভূষণ স্বর্গীয় ৺রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের কালে কাশীম্বাজারস্থ ৺মহারাণী স্বর্ণময়ীর সভাসদ্ ছিলেন।

স্তবাবলী—ইহার প্রণেতা শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়মধ্যে ইনিই কঠোরবৈরাগ্যসম্পন্ন ও প্রাচীন সাধক। সেই সাধনার ফল স্তবাবলী। হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান ত্রিশবিঘা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট সরস্বতী নদীতীরে কৃষ্ণপুর গ্রামে কায়স্থ-কুলপ্রদীপ নবাবী আমলের প্রসিদ্ধ বিপুল ধনী গোবর্দ্ধনমজুমদারের ঔরসে ১৪১৯ কোন মতে ১৪১৮ শাকে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"রঘুনাথের বৈরাগ্য হয় পাষাণের রেখা" সত্য সত্যই বৈষ্ণবরাজ্যে এমন কঠোরব্রতী দেখা যায় না। স্তবাবলী গ্রন্থে ২৯টী বিভিন্ন ভাবের স্তব আছে। তন্মধ্যে মনঃশিক্ষা, চৈতন্যাষ্টক, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, প্রেমাম্ভোজমরন্দ (স্তবরাজ), এই কয়টী সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্তবাবলীর টীকাকার বঙ্কবিহারি বিদ্যালঙ্কার। কাঞ্চনগড়িয়ানিবাসী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রাধাবল্লভ দাস (মণ্ডল) উক্ত বিলাপকুসুমাঞ্জলীর বঙ্গানুবাদ করেন। রঘুনাথ প্রথমে নীলাচলে এবং শেষ বয়সে বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনে বাস করিয়া সাধনসিদ্ধ অবস্থাতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পাঠ করিয়া বোধ হয় যেন বর্ণনীয় বিষয় গুলি স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন।

"শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ।
নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি।
মহাভাবোজ্জ্বলচ্চিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তনসুপ্রভাং॥
কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং॥"

ইত্যাদি পদ্যগুলি অশেষভাবব্যঞ্জক। ইহার রচনাতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ভাবেরই আধিক্য।

মহাপ্রভুর অসাধারণ দয়া লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি॥"

মহাসিদ্ধ রঘুনাথ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি কর্ম্মদ্বারা ব্যাকুলচিত্ত বৈষ্ণবগণের জন্য নিজ মনকে লক্ষ্য করিয়া গৌরাঙ্গও গুরুবিষয়ে উপদেশ দিতেছেন—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে, গুরুবরং-
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে, স্মর পরমজস্রং নন্বু মনঃ॥"

ভগবৎপ্রেমপিপাসু সাধকের মন কেমন হওয়া উচিত, তাহাও বলিতেছেন—

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥"

মুক্তাচরিত্র—এখানী শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত গদ্যকাব্য। শ্রীল সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের আদেশে লিখিত। গদ্যের অনেক প্রভেদ থাকিলেও এই খানীকে "কথা" বলা অযৌক্তিক নহে। ইহাতে কথার লক্ষণ প্রায়ই লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ গ্রন্থকর্ত্তাও গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন:—

"যস্য সঙ্গবলতোঽদ্ভুতা ময়া, মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতের্ব্রজে, সঙ্গতির্ভবতু জন্মজন্মনি॥"

এই গ্রন্থের প্রধান বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোত্রী সত্যভামা দেবী। অবান্তর বক্তা ও শ্রোতা অনেক। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তারোপণসম্বন্ধীয় যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, দ্বারকাতে সত্যভামার প্রশ্নানুসারে তাহাই বর্ণন করেন। বৃন্দাবনের মুক্তারোপণলীলা এইরূপ:—একদা কার্ত্তিক মাসে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে দীপোৎসব হয়, তৎপূর্ব্বে নানা লোকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত হয়, কিন্তু গোপগণ গবাদি পশুবর্গের ভূষণার্থ বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ জননীর কাছে কতিপয় মুক্তা লইয়া যমুনার ঘাটের নিকটে গভীর গর্ত্তে বপন ও দুগ্ধদ্বারা সেচন করেন, পরে চতুর্থ দিনেই অঙ্কুর ও অনতিবিলম্বে মুক্তালতা এবং কতিপয় দিনে প্রসিদ্ধ অষ্টবিধ মুক্তা হইতেও অন্যরূপ মুক্তাফল উৎপন্ন হয়। ইহার পর অন্য ব্রজবাসিকর্ত্তৃক মুক্তোৎপাদনের চেষ্টা, মুক্তার

আদান প্রদান, বেশভূষা, তৎসম্বন্ধে জয় পরাজয়, মুক্তাসম্বন্ধীয় ইত্যাদি অনেক ব্যাপারই এই মুক্তাচরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যা অল্প, গদ্যই অধিক। ইহার দুইটি গদ্য পদ্য উদ্ধৃত করা গেল :—

"ভো সখ্যঃ ভদ্রেণ জ্ঞাতং, অস্মাভং কৃষ্ণো মৌক্তিকানি সর্ব্বথৈব ন দাস্যত্যেব, ভবতু তৎকৃতমৌক্তিককৃষিপ্রক্রিয়াস্মাভির্ন দৃষ্টাস্তীতি ন স্যাৎ, তত্রানধ্যবসায়ং তক্ত্বা তদ্বিগুণিকায়াঃ কেদারিকায়া আরম্ভঃ কথং ন ক্রিয়তে ?"

"স্বপত্নীনাসানাং সততমভিতাপং জনয়তাং
সুহৃচ্ছে্ণীনাসাপ্রমদমনুবেলং রচয়তাং।
বপুঃ সৌরভ্যাণাং পরিমিলিতসর্ব্বব্রজভুবাং
নিকামং কাশ্মীরব্রজকমলগর্ভা বররুচঃ॥" ইত্যাদি।

দীনেশবাবু, মহাভাবুক ও লীলাস্মরণসিদ্ধ দাসগোস্বামির হংসদূতনামে একখানী গ্রন্থের উল্লেখ করেন, বস্তুতঃ স্তবাবলীতে যে ভাবের বর্ণনা আছে, দূতকাব্য তাহার বিপরীত বিপ্রলম্ভ রসের এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহার কোন উল্লেখ না করায়, তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না।

জগন্নাথবল্লভ—এখানী নাটকশাস্ত্র,প্রণেতা শ্রীরামানন্দ রায়। ইনি দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরস্থ বিদ্যানগরবাসী রাজা ভবানন্দরায়ের পুত্র, মহাপ্রভুর সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের অগ্রণী ও ভক্তিশাস্ত্রে মহাপ্রবীণ। এক সময়ে মহাপ্রভু ইহার রসসিদ্ধান্তের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে গুরু বলিয়াও ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিল দুর্লভ জ্ঞান করি॥" (বৈষ্ণববন্দনা)

ইনি জগন্নাথের রাজা প্রতাপরুদ্রের মহামন্ত্রী হইয়া শ্রীক্ষেত্রেও বাস করিতেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছামত দেবদাসী নামক বেশ্যাদ্বারা এই নাটক অভিনীত হইত। রাধা ও ললিতাদি স্ত্রীপাঠ্য অংশ পুরুষের মুখে প্রকৃত হয় না-এজন্য স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। অভিনয়কালে অভিনেত্রীদিগকে রামানন্দ সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেয়সীরূপে চিন্তা করিতেন এবং তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা অতি নির্ব্বিকার ও ভক্তিভাবে সম্পাদন করিতেন। এই তাৎপর্য্য বোধ না থাকায় ইহাতে অনেক অশ্লীল মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অঙ্ক পাঁচটী। তাহাতে পূর্ব্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, ভাবপ্রকাশ, রাধাভিসার ও রাধামিলন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অনেকাংশ কীর্ত্তনিয়াগণ গান করিয়া থাকেন। ১ম শ্লোক এই—

"স্বরাঙ্কিতবিপঞ্চিকামুরজবেণুসঙ্গীতকং
ত্রিভঙ্গতনুবল্লরীবলিতবক্তহাসোল্বণং।
বয়স্যকরতালিকারণিতনূপুরৈরুজ্জ্বলং
মুরারিনটনং সদা দিশতু শর্ম্ম লোকত্রয়ে॥"

শেষ গদ্য এই—

"শ্রদ্ধাবদ্ধমতির্ম্ম প্রতিদিনং গোপাললীলস্তু যঃ
সংসেবেত রহস্যমেতদতুলং লীলামৃতং লোলধীঃ।
তস্মিন্ সদ্গতমানসে কিল কৃপাদৃষ্ট্যা ভবত্যা সদা
ভাব্যং যেন নিজেপ্সিতাং ব্রজজনে সিদ্ধিং সমাপ্নোতি সঃ॥"

ইহার প্রতি গীতের শেষে—"জনয়তু রুদ্রগজাধিপমুদিতং, রামানন্দরায়কবিভণিতং" এইরূপে গজপতি প্রতাপরুদ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনি মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বৎসর ১৪৫৬ শাকে ইহাঁরও অন্তর্ধান হয়।

নদিয়াবাসী পুরুষোত্তম পণ্ডিতের শেষ নাম স্বরূপগোস্বামী, ইনি মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। এক কড়চা ভিন্ন ইহার কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, সেই কড়চাও আবার দুর্লভ, কদাচিৎ কোন পণ্ডিতবৈষ্ণবের ঘরে কিয়দংশ দৃষ্ট হয়, তবে কৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের প্রথম তত্ত্ববিচার ঐ কড়চা হইতেই সূচনা করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" হইতে ৯টী শ্লোক স্বরূপগোস্বামীর কড়চা হইতে অবিকল উদ্ধৃত। গোচরার্থে ঐটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল :—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥"

তৎপরে—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবা...। সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী...। মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে...। মায়াভর্ত্তাজাণ্ড ··। যস্যাংশাংশ ·· ইত্যাদি শ্লোক আছে।

চৈতন্যশতক—বাসুদেবসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃত একশত শ্লোকে মহাপ্রভুর স্তব। এখানি প্রামাণিক ও ইতিহাসসিদ্ধ গ্রন্থ। অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইনি আদিশূর সমানীত পঞ্চব্রাহ্মণের, অন্যতম শ্রীহর্ষবংশীয় গঙ্গানন্দ বা মহেশ্বরবিশারদের পুত্র। নবদ্বীপসন্নিহিত বিদ্যানগরে ইহার বাস ছিল, নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের প্রাচীন টোল স্থাপয়িতা। ইহার পূর্ব্বে রামভদ্র ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নামক দুই জন অধ্যাপক ছিলেন। বাসুদেব পিতার সহাধ্যায়ি-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর খুড়া ও বাল্যকালের গুরু, ৩০। ৪০ বর্ষের জ্যেষ্ঠ। শেষজীবনে নীলাচলে গিয়া রাজাশ্রয়ে টোল করিয়া বেদান্তপ্রচার করেন। মহাপ্রভুকে বেদান্তমতে শিক্ষা দিতে গিয়া শেষে ভক্তিরসে গলিয়া যান ও প্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া স্তব করেন, সেই স্তবই চৈতন্যশতক। শ্রীহর্ষবংশীয় ও বাঙ্গলার প্রাচীন কবি কীর্ত্তিবাস বাসুদেবের ঊর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষ। (ইহার জীবনী অতি বৃহৎ, সংস্কৃত বৈষ্ণবজীবনীতে বিবৃত আছে)।

চৈতন্যচরিতামৃত—এখানি কর্ণপূরকৃত সংস্কৃত মহাকাব্য। ২০ সর্গে বিভক্ত। প্রভুর

বাল্য হইতে শেষ লীলা পর্য্যন্ত ইহার বর্ণনীয়। লীলার সূত্র, নবদ্বীপ শ্রীবাস জগন্নাথও দেশ কালের অবস্থা, বিবাহ, নবদ্বীপের প্রাচীন অবস্থা, সন্ন্যাসের পূর্ব্বভাব, নীলাচলবাস, তীর্থভ্রমণ, রামানন্দরায়সম্মীলন, রাধাভাবে প্রলাপ, নৌকাবিহার ইত্যাদি বিষয় ইহাতে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। গৌরগণোদ্দেশের প্রথম পদ্যই ইহারও প্রথম পদ্য। ১৪৬৪ শাকে প্রভুর তিরোভাবের ৯ বৎসর পর, আষাঢ় সোমবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া তিথিমধ্যে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। অন্য গ্রন্থকার অপেক্ষা ইনি গ্রন্থসমাপ্তির কালনির্দ্দেশে বেশ পটু। বৈষ্ণবসাহিত্য জগতে মহাকাব্য এই দ্বিতীয়। ইহাতে বিবিধ রস, ভাব, অলঙ্কার ও ছন্দের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। শিশুপালবধ ও কিরাতার্জ্জুনীয়ের মত ইহাতেও শব্দালঙ্কার ও চিত্রকাব্য প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম সর্গের ১৫। ১৬ শ্লোকে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"প্রভুর বিরহে হৃদয়ে বল নাই, প্রাণ বহির্গত প্রায়, ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে, কি লিখিব, তবু প্রাণ মানেনা, প্রভো দীনবন্ধো বল দাও, তোমার কথা তুমি লেখাইয়া লও।" ছন্দোমঞ্জরীর উপজাতি প্রকরণে টীকার ব্যাখ্যাতে ন্যূনাধিক বর্ণেও যে উপজাতি প্রমাণিত হয়, তাহার উদাহরণ কালিদাসের ঋতুসংহারের হেমন্তবর্ণনে প্রথম শ্লোকে, মৃচ্ছকটিকের ৩অঙ্কে ৭শ্লোকে, গোবিন্দলীলামৃতের ১০ম, ৮০শ্লোকে আর এই মহাকাব্যের ১৩ সর্গে ৯৯ শ্লোকে দৃষ্ট হয়। মুরারিগুপ্তকৃত চৈতন্যচরিত কাব্য এই মহাকাব্যের আদর্শ।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—কর্ণপূরের একখানি নাটক, ১০ অঙ্কে বিভক্ত। মহাপ্রভুর মধুর চরিত্র ইহার বর্ণনীয়। প্রথম হইতে ১০ অঙ্কে যথাক্রমে স্বানন্দাবেশ, সর্ব্বাবতারদর্শন, দানবিনোদ, সন্ন্যাসপরিগ্রহ, অদ্বৈতপুরবিলাস, সার্ব্বভৌমানুগ্রহ, তীর্থাটন, প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ, মথুরাগমন এবং মহামহোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। ১৪৯৪ শাকে এই নাটকলেখন সম্পূর্ণ হয়। সার্ব্বভৌমানুগ্রহ নামক ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিচারপ্রসঙ্গে সমস্ত মাধবদর্শনের মত প্রদর্শিত হইয়াছে। অথচ তাহা দার্শনিক গ্রন্থের মত নীরস নহে। ইহার অধিক রচনা প্রসাদগুণযুক্ত, শ্রুতমাত্রে অর্থ বোধ হয়। মহাপ্রভুর ভক্তগণ ব্যতীত, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের মত ইহাতেও প্রেম, মৈত্রী বিরাগ, ভক্তি ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ভাবকেও নট নটীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। নাটকখানি ভক্তিরসপ্রধান। নিত্যানন্দ বৃন্দাবনগমনোদ্যত মহাপ্রভুকে ছল করিয়া শান্তিপুরে লইয়া যাইতেছেন এবং ভাবোন্মত্ত প্রভুকে গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া দেখাইয়া দিলে প্রভু যমুনাকে স্তব ও প্রণাম করিতেছেন—

"চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ, পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী, পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে ভক্তির পরতমত্ব দেখাইয়া বলিতেছেন—

"শাস্ত্রং নানামতমপি তথা কল্পিতং স্বস্বরুচ্যা
নোচেত্তেষাং কথমিব মিথঃ খণ্ডনে পণ্ডিতত্বং।
তত্রোদ্দেশ্যং কিমপি পরমং ভক্তিযোগো মুরারে-
র্নিষ্কামো যঃ সহি ভগবতোঽনুগ্রহেণৈব লভ্যঃ॥"

কুলনগর নিবাসী পুরুষোত্তম (শেষ নাম প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ) এই নাটকের বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন। অনুবাদের সময় ১৬৩৪ শাক। এই অনুবাদে প্রেমদাসের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—কর্ণপুরকৃত গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। ইহাতে ভাগবতীয় দশমস্কন্ধের বর্ণিত কৃষ্ণলীলা মধ্যে কেবল ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতেও গোপালচম্পূর মত অনুপ্রাসের আধিক্য আছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার সুখবর্ত্তিনী নামে টীকা করেন। ইহার মঙ্গলাচরণ ও মুখবন্ধ অতি হৃদয়স্পর্শী। প্রথম হইতে ১৬ শ্লোকে কৃষ্ণপাদপদ্ম, মহাপ্রভু, তদীয় ভক্তগণ, শ্রীনাথনামক গুরু এবং সরস্বতীর বন্দনা আছে। তন্মধ্যে দুইটি উদ্ধৃত হইল—

"তব স্তবং কিং করবাণি বাণি, প্রাণী ন বক্তুং ক্ষমতে তদীহাং।
যতো নিবদ্ধৈব তনোষি মানং, তমন্যথা সন্তমপি ক্ষিণোষি॥

নমস্যামোঽস্যৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানঃ প্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেঽগ্রী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ॥"

গ্রন্থকর্ত্তা "দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতন্যরূপো হরিঃ" এই কথাদ্বারা মহাপ্রভুকে কুলদেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কাদম্বরীর মত ইহাতেও সজ্জনস্তুতি, দুর্জ্জননিন্দা বর্ণিত আছে। ইনি বলিয়াছেন—"নিজ আত্মা সকলেরই প্রিয়, এজন্য নিজকাব্যে কাহারও দোষদৃষ্টি হয় না, কারণ প্রদীপে সমস্ত অন্ধকার দূর করিলেও নিজের মূলদেশের অন্ধকার দূর করিতে পারে না। কিন্তু সাধু কবিগণ স্বচরিত্র নির্ম্মল হইলেও তাহার দোষই প্রথমে প্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ অগ্নি নিজতেজে উজ্জ্বল হইলেও প্রথমে ধূমোদ্গিরণ করিয়া থাকে। যেমন গঙ্গা যমুনাদি পুণ্যনদীতে অবগাহন না করিলেও দৃষ্টিমাত্র পবিত্র করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্থ ও অলঙ্কারাদি পর্য্যালোচনা না করিলেও সুকবির বাক্যে আহ্লাদিত করিয়া থাকে। পুষ্প যেমনই হউক গুম্ফনকৌশলে তাহা বিচিত্র হইয়া থাকে, আবার সেই পুষ্প যদি সৌরভযুক্ত হয় তবে মালা যে রমণীয় হইবে তাহার আর বক্তব্য কি।" এইরূপ ভঙ্গীতে গ্রন্থকার কিঞ্চিৎ স্বগৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরিচ্ছেদের নাম স্তবক। ভগবানের স্থানতত্ত্ব, প্রাদুর্ভাবলীলাবিস্তার, পূতনাবধ, শকট তৃণাবর্ত্তবধ, মৃত্তিকাভক্ষণ, যমলার্জ্জুনভঙ্গ, বৎসবকাদিবধ ও ব্রহ্মমোহন ইত্যাদিরূপে প্রতিস্তবকে সমস্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের ব্যাখ্যাতৃবর্গ এই আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও শ্রীজীবকৃত গোপালচম্পূ লইয়াই ব্যাখ্যামাধুর্য্য প্রকটন করিয়া থাকেন।

সাহিত্যের ভূষণ বা সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যকারী অলঙ্কারগ্রন্থেও বৈষ্ণবগণ পশ্চাৎপদ হন নাই। সে বিষয়ে অলঙ্কারকৌস্তুভের নাম উল্লেখযোগ্য। কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামে শিবানন্দ সেনের বাস, জাতি বৈদ্য, ইনি মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে প্রতিবর্ষে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া তদানীন্তন দুর্গম পথে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে

লইয়া যাইতেন। ১৪৩৬ শকাব্দের পর ১৪৫৪ পর্য্যন্ত ১৮ বৎসর প্রভুর নীলাচল বাস, তন্মধ্যে প্রথম ৬ বৎসর মধ্যে মধ্যে গৌড়দেশে আগমন করিতেন। শেষ ১২ বৎসর প্রভুর সর্ব্বদা ভাবোন্মাদ হইত, স্থানান্তরে যাইতে পারিতেন না, দেহস্মৃতিপর্য্যন্ত থাকিত না, স্বরূপ ও রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া দেহরক্ষা করিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর। কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥" বাহ্যে সংসারী অথচ মনে উদাসীন এমত শিবানন্দ প্রভৃতি কয়টী ভক্ত প্রতিবর্ষে রথযাত্রাদর্শনপ্রসঙ্গে প্রভুর তত্ত্ব লইতে যাইতেন, একবার পঞ্চমবর্ষীয় কর্ণপূরকে লইয়া গিয়াছিলেন, অনেকে ইহাও বলেন যে, ইঁহার জননীর গর্ভসঞ্চার পুরীতে হয়। বালকটী শৈশবে মহাপ্রভুর অঙ্গুষ্ঠচুম্বন করিতেন, পরে ঐ বালক ৭ম বৎসর বয়সে প্রভুর আদেশে একটী কৃষ্ণগুণ বর্ণনময় শ্লোক উচ্চারণ করিলে প্রভু "পুরীদাস" ও "কবিকর্ণপূর" নাম প্রদান করেন। ইহার পিতৃদত্ত নাম "পরমানন্দ দাস"। বোম্বে মুদ্রিত অলঙ্কারকৌস্তুভ নামে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতকৃত একখানী অলঙ্কার গ্রন্থ আছে, তাহা পৃথক্, তাহার সঙ্গে আমাদের কবিমুকুটমণি কর্ণপূরের গ্রন্থের সাদৃশ্য হইতে পারে না।

কর্ণপূরের অলঙ্কারকৌস্তুভ সাহিত্যজগতের উজ্জ্বলরত্ন। ইহাতে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সমস্ত বিষয় অর্থাৎ বাক্য, কাব্য, অভিধা ব্যঞ্জনাদি শব্দশক্তি, ধ্বনি, রস, নাট্যাঙ্গ, দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকটন করিয়াছেন। ইহাতে দশটি পরিচ্ছেদ বা কিরণ আছে। তাহাতে সাঙ্গোপাঙ্গ ও উদাহরণ সহিত ঐ দশটি বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন। ১৪৩৬ শকাব্দে কর্ণপূরের জন্ম। ১৪৯৮ শকাব্দে গৌরগণোদ্দেশের রচনা হয়। সুতরাং ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব সময় কৌস্তুভরচনার কাল বলিয়া জানা যায়।

ইনি যে ভাবে গ্রন্থের সূচনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যদর্পণের মত বিখ্যাত ও মহোপকারক অলঙ্কার গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না। প্রথমে নিজাভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বন্দনা করিয়া ব্যঞ্জনা বৃত্তি ও "ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্ম্মুরারাতেঃ" এই রূপ কথায় শ্লেষে গোপীগণের নয়নাঞ্জনের ন্যায় ব্যঞ্জনা বৃত্তি এবং পদ পদার্থের অতিরিক্ত ধ্বনি নামক শব্দশক্তি বিশেষকে মুরারির মুরলীধ্বনির সঙ্গে উপমিত করিয়াছেন। বিশেষ এই যে—ধ্বনির্নাদব্রহ্ম। তদুক্তং—

মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধস্তস্মাদ্ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ॥

এই যোগশাস্ত্রোক্ত বচন দ্বারা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী নামক শব্দের মূলাবস্থার প্রকটন করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকার্থ এই :—

"নাদ প্রথমতঃ মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া পরা নাম প্রাপ্ত হয়, পরে ক্রমশঃ হৃদয়-গত হইয়া পশ্যন্তী নামে, বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মধ্যমা নামে, এবং কণ্ঠগত হইয়া বৈখরী নামে অভিহিত

হয়। রোদনপ্রবৃত্ত জন্তুর অর্থাৎ বালকের নাসামধ্যস্থিত ও সুষুম্না নাড়ী দ্বারা বদ্ধ হইয়া ঐ নাদ অনুভূত হয়। এইরূপে পবনপ্রেরিত হইয়া বর্ণসমূহ সাধারণের প্রত্যক্ষ বিষয় হইয়া থাকে।"

ইত্যাদি শব্দোৎপত্তির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল সুন্দর পর পর ভাবে বুঝাইয়া শব্দোচিত ধ্বনি, ভাব ও তদাত্মক কার্য্যস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখানি সকলের শেষ অলঙ্কার গ্রন্থ বলিয়া ইহাতে অলঙ্কারোক্ত কোন বিষয়েরই অভাব নাই। এক কথায় মহাকবি কর্ণপূরের অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—কবিকর্ণপূর কৃত। ইহাতে কৃষ্ণাবতারের ভক্তগণমধ্যে কলিযুগে গৌরাবতারে কে কোন্ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাই বর্ণিত আছে। ইহাতে ১১৫টি শ্লোক আছে। উপাসনাতত্ত্বে বৈষ্ণবগণের বিশেষ উপযোগী। ইহার প্রথম শ্লোক এই—

"যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো-
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্ দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥"

প্রবাদ আছে যে এই শ্লোকটী কর্ণপূরের স্বকৃত নহে। শেষ শ্লোক এই—

"শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমগ্নচিত্তৈঃ
শোধ্যঃ সমাকলিতগৌরগণাখ্য এষঃ॥"

শেষ শ্লোকে জানা যায় যে গ্রন্থখানী ১৪৯৮ শকাব্দে লিখিত হয়। কর্ণপূরেরই প্রণীত আর একখানী বৃহৎ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা আছে

শ্যামদাসপ্রণীত অদ্বৈতমঙ্গল, অদ্বৈতশিষ্য ঈশাননাগর কৃত অদ্বৈতপ্রকাশ, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসপ্রণীত অদ্বৈতবাল্যলীলাসূত্র এই কয়খানী বাঙ্গলা পদ্যে লিখিত ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈষ্ণববন্দনা—দেবকীনন্দনদাসকৃত স্তোত্রগ্রন্থ। চিরদিন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সায়ম্প্রাতঃ পঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে মহাপ্রভুর প্রায় তাবৎ ভক্তের নাম, স্থলবিশেষে ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদর্শিত আছে। এখানীকে একরূপ বৈষ্ণবাভিধান বলিলেও চলে। এই দেবকীনন্দন প্রথমে বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন, বৈষ্ণবনিন্দাই তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। শেষে তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বৈষ্ণববন্দনা রচনা করিতে আদিষ্ট হন। এবং বৈষ্ণববন্দনা লিখিয়া উক্ত মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন।

চৈতন্যভাগবত।—ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের রচিত। সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাসের মত ইনি মহাপ্রভুর বরপুত্র। ১৪২৯ শাকে ইঁহার জন্ম অনুমিত হয়। জন্মস্থান হালিসহরের নিকট কুমারহট্ট, মতান্তরে নবদ্বীপ। মাতার নাম নারায়ণী। জাতি ব্রাহ্মণ। রাঢ়দেশে বর্দ্ধমানের দেনুড় গ্রামে বাস করেন। কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর ও কাশীরামদাসের পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাস বাঙ্গলাতে চৈতন্যভাগবত লিখিয়া বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস, লোচন দাস প্রভৃতির চৈতন্যলীলার গ্রন্থাবলীর ইহাই আদর্শ। বাঙ্গলা ভাষায় ইহাই দ্বিতীয় সুবৃহৎ পদ্য গ্রন্থ। কেবল মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, মনসার গান ও সীতামাহাত্ম্য ইহার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব বলিয়া মহিমা ঘোষণা করেন। এই গ্রন্থ প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল নামে খ্যাত ছিল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইলে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ দ্বারা "চৈতন্যভাগবত" এই নামান্তর হয়। ১৪৯৭ শাকে এই গ্রন্থের সমাপ্তি। প্রভুর অন্তর্দ্ধানের ১৫। ১৬ বৎসর পর আরম্ভ। অনেক কথাই লোক পরম্পরায় শুনিয়া লিখিত হইয়াছে। "বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে। তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।" গৌরলীলা জানিতে হইলে এই গ্রন্থই প্রথমপাঠ্য। ইহার রচনা খুব প্রাঞ্জল।

"পক্ষী যৈছে আকাশের শেষ নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে তত দূরে উড়ি যায়॥
এইমত চৈতন্যকথার অন্ত নাই।
যার যত শক্তি সবে তত তত গায়॥"

মহাপ্রভুর তীর্থভ্রমণপ্রসঙ্গে ভৌগলিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইহাতে সিদ্ধান্তাংশের ছায়া মাত্র আছে, লীলাংশই প্রধান। এজন্য সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গানের গ্রন্থ মধ্যেও ইঁহার রচিত গান দেখা যায়। আদি, মধ্য, অন্ত ভেদে প্রভুর তিন লীলা ইহাতে বর্ণিত। শ্লোক অতি অল্পমাত্র। আদিতে ১৫টী, মধ্যে ২৭টী, অন্তে ১০টী অধ্যায় আছে। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন চৈতন্যভাগবত নামসম্বন্ধে এবং তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে অনেক কল্পিত কথা লিখিয়াছেন, বস্তুতঃ ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ দেখিলে তাহা তিনি কখনও লিখিতেন না। তৎকালে সেগুলি দেখারও তাঁহার সুবিধা ছিল না। কেবল ইহাই নহে, রূপ, সনাতন ও জীব সম্বন্ধেও অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তত্ত্ববিলাস, গোপিকামোহন কাব্য, নিত্যানন্দবংশমালা, বৈষ্ণববন্দনা (অন্য), এই চারিখানি পুস্তক ঠাকুর বৃন্দাবনের বলিয়া প্রখ্যাত আছে।

চৈতন্যমঙ্গল—ঠাকুর ত্রিলোচন বা লোচনানন্দ দাস বিরচিত। বর্দ্ধমানান্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকট কুনুর নদীর তীরে কোগ্রামে বৈদ্যজাতি কমলাকর দাসের ঔরসে সদানন্দীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহের বাস ও পিতৃবাস এক গ্রামে বলিয়া বাল্যে খুব আদুরে বালক ছিলেন। লোচন নিজের মূর্খতা প্রকাশ করিলেও ইনি যে পণ্ডিত তাহা জগন্নাথবল্লভের সংস্কৃত গীত ভাঙ্গিয়া বাঙ্গলা গীত করাতে সম্পূর্ণ বোধ হয়। বাঁশের

কলমে তেড়েট পাতে প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ইহারও আদি, মধ্য, অন্ত তিন খণ্ড। মধ্যে মধ্যে অনেক গান আছে। প্রথম সূত্রখণ্ডে গৌরাবতারের উদ্দেশ্য দেখাইয়া আদি খণ্ড হইতে কথারম্ভ করিয়াছেন। গৌরপ্রিয়া লক্ষ্মীর পূর্ব্বজন্ম, মুরারিমিশ্রের রামাষ্টক, তীর্থভ্রমণে পুরাকথা, জগন্নাথাঙ্গে প্রভুর প্রবেশ, খণ্ডবাসী নরহরির বিবরণ ইত্যাদি অনেক কথা ইহাতে পাওয়া যায়, তাহা অপরে উল্লেখ করেন নাই। ইঁহার রচনা অতি সরল। চৈতন্যমঙ্গল পাঁচালী প্রবন্ধ বলিয়া উল্লেখ আছে। অতি সরল পঞ্চালী রীতিতে বর্ণিত বলিয়া পাঁচালী নাম সার্থক হয়। মহাপ্রভু ও গণেশ দুর্গাদিকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। লোচনের চনা অধিকাংশ হাস্যজনক ও কৌতূহলোদ্দীপক। লোচনের ধামালী নামক পদাবলী পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। যথা—

শ্রীরাধা উরোজের নখাঘাতরূপ কৃষ্ণসম্ভোগ গোপন করিতে গিয়া শাশুড়ীকে বলিতেছেন—"সাঁজ দিলাম, শলিতা দিলাম, গোহালে দিলাম বাতি, তোমার ঘরের চোরা বাছুর বুকে মারিল লাথি। বুক্ বুক বলে আমি প'লাম ক্ষিতিতলে, এমন কেহ ব্যথিত নাই যে হাতে ধ'রে তোলে। লোচন বলে ওলো দিদি আমি তখন কোথা, শাশুড়ী ভুলাইতে তুমি এত জান কথা"।

ইত্যাদি কবিতা দেখিয়া লোকে ব্রজের রসিকা বড়াইবুড়ীর অবতার বলিয়া লোচনদাসকে বর্ণনা করেন। রচনার সারল্য ও রহস্যাংশে ইহার অনেক গৌরব। এছাড় রায় রামানন্দ কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটকের পদ্যানুবাদ এবং প্রেমবিলাস (অন্য), দুর্লভসার, দেহ নিরূপণ, আনন্দলতিকা ও প্রার্থনা নামে কয়খানি গ্রন্থ লোচনদাসের প্রণীত। দুলভসারে চৈতন্যলীলা ও রসতত্ত্বের বর্ণনা আছে। আরও লোচনকৃত অনেক পদাবলী আছে, তাহা নানাবিধ পদগ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

গোবিন্দলীলামৃত।—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত মহাকাব্য, ২৩ সর্গে বিভক্ত। জরাতুর কৃষ্ণদাস ১৫০৩ শাকে চৈতন্যচরিতামৃত শেষ করিয়া ১৫০৪ শাকে লোকান্তর প্রাপ্ত হন, সুতরাং গোবিন্দলীলামৃত ইহার পূর্ব্বের গ্রন্থ বলিয়াই স্থির করা যায়। শ্লোক সংখ্যা ২৪৮৯, বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী নামক পণ্ডিত ইহার টীকা করেন; টীকার নাম সদানন্দ বিধায়িনী। টীকারচনার শেষকাল ১৭১২ শাক, অগ্রহায়ণ, সোমবার পূর্ণিমা তিথি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই মহাকাব্যকে রূপগোস্বামীর সেবার ফল, রঘুনাথদাস গোস্বামীর আদিষ্ট, জীবগোস্বামীর সঙ্গগুণে এবং রঘুনাথ ভট্ট হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রত্যেকসর্গের শেষে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ শ্লোক একটী দেওয়া গেল।—

"শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপশ্রীরূপসেবাফলে
দিষ্টে শ্রীরঘুনাথদাসকৃতিনা শ্রীজীবসঙ্গোদ্গতে।
কাব্যে শ্রীরঘুনাথভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে
সর্গঃ সপ্তম এব সুষ্ঠু নিরগাৎ পূর্ব্বাহ্নলীলাময়ঃ॥"

বস্তুতঃ ইহা গুরুজনের সম্মান ও তাঁহাদের কৃপার মহিমার ঘোষণামাত্র। শ্রীহর্ষকৃত নৈষধচরিতের মত ইনি সর্গশেষটী পুষ্পিকা অর্থাৎ "ইতি অমুক" ইত্যাকার কথায় শেষ না করিয়া এক একটী শ্লোকদ্বারা সর্গ শেষ করিয়াছেন। এই মহাকবি প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত্র, নিশান্ত এই অষ্টকালীয় কৃষ্ণলীলা নিজের কবিত্ববলে সুন্দর সজ্জিত করিয়াছেন। লোকের জানা শুনা এমন লীলাই নাই যাহার বর্ণনা এই গ্রন্থে হয় নাই। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ ও সঙ্গীত শাস্ত্রের ইহাতে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অলঙ্কার ও সঙ্গীতের ইহাতে অনেক অজ্ঞেয় তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ ১১ সর্গে ১৪৬টী পদ্যে সমস্ত অলঙ্কার ক্রমে ক্রমে দেখাইয়াছেন এবং ১৩সর্গে ১ হইতে ৭১ শ্লোকে নানাবিধ ছন্দ এবং ৭৩ হইতে ১৪৬ পর্য্যন্ত (গঙ্গাদাস কৃত ছন্দোমঞ্জরীর মত) একাক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া ছন্দ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতি শ্লোকে ছন্দের নামটীও ভঙ্গীতে দেখান হইয়াছে, তাহার একটী উদাহরণ এই—

"বিধর্ম্মশাস্ত্রশংসিকা, তবাতুলা সুবংশিকা।
কুকুট্টিনীক্রিয়াপরা, জগদ্বধূপ্রমাণিকা॥" (১৩। ৯৬)

এইটী প্রমাণিকা ছন্দের শ্লোক। একাক্ষরাদির উদাহরণ কিঞ্চিৎ এই—সা শ্রীঃ, ত্বৎস্ত্রী॥ যৎ ত্বং, সা শ্রীঃ॥ গোপস্ত্রীণাং শ্রীত্বং কস্মাৎ। গোপস্ত্রীশঃ শ্রীশো যস্মাৎ॥ ইত্যাদি। বৈষ্ণবসাহিত্যে এতাদৃশ বৃহৎ মহাকাব্য আর নাই। লীলার বিশ্লেষণ, মনুষ্য, পশু পক্ষীর পর্য্যন্ত চরিত্র বিবরণ এই গ্রন্থের মত অপর সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। শুকমুখে কৃষ্ণের এবং সারীমুখে রাধার মহিমার ঘোষণা একটী অপূর্ব্ব পদার্থ।

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল,
সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল।
নইলে পারবে কেন?"

ইত্যাদি বাঙ্গলা গানের ছড়া বঙ্গদেশে যে প্রচলিত আছে, তাহার মূল কৃষ্ণদাসের কবিত্ব। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও আনন্দলহরীতে ঐরূপ শক্তিপ্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"

চৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজের অপূর্ব্ব দার্শনিক ও ভক্তিসিদ্ধান্তপরিপূর্ণ বাঙ্গলাভাষায় মহাকাব্য। কৃষ্ণদাসের দুই অমৃত। এক গোবিন্দলীলামৃত, দ্বিতীয় চৈতন্যচরিতামৃত। এই তাঁহার জীবনের শেষ গ্রন্থ। এখানী প্রাচীন বঙ্গভাষার পদ্যে লিখিত। নামে বঙ্গভাষা কিন্তু সংস্কৃতের উপরেও ইহার স্থান। মহাপ্রভুর মধুরলীলা বর্ণন করিতে গিয়া তিনি অশেষ পাণ্ডিত্য, অশেষ বহুদর্শিতা ও অশেষ ভক্তিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন। আদি, মধ্য, অন্ত এই তিন ভাগে তিন লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে এমন লোক বিরল, যিনি এই গ্রন্থের সর্ব্বাংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সংস্কৃতের মধ্যে ষট্‌সন্দর্ভ ও গোপালচম্পূ যে শ্রেণীর, বাঙ্গলাতে এখানি

সেইরূপ। ৬টী সন্দর্ভের সমস্ত সিদ্ধান্তাংশ এই গ্রন্থে বাঙ্গলাতে দৃষ্ট হয়। এজন্য ইহাকে সন্দর্ভের টীকা বলা হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এতাদৃশ মহাগ্রন্থ এখন সর্ব্বসাধারণ লোকের হাতে দেখা যায়। সদর্থ না বুঝিয়া অনেকে কুৎসিতার্থ করিয়া তাহাতে শাস্ত্রবহির্ভূত মত আবিষ্কার করতঃ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসমাজে কলঙ্কারোপ করিয়াছে। সংস্কৃত বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে সকল শাস্ত্রের কথাই ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে ৫৫খানী গ্রন্থের শ্লোক দৃষ্ট হয় এবং উদ্ভট শ্লোকও অনেক আছে (১৩)। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই বাঙ্গলা গ্রন্থের একখানী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। কালিদাসের মত এক সময়ে কৃষ্ণদাসের এমন গৌরব ছিল যে, অনেকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার নামে ভণিতা দিয়াছেন। সেরূপ গ্রন্থ আমি অনেক দেখিয়াছি। এরূপ উপাখ্যানও আছে যে "বাঙ্গলা দেখিয়া এবং নিজের সিদ্ধান্ত বাঙ্গলা ভাষাতে রচিত ও অনধিকারীতে কদর্থ করিবে বলিয়া জীবগোস্বামী ইহাকে জলে ফেলিয়া দেন এবং তাহা যমুনাতে উজান চলে। সেই গ্রন্থ আবার সমস্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে থাকিয়াও উপরে উঠে।" বস্তুতঃ এই সকল উপাখ্যান গ্রন্থগৌরবের পরিচায়ক।

আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মনিরূপণ, আত্মসাধন, জ্ঞানরত্নাবলী, রাগরত্নাবলী, শ্যামানন্দ-প্রকাশ, স্বরূপবর্ণন (গদ্য ও পদ্যে সারসংগ্রহ), সিদ্ধনাম, পাষণ্ডদলন, রাগময়ীকণা, রসভক্তি-চন্দ্রিকা। ইত্যাদি অনেকানেক ক্ষুদ্র গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কৃত বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু সব গুলির কর্ত্তা যে কবিরাজ কৃষ্ণদাস তাহাতে ঘোর সন্দেহ। কারণ চৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেক গ্রন্থোক্ত বিষয়েরই সঙ্গতি হয় না।

এতদ্ভিন্ন "রূপমঞ্জরী" নামে একখানী সংস্কৃত গ্রন্থ কৃষ্ণদাসকৃত বলিয়া প্রচলিত আছে, ইহাতে শ্রীরূপগোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে তজ্জন্য বিলাপ বর্ণিত আছে। ইহার অনুবাদকের নাম বৈষ্ণবদাস।

---

(১৩) আদিলীলাতে—স্বরূপকৃত কড়চা ১, ভাগবত ২, ভগবদ্গীতা ৩, কৃষ্ণকর্ণামৃত ৪, বৃহৎ ভাগবতামৃত ৫, ভাবার্থদীপিকা ৬, ব্রহ্মসংহিতা ৭, কাব্যপ্রকাশ ৮, বিদগ্ধমাধব ৯, লঘুভাগবতামৃত ১০, মহাভারত ১১, স্তবমালা ১২, ষট্‌সন্দর্ভ ১৩, উপপুরাণ ১৪, যামুনাচার্য্যস্তোত্র ১৫, পদ্মপুরাণ ১৬, হরিভক্তিবিলাস ১৭, হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৮, বিষ্ণুপুরাণ ১৯, উজ্জ্বলনীলমণি ২০, বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্র ২১, গোবিন্দলীলামৃত ২২, দানকেলীকৌমুদী ২৩, ললিতমাধব ২৪, গৌতমীয়তন্ত্র ২৫, গোপীপ্রেমামৃত ২৬, গীতগোবিন্দ ২৭, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ২৮, শ্রীরূপকৃত কড়চা ২৯, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩০, হরিভক্তিসুধোদয় ৩১, সামুদ্রিক শাস্ত্র ৩২, উদ্বাহতত্ত্ব ৩৩, একাদশীতত্ত্ব ৩৪, ভরতসূত্র ৩৫, পদ্যাবলী ৩৬, মলমাসতত্ত্ব ৩৭। মধ্যলীলাতে—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ৩৮, জগন্নাথবল্লভ ৩৯, চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৪০, উত্তররামচরিত ৪১, কূর্ম্মপুরাণ ৪২, রঘুবংশ ৪৩, চৈতন্যচরিতামৃত (মহাকাব্য) ৪৪, বিশ্বপ্রকাশ ৪৫, পাণিনি ৪৬, অমরকোষ ৪৭, বাসনাভাষ্য ৪৮। অন্ত্যলীলাতে—নৈষধচরিত ৪৯, নাটকচন্দ্রিকা ৫০, সাহিত্যদর্পণ ৫১, নৃসিংহপুরাণ ৫২, স্তবাবলী ৫৩, কিরাতার্জ্জুনীয় ৫৪, অভিজ্ঞান শকুন্তল ৫৫।

চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাসের প্রায় ৮০টী স্বকৃত শ্লোক আছে। তদ্ভিন্ন গোবিন্দলীলামৃতের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিও স্বকৃত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থাবলম্বনে ঈশ্বরতত্ত্ব, শক্তিবিচার, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক তথ্যের মীমাংসায় ইনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। যে কালে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয় তখনও বাঙ্গলা পয়ারের উন্নতি হয় নাই। যদিও এই গ্রন্থের লীলাবর্ণনাংশে বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবত আদর্শ, তথাপি ইহাতে ভাষাগত স্বাধীনতা দৃষ্ট হয়, অন্ত্য অক্ষরের মেল মাত্রই পয়ারের চরম বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভেই আছে—

"এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দো তিনে মোর নাথ॥"

ইহার প্রথমার্দ্ধে ২০ ও শেষার্দ্ধে ১৫ অক্ষর আছে। কেবল ভাবাংশে ইহার রচনা শ্রেষ্ঠ হইলেও স্থলবিশেষে শ্রুতিমধুর রচনা আছে, যথা—

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকৈশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥"
"উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর, কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ, পরনারীবধে সাবধান॥"
"বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃতজন্মস্থান, যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত ধন, সকল ইন্দ্রিয়গণ, কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥"
"কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।"
"মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল, যেই হরে তার গর্ব্ব মান।"
"কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি॥" ইত্যাদি।

ইহার অনেক পয়ার ও ত্রিপদী গায়কগণ গান করিয়া থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লীলা বা চরিত্রের বিশ্লেষণ অল্প, সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণই অধিক। বাঙ্গলাতে অনেক গূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ থাকায়, তাহা অনভিজ্ঞের অবোধ্য হইয়াছে। উচ্চ অঙ্গের বৈষ্ণবশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে এখানী মহোপকারক, কিন্তু তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তিমান্ গুরুর উপদেশ সাপেক্ষ। রামানন্দরায়মিলন, বসুদেবসার্ব্বভৌমমিলন, সনাতনশিক্ষা, পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণ প্রভৃতি কয়টী পরিচ্ছেদ ইহার সমধিক কঠিন। মহাপ্রভুর নীলাচলাবস্থান কালের ঘটনাতে গ্রন্থের অধিকাংশ, এজন্য ইহাতে উৎকলের ভাষা অনেক দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থ যদিও ভক্তিরসপ্রধান তথাপি করুণ রসেরও বর্ণনা আছে। সন্ন্যাস ও ভাবোন্মাদ এই সকল স্থলের বর্ণনায় অশ্রুমোচন করিতে হয়। বৈষ্ণবরাজ্যে এখানী ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পূজিত, কিন্তু আমি কাব্যশ্রেণীতেই ধরিয়া লইলাম। উত্তররামচরিত ও কাদম্বরীতে যেমন প্রধান নায়কের দেহাবসানের পর পুনর্ম্মিলন বর্ণিত আছে। সেইরূপ ইহাতে মহাপ্রভুর যমুনাভ্রমে আইটোটা নামক সমুদ্রের খাড়ীতে

দেহাবসান হইলেও পুনর্জ্জীবন বর্ণিত হইয়াছে (১৪)। অলঙ্কারশাস্ত্র বলেন "রসবিচ্ছেদহেতুত্বা-ন্মরণং নৈব বর্ণ্যতে।" সুতরাং অন্তে বিয়োগ দুঃখ না হইয়া সংযোগ সুখই প্রার্থনীয়। ইহা ভারতীয় সাধারণপ্রথা। চৈতন্যভাগবত ভিন্ন বাঙ্গলা ভাষার সমস্ত বৈষ্ণবগ্রন্থেই চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রস্ফুট বা অস্ফুট ছায়া লক্ষিত হয় এবং ভক্তিশাস্ত্রে সাধারণের যাহা কিছু জ্ঞান, তাহারও আদর্শ চরিতামৃত। বিল্বমঙ্গলের কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকাও ইহাঁরই রচিত। "ভাগবতগূঢ়ার্থরহস্য" গ্রন্থও কৃষ্ণদাসের বলিয়া প্রবাদ কিন্তু তাহা ১৫৭৫ শাকে শেষ হয় সুতরাং তাহা অপর কৃষ্ণদাসের বলিয়া স্থির করা যায়। কবিরাজ কৃষ্ণদাসের হইলে তাঁহাকে ১৫৭ বৎসর বয়স্ক ধরিতে হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রামাণিক নহে। ৬।৭ জন কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।

এইবারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তরঙ্গ শিষ্য মুকুন্দদাসের ও তৎকৃত গ্রন্থের কথা বক্তব্য। মুর্শিদাবাদের মস্তকমণি পরলোকস্থ ৺আনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত নরোত্তমবিলাসের শেষ হইতে মুকুন্দের বিবরণ সংগৃহীত হইল। মুকুন্দ যখন কৃষ্ণদাসের আশ্রিত হন তখন গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষাই, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার অধ্যয়নাদি শেষ হয়। এই সময়ে মুকুন্দকে ন্যূনাধিক ৬৫ বৎসরের লোক ধরিলে এবং কৃষ্ণদাসের জন্ম সময়ের হিসাবে, কম বেশী ১৪৫৩ শাকে মুকুন্দের জন্ম অনুমিত হয়।

মুকুন্দদাস পঞ্চালদেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব (১৫) জাতি ব্রাহ্মণ। ইনি বিশেষ সদাচার ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কালক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং কৃষ্ণদাসের দেহান্তর ঘটিলে, অতীব দুঃখের সহিত কালাতিপাত করিতে করিতে বহু দিন পর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে পাইয়া সুখে কালক্ষয় করেন। মুকুন্দদাস নিজে অনেকগুলি লীলাগ্রন্থ আরম্ভ করিয়া নিজের শেষাবস্থায় বিশ্বনাথদ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করেন, ইহার পরেই তাহার দেহান্ত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলক্ষেত্রে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে যে গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিয়াছিলেন, দাসগোস্বামীর অপ্রকটের পর কৃষ্ণদাস ঐ শিলার অর্চ্চনা করিতেন, তৎপরে মুকুন্দদাস তাঁহার অর্চ্চনভার গ্রহণ করেন। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন, তিনি মুকুন্দের বার্দ্ধক্যদশায় শুশ্রূষাদি করায় তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া গুরুপরম্পরালব্ধ গোবর্দ্ধনশিলা ঐ বিষ্ণুপ্রিয়াকে সমর্পণ করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া আবার সময়ে সময়ে তাহা বিশ্বনাথকে অর্পণ করিতেন। উল্লিখিত

---

(১৪) গোবিন্দদাসের কড়চার মতে, পাদে ইষ্টক বিদ্ধ হইয়া জ্বররোগে দেহত্যাগ করেন।

(১৫) কেহ কেহ মুলতান দেশীয় বণিক্ বলিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ শিলা সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোকুলানন্দ বিগ্রহের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রেমময়ী ছিলেন, শিলামধ্যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন, বস্তুতঃ উক্ত শিলার স্বভাবই এইরূপ। শ্রীযুত দাস গোস্বামীকেও এইরূপে দর্শন প্রদান করিতেন। বাস্তবিক উৎকট চিন্তাপ্রবাহে বা মহাপ্রেমে কি না হইতে পারে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, "মুকুন্দের ধর্ম্মমত গোস্বামিপাদদিগের মতের বিপরীত ছিল, কৃষ্ণদাসের মতও সুতরাং তদ্রূপ, কারণ তিনি গুরু, মুকুন্দ শিষ্য, এতৎ-সঙ্গী বলিয়া বিশ্বনাথের মতও কিছু অন্যরূপ।" এই অনুমান সঙ্গত নহে, কৃষ্ণদাস সেরূপ হইলে তৎকৃত গ্রন্থ শ্রীজীব প্রভৃতির আদরণীয় ও চিরদিন বৈষ্ণবগণের মাননীয় হইত না। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণদাস যে ভগবানের গূঢ়লীলা বিস্তার করিয়াছেন, তাহার পাঠের অধিকারী অতি বিরল। অনধিকারী লোকে উহার বিপরীত অর্থ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকেও সেই দোষে দূষিত করিতেছে।

কতিপয় বাঙ্গলা পদ্য গ্রন্থ মুকুন্দপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকল গ্রন্থাবলী কিছু নিগূঢ়ার্থ ও কেবল রসতত্ত্বে পরিপূর্ণ। তাহার আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ লইয়া অনেক মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে। মুকুন্দের গ্রন্থাবলী এই :—

১—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়। ২—অমৃতরত্নাবলী। ৩—রসতত্ত্বসার। ৪—রাগরত্নাবলী। ৫—আদ্যসার-তত্ত্বকারিকা। ৬—আনন্দরত্নাবলী। ৭—সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা। ৮—উপাসনা-বিন্দু। ৯—চমৎকার চন্দ্রিকা, ১০—সাধনোপায়, এই ১০ খানি গ্রন্থ আমি অবলোকন করিয়াছি। ইহা ভিন্ন অপর গ্রন্থ আছে কি না বলিতে পারি না। উক্ত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে, প্রথম সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় খানিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণদাস প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব-জগতের উজ্জ্বলতম রত্ন ও সুসিদ্ধান্তের খনি, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় উক্ত মহাগ্রন্থের পরিশিষ্ট স্বরূপ। যাঁহারা চরিতামৃত গ্রন্থ আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট বিশেষ আদৃত হইবার বস্তু, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের প্রথম ৫ প্রকরণে স্বরূপ, ব্রহ্ম, শক্তি, অভিধেয় ও রতিতত্ত্ব এবং সুবৃহৎ ৬ষ্ঠ প্রকরণে নিত্যলীলা, কৃষ্ণগৌরতত্ত্ব, রাগভক্তি, তাহার নানারূপ প্রভেদ, নাম-মাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবাচার এবং ৭ হইতে ১৮ প্রকরণে প্রীতি, রাগ, পরপদার্থ, মাথুররাহিত্য, সন্দেহভঞ্জন, রাগপ্রাপ্তি, সহেতু নির্হেতু ভক্তি, দৈত্যারি নামক কুম্ভকার ভক্তচরিত, নিত্যানন্দের বিবাহ, পরকীয়া, আত্মসুখরাহিত্য এবং গুরুবন্দনা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ১৮টী প্রকরণ আছে।

বৃহৎপাষণ্ডদলন।—ভক্তিমার্গ পরিপোষক ও পুরাণাদি হইতে সংগৃহীত নানাবিধ শ্লোকাবলী ও পয়ারছন্দে বাঙ্গলা তাৎপর্য্য। শ্রীমন্নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র গোস্বামিকর্তৃক সঙ্কলিত। ১৪৫২ শাকে বীরভদ্রের সত্তার উপলব্ধি হয়। বহুদিন হইতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে কৃষ্ণভক্ত, বৈষ্ণব, ভক্তি, গুরু ও হরিনামের মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিপথে মূর্খজনগণকে সহজ কথায় বিনা বিচারে (যেন রাজদণ্ডের মত) শিক্ষা দিতে এই গ্রন্থের আবির্ভাব, তাহা গ্রন্থের নামেই সমর্থিত হয়। ইহা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে

দুইখানী। কলিকাতায় বটতলার প্রেসে মুদ্রিত হইয়া অসংস্কৃত ভাবে জনসমাজে চিরদিন প্রচলিত আছে। ইহার বিশুদ্ধ সংস্করণ অদ্যাপি দৃষ্ট হয় না, যাহা হইয়াছে তাহাও রূপান্তরিত। এই গ্রন্থকার হইতে বাউল বা ন্যাড়া সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক মহতী উপকথা চিরদিন শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা অশ্লীল ও বৃহৎ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। কতিপয় প্রাচীন পুরাণাদির শ্লোক ও তাহার কৃষ্ণদাস কৃত পয়ার অনুবাদযুক্ত ক্ষুদ্র পাষণ্ডদলনও সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই কৃষ্ণদাসকে চরিতামৃতের গ্রন্থকর্ত্তা বলিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের কর্ত্তৃগণ মধ্যে কৃষ্ণদাসনামের অসদ্ভাব নাই বরং বাহুল্যই দৃষ্ট হয়।

রামানন্দস্বামিদ্বারা রামানুজের সম্প্রদায় বিস্তৃত হয়, কিন্তু তিনি কোন কোন অংশে ভিন্ন মত প্রচার এবং নিজ নামে রামায়ৎ সম্প্রদায় নাম দিয়া ইহাকে বহুবিস্তৃত করেন। এই সম্প্রদায়ের শিষ্যানুশিষ্য অনেক, তন্মধ্যে তুলসীদাস ও কবীরদাসই গ্রন্থকার। হিন্দীভক্ত-মাল প্রণেতা নাভাজিউর শিষ্য অগ্রদাস ও জগন্নাথদাস তুলসীর দীক্ষাগুরু। তিনি কাশীতে আসিয়া ১৬৩১ সম্বতে অর্থাৎ ১৪৯৬ শাকে হিন্দী ভাষায় রামায়ণের আধ্যাত্মিক ভাগের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে অনেক বৈরাগ্যোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শতসই, রামগুণাবলী, গীতাবলী, দোঁহাবলী এবং বিনয়পত্রিকা পুস্তকও তুলসীদাসের বিরচিত। তুলসীর দোঁহাবলী এপর্য্যন্ত সকল বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে আদরের সহিত আলোচিত হইয়া থাকে। তুলসীদাস অধিক স্থলে নিজেকেই সম্বোধন করিয়া দোঁহা রচনা করিয়াছেন—

"তুলসি এইসা ধিয়ান্ ধর, যৈসা বিয়ান গা গাই।
মুমে তৃণ চানা চুড়ে ওঁর্ চেৎ রাখে বাছাই॥
সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ্ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
(তব্) কয়লাকো ময়লা ছোড়ে, (যব্) আগ্ করে পরবেশ॥"

নবপ্রসূতা গাভী যেমন নানাস্থানে বিচরণ করিলেও মনপ্রাণ বৎসের প্রতি রাখে, সংসারী জীব তদ্রূপ ঈশ্বরে মন প্রাণ রাখিয়া সংসারকার্য্য করিবে।

নানা চেষ্টাতেও কয়লার ময়লা দূরীভূত হয় না, কিন্তু অগ্নিসংযোগ মাত্রেই তাহার ময়লা দূরীভূত হইয়া উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে, তেমনি সদ্‌গুরুর উপদেশ ভিন্ন চিত্তমল ক্ষালিত হয় না। অর্থাৎ—"অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥"

এই সকল অতি সরল ও সুমধুর উপদেশ তুলসীদাস বিবৃত করিয়াছেন।

এই সম্প্রদায়ী কবীরদাস নামক এক মহাপুরুষ এক বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সমাজচ্যুত হইয়া কাশীতে "রাম রাম" শব্দ শ্রবণমাত্রে তাহাই ইষ্টমন্ত্ররূপে জপ করতঃ শেষে মহাসাধু হইয়াছিলেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয় দলে গতিবিধি করিয়া উদার-ভাবে অনেক দোঁহাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার হিন্দী গ্রন্থাবলী কম নহে, সংখ্যাতে ২১খানী; ইহা অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে। যথা—সুখনিধান ১, গোরক্ষনাথগোষ্ঠী ২, কবীরপাঞ্জী ৩, বালকৃখীরমৈনী ৪, রামানন্দকী গোষ্ঠী ৫, আনন্দরামসাগর ৬, শব্দাবলী ৭,

মঙ্গল ৮, বসন্ত ৯, হোলী ১০, রেখ্‌তা ১১, ঝুলন ১২, কহার ১৩, হিন্দোল ১৪, দ্বাদশ মাস ১৫, চঞ্চর ১৬, চৌতীশা ১৭, আলিফ্‌নামা ১৮, রমৈনী ১৯, বীজক ২০, শাখী ২১।

এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন আগম ও বাণী প্রভৃতি নামে অনেক কবিতাও কবীর-রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। এই মহাত্মা ১৫০৫ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবীরপন্থীর মধ্যে দাদু নামে এক ধুনরী জাতি সাধু ছিলেন। এই দলে "বিশ্বাস কা অঙ্গ" "বিচার কা অঙ্গ" নামে অনেক দার্শনিক গ্রন্থ আছে। দাবিস্তানের দ্বিতীয় ভাগে ১২ অধ্যায়ে লেখা আছে দাদু দরবেশ বা উদাসীন। আক্‌বর বাদসাহের রাজ্যের শেষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাদুর অস্তিত্ব অনুমিত হয়। তুলসী ও কবীর অতি সরলভাবে সরলদৃষ্টান্তে সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে অনেক উপদেশ দান করিয়াছেন। এগুলিকে কোষকাব্যের অন্তর্গত বলা যায়। ইঁহারা হিন্দীকাব্য প্রসারের কালেও অনেক অধ্যাত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া হিন্দী বৈষ্ণবসাহিত্যের অঙ্গে মহামূল্য রত্নাভরণ দান করিয়াছেন।

শ্রীবিঠ্‌ঠল ভক্ত পূর্ব্ব কথিত নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য। এতৎসম্প্রদায়ীকে "বৈষ্ণববীর" আখ্যাতে ভূষিত দেখা যায়। পাণ্ডুর নামক বুদ্ধমূর্ত্তিকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ইহারা পূজা করেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাট্‌ প্রভৃতি ভারতের অনেকস্থলে এই ধর্ম্মাক্রান্ত লোক বাস করেন। ভক্তবিজয়, পাণ্ডুর মাহাত্ম্য, হরিবিজয় প্রভৃতি অনেকগুলি আরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী গ্রন্থ ইঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হয়। হরিবিজয় গ্রন্থ ১৫২৪ শকাব্দে শ্রীধর নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত হয়। এগুলি যদিও কাব্য তথাপি ধর্ম্ম ও জীবনকাহিনীতেও বঞ্চিত নহে। এই প্রণালীকে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শ বলা যাইতে পারে।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় প্রণীত। শ্রীরূপকৃত হরিভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর উত্তমা ভক্তির লক্ষণ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" এই শ্লোকের মর্ম্ম লইয়া অতি সহজ ভাষাতে বাঙ্গলা ত্রিপদী ছন্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই পুস্তক সংস্কৃতানভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের মধ্যে অভ্রান্ত বেদবাক্যের ন্যায় শিরোধার্য্য। সত্য সত্যই ইনি সরল প্রাণের ভাষায় প্রেম, প্রীতি বা ভালবাসার যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। প্রেমের লক্ষণ করিতে গিয়া ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

"জল বিনে যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনে সেইমত ভক্ত।
চাতক জলদ গতি, এমতি প্রেমের রীতি,
জানে যেই সেই অনুরক্ত॥
মকরন্দ ভ্রমে যেন, চকোর চন্দ্রিকা হেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এইমত প্রেমভক্তি রীতি॥"

সংক্ষেপতঃ লিখিয়া অপরিতোষ হওয়ায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র "নরোত্তমবিলাস" নামক পৃথক্ গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করেন।

"কহিলু এ প্রসঙ্গাতিশয় সংক্ষেপেতে।
বিস্তারি বর্ণিব নরোত্তমবিলাসেতে॥" (ভক্তিরত্নাকর ১০ম তরঙ্গ)

ভক্তিরত্নাকর ১৫ তরঙ্গে বিভক্ত মহাবৃহৎ গ্রন্থ। ইহার ৫ম তরঙ্গে পাঠ করিলে গ্রন্থকারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বহুদর্শিতা ও কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মথুরামাহাত্ম্যে বহুতর পৌরাণিক বচন ও রাসস্থলীর বর্ণনপ্রসঙ্গে বহু বহু সঙ্গীতশাস্ত্রীয় বচনাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তিরত্নাকরে অনেকানেক গ্রন্থের বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, বিশেষতঃ চৈতন্যলীলার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ মুরারিগুপ্তকৃত চৈতন্যচরিত নামক মহাকাব্যের বহুতর শ্লোক ইহাতে ১২শ তরঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু কর্ণপুর স্বকৃত মহাকাব্য চৈতন্যচরিতামৃতে তাহা করেন নাই আভাসমাত্র দিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে প্রসিদ্ধ ও শ্রুতিমধুর রামাষ্টকটী পর্য্যন্ত উদ্ধৃত আছে। চরিত্রবর্ণনের অধিকাংশই প্রাচীন লোকের মুখ হইতে শ্রুত এবং চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত হইতে অনেক কথা সংগৃহীত হইয়াছে। নরোত্তমবিলাসের শেষে মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যাচার্য্য মহাপণ্ডিত ৺আনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণ মহাশয় রেঞাপুরস্থ নরহরির ২। ৩ পুরুষ নীচের লোকের মুখে শুনিয়া নরহরির অনেক বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকরের বিষয়ের সারসূচী এইরূপ :—গোপালভট্ট, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্যামানন্দ ও সন্তোষদত্তের বিবরণ। সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামির বংশাবলী ও চরিত্র। শ্রীনিবাসের জন্ম ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস। শ্রীনিবাসের মাতা ও পিতার বিবরণ। জগাই মাধাই ও কাজি উদ্ধার। শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রদর্শন ও গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ। বৃন্দাবনে গমন ও শ্রীজীবসমীপে "আচার্য্য" উপাধি লাভ। নরোত্তমের দীক্ষা ও "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি লাভ। সুবিস্তৃত ভাবে মথুরামাহাত্ম্য, বৃন্দাবনের সমস্ত লীলাস্থলীদর্শন। গোস্বামী, যোগপীঠ, কালিয়হ্রদ ও তিন প্রভুর লীলাবর্ণন। রাসস্থলীদর্শনপ্রসঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের ভূয়সী বর্ণনা। ইহাতে রাগ, রাগিণী, গ্রাম মূর্চ্ছনা বাদ্য ও অভিনয় বর্ণিত আছে। অষ্টকালীয় লীলা, বারমাসিকলীলা। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন। বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি ও বীরহাম্বীর রাজার কথা। গৌরীদাস ও হৃদয়চৈতন্যের কথা। যাজিগ্রাম, কাটোয়া, নবদ্বীপ, অম্বিকা, খড়দহ, সপ্তগ্রাম ও শান্তিপুরভ্রমণ। রামচন্দ্রের "কবিরাজ" উপাধি। শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার ঠাকুরের কীর্ত্তন ভক্তসম্মীলন ও বিদায়। জাহ্নবা ঈশ্বরী, বড়ু গঙ্গাদাস, একচক্রা নগর, নিত্যানন্দের বিবাহ, মুরারি গুপ্ত, শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর জন্মস্থান শ্রীহট্টস্থ নবগ্রামের কথা, জীব গোস্বামীর হস্তলিখিত সংস্কৃত পত্রাবলী। মুর্শিদাবাদের মহুলা, বুধরী, বোরাকুলীর রাধাবিনোদ সেবা, কাঁদড়ায় জয়গোপালদাস, জ্ঞানদাস, মঙ্গলঠাকুর, রসিকমুরারির কথা, রামচন্দ্র কবিরাজের বৃত্তান্ত, তদীয় শিষ্য সৈয়দাবাদের হরিরাম ও রামকৃষ্ণাচার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণরায় ও শ্রীমোহনরায়ের কথা। গাম্ভীলা বা বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর উপাখ্যান।

এতদ্ভিন্ন অনুরাগবল্লী ও বহির্মুখপ্রকাশ নামে ২খানী গ্রন্থও নরহরিলিখিত। নরোত্তম বিলাসের ১২টী বিলাস বা অধ্যায় আছে। গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থশেষে নিজের মাতা, পিতা ও গুরুর পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। ঘনশ্যাম ও নরহরিদাস ভণিতাযুক্ত আরও কতিপয় গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। সমস্ত গুলিকে এই নরহরির কৃত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সে গ্রন্থ এই—গোবিন্দরতিমঞ্জরী, নামামৃতসমুদ্র। গৌরচরিত্রচিন্তামণি, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাস-চরিত, ইত্যাদি।

১৭ ও ১৮ শতাব্দীতে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কয়েকখানী উক্ত শতাব্দীর পূর্ব্বের ও পরের হইলেও একজাতীয় বিষয় বলিয়া, গ্রন্থকারও গ্রন্থগত তারতম্য ধরিয়া এবং পূর্ব্ব মুদ্রিতের পরে সংগৃহীত বলিয়া এই ভাগেই বিবৃত হইল। ইহাতে অস্থানগত দোষ হয়, কিন্তু তাহা পাঠকসমীপে ক্ষন্তব্য।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুর হইতে ১২। ১৩ ক্রোশ দক্ষিণ কাটোয়ার উত্তর ভরতপুর থানার অধীন ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ মালিহাটীগ্রামে বর্ত্তমান ১৮২৯ শাক হইতে ২৯৭ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন পদ্যলেখক ও সংস্কৃত বৈষ্ণবকাব্য-বিশারদ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন, নাম যদুনন্দন দাস, সম্মানসূচক উপাধি ঠাকুর, জাতি বৈদ্য। ইঁহার প্রণীত মূল গ্রন্থ কর্ণানন্দ, ইহাতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখাবর্ণন বহুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন শ্রীরূপকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ (এই অনুবাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত মহতী টীকার অনুসারে লিখিত)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সুবৃহৎ মহাকাব্য গোবিন্দলীলামৃতের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ। ভগবদ্গীতার পদ্যানুবাদ, এই তিন অনুবাদ গ্রন্থ এবং পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু নামক প্রাচীন বাঙ্গলা গানের গ্রন্থে যদুনন্দনের অনেক পদ দৃষ্ট হয়। কাশীরাম দাস ও কীর্ত্তিবাসের কর্ত্তৃক যেমন সংস্কৃত সুবৃহৎ মহাভারত ও বাল্মীকি-রামায়ণের পদ্যানুবাদ দ্বারা বঙ্গদেশে ভারত ও রামায়ণজ্ঞানের পথ সুগম হইয়াছে, কেবল সুগম নহে, সংস্কৃতজ্ঞ লোকের মধ্যেও ভারত রামায়ণের চর্চ্চা অল্প লোকে করিয়া থাকেন সুতরাং তাহার অনুবাদ না থাকিলে গ্রন্থলিখিত উপাখ্যান দেশে মৃতপ্রায় হইত, কাশীদাস ও কীর্ত্তিবাসই তাহার প্রাণদান করিয়া আপামর সাধারণের পক্ষে মহোপকার করিয়াছেন। আমাদের যদুনন্দন দাস বৈষ্ণব-সাহিত্য বিষয়ে সেই কার্য্যের যোগ্যপাত্র। ইঁহার কৃপাতেই সংস্কৃতজ্ঞানহীন জনগণে অনেক বৈষ্ণবকাব্যের রসাস্বাদে অদ্যাপি সমর্থ। ইনি বহরমপুর খাগড়ার অপর পারস্থ ভাগীরথী তীরবর্ত্তী বুঁধইপাড়াতে শ্রীনিবাসকন্যা হেমলতার নিকট অধিক সময় বাস করিতেন এবং হেমলতাই উল্লিখিত গ্রন্থ শ্রবণে আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া "কর্ণানন্দ" নাম রাখেন। এই গ্রন্থ বুঁধইপাড়াতে ১৫২৯ সালে সম্পূর্ণ হয়।

এতদ্ভিন্ন জ্ঞানদাস, বাসুদেব ঘোষ, রাজা বীরহাম্বীর, রায়শেখর, শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর, জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অনন্ত দাস, গতিগোবিন্দ, গদাধর, গোবিন্দ ঘোষ, ঘনশ্যাম, চম্পতি ঠাকুর, চৈতন্য দাস, জগদানন্দ, জগন্মোহন, প্রেমানন্দ, বংশী-

বদন, বসন্ত রায়, বৈষ্ণব দাস, বৃন্দাবন, দৈবকীনন্দন, নয়নানন্দ, নরহরি, নরোত্তম, পীতাম্বর, পরমানন্দ, প্রসাদ দাস, পরমেশ্বরী, মাধব ঘোষ, মাধব দাস, মুরারি দাস, রসময় দাস, রাধাবল্লভ, রামানন্দ, রামানন্দবসু, রসিকানন্দ, লোচন দাস, শচীনন্দন, শ্যামানন্দ, শ্যামদাস, শিবানন্দ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাসাচার্য্য, সিংহভূপতি, হরিদাস, হরিবল্লভ, পরমানন্দ দাস, কবিশেখর, উদ্ধবদাস, গৌরদাস, হরেকৃষ্ণ, হরেরাম, যদুনাথ আচার্য্য ইত্যাদি বহুতর সঙ্গীতজ্ঞ কবিগণের গানমালা বৈষ্ণব-সাহিত্যকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন, একথা শতমুখে উচ্চারণ করা যাইতে পারে।

উপরি লিখিত প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত পদামৃতসমুদ্র এবং মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর সন্নিহিত টেঞা বৈদ্যপুর গ্রামনিবাসী কতিপয় বৎসর পূর্ব্বের বৈদ্যজাতি বৈষ্ণবদাস (পূর্ব্ব নাম গোকুলানন্দ সেন) নামক মহাত্মার সংগৃহীত পদকল্পতরু গ্রন্থে বহু বহু মহাকবির রচিত গান সংগৃহীত আছে। বলা-বাহুল্য যে, বঙ্গদেশে রাজসাহীর গড়ের হাটী ও মুর্শিদাবাদের মনোহরসাহী পরগণার নামে বিখ্যাত "গড়ের হাটী ও মনোহরসাহী" নামক যে সুদীর্ঘ ও অত্যল্পস্বরের গান কীর্ত্তনীয়াগণ ব্যবহার করিয়া জীবিকাসংগ্রহ করেন, তাহার মূল ঐ দুই মহাগ্রন্থ। সুতরাং রাধামোহন ও বৈষ্ণব-দাসের নিকট বৈষ্ণবগণমধ্যস্থ সঙ্গীতাস্বাদী সমাজ বিশেষ ঋণী।

শ্যামানন্দ দাসের উপাসনা, সময়সংগ্রহ। শ্যামদাসকৃত একাদশীব্রতকথা। দ্বিজ পরশুরামের কালিয়দমন, সুদামচরিত্র ও গুরুদক্ষিণা। অযোধ্যারাম স্বরূপরাম ও শঙ্করকৃত গুরুদক্ষিণা। কবিশেখরের গোপালবিজয়। ঘনশ্যাম দাসের গোবিন্দরতিমঞ্জরী। দেবনাথকৃত গৌরগণাখ্যান, দেবদাসকৃত রাধাচৌত্তিশা। দ্বিজ রূপনারায়ণকৃত গৌরগণোদ্দেশের অনুবাদ। এই গ্রন্থের অনুবাদ শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন বংশীয় হৃদয়ানন্দকৃতও দৃষ্ট হয়। প্রেমানন্দ দাসের চন্দ্রচিন্তামণি। রসময় দাসের চমৎকারকলিকা (গদ্য ও পদ্য)। নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য রামগোপাল দাস কৃত চৈতন্যতত্ত্বসার, সরকার ঠাকুরের শাখাবর্ণন। হরিদাসের চৈতন্য মহাপ্রভু। দ্বিজ মুকুন্দের জগন্নাথমঙ্গল। যদুনাথ দাসের তত্ত্বকথা। দ্বিজ ভগীরথের তুলসীচরিত্র ও চৈতন্য-সঙ্গীত। দ্বিজ জয়নারায়ণের দ্বারকাবিলাস। বংশীদাসের দীপকোজ্জ্বল ও নিকুঞ্জরহস্য স্তব। গোবিন্দদাসের নিগম গ্রন্থ। গৌরীদাসের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী। কৃষ্ণরাম দাসের ভজনমালিকা। জয়কৃষ্ণ দাসের মদনমোহনবন্দনা। গিরিবর দাসের মনঃশিক্ষা। দ্বিজ রামচক্রবর্ত্তীর মাধবমালতী। পুরুষোত্তম দাসের মোহমুদ্গর। নারায়ণ দাসের মুক্তাচরিত্র। কবিবল্লভের রসকদম্ব (ইহার পিতা রাজবল্লভ, মাতা বৈষ্ণবী, দীক্ষাগুরু নরহরিদাস—বাস করোত জাতিয় মহাস্থানের নিকট আমবাড়া, মুকুটরায় নামক বন্ধুর অনুরোধে ১৫২০ শাকে রচিত)। নিত্যানন্দ দাসের রসকল্পসার। রাইচরণ দাসের অভিরাম বন্দনা (খানাকুলের অভিরাম গোস্বামী ও জাহ্নবা ঠাকুরাণীর বৃত্তান্ত, সন ১০৯৫ সালের হস্তলিপি)। বাঙ্গলা ভক্তমালপ্রণেতা কৃষ্ণদাস বা লালদাসকৃত উপাসনাচন্দ্রামৃত।

জগন্নাথ দাসের রসোজ্জ্বল। গোপীনাথ দাসের সিদ্ধসার। রামচন্দ্র দাসের সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা, স্মরণদর্পণ। গিরিধর দাসের স্মরণমঙ্গল সূত্র। গোপীকৃষ্ণ দাসের হরিনামকবচ। বলরাম দাসের হাটবন্দনা। মালাধর বসু ও প্রসিদ্ধ কাশীরামদাসের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসকৃত ভাগবতানুবাদ, নাম যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণবিলাস ও জগন্নাথমঙ্গল। জয়নারায়ণ সেন ও তদীয় ভ্রাতৃকন্যা বিদুষী আনন্দময়ী দেবীকৃত হরিলীলা কাব্য। মাধব গুণাকরের উদ্ধবদূত। দ্বিজ নরসিংহের উদ্ধবসংবাদ। দীনহীন দাসের কিরণদীপিকা (কর্ণপূরকৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদ)। বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃত। ভবানন্দের কৃত কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা। রাজেশ্বর নন্দিকৃত ক্রিয়াযোগসার (নিত্য নৈমিত্তিক বৈষ্ণবকৃত্য)। ভবানী দাসের গজেন্দ্রমোক্ষণ। যুগলকিশোর দাসের চৈতন্যরসকারিকা ও প্রেমবিষয়ক বিলাপ। বৃন্দাবন দাসের দধিখণ্ড। জীবন চক্রবর্ত্তীর দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড। মনোহর দাসের দীনমণিচন্দ্রোদয়। নরসিংহের হংসদূত ও প্রেমদাবানল। গুরুদাস বসুর প্রেমভক্তিসার। গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত। বৃন্দাবন দাসের ভক্তিচিন্তামণি। রসিকদাসের রতিবিলাস ও শাখাবর্ণন। গৌরমোহন দাসের পদকল্পলতিকা ও পদচিন্তামণিমালা। ভাগবতাচার্য্যের (রঘুনাথ পণ্ডিতের ?) কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নামে ভাগবতের সুবৃহৎ পদ্যানুবাদ। গোবিন্দদাস কর্ম্মকারকৃত কড়চা।

মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্রের বংশজাত জগজ্জীবন মিশ্র মনঃসন্তোষিণী নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরিলিখিত পদ-কর্ত্তৃগণের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত সকলেই মহাপ্রভুর সমকালিক, আবার অনেকে পরবর্ত্তী, কিন্তু পদকর্ত্তৃগণকে প্রধানতঃ একসঙ্গেই উল্লেখ করিলাম। এতদ্ভিন্ন ছয় গোস্বামীর মধ্যে প্রত্যেকের সূচক নামক গান আছে ও কড়চা (অপরের সংগৃহীত ক্ষুদ্র স্মারকলিপি) আছে, তাহাতে অনেক প্রাচীন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। কড়চামধ্যে গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের মত বহুবিষয়জ্ঞাপক কড়চা আর দৃষ্ট হয় না। ইদানীন্তন ঐতিহাসিকরত্ন বাবু নগেন্দ্রনাথবসু ও বঙ্গ-সাহিত্যসাগরমগ্ন বাবু দীনেশচন্দ্র সেন ঐ কড়চার উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণবেতিহাসের মহোপকার করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় যে উক্ত গোবিন্দ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য তীর্থভ্রমণের সঙ্গী, তিনি স্বচক্ষুতে সমস্ত দেখিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন যে "তীর্থভ্রমণকালে দুই বৎসর মধ্যে কোন ভক্তের জন্য একদিনও নাম করেন নাই, কেবল "নরহরির" জন্য একদিন মহাপ্রভু ব্যাকুল হইয়াছিলেন", এবং অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে বলেন যে "চরণে ইষ্টক বিদ্ধ হইয়া ২।১ দিনে বেদনাবৃদ্ধি হয়, (১৫৩৩ খৃঃ) আষাঢ়ের শুক্লপঞ্চমীতে শয্যাশায়ী ও সপ্তমীতে ইহলোক ত্যাগ করেন" (কিন্তু অনেকের মতে সমুদ্রজলে ঝম্প দিয়া প্রাণত্যাগ করেন)। আর "পুরী হইতে দক্ষিণপ্রদেশ হইয়া দ্বারকা পর্য্যন্ত ভ্রমণ ও তদন্তে একবারে সমসূত্রপাতে সরলপথে পুরীতে আগমন হয়"। কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে ২১১ শ্লোকে নিজগুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের ভাগবতটীকার উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্র ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গোস্বামিপাদগণের পর সংস্কৃতভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইহার জন্ম স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম। ১৫৮৬ শাকে ইঁহার জন্ম হয়, নামান্তর হরিবল্লভ। মাতা পিতার পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। সংস্কৃত বৈষ্ণবসাহিত্যসমাজে গোস্বামিদিগের পর বিশ্বনাথের সদৃশ বহু বহু গ্রন্থরচয়িতা পণ্ডিত আর দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্ববঙ্গের রূপকবিরাজ বিশ্বনাথের জ্ঞাতি, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে ইহার জন্ম, আমি তাহার কোন প্রামাণ প্রাপ্ত হই নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রমাণ দ্বারা আমাদের সম্প্রদায়ে দুইটী মহৎ কার্যও সাধিত হয়। প্রথমতঃ ভক্তিমার্গের অন্যাঙ্গবর্জ্জিত কেবল স্মরণাঙ্গসম্বল রূপকবিরাজিদলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব আচায্যের সাহায্যে স্বসম্প্রদায় হইতে বহিস্কৃত করিয়া ভক্তিপথের গৌরবরক্ষা করেন। দ্বিতীয়তঃ—জয়পুরের সভাতে চৈতন্যসম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা করেন (পরে ইহা যথা স্থানে বিবৃত আছে)।

বিশ্বনাথের গ্রন্থাবলীমধ্যে ভাগবতের টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রথমে তাহার কথাই বলিব। তবে ঐ টীকাতে কোন কোন লোকের কটাক্ষ আছে। ইহার কথা তোষণীবিবরণে কিঞ্চিৎ উক্ত হইয়াছে, এখানে বিস্তৃতভাবে বলা যাইতেছে :—

শ্রীজীবপ্রভৃতি আচার্য্যগণ লীলার পরিপুষ্টি জন্য মায়িক ঔপপত্য স্বীকার করেন, বাস্তবিক পক্ষে করেন না। এই অংশে বিশ্বনাথী টীকার সহিত কিঞ্চিৎ অনৈক্য থাকায় তাহা অপর পক্ষের কটাক্ষের পাত্র হইয়াছে। এখানে প্রাসঙ্গিক দুঃখের কথা এই যে, প্রধান আচার্য্য শ্রীজীব ঔপপত্যকে কেবল লীলাপোষক বলিয়া মিথ্যারূপে স্বীকার করেন। কালগতিকে ঐ মিথ্যার বড়ই অভিবৃদ্ধি হইয়াছে। এজন্য পশ্চিম দেশীয় নিমার্গী ও রাধাবল্লভী সম্প্রদায় "গৌড়ীয়াগণ প্রিয়াজীকে ভগবানের খশম্ বানাইয়াছে" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঘৃণার কারণ ও যথেষ্ট। ভাগবতের রাসলীলার উদ্দীপন বিভাবের "দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং" ইহার ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"নক্ষত্ররূপ অসংখ্য পত্নীসত্ত্বে রাজযক্ষ্মরোগগ্রস্ত অতি পুরাতন জরাতুর চন্দ্র ইন্দ্রপত্নীরূপা পূর্ব্বদিগঙ্গনাতে অনুরক্ত হইয়া নিজ বংশীয় গোপবালক বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন অকৃতদার শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষা দিতেছেন যে, তোমার পরদারাভিমর্ষণে দোষ নাই।" ইত্যাদি

যাহা হউক বিশ্বনাথী টীকা যে কবিত্ব অংশে শ্রেষ্ঠ তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য। সুকবির হস্তলিখিত গদ্য পদ্য রচনাবলী তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশ্বনাথী টীকা শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভ ও তোষণী দৃষ্টে লিখিত এবং এইজন্যই তাহার নাম সারার্থদর্শিনী। বিশ্বনাথী টীকার কিঞ্চিৎ কবিত্ব বা রসিকতার পরিচয় এখানে দেখাইলাম। "জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াৎ" এই ভাগবতীয় প্রথম শ্লোকটীতে সমস্ত দর্শনের মত উদ্ধৃত আছে। ঐ শ্লোকে প্রচলিত যে সমস্ত স্বামী, সন্দর্ভ, তোষণী ও বিশ্বনাথের টীকা আছে, তাহার বিস্তৃত মৌখিক ব্যাখ্যা করিলে অন্ততঃ একমাস সময় লাগে। এতাদৃশ দার্শনিকতাপরিপূর্ণ শ্লোকেও বিশ্বনাথ আদিরসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ "আদ্যস্য শৃঙ্গাররসস্য যতো জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ।" অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাররসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এবং "অন্বয়াৎ ইতরতঃ" ইহা দ্বারা সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-রসের সূচনা করিয়াছেন। টীকাসমাপ্তির স্থান ও সময়নির্দ্দেশ এইরূপ :—

বিশ্বনাথের ভাগবতীয় টীকা প্রথম হইতে তৃতীয় স্কন্ধ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে যমুনাতটে আশ্বিনের অষ্টমীতে এবং চতুর্থস্কন্ধের টীকা যমুনাতটে বৃক্ষমূলে আষাঢ় মাসে বুধবার শুক্লপঞ্চমী তিথিতে শেষ হয়। ষষ্ঠের টীকা লেখাকালে বিশ্বনাথের শরীর জরাজীর্ণ ও আসন্নমৃত্যু ছিল। এই অংশও যমুনাতটে বৃক্ষমূলে বুধবার শুক্লনবমীতে শেষ হয়। সপ্তমের টীকা গোবর্দ্ধনসমীপে রাধাকুণ্ডতীরে পৌষমাসে কৃষ্ণা একাদশীতে শেষ হয়। অষ্টমের টীকা রাধা ও শ্যামকুণ্ডে ফাল্গুনের শুক্লষষ্ঠীতে,নবমের টীকাও এই স্থানে বৈশাখের শুক্লপঞ্চমীতে শেষ হয়। দশমের টীকাও রাধা ও শ্যামকুণ্ডতটে মাঘের কৃষ্ণ দ্বাদশীতে সম্পূর্ণ হয়। এই দশমস্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণলীলাপূর্ণ বলিয়া বৈষ্ণবগণের তাহাতে অধিক আগ্রহ। ইহার মঙ্গলাচরণেই ২৩টী শ্লোক আছে এবং মঙ্গলাচরণেই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি বয়ঃক্রম তাহার প্রভেদ এবং প্রত্যেক প্রভেদে লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এতদ্ভিন্ন রাসলীলার প্রথমে অষ্টমবর্ষীয় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দ্বারা রাসলীলা তৎপূর্ব্বে সপ্তম বর্ষবয়সে কার্ত্তিকী অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যেক তিথিতে গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলার সমন্বয় করিয়াছেন। একাদশ স্কন্ধের টীকা গোবর্দ্ধনে অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে শেষ হয় এবং দ্বাদশ স্কন্ধ টীকা রাধাকুণ্ডে ১৬২৬ শাকে মাঘমাসে শুক্লষষ্ঠীতে শেষ হয়।

উল্লিখিত বর্ণনাতে ও সময় নির্দ্দেশে বোধ হয় ভাগবতের টীকাই বিশ্বনাথের আসন্ন মৃত্যুকালের শেষ গ্রন্থ। বস্তুতঃও ভাগবতের টীকাতে যে অশেষ অভিজ্ঞতা আছে তাহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত—২০ সর্গে বিভক্ত অষ্টকালীন লীলা বর্ণনময় মহাকাব্য। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত। শ্রীরূপের হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও কৃষ্ণদাসকবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত নামক সুবৃহৎ মহাকাব্য অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১৬০১ শাকে রাধা ও শ্যামকুণ্ডের তীরে ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা প্রতিপদ সন্ধিতে রচনা শেষ হয়। ইহার ১ম সর্গে প্রাভাতিক লীলা। ২য় সর্গে কুঞ্জভঙ্গ ৩য় সর্গে রসোদ্গার। ৪র্থ সর্গে স্নানভূষণাদি। ৫ম সর্গে নন্দালয়ে গমন ও রন্ধনাদি। ৬ষ্ঠ সর্গে ভোজনাদি লীলা। ৭ম সর্গে গোষ্ঠ। ৮ম সর্গে কাননবিহার। ৯ম সর্গে কুসুমকেলী ও নর্ম্মবিলাস। ১০ম সর্গে কুঞ্জকেলী। ১১শ সর্গে হিন্দোল। ১২শ সর্গে বন-ভ্রমণাদি। ১৩শ সর্গে মধুপান। ১৪শ সর্গে জলবিহার। ১৫শ সর্গে পাশক্রীড়া ও সূর্য্যপূজা। ১৬শ সর্গে অপরাহ্ণ লীলা। ১৭শ সর্গে গোদোহনাদি সায়ন্তন লীলা। ১৮শ সর্গে অভিসারাদি প্রদোষকালীন লীলা। ১৯শ সর্গে রাসলীলা এবং ২০শ সর্গে অলস নিদ্রাদি বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ণ মাধুর্য্যলীলার বহুবিস্তৃতি আছে। সুতরাং সম্পূর্ণ রাগানুগা ভাবুক ভিন্ন অন্যের আস্বাদ্য নহে। ইহার টীকাকার বিশ্বনাথের মন্ত্রশিষ্য কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। তিনি বিশ্বনাথের স্তবামৃতলহরীর অন্তর্গত সঙ্কল্পকল্পদ্রুমের টীকায় বিশ্বনাথের রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে ২১খানী গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—সারার্থদর্শিনী

নামক ভাগবতের টীকা, গীতার টীকা, ব্রহ্মসংহিতার টীকা, চৈতন্যচরিতামৃতের টীকা (অসম্পূর্ণ), বিদগ্ধমাধবের টীকা, ললিতমাধবের টীকা, দানকেলীকৌমুদীর টীকা, আনন্দচন্দ্রিকা নামক উজ্জ্বল নীলমণির টীকা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা (দুষ্প্রাপ্য), মাধুর্য্যকাদম্বিনী, ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য), রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, রসামৃতসিন্ধুর বিন্দু, উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ, ভাগবতামৃতের কণ, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত (মহাকাব্য), স্তবামৃতলহরী, গীতাবলী, প্রেমসম্পুট (খণ্ডকাব্য), চমৎকার-চন্দ্রিকা, ব্রজরীতিচিন্তামণি। ইহার মধ্যে স্তবামৃতলহরীতেই ২৮টী স্তব আছে। যথা—গুরুতত্ব=মন্ত্রদাতৃ গুরু, পরম গুরু, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নরোত্তম ঠাকুর, লোকনাথ গোস্বামী, শচীনন্দন, স্বরূপচরিত, গোপালদেব, মদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, স্বয়ং ভগবান্, রাধাকুণ্ড, জগন্মোহন, ইষ্টদেব, বৃন্দাদেবী, নন্দীশ্বর, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড। এই ২১খানী অষ্টক। তদ্ভিন্ন—স্বপ্নবিলাসামৃত, অনুরাগবল্লী, রাধিকা ধ্যানামৃত, রূপচিন্তামণি। এই ৪খানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম ও সুরতকথামৃত। এই দুইখানী শতক কাব্য। নিকুঞ্জবিরুদাবলী এখানী বিরুদকাব্য।

এতদ্ভিন্ন সুখবর্ত্তনী নামে আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা, সুবোধিনী নামে অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকা এবং গোপালতাপনীর টীকাও বিশ্বনাথ কৃত বলিয়া দৃষ্ট হয়।

বিশ্বনাথ চৈতন্যরসায়ন নামে একখানী মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বপ্নযোগে নাকি মহাপ্রভুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। প্রথমোক্ত ভাবনামৃতখানী বিংশতি সর্গাত্মক মহাকাব্য অতি বৃহৎ ও বিবিধ রস ভাব ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। স্তবামৃতলহরীতে সমস্ত গৌরভক্তের মহিমা ও স্তব বর্ণিত আছে, এখানীও মহাকাব্য। গৌরগণচন্দ্রিকা গৌরভক্তের সংক্ষিপ্ত নাম ধামাদি পরিচয়ে পরিপূর্ণ, গৌরাঙ্গলীলামৃতে মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলাবর্ণন এখানি কোষকাব্য। স্বপ্নবিলাসমৃত ৯টী শ্লোক মাত্র। ইহার উপাখ্যান স্বপ্নলব্ধ। সে ঘটনা এইরূপ—"শ্রীরাধার স্বপ্ন দেখিয়া যমুনার মত গঙ্গাতীরে গৌরচরিত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন।" ইহাই ঐ ৯টী শ্লোকে বর্ণিত আছে। বৈষ্ণবদাস নামক ভক্ত ইহার বাঙ্গলাগদ্যে অনুবাদ করেন। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য কাদম্বিনীতে ও চমৎকারচন্দ্রিকাতে রসপরিপাটীর বর্ণনা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা চমৎকারচন্দ্রিকা কয়েকজনেরই আছে। ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি গানের গ্রন্থ।

বিশ্বনাথের রচনা অতি সরল প্রসাদগুণযুক্ত ও হৃদয়গ্রাহী। বিশ্বনাথ ভগবদ্গীতার টীকার শেষে একটী কৌতুকের কথা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই—"ইত্যহং বাসুদেবস্য" হইতে "যত্রযোগেশ্বরঃ" পর্য্যন্ত ৫টী শ্লোক যে পত্রে লিখিত ছিল, তাহার আমি টীকা করিতে পারিলাম না, কারণ, গণেশদেব নিজ বাহন আখু (ইঁদুর) দ্বারা তাহা হরণ করিয়াছেন।" এখন গীতার বাজার, মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় ঘরে ঘরে ৫০ রকমের গীতা দৃষ্ট হয়, বর্ণপরিচয়ের বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধেও গীতা পাঠে রত! আর ন্যূনাধিক ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে একটী পাতার অভাবে বিশ্বনাথ গীতার টীকা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। কি সময়ের মাহাত্ম্য !!!

গোস্বামিপাদগণের অনেক পরবর্ত্তী সময়ে উৎকলদেশীয় বলদেব বিদ্যাভূষণ নামক একজন পণ্ডিত বেদান্তের দ্বৈতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। বিশ্বনাথের শিষ্য কৃষ্ণদেবাচার্য্য সার্ব্বভৌমের অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকায় জানা যায় যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ উৎকল-দেশীয় খণ্ডাইৎ জাতি ছিলেন। ইনি মাধ্বমতের অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইনি শ্যামানন্দ প্রভুর পরিবার। বর্ত্তমান বৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ ইহার স্থাপিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ভক্তিগ্রন্থ শিক্ষা করেন। ইহাও জানা যায় যে চৈতন্য সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করার জন্য "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" নিজে রচনা করিয়া কর্ণপূরের নামে প্রচার করেন (কিন্তু অন্যত্র একথার উল্লেখ নাই)। যাহা হউক উক্ত বেদান্ত-ভাষ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের মতও সম্যক্ সমর্থিত আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান এইরূপ—

"রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক এই ৪ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ৪ খানী বেদান্তভাষ্য আছে। বেদান্তের ভাষ্য না থাকিলে সম্প্রদায় বদ্ধমূল বা সুসিদ্ধ হয় না। শ্রীচৈতন্য-দেব যদিও মাধ্বসম্প্রদায়ী কেশবভারতীর শিষ্য, তথাপি তাঁহার মত মাধ্বমতের বিপরীত অর্থাৎ "অচিন্ত্য ভেদাভেদ"। এজন্য শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত গোস্বামিশিষ্যগণকে মাধ্বসম্প্রদায়ী না বলিয়া চৈতন্যপন্থী বলা উচিত, এবং বৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজীর সেবাতেও তাহাদের অধিকার নাই, কারণ তাহারা অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব"। জয়পুরের অন্তর্গত গল্‌তার গাদীর শঙ্করমতানুগত হিন্দু-স্থানী সন্ন্যাসিগণ এই মর্ম্ম জয়পুররাজকে জ্ঞাপন করিলে, রাজা হঠকারিতায় প্রবৃত্ত না হইয়া ৪ সম্প্রদায়ের ও গোস্বামিদিগের শিষ্যদিগকে লইয়া এক মহতী সভার আয়োজন করেন। সভাতে সমস্ত পণ্ডিতগণ যথোচিত উচ্চাসনে এবং বিশ্বনাথ ও বলদেব প্রভৃতি নির্ম্মৎসর গোস্বামিশিষ্য-গণ অনুরোধসত্ত্বেও ভূতলে উপবেশন করিলেন, ইহাঁরা উক্ত মর্ম্মে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করি-লেন "গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ" ইত্যাদি প্রমাণবলে ভাগবতই বেদান্তভাষ্য, নীলাচলে সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুও এই কথাই বলিয়াছিলেন। ভাগবত রচনা করিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব অপরভাষ্যের অপেক্ষা রাখেন নাই। মাধ্বভাষ্যের মত লইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাহার বিচার পূর্ব্বক গোস্বামিগণকে উপদেশ দেন, তাঁহারা সেই অনুসারে ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে সমস্ত ভাগবতরূপী ভাষ্যাদির মত প্রকটিত করিয়াছেন।" এই কথায় এক শাঙ্কর সন্ন্যাসী স্বপক্ষ দুর্ব্বল ভাবিয়া বিচারে উদ্যত হন, বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীচৈতন্যস্বীকৃত অর্থানুসারে বিচার করিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে পরাস্ত করেন, ইহাতে পুনশ্চ বলদেবকে বলেন "কোন ভাষ্যানুগত যুক্তি লইয়া এই বিচার করিলেন" বলদেব বলিলেন ইহা শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের ভাষ্যানুগত। এবং তাঁহারা সেই ভাষ্য দেখিতে চাইলে তিনি দেখাইতে স্বীকার করিলেন। বস্তুতঃ তখন ষট্‌সন্দর্ভ ব্যতীত কোন বেদান্তভাষ্য বা সিদ্ধান্তগ্রন্থ ছিল না। এদিকে বলদেব এক মাস মধ্যে সমগ্র বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহাদিগকে প্রদর্শন করান, এই কাল পর্য্যন্ত সভা স্থগিত থাকে। ভাষ্যপ্রদর্শনের পর তাঁহারা মাধ্বসম্প্রদায়ী বলিয়া গোবিন্দসেবাতে অধিকার প্রাপ্ত হন। বলদেব শ্রীগোবিন্দদেবের শরণাগত হইলে তাঁহার স্বপ্নাদেশেই নাকি

ভাষ্য রচনা করেন এবং ইহাই "গোবিন্দভাষ্য" নামের কারণ। ইতঃপর সকলকে জয় করিয়া ঐ শাঙ্কর সন্ন্যাসিদিগের গল্‌তার গাদীতে জয়সূচক "জিতগোপাল" নামে কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপনপূর্ব্বক তাহাও অধিকার করেন। ইত্যাদি!!!

উল্লিখিত গোবিন্দভাষ্যের "সূক্ষ্ম" নামে একটী ব্যাখ্যাও গ্রন্থকার নিজে রচনা করেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পক্ষে ষট্‌সন্দর্ভের পর গোবিন্দভাষ্যই প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন বলদেবকৃত সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়রত্নাবলী, তাহার কান্তিমালা টীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্য, দশোপনিষদ্ ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, স্তবমালাভাষ্য এবং সারঙ্গরঙ্গদা নামক লঘুভাগবতামৃতের এক টীকাও প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থাবলীমধ্যে সারঙ্গরঙ্গদা ও স্তবমালাভাষ্য ব্যতীত সমস্তই দার্শনিক গ্রন্থ। দুঃখের বিষয় এতাদৃশ গোবিন্দভাষ্যের অধ্যয়ন অধ্যাপন অতি বিরল। যাহাও হয় তাহা অতি সামান্য ও সীমাবদ্ধ।

দার্শনিক গ্রন্থে প্রধানতঃ প্রমাণ ও প্রমেয় (বা বিচার ও বিচার্য্য) এই দুইটী তত্ত্ব থাকে, তন্মধ্যে প্রমাণাংশই কঠিন, এজন্য কতিপয় বৈষ্ণব তাঁহার নিকট গোবিন্দভাষ্যের প্রমেয় অংশ, কি কি? তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইলে ভাষ্যের সংক্ষেপ করিয়া অতি ক্ষুদ্রাকারে নয়টী প্রমেয় বলদেব উহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম প্রমেয়রত্নাবলী। ইহার কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল—

(১) "জয়তি শ্রীগোবিন্দো গোপীনাথঃ সমদনগোপালঃ।
বক্ষ্যামি যস্য কৃপয়া প্রমেয়রত্নাবলীং সূক্ষ্মাং॥

(২) আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

এ দুইটী মঙ্গলাচরণ। নয়টি প্রমেয় যথা—

(৩) "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং, ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাং।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

১ মধ্বমতে বিষ্ণুই পরতত্ত্ব। ২ তিনি সর্ব্ববেদবেদ্য। ৩ বিশ্ব মিথ্যা নহে সত্য। ৪ তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। ৫ জীব বিষ্ণুপদাশ্রিত। ৬ জীবের তারতম্য আছে। ৭ বিষ্ণুপদলাভই মোক্ষ। ৮ মোক্ষের হেতু বিষ্ণুর নির্ম্মল ভজন। ৯ প্রত্যক্ষ অনুমান শাব্দ এই তিনটী প্রমাণ। প্রমেয়রত্নাবলীতে এই নয়টী প্রমেয় ৯টী প্রকরণে বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণাদির বচন দ্বারা সুদৃঢ় করা হইয়াছে। বলদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক। সুতরাং ১৬২৬ শকাব্দের পূর্ব্বেও বলদেবের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়।

বেদান্ত স্যমন্তক—এই গ্রন্থ রাধাদামোদর নামক কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের রচিত। অনেকে বলদেববিদ্যাভূষণরচিত বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, প্রমেয়রত্নাবলীসম্বন্ধে পুনশ্চ

তাদৃশ ক্ষুদ্র গ্রন্থের তাঁহার প্রয়োজনও অনুমিত হয় না, গ্রন্থকর্ত্তা শেষে নিজের নাম নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"রাধাদিদামোদরনাম বিভ্রতা
বিপ্রেণ বেদান্তময়ঃ স্যমন্তকঃ
শ্রীরাধিকায়ৈ বিনিবেদিতো ময়া
তস্যাঃ প্রমোদং স তনোতু সর্ব্বদা ॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই রাধাদামোদরকে বৃন্দাবনের শ্যামসুন্দর নামক বিগ্রহের সেবাধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। তদনুসারে এই গ্রন্থ ১৪৩৫ শকাব্দেরও পরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ১৪৩৫ শকাব্দে, শ্যামানন্দ প্রভু নরোত্তমের বন্ধু ও নিত্যসঙ্গী, ঐ শ্যামানন্দ শ্যামসুন্দর সেবার অধ্যক্ষ।

এই বেদান্তস্যমন্তক দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে ৬টী পরিচ্ছেদ আছে, পরিচ্ছেদের নাম কিরণ, ইহার ১ম কিরণে প্রমাণনিরূপণ। ইহাতে চার্ব্বাকস্বীকৃত প্রত্যক্ষ, বৈশেষিক-স্বীকৃত অনুমান, কপিল ও পতঞ্জলিস্বীকৃত শাব্দ, গৌতমস্বীকৃত উপমান, মীমাংসকস্বীকৃত অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি, পৌরাণিকস্বীকৃত ঐতিহ্য ও সম্ভব। এই ৮ প্রমাণের মধ্যে স্বসম্প্রদায়ানুগত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ প্রমাণকেই সর্ব্বপ্রমাণের শিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ২য় হইতে ৬ষ্ঠ কিরণে যথাক্রমে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম। এই ৫টী প্রমেয় তত্ত্ব মীমাংসা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মাধ্বমতের ভেদবাদ এবং উক্ত ৫টী বিষয় সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় ইহাতে প্রকটিত আছে। ১ম শ্লোক এই—

"সনাতনং রূপমিহোপদর্শয়ন্নানন্দসিন্ধুং পরিতঃ প্রবর্দ্ধয়ন্।
অন্তস্তমস্তোমহরঃ স রাজতাং, চৈতন্যরূপো বিধুরদ্ভুতোদয়ঃ ॥"

চন্দ্রোদয়ে যেমন সকল রূপ দৃষ্ট হয় এবং সমুদ্র বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ চৈতন্যরূপী চন্দ্র ভগবানের নিত্যরূপ দেখাইয়া, পক্ষান্তরে সনাতন ও রূপ নামক ভক্তদ্বয়কে জগতে দেখাইয়া আনন্দসিন্ধু বর্দ্ধিত করিয়াছেন, ইহাতে জীবের মনের অন্ধকাররাশিও দূর হইয়াছে সুতরাং সামান্য বিধু অপেক্ষা ইহার ইহাই আশ্চর্য্যজনকতা।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার যদিও কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি কর্ণপূরকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বাঙ্গলাপদ্যে অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণবসাহিত্যসংসারে পরিচিত হইয়াছেন, ১৬৩৪ শকাব্দে এই অনুবাদ লিখিয়া শেষ করেন। অনুবাদটি বেশ শ্রুতিমধুর ঐ অনুবাদে কৃতিত্ব কবিত্ব, ভক্তত্ব এবং ঐতিহাসিকত্বের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থের শেষে নিজের পরিচয় এইরূপ প্রদান করিয়াছেন:—কুলনগরে ইঁহার বাসস্থান ছিল, বর্ত্তমান কোন্নগরকে কুলনগর বলিয়া অনুমান করা যায়, মহাপ্রভুর প্রকটকালে কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ জগন্নাথ বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহার পুত্রের নাম মুকুন্দ তৎপুত্র গঙ্গাদাস ইঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে তিনটি প্রথমে

অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, অবশিষ্ট তিন জন মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দরাম মধ্যম রাধাচরণ, কনিষ্ঠ পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমের গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। বাল্যকাল হইতে ইঁহার কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। ১৬ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে গিয়া তথাকার কাম্যবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে পূজারি শ্রীকৃষ্ণচরণগোস্বামিকর্তৃক গোবিন্দসেবায় নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে দেশে লইয়া আসেন এবং দেশে আসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়া চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটককে বঙ্গভাষায় পদ্যে অনূদিত করেন। বাগ্‌নাপাড়ার ঠাকুর রামাইকে ইনি গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রন্থারম্ভে শ্রীল বংশীবদন ঠাকুরকেও গুরু বলিয়াছেন। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে একজন প্রেমদাসের গুরু হইতে পারেন। রামাই বংশীবদনের পৌত্র। বংশীবদন আবার শ্রীল মহাপ্রভুর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শিষ্য। বংশীশিক্ষা নামে বংশীবদনের একখানি গ্রন্থ আছে ইহা অবগত হওয়া যায়। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস, গৌরাঙ্গপার্ষদ বংশীদাস ঠাকুরের জন্ম দিন ও শিক্ষার বিষয় ইহার বর্ণনীয়।

এখানে প্রসঙ্গাধীন অপর কথা এই যে—বিষ্ণুপ্রিয়া, রামাই ও বংশীবদনের পরিবার বলিয়া যে সকল ব্যক্তি পরিচয় দেন, তাহা সুসিদ্ধ নহে, সেই সেই স্থানে শ্রীজাহ্নবার পরিবার হওয়াই সঙ্গত। বাগ্‌নাপাড়ার ঠাকুরগণ শ্রীজাহ্নবার শিষ্যবংশীয়। কেবল বংশীবদন ঠাকুর মহাপ্রভুর সন্ন্যাসান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচী মাতার চিত্তবিনোদনার্থ মহাপ্রভুর আদেশে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি গড়াইয়া নবদ্বীপে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বাস করেন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট দীক্ষিত হন। বর্ত্তমানে নবদ্বীপের "মহাপ্রভু" নামক প্রধান মূর্ত্তি ঐ বংশীবদনের নির্ম্মিত, ইহা প্রবাদ বাক্যে অবগত হওয়া যায়।

সংস্কৃত ও বাঙ্গলাতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচলিত আছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশের ভণিতিবাক্যে নরোত্তমদাস ও কৃষ্ণদাস বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে বিন্দু, কিরণ কণাই প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বসাধারণের নিকট নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য। শ্রীরূপগোস্বামীর হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দু, উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ ও লঘুভাগবতামৃতের কণা, অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থত্রয়ের সারাংশের সংগ্রহমাত্র। কৃষ্ণদাসনামা কোন ব্যক্তি মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমীর বিবরণ পুস্তক উপাসনাপটল, গুরুশিষ্যসংবাদ, গোপীভক্তিরস, নিমাইচাঁদের বারমাসিয়া ব্রজতত্ত্বনির্ণয়, ভক্তনির্বাণ, গৌরগণোদ্দেশের পদ্যানুবাদ, অকিঞ্চনদাসের ভক্তিরসাত্মিকা, কংসবধ, কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বৃন্দাবনপরিক্রমা, নবদ্বীপপরিক্রমা, বনযাত্রা, আশ্রয়-নির্ণয়, গৌরগোবিন্দ পূজা, রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী, প্রহ্লাদচরিত, রুক্মিণীহরণ, সুধাকর কড়চা, রাধাবীজটীকা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, রসভক্তিচন্দ্রিকা, অষ্টধা শক্তিসঞ্চার, হরিনামদীপিকা, ধ্রুবচরিত, নন্দবিদায়, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, পারিজাতহরণ ও বৃন্দাবনশতক। পদাঙ্কদূত নামে একখানী দূতকাব্য অনেক দিন ধরিয়া প্রচলিত আছে তাহা প্রাচীন নহে কিন্তু রচনা বেশ শ্রুতিমধুর। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ড

ও অন্যান্য আর্ষ্য গ্রন্থের ভক্তিরসপোষক উপাখ্যান লইয়া যে কত কত ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা, আর রত্নাকরের তলদেশে গিয়া সমস্ত রত্নরাজী সংগ্রহ করা সমান কথা। তবে যথাশক্তি উল্লেখ করিলাম মাত্র। এই গুলির সময় নির্দ্দেশ কঠিন তবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বলিয়া অনুমান হয়।

মনঃশিক্ষা—বাঙ্গলা পদ্য। মহানুভব প্রেমানন্দ দাসকৃত। পার্থিব সংসারের অনিত্যতা, ধর্ম্মের নিত্যতা, রাধাগোবিন্দের রাগানুগা উপাসনা ইহার বর্ণনীয়। বহু দিন হইতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের নিকট আদৃত হইয়া আসিতেছে। মথুরাদাসকৃত বৃষভানুজা নাটিকাখানী সুন্দর কাব্যগ্রন্থ। সুগৃহীতনামা বা প্রাতঃস্মরণীয় ৺কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (নামান্তর লালাবাবু) ইঁহার শিক্ষাগুরু গোবর্দ্ধনবাসী বৈষ্ণবচূড়ামণি সিদ্ধকৃষ্ণ দাস বাবাজীর নিজ-লিখিত "ভজনগুট্‌কা" অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় ব্রজলীলাস্মরণবিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্য পদ্য পুস্তক। এগুলি রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও বনবাসী অকিঞ্চন সাধক বৈষ্ণবগণের দৈনন্দিন স্মরণার্থে ব্যবহার্য্য।

ঊনবিংশ শতাব্দী।

বর্দ্ধমানান্তর্গত মাণ্ড (মাড়ো) গ্রামনিবাসী কলিযুগ পাবনাবতার ভগবৎ শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় ৺বীরচন্দ্র গোস্বামী সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় অনেক গুলি গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের অঙ্গপোষণ করিয়া গিয়াছেন, যথা—সদাচারদেশিকা, সন্মতভূষিকা, গৌর-লীলার্ণব, পাষণ্ডমুদ্গর, জ্যোতিষরত্নাকর। চোদ্যাহারিকা (ভাগবতের ফক্কিকার উত্তর) ভাবতরঙ্গিণী নামক দশমের পদ্যানুবাদ, সন্দেহভঞ্জিকা, ভাবপ্রকাশিকা (এই চারি খানী ভাগবত বিষয়ে)। মনোদূত (দূতাখ্য খণ্ডকাব্য), কৃষ্ণলীলার্ণব (মহাকাব্য), মাধুর্য্যকাদম্বিনী, গৌরলীলাকথা, পরতত্ত্বরত্নাকর (বেদান্তবিষয়ক), ব্রজরমাপরিণয় (স্বকীয়াবাদের নাটক), গদহারি-সুধার্ণব (বৈদ্যক গ্রন্থ), ধাতুপদ্ধতি, সূত্রার্থদিপীকা (ক্রতবোধব্যাকরণের টীকা), রসিক-রঙ্গদা, (পদ্যাবলীর টীকা)। শব্দার্থবোধিনী (শ্রীজীবকৃত গোপালচম্পূ নামক মহাগ্রন্থের সম্পূর্ণ টীকা)। এই বীরচন্দ্রের সহোদর রঘুনন্দনগোস্বামীর "রামরসায়ন" নামক বাঙ্গলা পদ্য-লিখিত শ্রীরামচন্দ্রের লীলাগ্রন্থ বহুদিন বৈষ্ণবসাহিত্যসমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে। মুক্তালতা—দুর্গাদাস শর্ম্মার কৃত। শ্রীনিত্যানন্দবংশ্য কলিকাতা—নিমতলাবাসী খড়দহের শ্রীউপেন্দ্রমোহনগোস্বামী কয়খানী দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়া সিদ্ধান্ত রসপিপাসু জনগণের মহোপকার করিয়াছেন। সিদ্ধান্তরত্ন (সংস্কৃত ও বাঙ্গলাতে লিখিত), গোবিন্দভাষ্য, সূক্ষ্ম ভাষ্য, ষট্‌সন্দর্ভ সর্ব্বসম্বাদিনী এবং এতন্মতপরিপোষক শাঙ্করভাষ্য হইতে মতামত সংগ্রহ পূর্ব্বক লিখিত। ইহার প্রথম পাদে পরম পুরুষার্থ নির্ণয়। দ্বিতীয় পাদে ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি নির্ণয়। তৃতীয় হইতে ৭ম পাদে যথাক্রমে বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব, কেবলাদ্বৈত নিরাস, প্রকারান্তরে কেবলাদ্বৈতনিরাস, কেবলানুভূতিনিরাস এবং উদ্দিষ্টপুরুষার্থনির্ণয়।

বৃন্দাবনের ৺গোপালভট্টস্থাপিত ৺রাধারমণ বিগ্রহের প্রসিদ্ধ সেবাইত ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী যেন শ্রীজীবসদৃশ ৺সখালাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺গোপীলাল গোস্বামি মহারাজজি কর্ত্তৃক লিখিত বেষাশ্রয়বিধি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের ভেক লইবার পদ্ধতি গ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ভাগবতের দশমের কিয়দংশের শ্রীধরী টীকার ব্যাখ্যা, নাম দীপিকাদীপন, এই বংশে রাধারমণ গোস্বামী ইহার প্রণয়ন করিয়া ভাগবতশিক্ষার্থীর মহোপকার করিয়াছেন। কলিকাতা বেণেটোলার ৺সোণার গৌরাঙ্গসেবক খড়দহের ৺নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর বৈষ্ণবাচারদর্পণ (কৃষ্ণ ও গৌরলীলায় প্রভুভক্তগণের সম্পূর্ণ পরিচয় ও উপাসনামার্গের কতিপয় বৃত্তান্ত, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষাতে লিখিত)। বৈষ্ণব ব্রতনির্ণয় ও আমতণ্ডুলনৈবেদ্যবিচার। ইনি মহাগম্ভীর পণ্ডিত, স্বধর্ম্মাচাররক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্প ও অবস্থাপন্ন। উক্ত প্রভুপাদ বৈষ্ণবাচারসম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণের ভাগ্যদোষে কিয়দ্দিন হইল দেহান্তরিত হইয়াছেন।

সন্দর্ভাদিগ্রন্থে উক্ত সখালালগোস্বামীর শিষ্য শান্তিপুরবাসী লোকান্তরিত মহাবাগ্মী ৺মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় কাল্না হইতে চৈতন্যচরিতামৃতের এক সুন্দর সারগর্ভ ও স্বমতরক্ষক ব্যাখ্যান প্রকাশ করিয়া কুপথপ্রস্থিত বৈষ্ণবগণের মোহমুদ্গর নির্ম্মাণ করিয়াগিয়াছেন। এরূপ বিশুদ্ধ, বৃহৎ, সদর্থপূর্ণ নানাবিধ তীর্থের চিত্রসম্বলিত সর্ব্বসাধারণের প্রীতিজনক সংস্করণ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। অদ্বৈতবংশ্য নদীয়া চিৎলা নিবাসী মদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদের কৃত বিপ্রকণ্ঠাভরণ (তুলসী মালাধারণের ব্যবস্থা), দুর্ম্মতনিরসন (ব্যবস্থা), গোবর্দ্ধন পূজার সময় নির্ণয়। ক্ষুদ্র হইলেও পুস্তক তিনখানী সুবিচার ও পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। নদীয়া কুমারখালীনিবাসী তদ্বংশ্য ৺নীলমণিগোস্বামী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত চৈতন্যমতবোধিনী মাসিক পত্রিকাতে বিবিধ স্বকৃত রচনা ও সুসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া শিক্ষিত বৈষ্ণবগণের বেশ উপকার করিয়াছেন। ব্রজবাসী ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (শুক্ল) মহাশয় বহরমপুর হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ও নানাবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ (প্রায় ৪৮ খানী) দুষ্প্রাপ্য টীকা এবং স্বকৃত বঙ্গানুবাদসহিত প্রচার করিয়া বঙ্গদেশে এক নবযুগের আবির্ভাব করিয়া গিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ-সন্নিহিত নাভিচণ্ডী গ্রামোৎপন্ন পরে বহরমপুরবাসী ৺আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ মহাশয়ের গৃহে প্রচুর পরিমাণে বৈষ্ণবগ্রন্থ সংগৃহীত আছে। তৎপুত্র শ্রীগোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র সেগুলিকে গৃহদেবতার মত সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। গ্রন্থাবলীমধ্যে অনেকগুলি তাঁহার স্বহস্ত লিখিত। স্বকৃত গ্রন্থ কিছু দেখা যায় না, তবে নরহরি দাসকৃত নরোত্তমবিলাসের শেষে একটি উপসংহার বাঙ্গলা পদ্যে লিখিয়াছেন, বস্তুতঃ তদ্দ্বারা বৈষ্ণব কবি ও ভক্তগণের অনেক অপ্রাপ্য বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। নবদ্বীপের স্মার্ত্তকুলগুরু ও দ্বিতীয় রঘুনন্দনসদৃশ ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, নবদ্বীপবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট গৌরভক্ত ৺মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি, এল্, বিদ্যারণ্য-প্রকাশিত

ঈশানসংহিতাদি পুস্তক এককালে গৌরভক্তগণের মহোপকার করিয়াছে। বাঁকুড়া মালিয়াড়ার জমীদার বিচক্ষণ শ্রীগোপালচন্দ্র অধ্বর্য্যু মহাশয়ের মুক্তিপ্রদীপ, রাধাদামোদরার্চ্চনচন্দ্রিকা, বৈষ্ণবসাহিত্যের একটি অঙ্গের ভূষণ। কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থ সংগ্রাহক শান্তিপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন কৃত "বাসুদেববিজয়" নামক সংস্কৃত মহাকাব্যখানী উজ্জ্বলরত্নবিশেষ, শ্লোকপাঠে প্রাচীন মহাকবিদিগের বলিয়া ভ্রম হয়। এমন সরল ওজস্বী সংস্কৃতগ্রন্থলেখক বিরল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পারিজাতহরণার্থে যুদ্ধযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্য উদ্ধৃত হইল—

"পবিত্রচারিত্রতয়া জগত্রয়ীং, পবিত্রয়ন্ নির্ম্মলকীর্ত্তিমৌক্তিকৈঃ।
বিভূষয়ামাস কুলং কলানিধেরুদারশৌর্য্যৈকরসো রমাপতিঃ ॥১॥
ক্বচিন্ন দুর্ভিক্ষমলক্ষ্যত ক্ষিতৌ, পয়াংসি কালে মুমুচুঃ পয়োমুচঃ।
ন ভানুরত্যর্থমতাপয়জ্জগজ্জগন্নিবাসে বসতি ক্ষমাতলে ॥২॥"

কবিবরের আরও এই শ্রেণীর কাব্য ২।৩ খানী আছে, তবে তাহা বিষ্ণুসংক্রান্ত নহে।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের বংশীয় মধ্যে সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ বুধইপাড়ার ৺রাসিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের অরুণোদয়বিচার, গোবরহট্ট নিবাসী শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষের গৌরচন্দ্রোদয়, কলিকাতা রামবাগান নিবাসী পূর্ব্বতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সুপণ্ডিত ও ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ়জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা ও মহাপ্রভুর মতানুসারে ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ এবং অপরাপর অনেক গ্রন্থের বাঙ্গলা ব্যাখ্যা, এগুলি ইংরাজী ভাবসাগরনিমগ্ন বিজ্ঞানরাজ্যের প্রজা বর্ত্তমান শিক্ষিতদলের পক্ষে ভক্তিমর্ম্ম বুঝিবার পথপ্রদর্শক। কলিকাতা বাগবাজারস্থ বাবু শিশিরকুমার ঘোষের অমিয়নিমাইচরিত, কালাচাঁদ গীতা প্রভৃতি কয়খানী পুস্তক, মেদিনীপুর দাতনস্থ পূর্ব্বতন সবরেজিষ্টার বাবু মথুরানাথ দাসের বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা, নদীয়া গরুড়াবাসী রামনারায়ণ বিদ্যাভূষণের একাদশীশ্রাদ্ধনিষেধ, মালদহ মালঞ্চপল্লীস্থ মোহিনীমোহন লাহিড়ী বিদ্যালঙ্কারের রাধাপ্রেমামৃত (রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী দৃষ্টে সুমধুর সংস্কৃত কবিতাতে নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, বস্ত্রহরণ ও দানলীলা বর্ণন), মুর্শিদাবাদ পাঁচথুপী নিবাসী গৌরগোপালশিরোমণির সংস্কৃত কাকদূত, খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসন্নকুমারগোস্বামীর সঙ্কলিত অভিরামলীলামৃত, শান্তিপুরবাসী মদীয় সুহৃদ্বর স্বর্গীয় কালিদাস নাথের ধুলোটদর্শন ও অপরাপর প্রবন্ধ, বর্ত্তমান কালে সাধারণের মহোপকার সাধন করিয়াছে। তদ্ভিন্ন একজন আসামী ভক্ত দিবাকর শর্ম্মা মিনতি নামে এক ক্ষুদ্র পদ্যপুস্তক রচনা করেন, তাঁহার উপাদান স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান হইতে সংগৃহীত। উপাখ্যানটী এই :—"যোন্না মাঘমাসর রাতি সপোন ত দেখিল যে, সকনৈ এখনেদি ভাটি মুয়ে গৈ থকি" ইত্যাদি। স্তবগুলি ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ইহাতে বাঙ্গলা, আসামী, সংস্কৃত, উড়িয়া ও অর্দ্ধবাঙ্গলা ভাষার সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। শর্ম্মা মহাশয় আসামী বৈষ্ণবসাহিত্যের লেখকের অন্যতম, ইহার টিপ্পনীও আসামী ভাষাতে লিখিত।

ভজনসঙ্গীত।

হিন্দী, ব্রজভাষা, উড়িয়া আসামী এবং বাঙ্গলাভাষাতে বৈষ্ণবগণের অনেক ভজনসঙ্গীত শুনা যায়, যথা—শেষ রজনীর মঙ্গল আরতি, প্রভাতিকীর্ত্তন, মধ্যাহ্নের নাম সঙ্কীর্ত্তন, ভোগ আরতি, সন্ধ্যাকালে আরতি কীর্ত্তন, ইহা ছাড়া টহলের কীর্ত্তন (ভিক্ষুকগণ গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী কীর্ত্তন করে)। নগরকীর্ত্তন। এই গুলি কোথাও নিজ নিজ ভজনের জন্য কোথাও বা জীবিকার জন্য আলোচিত হয়। মৃদঙ্গ ও করতালই ইহার প্রধান যন্ত্র, এগুলি গোস্বামী ও বাবাজীদিগের একচেটিয়া। বস্তুতঃ ঐ গানমালা বড়ই শ্রুতিমধুর, প্রেমপূর্ণ ও ভক্তিরসের উদ্বোধক।

যাত্রার গান।

জাহাঙ্গীরপাড়া কৃষ্ণনগর নিবাসী ক্ষণজন্মা সুকবি স্বর্গীয় গোবিন্দ অধিকারী মহাশয় একদিন স্বকৃত তান লয় সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গানদ্বারা বঙ্গীয়সাহিত্যকাননকে আন্দোলিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও বঙ্গদেশের প্রাচীন লোক তাঁহার অদ্ভুত রচনাশক্তির গৌরবে মুগ্ধ, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বর্দ্ধমান প্রদেশান্তর্গত ধাওয়াবুনী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই উপযুক্ত গুরুর কীর্ত্তি বজায় রাখিয়া বঙ্গদেশে প্রাচীন স্রোতোদ্বারা জনগণের কর্ণকুহরে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছেন। গোবিন্দের—"শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি, ধরেছি নয়নফাঁদে, তারে হৃদয়পিঞ্জরে, রাখিতাম ভ'রে প্রেমশিকলিতে বেঁধে"। এবং "বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের। রাই আমাদের আমরা রায়ের, রাই আমাদের। শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রে ছিল, সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, নইলে পারবে কেন" ইত্যাদি। নীলকণ্ঠের—"কিবা তমাল পাশে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়াল রে। কিম্বা নব নীরদ বামে দামিনী হেঁসে দাঁড়ালরে"। এবং "কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার"। "সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুতলে। মান নিলে মন নিলে প্রাণ পড়ে পদতলে।" ইত্যাদি পদাবলী অদ্যাপি লোকের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে। অনেক ভিখারী বেহালা তবলা সহযোগে গোবিন্দ ও কণ্ঠের গান গাহিয়া জীবিকা সঞ্চয় করিতেছে। এই সকল যাত্রার গানের সাধারণ নাম কালিয়দমন। সখীসংবাদ, অক্রুরসংবাদ, সবগুলিই কৃষ্ণবিষয়ক। এ ছাড়া দাশরথি রায়ের মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন বস্ত্রহরণ গানও অশেষ কবিত্বের পরিচায়ক। তৎপরে শ্রীধরকথক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ও রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি অনেক বাঙ্গলা কবি বৈষ্ণব সাহিত্যের শেষ অঙ্কে অনেক দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানমধ্যে নীলকণ্ঠ ও কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত গানমালা প্রাচীন ও নব্যদলে বিশেষ আদৃত।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে রামনিধি রায় (নিধুবাবু), রাম বসু, হরুঠাকুর (সভাবাজারস্থ রাজা নবকৃষ্ণের সভ্য), রাসু, নৃসিংহ, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, যজ্ঞেশ্বরী, ভোলাময়রা, রামরূপ ঠাকুর (পূর্ব্ববঙ্গের), কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ইত্যাদি কবিওয়ালাগণ নানাবিধ সাময়িক গদ্য

পদ্যাত্মক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে এক যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, নিমাইসন্ন্যাস, বিচিত্রবিলাস, ভরতমিলন, নন্দহরণ, সুবলসংবাদ। এক কালে বঙ্গীয় রসিকসমাজে সুভিক্ষকালে নিশ্চিন্ত গৃহবাসী লোক পল্লীতে পল্লীতে চক্কা, ঢোল, মৃদঙ্গ ও সানাই বাদ্য সমন্বিত উক্ত কাব্যের গীতকোলাহলে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। বর্ত্তমান কালেও পল্লীগ্রামে সেই প্রাচীন ছায়া দেখা যায়, তবে দুরন্ত সর্ব্বনাশী অন্নাভাব লোককে ক্রমে ক্রমে সে সব উৎসবকোলাহল হইতে সুদূরে ফেলিয়া দিতেছে। হা মাতঃ বঙ্গভূমি, তুমি কি ছিলে, আর দিন দিন কি হইতেছ?

মুসলমান-বৈষ্ণবকবি।

অনেকে মনে করেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে সুতরাং মুসলমানকেও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। একথা বলিবার কারণ, হরিদাস মুসলমান ও নবদ্বীপের কাজী সাহেব মুসলমান। হরিদাস মহাসাধু, লোকসমাজে না মিশিয়া শ্রীক্ষেত্রে সাগরতীরে বাস করিতেন। জগন্নাথদেবকে মন্দিরে উঠিয়া দর্শন করিতেন না। কাজী প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে বাধা দিয়া শেষে প্রেমে মত্ত হন, প্রভু তাহাকেও লইয়া কীর্ত্তন করেন। ইহা এক দিনের ঘটনা। এই ব্যাপারে প্রভু কর্ত্তৃক মুসলমানকে দীক্ষিত করা কি করিয়া বুঝিব। প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে জগাই মাধাইর মত ঘোর মদ্যপায়ী শাক্ত মজিয়াছিল, তাহাতে প্রকৃতিস্থ কাজির মত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। অনেক অদূরদর্শী লোক রূপসনাতনকেও মুসলমান বলে, তাহা অত্যন্ত ভ্রান্তি। তোষণীর শেষে তাঁহাদের পরিচয়ে জানা যায়, তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ। গৌড় বাদসাহের কার্য্য করিয়া সংসর্গ জন্য নিজেকে হীন ভাবিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে যাইতেন না। তখন জাতি ছিল, সংসর্গেও জাতি যাইত, এখন প্রায় লোকের জাতি নাই সুতরাং উচ্ছিষ্ট খানা খাইয়াও জাতি যায় না। হরিদাসের মুসলমানত্ব সম্বন্ধে গোল আছে। ভগীরথকৃত প্রাচীন বাঙ্গলা পদ্যগ্রন্থ চৈতন্যসঙ্গীতে দেখিতে পাই, ছয়মাস বয়সে মাতাপিতৃহীন হন, এজন্য প্রতিবেশি মুসলমানদ্বারা দুগ্ধপানে প্রতিপালিত। উৎকৃষ্ট পারশী জানিতেন বলিয়া দিল্লীশ্বর রূপও সনাতনকে "দবীর খাস ও সাকরমল্লিক" উপাধি দেন উহা নাম নহে। উপাধির অর্থ, ঈশ্বরের উত্তম আজ্ঞাভাজন ও মর্য্যাদাসম্পন্ন বুদ্ধিমান্। মহাপ্রভু ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের ঘরে অন্নাদি ও সৎ শূদ্রাদির ঘরে ফল মূলাদি খাইতেন, ইহা দ্বারাও বুঝিলাম তিনি সংসারাতীত হইলেও সংসারের নিয়ম সম্পূর্ণ মানিতেন, তবে ভগবদ্ভজনে সর্ব্ববর্ণের অধিকার ইহা তাঁহার মত। প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত নিষ্কিঞ্চন সাধু হিন্দু হউন মুসলমান হউন তিনি চিরদিন সকলের পূজ্য বা ভক্তির পাত্র, ইহা মহাপ্রভু মানিতেন এবং এখনও জ্ঞানিজন মানিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর অপরের পক্ক আহারাদিসম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ছিল সেই নিয়ম এ কাল পর্য্যন্ত সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবসমাজে চলিয়া আসিতেছে।

গোস্বামী দূরে থাক হিন্দুর আচারেও বর্জ্জিত বৈষ্ণবনামধারী নূতন রকমের স্বেচ্ছাবিহারী তান্ত্রিকের অনুকরণে ইতঃপূর্ব্বে দুইটী দল হইয়াছে, তাহার নাম দরবেশ ও বাউল। শব্দ দুইটী মুসলমান ফকির ও উন্মত্তবোধক। উহাদের আহার বিহারের বন্ধন একেবারেই নাই, অথচ তাহাদের মধ্যে একপ্রকার বৈষ্ণবসাহিত্য দৃষ্ট হয়, তাহা "বাউলের গান" ও "দরবেশী গান" নামেই বিখ্যাত। তবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামগন্ধ কিঞ্চিৎ পাওয়াযায় বলিয়াই ঐ গুলিকে বৈষ্ণবসাহিত্যের শেষভাগে উল্লেখ করিলাম। তাহার মধ্যে অধিকাংশই দেহতত্ত্ব ও নায়কনায়িকা ঘটিত পীরিতি বা প্রীতির বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ, স্থলবিশেষে তান্ত্রিকের অনুকরণে রেচক, পূরক ও ইড়া, পিঙ্গলাদি ঘটিত এবং দেহের মধ্যে বৃন্দাবন সাজান, রাধাকৃষ্ণ সাজান ইত্যাদি ভাবও দৃষ্ট হয়। তাহার অনেক কথা হেঁয়ালীর মত, একেবারে অজ্ঞেয়, যে জানে সেই জানে, অন্যের কাছে বানরের বুলি।

উল্লিখিত দল ব্যতীত, অত্যল্প পূর্ব্বকালের মুসলমানসমাজভুক্ত লোকের মধ্যে ধর্ম্মভীরু হিংসাদিবিহীন ও জ্ঞানালোচনাপরায়ণ অনেক ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যেও আবার অনেকে বহুতর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীও রচনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে এখন সাহিত্যিকগণ "মুসলমান বৈষ্ণবকবি" বলিয়া থাকেন। আমি এখানে ধর্ম্মাচারপরায়ণ অর্থে বৈষ্ণব শব্দ ব্যবহার করিলাম না, কিন্তু বিষ্ণুর গুণগায়ক এই অর্থে ধরিয়া লইলাম। এইরূপ বৈষ্ণবকবির গানের ও জীবনীর পরিচয়সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম, বাবু দীনেশচন্দ্র সেন, বাবু রমণীমোহন মল্লিক ও বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল সরস্বতী মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। শেষোক্ত সরস্বতী মহাশয় আমাকে তাঁহার নিজপ্রকাশিত মুসলমান বৈষ্ণব কবির গ্রন্থ তিন খণ্ড উপহার দিয়া আমার তদ্বিষয়ক আলোচনার পথ সুগম করিয়াছেন। এজন্য সরস্বতী মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। উক্ত গ্রন্থে আমি ২৪ জন মুসলমান্ বৈষ্ণব কবির নাম প্রাপ্ত হইলাম। যথা—১ আকবর আলি। ২ কবীর। ৩ করম আলি। ৪ নসির মামুদ। ৫ ফকির হবির। ৬ কতন। ৭ সালবেগ। ৮ সেখ জালাল। ৯ সেক ভিক্। ১০ সেখ লাল। ১১ সৈয়দ মর্ত্তুজা। ১২ আকবর সাহা। ১৩ সৈয়দ আইনদ্দিন। ১৪ মীর্জা ফয়েজুল্লা। ১৫ আফ্জল আলি। ১৬ সৈয়দ নাজিরউদ্দীন। ১৭ হাসিম। ১৮ গয়াজ। ১৯ আলাওল। ২০ সেরচাঁদ। ২১ আলিরাজা। ২২ মহম্মদ আলি। ২৩ মোহন আলি। ২৪ সৈয়দ সুলতান। এই সকলের মধ্যে প্রায় অনেকেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী, কারণ তাঁহাদের রচনাতে খাঁটি শিলেটি ও ঢাকাই ভাষার প্রাবল্যই তাহা বুঝাইয়া দেয়।

এতন্মধ্যে কতিপয় বিখ্যাত লোকের পরিচয় এই—সুবিখ্যাত পদকল্পতরু গ্রন্থে সৈয়দ মর্ত্তুজার কতিপয় গান দৃষ্ট হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরসন্নিহিত বালিয়াঘাটায় সৈয়দ মর্ত্তুজার জন্ম হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বেরেলীজেলায় পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল। জনশ্রুতি যে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জঙ্গীপুরের নিকট চড়কা নামক স্থানে রাজাক সাহেবের শিষ্য হইয়া তত্রত্য সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে এক আস্তানা করেন। অদ্যাপি

তথায় তাঁহার সমাধি আছে। ব্রজসুন্দর বাবু শ্রীহট্ট হইতে মর্ত্তুজার অনেক পদ প্রাপ্ত হইয়া সেই পদকর্ত্তাকে এই মর্ত্তুজা বলিতে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। পদকল্পতরুর সংগ্রাহক বৈষ্ণব-দাস মুর্শিদাবাদের লোক, তিনি যে মর্ত্তুজার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন তিনি এই জঙ্গীপুরজাত বলিয়াই বিশ্বাস হয়, কারণ উভয়ের বাস এক জেলায়, শ্রীহট্টের মর্ত্তুজা যে ইনি নহেন তাহাও বলা যায় না, ফকির লোকের নানাদেশে বিশেষতঃ মুসলমানপ্রধান শ্রীহট্টে গমন অসম্ভব নহে। হয়ত শ্রীহট্টে রচিত পদাবলী বৈষ্ণবদাসের অগোচর ছিল। মর্ত্তুজা হিন্দুদিগের তান্ত্রিক ভাবাপন্ন ও সুরাসেবী ছিলেন, আনন্দময়ী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার ভৈরবীরূপে সহচরী ছিলেন। মর্ত্তুজার একটী পদ এই :—"পার কর পার কর মোরে লইয়া কানাই। কানাই মোরে পার কর রে। (ধ্রু)। ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার। নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ায় পাই পার। হইল হাটের বেলা না হইল বিকাকিনি। মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি। সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে রাধে গোপালিনী। কানাইয়ের বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী।" মর্ত্তুজার রচনা প্রাণখোলা ও সরল, ছন্দ বন্ধ অলঙ্কারের বাঁধাবাঁধি নাই, কিন্তু ভক্তি বা প্রেম তাহাতে পরিস্ফুট।

আলিরাজা ওয়াহেদ কানু—ইনি ফকির হইলেও হজরত মহম্মদ মুস্তফাকে মানিতেন ও দেশে দেশে ভ্রমণ না করিয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহে থাকিতেন। জ্ঞানসাগর, ধ্যানমালা, সিরাজকুলুপ প্রভৃতি দরবেশী গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। চলিত নাম কানু ফকির। সাহা কেরামদ্দীন দীক্ষাগুরু (পীর)। যোগকানন্দর ও ষট্‌চক্রভেদ ইঁহার তান্ত্রিক গ্রন্থ। তান্ত্রিক রচনা এই-রূপ :—"মনের কল্পনা সঙ্গে পবনের সুতে। ধ্বনিমূলে ধ্যান ঘন টানিব ইঙ্গিতে॥ ধ্বনিমূলে ব্রহ্মনাম বায়ুর সঙ্গতি। সেই নামে পবন চলয়ে নিতি নিতি॥ সেই ধ্বনি পরম হংস কহে সিদ্ধগণ। হংস নামেতে তেজ নির্ম্মল তিন মন॥" ইত্যাদি। আবার গানেও প্রায় মধ্যে মধ্যে তান্ত্রিক ভাব দৃষ্ট হয়। "বৃন্দাবনে রসরঙ্গে রহিয়াছে হরি। তান হেতু ষোলশ গোপিনী কহি মরি। গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেম ধরে। প্রেম খেলে নানারূপে প্রতি ঘরে ঘরে॥"

এতদ্ভিন্ন আলাওল, নাজির মহম্মদ, এবাদোল্লা, আবাল ফকির, মহম্মদ হানিফ্, আলিমদ্দিন প্রভৃতি আরও কয়টী কবির নাম দেখা যায়, ইঁহাদের রচনা বড় সুন্দর, প্রাচীন হিন্দু বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের রচনা হইতে পার্থক্য অতি সামান্যই অনুভূত হয়। ২। ৪ পঙ্‌ক্তি অবিকল দেখান গেল—"ননদিনী, রস বিনোদিনী, ও তোর কুবোল সহিতাম নারি, ঘরের ঘরণী, জগতমোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি। বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি॥... অঘোর সাঁজুয়া বেলা, কি বোল বলিয়া গেলা, সাঁচ যদি না আছিল মনে॥··· ঠিক্ দুপুরিয়া বেলা, কদমতলে নিদ্রা গেলা, মুরড়ি লইয়া গেল করে। নিদ্রার আবেগে রাই, ঘুমেতে চৈতন্য নাই, মুরড়ি লইয়া গেল চোরে॥"

মুসলমান বৈষ্ণবকবিদিগের অনেক পদ ও পুস্তক আছে, তাহার অল্পই উল্লেখ করি-লাম, অধিক উল্লেখের স্থানাভাব। প্রবন্ধাংশের এই খানেই শেষ করা গেল।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে যে প্রেমবন্যা আনিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত দেশ ভাসিয়াছিল, কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই সে বন্যাতে বঞ্চিত হয় নাই। আপামর সাধারণ সে প্রেমবন্যাতে ডুবিয়াছিল। বাহ্য বুজরুকি-পরিপূর্ণ বর্ত্তমান বিপ্লবকালে ধর্ম্মের স্থানে যে কেবল ব্যবসাদারী ও লোকভুলান শঠতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কি শেষ হইবে না। হায় ভগবন্! সে শুভদিন কি আর আসিবে। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! আপনি যে শিক্ষা বাঙ্গালীকে দিয়া গিয়াছেন, যে ভাবে আপনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সংশয়িতচেতাঃ ও ইন্দ্রিয়সেবী বাঙ্গালীর ভাগ্যে কি সে শুভদিন আর হইবে না। হতভাগ্য বঙ্গবাসী কি আপনার সেই সুশিক্ষা ও প্রেমবন্যার বিন্দুলাভেও সমর্থ হইবে না?

সমালোচনা ও সমাজ।

"তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বেদবাক্যই অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের বিবাদক্ষেত্র। পঞ্চম বেদ ভাগবতাদি পুরাণে দ্বৈতবাদ সুস্পষ্ট থাকায় দ্বৈতাচার্য্যগণ নীরব ছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহাতে নিজ ধীশক্তির সাহায্যে লক্ষণা দ্বারা অদ্বৈতবাদ আবিষ্কার করিলে পর রামানুজাচার্য্য শ্রুতি যুক্তি অনুভব দ্বারা অপ্রাকৃত রূপগুণাদিবিশিষ্ট অদ্বৈত অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের সিদ্ধান্ত করিয়া, চিৎ অচিৎ ঈশ্বর, এই তিন তত্ত্ব মীমাংসিত করেন। তৎপরে মধ্বাচার্য্য প্রত্যক্ষ অনুমান ও বেদ প্রমাণে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও অস্বতন্ত্র জীব এই দুই তত্ত্ব বিচারসিদ্ধ করেন। অপর নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী দুই সম্প্রদায় ইঁহার অনুগত। শঙ্কর ও রামানুজের মতভেদ ছিল, কিন্তু উভয় মতের প্রসার সমান। অধিকারদৌর্ব্বল্য বা কালমাহাত্ম্যে শঙ্করমতের অধস্তন সম্প্রদায়ে শৈবাচার এবং রামানুজমতে রামানন্দ, তুলসীদাস ও কবিরাদিদ্বারা ক্রমে মূল বৈষ্ণবাচারের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। শেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, "ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিময়" বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব প্রচার করিলে পর, তদনুগত গোস্বামিবর্গ সেই মতের অনুসরণ করেন। পূর্ব্বোক্ত মতাবলী সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া বলিতে গেলে তত্ত্ববিচারপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের ও রামানুজ মধ্ব প্রভৃতির বিচার প্রণালী স্বতন্ত্র। পক্ষবিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষ বলা যায় না। তবে মাধ্ব মত লইয়া এই বলিতে পারি যে, লক্ষণাশক্তি শক্তিপ্রতিপাদ্য বস্তুতে খাটে, অশক্য ব্রহ্মে খাটে না, তাহা কেবল বেদবেদ্য। উল্লিখিত ব্যাপার সন্দর্শনে জানা যায় যে, পৌরাণিক দ্বৈতমতের পর শঙ্করের বিচার প্রণালীর অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তৎপরে দ্বৈতাচার্য্যগণ পূর্ব্বসিদ্ধ দ্বৈতবাদকে বিচার করিয়া বদ্ধমূল করেন। যাহা হউক প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উচ্চতম আচার্য্যশ্রেণীতে উন্নতি বই অধোনতি লক্ষিত হয় নাই, তাহা পরে উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্বসম্প্রদায়ীরা শঙ্করিদলকে "মায়াবাদমতান্ধকারমুষিতপ্রজ্ঞ" বলিয়া কটাক্ষ করিলেন, আবার শাঙ্করি পঞ্চদশীকার দ্বৈতাচার্য্যগণকে বলিলেন—

"নির্ব্বিশেষপরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।"

"মূঢ়বুদ্ধিগণ নির্ব্বিশেষ পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ হইয়া সবিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া থাকেন"। পরবর্ত্তী সময়ে ইত্যাকার দ্বেষাদ্বেষির সৃষ্টি সংঘটিত হইল।

ইহারও বহুদিন পরে অদ্বৈতাচার্য্য শঙ্করমঠে ধনলোভে বা লোকরঞ্জনজন্য শিবদুর্গাদির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তথায় কাপালিকতা এবং তৎপরে তন্ত্রাচার প্রবল হইয়া পশুবধাদি সুরাপানাদি ও অন্যবিধ সাত্ত্বিকতার ভানে "কুমারীসাধন" নামে ব্যাভিচারের স্রোত প্রবল হইয়া উঠিল।

অপর দিকে এই ব্যাপারের পর (১৭) জ্ঞানবিশেষ যে ভক্তি, তাহার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন কাণ্ড সম্পূর্ণ প্রেমসহকারে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইল। মহাপ্রভুর পর শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিগণ তাহা শাস্ত্রীয় বন্ধনে সুদৃঢ় করিলেন। তৎপরে শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীজীবসমীপে উপাধিপ্রাপ্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতা হইয়াও কীর্ত্তন, মহোৎসব ও বৈষ্ণবসেবায় মন দিলেন, শাস্ত্রচর্চ্চা হ্রাস পাইল। বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তে প্রেমের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। তবে সুখের বিষয় যে, অনধিকারী বামন সেই ধর্ম্মবৃক্ষের সর্ব্বোর্দ্ধ চূড়াস্থিত প্রেমফলে হাত বাড়াইতে পারিল না। অনেক দিন পর বামনও উদ্বাহু হইল, আপামর সাধারণে আশ্রমাচার ছাড়িয়া প্রেম প্রেম করিয়া পাগল হইল, ভগবৎপ্রেমের স্থল ইন্দ্রিয়সেবীদিগের রঙ্গভূমি হইল। নিজের উদারতাগুণে ইহাঁদের সময় বেশ কাটিল। তৎপরে বীরভদ্রগোস্বামি-প্রভু জাতিনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণব করিবার পথ দেখাইলেন। এই সময়েও বিষ্ণু উপাসনার প্রাধান্য ছিল, কেবল বাহ্যানুষ্ঠানের গৌরব ছিল না। এই ব্যাপারের কিছুদিন পূর্ব্বে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্যের অনেক পরে বলদেব ও বিশ্বনাথও পূর্ব্বমতের অনুগমন করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদাসের আচার ব্যবহার গোস্বামিসম্মত ছিল। তাহার পর চরিতামৃতের গৌরব দেখিয়া অনেকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার নামে, কেহবা নরোত্তমের নামে প্রচার করিলেন। ইহার পর হইতে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতে শাস্ত্রসম্মত পরাধীনতার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা স্থান পাইল। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় চরিতামৃতের প্রকৃত অর্থগুলি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার প্রসার হইল। ইত্যাকার শাস্ত্রাচারবিহীন স্বেচ্ছাচারিতা বঙ্গদেশপ্রচলিত প্রধান দুই সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়, যেমন শাক্তমধ্যে পঞ্চ মকারের অন্তর্গত ব্যাপার, যথা—পূর্ণাভিষেকে খপুষ্প, স্বয়ম্ভূপুষ্প, কুণ্ডপুষ্প, গোলকপুষ্প ও বজ্রপুষ্প। এগুলির অর্থ লোকসমক্ষে বিশেষতঃ ভদ্র-সমাজে উচ্চার্য্য নহে, অত্যন্ত অশ্লীল ও উক্ত পদার্থগুলি অস্পৃশ্য। অপর অধঃপতিত বৈষ্ণবদলে ৪ চন্দ্রসাধন। এই ৪ চন্দ্র ও ঐ পাঁচপ্রকার পুষ্পের তুল্য। উভয় সম্প্রদায়ে এই অধঃপাতের মূল

---

(১৭) কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড, বেদ এই ত্রিকাণ্ডাত্মক। ইহার মধ্যে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। জীবব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান। সগুণব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপার উপাসনা। প্রথম ও তৃতীয়টী অনিত্য। দ্বিতীয় জ্ঞানই নিত্য বস্তু। এজন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিকে কর্ম্ম বা উপাসনার মধ্যে না ধরিয়া "জ্ঞানবিশেষ এব ভক্তিঃ" এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভক্তিকে বেদপ্রতিপাদ্য ও বেদের চরম ফল বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন।

শাস্ত্রজ্ঞান ও সৎসঙ্গের অভাব বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ সর্ব্বাপেক্ষা এই দুঃখ যে, সকলেই ঐ কুকার্য্যকে ধর্ম্মজ্ঞানে সম্পাদন করিয়া থাকে, কেহ তাহাকে পাপজ্ঞান করে না।

আলোচ্য বৈষ্ণবসাহিত্যের মধ্যে নগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকই ঐ সকল পাতিত্যের পথ-প্রদর্শক, কিন্তু শাক্তসম্প্রদায়ে ইদানীন্তন স্বকপোলকল্পিত সংস্কৃত ভাষার তন্ত্রশাস্ত্রই কুপথের মূল। ইহাতে জানিলাম বৈষ্ণবসাহিত্যরাজ্যে সংস্কৃত বা ঠিক তদনুগত বাঙ্গলাসাহিত্যে কুপথ দেখায় নাই, কিন্তু সংস্কৃত নবীন তন্ত্র তাহা দেখাইয়াছে। এবিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্র, নিত্যতন্ত্র, গুপ্ত-সাধনতন্ত্র এবং অপর পক্ষে বাউল, দরবেশ ও সহজিয়াদিগের রচিত বাঙ্গলা পদ্যগদ্যাত্মক কড়চা, বিবর্ত্তবিলাস ও দেহতত্ত্ববোধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ধরা যাইতে পারে।

আর এক কথা। বৈষ্ণবসাহিত্যের পর যে প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ ও সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ গ্রন্থকে অনেক লোক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রেম-বিলাস নানাস্থানে নানা লোকের দ্বারা লিখিত হওয়াতে অনেক স্থলে পূর্ব্বাপর ক্রমবিহীন কথা দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ীয় শ্রেণীর, তাঁহার কন্যা গঙ্গা বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্বা-চার্য্যের হস্তে অর্পিত হয়েন। ইহাও সম্প্রদায়বিশেষের আপত্তির কারণ। অপিচ "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার কুলজী শাস্ত্রের প্রমাণে দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক মহাপ্রভুর মাতামহ বিষ্ণুদাস চক্রবর্ত্তী একটী রাঢ়ীয় কন্যাগ্রহণের জন্য দেশত্যাগপূর্ব্বক ফরিদপুরের মুক্-ডোবা গ্রামে বাসুদেব মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক কালযাপন করেন। নিত্যানন্দ প্রভু সুবর্ণবণিক্ উদ্ধারণ দত্তের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি প্রদর্শন এবং ভিন্নশ্রেণীতে কন্যা দিয়া উভয় শ্রেণীর বংশগত একতাদ্বারা সমাধানপূর্ব্বক মীমাংসা করেন। অদ্বৈত প্রভুর ঊর্দ্ধতন পুরুষ নৃসিংহ লাড়িয়াল কন্যাদায়বশতঃ শালগ্রাম ও ধেনু লইয়া পাত্রের বাটীর সম্মুখে নদীতে মগ্ন করিতে উদ্যত হয়েন ও তাম্বূলবিক্রয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া সমাজে অনাদৃত হন। প্রেম-বিলাস ও কর্ণানন্দে আছে—শ্রীনিবাস আচার্য্য উদাসীনভাবে কৌপীন বহির্ব্বাস পরিধান ও কীর্ত্তনানন্দবশতঃ বৈদ্যজাতি রামচন্দ্র ও কায়স্থ নরোত্তমের স্পৃষ্টান্ন ভোজন করেন (১৮)। এ সমস্ত কথায় তত্তদ্বংশীয় ঠাকুর ও গোস্বামিগণ প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। আমি কেবল যাহা দেখিয়াছি তাহারই উল্লেখ করিলাম। কেবল প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দেই সমাজবিরুদ্ধ প্রথা আছে এমন নহে, গৌড়ে ব্রাহ্মণধৃত কুলজী গ্রন্থেও উক্তরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। লেখাগুলি সত্য হইলে, এসমস্ত ব্যাপার সমাজাপেক্ষা ভক্তের গৌরবঘোষণার জন্য কি প্রেমোন্মাদবশতঃ হইয়া-ছিল, তাহা মাদৃশ ক্ষুদ্রধী ব্যক্তির অগম্য। সুতরাং প্রতিবাদ কর্ত্তব্য হইলে উক্ত গ্রন্থাবলী দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়, লেখক কেবল অনুবাদক মাত্র।

তৃতীয়তঃ সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের লেখক মুকুন্দ দাস। গোস্বামিমতানুগত মহাত্মাদিগের সহিত ইঁহার বৃন্দাবনে বসবাস ও তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতাই লক্ষিত হয়, তবে মুকুন্দকে

(১৮) বহরমপুরের প্রেমবিলাস ১৭ বিলাস, ১৭৩ পৃঃ। এবং কর্ণানন্দ, ৩ নির্য্যাস ৪৪, ৪৫ পৃঃ।

চিরদিন লোকে সহজিয়া বলিয়াই ঘোষণা করেন, ইহা জনশ্রুতি। গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বত্রই গোস্বামিদিগের কথার অনুবাদ করিয়াছেন। বৈধভক্তি অপেক্ষা প্রীতি বা অনুরাগের গৌরব দেখাইতে এবং "নিষিদ্ধাচারকারীচ মদ্ভক্তঃ সর্ব্বদা শুচিঃ" ইহা প্রতিপাদন করিতে কয়টী উপাখ্যান তুলিয়াছেন। ইহাতে মুকুন্দনামক অপর কোন ব্যক্তির সহজিয়া গ্রন্থ দেখিয়া এই মুকুন্দকে সেই সহজিয়া দলভুক্ত করিতে আমি ইচ্ছুক নহি, তাঁহার গ্রন্থখানী হেয় বলিয়া বোধ করি না। তাঁহার জীবনীতে তাঁহাকে বিশুদ্ধাচারী বলিয়া ধারণা হয়। কেহ কেহ পূর্ব্বকথিত প্রেমবিলাস ও সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়কে হেয় করিলেও কয়টী বিবাদাস্পদ কথা ব্যতীত অপরাংশে উহার স্থান উন্নত।

ব্যবহার দেখিয়া সর্ব্বশেষে বলিতেছি, গোস্বামিগণ ও তৎপরবর্ত্তী ভক্তগণ কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় ভক্তগণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বিভিন্ন অবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এবং সমস্ত গ্রন্থেই সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার তৎসম্বন্ধে প্রাচীন অর্ব্বাচীন অনেক আর্ষ বচন দৃষ্ট হয়, কিন্তু গৌরভক্তগণকে বৃন্দাবনের ও অন্য ধামের শ্রীকৃষ্ণপরিবারবর্গের অবতার বলিয়া যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে কর্ণপূর বর্ণন করিয়াছেন, তাহার কোন মূল আর্ষগ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। ঐরূপ গ্রন্থ করা কি গতানুগতিক ন্যায়বশতঃ, কি ভক্তগত প্রীতি জন্য, কি উপরিতন আচার্য্যের আদেশবশতঃ তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। যাহা হউক ঐ সকল কাব্যগ্রন্থ চিরদিন গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অভ্রান্ত বেদবাক্যরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান গোস্বামিসম্প্রদায়ের ও আচারনিষ্ঠবৈষ্ণবগণের গোস্বামিসাহিত্যমধ্যে তোষণী, ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, ষট্‌সন্দর্ভ, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, স্তবমালা, স্তবাবলী ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রধান উপজীব্য।

ইহার মধ্যে আবার বঙ্গদেশে এক অবান্তর সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বৈষ্ণবগণ হইতে অন্যাংশে পৃথক্ নহেন, তবে উপাসনাংশে কিঞ্চিৎ স্বাধীন। তাঁহাদের চলিত নাম "গৌরবাদী"। বলাগড়ির রামতনু বিদ্যাভূষণ ও নীলমাধব ভক্তিভূষণ প্রভৃতি এই মতের পরিপোষক ও আবিষ্কারক। ইহারা কৃষ্ণাপেক্ষাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের এক দেহরূপী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে অধিক ভক্তি করেন, অনেকে কৃষ্ণমন্ত্রের পরিবর্ত্তে গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই মতে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুকে পৃথক্ ধ্যান মন্ত্রে উপাসনা ও তদীয় জন্মতিথিতে উপবাস ব্যবহৃত আছে। ইহার বিরোধী পক্ষ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন তনু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেই গৌরপূজা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতেই উপবাস করেন, গৌরজন্মতিথিতে উপবাস করেন না, উৎসবমাত্র করেন। ইহার নজীর এই—খেতরীর গৌরাঙ্গস্থাপনে গৌরজন্মোৎসবে উপবাস হয় নাই ও কৃষ্ণমন্ত্রে পূজা হইয়াছিল ইত্যাদি। প্রথম প্রথম এই মত ঢাকা শ্রীহট্টাদি দেশে হীন শূদ্রাদিমধ্যে প্রচারিত করা হয়, এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনেক গোস্বামী পণ্ডিত ও বৈষ্ণবমধ্যে এই মত সম্পূর্ণ প্রবল আছে। ইঁহাদের চৈতন্যচন্দ্রামৃত, চৈতন্যশতক, চৈতন্যোপনিষদ্,

ঊৰ্দ্ধাম্নায়সংহিতা, ঈশানসংহিতা এবং ভাগবত ও মহাভারতের দ্ব্যর্থঘটিত কতিপয় শ্লোক প্রমাণরূপে উপজীব্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিখিত চারি সম্প্রদায় এবং তত্তৎসম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীই বৈষ্ণবসাহিত্যের আদি। উহাই বিভিন্ন আচার্য্যের হস্তে পড়িয়া ও অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা গ্রন্থে নানা শাখায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বাচার্য্যের অবান্তর গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্যের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, রামানুজ সম্প্রদায়ী গ্রন্থের সংখ্যা তদপেক্ষা অল্প, এবং বল্লভাচারিসম্প্রদায়ের তাহা হইতেও অল্প। চতুর্থ নিমায়ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থ সংখ্যায় অল্পতম। তবে আরঙ্গজেব দ্বারা নষ্ট না হইলে মূল গ্রন্থের কত বিস্তার হইত, বলা যায় না। চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানুজের অতি অধস্তন সম্প্রদায়ে মূল শাস্ত্রোক্ত মতাপেক্ষা স্বেচ্ছাপ্রসূত মতের প্রাবল্য অত্যধিক, বিষ্ণুস্বামির অধস্তন সম্প্রদায়ে তদপেক্ষা অল্প। দ্বিতীয় মধ্বসম্প্রদায়ের অবান্তর শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে গোস্বামিদিগের কালে এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে বলদেব ও বিশ্বনাথের সময়ে মধ্বমতের কিঞ্চিৎ বিরোধী শ্রীচৈতন্যপ্রোক্ত "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" তত্ত্বের কথঞ্চিৎ অনুসরণ ছিল, ক্রমে তাহার গন্ধও নাই। এখন সদাচারী বৈষ্ণবমধ্যেও যে ভাবের সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে, তাহাতে মহাপ্রভুর মতের সম্বন্ধ নাই। সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, অতিবড়ী, শতকুলী, অনন্তকুলী কিশোরীভজন, ফকির, বলরামী, বাউল, দরবেশ ইত্যাদি মূলশাস্ত্রাচারবহির্ভূত অনেক উপশাখার মধ্যে, কি মাধ্বমত, কি চৈতন্যমত কোন শাস্ত্রোক্ত-মতের সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই।

শেষ নিবেদন।

এই সাহিত্যসম্মিলনে অশেষজ্ঞানসম্পন্ন বহুতর সাহিত্যরথিগণ সমবেত, সুতরাং জানাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি যে, কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্কৃতচর্চ্চা একেবারে নাশের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, স্বর্গগত মহাত্মা মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে ইহাতে রাজকীয়দৃষ্টি পতিত হয়, এজন্য বঙ্গের নানাস্থানে ইহার চর্চ্চা প্রবল হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রাচীন সংস্কৃত ভাণ্ডারে যত গ্রন্থ ছিল, তাহার অধিকাংশই অধীত ও অধ্যাপিত হইতেছে। কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যরাজ্যে কি অমূল্য রত্ন আছে, তাহাতে বড় একটা কাহারও মনোযোগ দেখি না। অবশ্য উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাপ্রাপ্ত নিরপেক্ষ লোকের কথা কহিতেছি না, এমন অনেক লোক আছে, যাহারা না শিক্ষিত, না অর্দ্ধশিক্ষিত, না পাদশিক্ষিত, না অশিক্ষিত, অথচ শিক্ষাভিমানী সবজান্তা গোছের অদ্ভুত জীব। বস্তুতঃ সংসারে এই শ্রেণীর জীবের সংখ্যাই অধিক। সে সব লোকে বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর নাম শুনিলেই মনে করেন যে, ও একটা গোসাঞি, ঠাকুর, অধিকারী, সামাজিকসম্বন্ধরহিত লম্পট বাবাজী, মহান্ত বা বৈরাগীদিগের অশ্লীল পাঁচালীমাত্র।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ইহাও একটা বড়দরের অপরাধ যে, তাঁহারা সকল পুস্তকেই নবীন যুবা শ্রীকৃষ্ণের কাছে একটী পরযুবতীকে খাড়া করিয়াছেন, আমি বলি ঐ সব পুস্তকের মধ্যে

হইতে রাধাকৃষ্ণকে উঠাইয়া দেন, তৎপরিবর্ত্তে কুন্দনন্দিনী চারুলতা বা চন্দ্রকান্ত যাহা ইচ্ছা বসাইয়া দেন, তাহাতে একটা বড়দরের অপরাধ হইবে, বৈষ্ণবগণের চক্ষে সে স্বর্গীয় শোভার পরিবর্ত্তে কুৎসিত ভাব আসিবে সত্য, কিন্তু তথাপি দেখুন সে স্বর্গীয় শোভা না থাকিলেও তাহাতে পার্থিব শোভা আছে কি না ? আর যদি রাধাকৃষ্ণই ঠিক রাখেন তবে ভক্তিভাবে ও জ্ঞাননেত্রে দেখিবেন যে, অগাধজলসঞ্চারী বিকসিত শতদলের মূল যেমন বহুদূরস্থ ভূগর্ভে নিহিত থাকে, সেইরূপ এই বৈষ্ণবসাহিত্যের মূল সেই চতুর্ব্বেদশিখামণি সর্ব্বশাস্ত্রগম্য পূর্ণব্রহ্ম ভগবত্তত্ত্বে গিয়া মিলিত হইয়াছে এবং তাহাতে মূল্যবান্ আদরের বস্তু পাওয়া যায় কি না ?

ভূলোকবিখ্যাত মহাকবি কালিদাসের সিংহাসনের পাদপীঠের কাছে, রূপ-গোস্বামীকে, কাদম্বরীর প্রণেতা বাণভট্ট ও সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা বিশ্বনাথের অনতিদূরে মহাকবি কর্ণপূরকে, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পার্শ্বে ধর্ম্মাচার্য্য সনাতন ও গোপালভট্টকে, এবং ভারতের মঠ-চতুষ্টয়নির্ম্মাতা দিগ্বিজয়ী মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ও দিগন্তবিশ্রান্তযশাঃ শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র ও মাধবাচার্য্যের কিঞ্চিৎ সম্মুখভাগে জীবগোস্বামিকে বসাইয়া দেখুন, কিরূপ শোভা হয়। ইঁহারা পথের ভিখারী, বৃন্দাবনের অরণ্যের সঞ্চিত কাষ্ঠ মথুরার হাটে বেচিয়া ২। ৫ কড়া সংগ্রহ করিয়া অথবা কোন দিন মাধুকরী করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। সেই ধূলিধূষরিত ছিন্নকন্থামাত্রসম্বল দীনাতিদীন নিরভিমান আচার্য্যগণের মলিন দেহে কি দৈবী শক্তি প্রবাহিত ছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। হিন্দুশাস্ত্রের অতিনীরস অতিদুর্গম বেদান্ত হইতে বাঙ্গলার ছড়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবভাণ্ডারে বিরাজমান। এই সুজীর্ণপর্ণকুটীরে কোন রত্নেরই অভাব নাই। এতাদৃশ দুর্লভ রত্নরাজী সংস্কার ব্যতীত কয়েকটী গোস্বামী ও ভিক্ষাজীবী বৈরাগীর হাতে পড়িয়া আছে। আজকাল দেখিতেছি উহার উদ্ধারচেষ্টা যাহা হইতেছে, তাহা হিমালয়ের কাছে সর্ষপমাত্র। তথাপি এই অতি ক্ষুদ্রতম চেষ্টার জন্য, বৈষ্ণবশাস্ত্রের প্রথম প্রচারক বহরমপুরবাসী লোকান্তরিত ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ধন্যবাদের পাত্র। ইহার অনেক পরে কলিকাতার রামবাগান-স্থিত ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত ও বাগবাজারনিবাসী বাবু শিশিরকুমার ঘোষ তৎপরে বৃন্দাবনস্থিত রাজর্ষিকল্প রায় বনমালী রায়বাহাদুর পূর্ব্বকথিত চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। ইহাও বলা সঙ্গত যে, আমাদের কাশীমবাজারের সাহিত্যানুরাগী মহারাজ শ্রীল শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ও প্রায় সার্দ্ধ তিন বৎসর হইল অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের সূত্রপাত করিয়াছেন। আমি বলি এই পথে আরও অনেকে অগ্রসর হউন, তবুও কিছু কার্য্য হইবে। আর এক কথা কেবল গ্রন্থপ্রকাশই প্রচার নহে। নৈষধচরিতে পড়িয়াছি, অধ্যয়ন, বোধ, আচরণ, প্রচার এই চারিটী শাস্ত্রের প্রকৃত চর্চ্চা। ইহার মধ্যে আচরণ কথাটা বড় কঠিন, সেটা সহজসাধ্য নহে। যাই হৌক্ অনায়াসসাধ্য আর তিনটী চর্চ্চাতে মন দিলেও কালে সুফলের আশা করা যায়।

বিশাল ভারতবর্ষব্যাপী স্বদেশীয় আন্দোলনের দিনে কত কত স্বদেশজ বস্তুর উদ্ধার-চেষ্টা হইতেছে, সুদূর অতীতকালের বিস্মৃত পুরাতনও আজ নূতন হইয়া উপস্থিত হইতেছে, প্রতাপাদিত্যের ভগ্নকলশীর খোলাখানীও রত্নাসনে উন্নীত হইতেছে। অথচ এমন সুদিনেও

ভিখারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পর্ণকুটীরে যে কত হীরকখণ্ড ধূলিমগ্ন হইয়া পতিত আছে, তাহাতে স্বদেশীয় নেতৃবর্গের দৃষ্টি কি যাইবে না? হা মাতঃ জন্মভূমি! একবার তোমার কৃতী সন্তানের প্রতি সুদৃষ্টি দানের ব্যবস্থা কর।

উপসংহার ও পরিহার।

প্রসঙ্গাধীন এই কথাটী বলিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। উল্লিখিত মহারাজের যত্নে আমরা ইহার মধ্যেই অনেকগুলি পুরাতন দুর্লভ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ দেখিতে পাইতেছি। সবগুলির নাম করা কঠিন, এজন্য কয়েকখানীর উল্লেখ করা গেল। যথা—মালবাঙ্ককৃত বৃন্দাবনযমক। দ্বিজ গোপীনাথকৃত জ্ঞানকল্পতরু। বিদ্যানিধিকৃত জ্যোতিষসারমঞ্জরী। মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ ও রামায়ণ প্রভৃতির বাঙ্গলা ও সংস্কৃত গদ্যে কথকতার পুঁথি। পুণ্ডরীকাক্ষকৃত কলাপমতে ভট্টিটীকা। তর্কপঞ্চাননকৃত অমরকোষটীকা। পঞ্চশায়কও শিবকৃত পাদুকাপঞ্চক। বাণীবিলাস নামক পণ্ডিতকৃত কুমারসম্ভবের টীকা। ইহার তৃতীয় সর্গের শেষে এই কবিতা আছে—

"শশ্বৎসমারাদ্ধভগীরথস্য, চম্পাবতীদক্ষিণ উদ্ভবস্য।
বাণীবিলাসস্য কৃতৌ তৃতীয়ঃ, সর্গঃ সমাপূরি সমীহিতস্য॥"

রামকৃষ্ণ উদীচ্য ভট্টাচার্য্য কৃত * দুর্গোৎসব ও ভট্টিটীকা বালবোধিনী। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রোক্ত * দত্তকপুত্রপ্রকরণ। ভানুদত্তকৃত রসমঞ্জরী। নীতিসার ও হরিভক্তিবিলাসসার। সংস্কৃত গদ্যে পুরুষোত্তমকথা। হরিহরাচার্য্যকৃত * জ্যোতিষসূত্র ও সময়প্রদীপ। অন্নদাকল্প (তন্ত্র)। মহাপ্রভুর অতিপ্রিয় ভাগবতাচার্য্যকৃত সমগ্র ভাগবতের প্রাচীন বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ, নাম "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"। ৫ শত বৎসর পূর্ব্বের কর্ণপুরকৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা নামক সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থে এই বাঙ্গলা গ্রন্থের উল্লেখ আছে। উল্লিখিত গ্রন্থমধ্যে কোনও খানী এ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। * এই চিহ্নিত গ্রন্থত্রয়ের কথা এবং ইহার পঠন পাঠন আছে কি না, তাহা স্মার্ত্ত মহাশয়গণ বলিতে পারেন। আমি কতিপয় বৈষ্ণবসাহিত্যের ক্ষুদ্র পরিচয় সহিত নামমাত্র করিলাম। এই প্রস্তাবে সমালোচনা অসম্ভব। দেখি, ইহাতে কেহ কর্ণপাত করেন কি না?

আমি যে সব বৈষ্ণবসাহিত্যের সামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহা "এক নিশ্বাসে মহাভারতকীর্ত্তন"বই আর কিছুই নহে। প্রবন্ধের বাহুল্যভয়ে অনেক গ্রন্থের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারি নাই, পৌরাণিক টীকা, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার এবং বিভিন্ন-বিভাগবিন্যস্ত কাব্য, এইগুলি যথাশক্তি পরপর সময়ানুসারে প্রদর্শিত হইল। প্রবন্ধ মুদ্রণারম্ভের পর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত কতিপয় সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থ, বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য এবং ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের মুসলমান বৈষ্ণবকবির ৩ খণ্ড পুস্তক হস্তগত হয়, এজন্য উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে ইহার অনেক উপাদান সংগৃহীত এবং প্রবন্ধের আয়-

তনের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। অপিচ প্রবন্ধমুদ্রণের শেষে অত্যন্ত সত্বরতানিবন্ধন প্রবন্ধের শেষ-ভাগের অনেকগুলি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সময়নির্দ্দেশ শ্রেণীবদ্ধভাবে হয় নাই, বিশেষ পরিচয় এবং প্রবন্ধের অধিকাংশ শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দিতে পারি নাই। সেজন্য আমি বিশেষ ক্ষুণ্ণ আছি। যদি ইহার ভাগ্যে কখন গ্রন্থাকারে পরিবর্ত্তন ও সংস্করণ সংঘটিত হয়, আশা থাকিল তৎকালে যথাশক্তি তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিব। বিশেষতঃ মাদৃশ ইংরাজীজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে সময়নির্দ্দেশ এক কঠিন ব্যাপার। যাহা প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গলাতে দেখিয়াছি তাহাই পূর্ব্বাপর বিবেচনাপূর্ব্বক বিবৃত করিয়াছি। যাহা পাই নাই তাহার আর উপায় কি?

বৈষ্ণবসাহিত্যে অভিধান শাস্ত্র একেবারে নাই এমন বলা যায় না। দৈবকীনন্দন দাসের ও বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বৈষ্ণববন্দনাতে অনেক ভক্তের গুণকীর্ত্তন আছে। ঐ শ্রেণীর "বৈষ্ণবাভিধান" নামে একখানি পুস্তক আছে, তাহা ঠিক্ কোষশাস্ত্রের মত না হইলেও তাহাতে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনেক নাম পাওয়া যায়। স্তবাবলীর টীকাতে (১৯) বাণীভূষণ নামে একখানি অভিধানের উল্লেখ আছে, সে পুস্তক প্রচলিত না থাকায় পরিচয় দিতে পারিলাম না। অমরকোষ, মেদিনী, বিশ্বপ্রকাশ প্রভৃতিপ্রাচীন অভিধানসত্বে গোস্বামিবর্গ সে শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই।

আমি যে সমস্ত বৈষ্ণবসাহিত্যের সামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম, তাহার প্রধান আদর্শ আমার বহুকাল হইতে সংগৃহীত বৈষ্ণবজীবনী। আমি বাল্যাবধি এই ৪৭ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যের যাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে আমি ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে সুবিধা পাইয়াছি। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, পূর্ব্বকথিত বহরমপুরবাসী ৺রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত বৈষ্ণবগ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও আলোচনা, এই সুবিধার প্রধান মূল, তবে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না না থাকায় উহাকে বাঙ্গলাসাহিত্যসমাজে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত করিতে সমর্থ হই নাই। ইহাতে ন্যূনাধিক একশত বৈষ্ণব কবি ও ভক্তের বিস্তৃত জীবনী প্রকটিত হইয়াছে।

প্রণাম—

"অদ্বৈতপ্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠঃ স্বরূপপ্রিয়ঃ
নিত্যানন্দসখঃ সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃৎকেতনঃ।
লক্ষ্মীপ্রাণপতির্গদাধররসোল্লাসী জগন্নাথভূঃ
সাঙ্গোপাঙ্গসপার্ষদঃ স জয়তাৎ দেবঃ শচীনন্দনঃ॥"

---

(১৯) বৃত্তরত্নাকরের মত দামোদরমিশ্রকৃত বাণীভূষণ নামে একখানী ছন্দোগ্রন্থ আছে, তাহা এই বাণীভূষণ নহে।

প্রবন্ধ (৮)

বাঙ্গালা ভাষা-সংস্কার

(প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী)

নানা দেশের অংশ এবং রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি বহু প্রাকৃতিক সীমানিবদ্ধ খণ্ডদেশগুলি বর্ত্তমান বঙ্গের মধ্যগত হইয়া নানা ভাষা-ভাষিগণকে এক ভাষার শাসনাধীন করিয়াছে। বহু শতাব্দী হইতে সুদূর পঞ্চনদ, দাক্ষিণাত্য, কান্যকুব্জাদি দেশ ও ভারতবর্ষের বাহিরের নানা স্থানের নানা সম্প্রদায়ের অনেকে, অধিবাসীদিগের সংস্রবে, ব্যবসায় ও চাকুরী ইত্যাদি নানা কারণে এদেশে আসিয়া ক্রমে পুরুষানুক্রমে বঙ্গবাসী হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের নানা প্রকার মাতৃভাষার সহিত বঙ্গের প্রতিবেশিগণের আদানপ্রদানে নানা মিশ্র ভাষা প্রচলিত হইলেও এখন এক ভাষার শাসনাধীন করিয়াছে। কোন কোন জাতি, কিংবা সম্প্রদায়, ভাষাতে সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিতে এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; কিন্তু তাহা যে কোন ফলই প্রসব করে না, সে কথা বলা বাহুল্য।

এখন বঙ্গের আদিমভাষা নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে আদিম অধিবাসী বাছিয়া বাহির করিতে হয়। আদিম বঙ্গ যমুনা (ব্রহ্মপুত্রের বর্ত্তমান প্রবল শাখা) ও পদ্মার পূর্ব্ব তীরে বিক্রমপুর ও তাহার চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দুর্লঙ্ঘ্য সীমার মধ্যগত স্থান বলিয়াই অনেকে বলেন। দক্ষিণবঙ্গ কেন উত্তরবঙ্গের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সেই দেশীয়কে "বাঙ্গাল" বলিয়া পরিহাস রসিকতা করিতেন। এখন তাহা ততটা প্রবল না থাকিলেও এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই। এখন কিন্তু সেই "বঙ্গ" দেশের উদরে সকলকেই প্রবেশ করিতে হইয়াছে। এমন কি কি উত্তর, কি পশ্চিম, কি দক্ষিণ সকল বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ, প্রায় সকলেই বর্ত্তমান বর্দ্ধিতকলেবর বঙ্গের কোন কোন স্থানেরই আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করেন না। সেই বঙ্গের বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে আদিশূর, ভূশূর, বল্লাল সেন প্রভৃতি বঙ্গাধিরাজদিগের মধ্যে কাহারও আনীত, কিংবা অন্য কারণে এদেশে সমাগত পূর্ব্বপুরুষদিগের রোপিত বংশবীজের কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সেই সঙ্গে সেই বঙ্গরাজদিগের দ্বারা মর্য্যাদালাভের গৌরব সকলেই করিয়া থাকেন।

বরং পূর্ব্ববঙ্গের জ্ঞাতিগণ, স্ব স্থানে আছেন, নানা কার্য্য উপলক্ষে অনেকের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে, পৈতৃক পবিত্র স্থান ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে বসতি করিয়াছেন, ইহা অনেকেই অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের কুলপঞ্জিকা এখন পূর্ব্ববঙ্গের জ্ঞাতিগণের সহায়তায় সেই দেশ হইতেই সংগৃহীত হইতেছে। তবে কৌলিন্য বিভাগে, কি অন্য কারণে যে সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ পূর্ব্ব হইতেই রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পূর্ব্ববঙ্গেই আদিম পুরুষের সমাগম ও বাস, এবং পরে রাঢ়দেশে আগমন স্বীকার করেন।

বাস্তবিকপক্ষেও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত নবশাখগণও যে ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত, তাহা নানা প্রমাণেই সমর্থিত হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যে "বাঙ্গাল" বলিয়া উপহাস স্থলে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও ভাষার উন্নতি পক্ষে অল্প সুবিধাজনক নহে। এখন আর গৌড়ীয় ভাষার গৌরব করিয়া "বাঙ্গলা ভাষা"কে দূরে পরিহার দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা ও পরিহাস-রসিকতার দিন নাই। "বঙ্গভাষা নামই এখন অদ্বিতীয়।

গৌড়ের সমৃদ্ধির সময় হইতে প্রস্তাবিত নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বীজে এদেশের জনসংখ্যা শতাধিকগুণ বাড়িয়াছে। বঙ্গের আদিম অধিবাসীর মধ্যে অসভ্য বন্যজাতির সংখ্যাই অধিক থাকা সম্ভব। বরং যে সকল সুসভ্য হিন্দু উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, নিকৃষ্ট জাতির আধিক্যে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের আচার ভ্রষ্ট হইবার অনেক প্রমাণ আছে। মূল বঙ্গের মধ্যে সুবিস্তৃত দুর্লঙ্ঘ্য নদী, জলা ও দুর্গম অরণ্য দ্বারা বহু খণ্ডে বিচ্ছিন্ন নানা বিভাগ থাকায়, আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ; বৈবাহিক বন্ধন প্রভৃতি দূর সম্মিলনের উপায় ছিল না। সুতরাং ভাষাও একরূপ ছিল না। পরে ক্রমে নানা দেশীয় জেতা ও অভ্যাগতগণের পুনঃ পুনঃ সমাগম ও সংসর্গে সেই সকল বিচ্ছিন্ন ভূ-ভাগে আচার, পরিচ্ছদ ও ভাষার বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু, দুর্গম পর্ব্বত ও অরণ্যবাসীদিগের কি আচার, কি পরিচ্ছদ, কি ভাষা, কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই,—এখনও হইতেছে না।

প্রস্তাবিত ভিন্নভিন্নভাষাভাষী আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষিত ও প্রতিভা-শালী লোকেও মাতৃভাষার উন্নতি কি, তাহাকে একটা ভাষা বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না। এই অবহেলা বঙ্গের প্রবল উন্নত অবস্থার সময় বিগত শত বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। সে সময়ে সংস্কৃত, পারস্য, উর্দ্দু প্রভৃতিই বিদ্যা বলিয়া খ্যাত ছিল। তাহা না জানিলে কেহ সমাজে বিদ্বান্ বলিয়া গণনীয় হইতেন না। পণ্ডিতমণ্ডলী কথোপকথনের ভাষায় অধিক পরিমাণে সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষার শব্দ ব্যবহার করায় ও পারস্য ভাষায় শিক্ষিতগণ দ্বারা পারস্য শব্দ বাহুল্যে ও বৈদেশিকগণের বাণিজ্যাদি ব্যাপারে ঘনিষ্ঠতায় পল্লিবাসী ইতর শ্রেণীর মধ্যেও ভাষা ক্রমে বিবর্ত্তিত হইতে ছিল। সেই বিবর্ত্তন এখনও চলিতেছে।

অতএব বঙ্গের আদিম ভাষা, যাহা প্রাকৃতিক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবচ্ছেদবশতঃ নানারূপ ছিল, তাহার একটী শব্দও এখন বাছিয়া বাহির করা কঠিন। বিশেষ অনুধাবন করিলে পুরাতন,

প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রভৃতি প্রান্তবর্ত্তী নানা ভাষা, সেই সেই প্রান্তে বিকৃতভাবে প্রচলিত থাকাই উপলব্ধি হয়। তাহার সঙ্গে নানা বৈদেশিক ভাষা, অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে।

বিদেশাগতগণ, প্রথমে আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও ভাষাকে স্বতন্ত্র রাখিতে যত্নপর হইলেও উত্তরকালে তাহা স্থির না থাকিয়া মিশ্রভাব অনিবার্য্য হইয়া যায়। ক্রমে তাঁহারা যেরূপ এদেশের আচার পদ্ধতি, পরিচ্ছদ ও ভাষা অজ্ঞাতে গ্রহণ করেন, সেইরূপ প্রাচীন অধিবাসীরাও আবার তাঁহাদিগের সংসর্গে বৈদেশিক আচার ব্যবহার ও ভাষাও গ্রহণ করিয়া সেই বিবর্ত্তনের সহায়তা করিতে থাকেন। ক্রমে ভবিষ্যতে একটা সমীকরণ ঘটিয়া যায়। আবার নূতন অভ্যাগতদিগ দ্বারা ঐরূপ বিবর্ত্তন ঘটে। এইরূপ সংস্কার ও বিবর্ত্তন ক্রমাগতই চলিতেছে।

বঙ্গের মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় চাঞী জাতি, তরকারী ও ফলাদি আবাদ উপলক্ষে এখন অনেক স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিলেও আচার, পরিচ্ছদ ও কথোপকথনের ভাষার সাম্প্রদায়িকতা রক্ষায় বড়ই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বেদিয়া, বারমাসিয়া প্রভৃতি জাতিও বহুকাল হইতে এদেশে বাস করিলেও আচার ও ভাষায় সাম্প্রদায়িকতা রক্ষায় বিস্তর আয়াস স্বীকার করে। কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতে প্রতিবেশীদিগের ভাষা ও আচার পরিচ্ছদাদি প্রবেশে বাধা পায় নাই।

রাজসাহী অঞ্চলেই প্রস্তাবিত বারমাসিয়া জাতি অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহারা বারমাস নৌকায় ব্যতীত মৃত্তিকায় গৃহ নির্ম্মাণ করিত না। কেহ তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইলে সমাজচ্যুত হইত। ইহারা ধর্ম্মে মুসলমান; কিন্তু অপর মুসলমানদিগের সঙ্গে ইহাদের বিবাহ আদি সম্বন্ধ কি সমাজবন্ধন ছিল না। ইহাদিগের রমণীগণ ফুতের মালা ইত্যাদি নানা দ্রব্য ফেরি করিয়া বিক্রয় করে। পুরুষগণ গান করিয়া ভিক্ষা ব্যতীত জনখাটিয়া কি কৃষিকার্য্যাদি কোন কার্য্য প্রাণান্তেও করিত না। এখন, তাহার সম্পূর্ণ ব্যত্যয় দেখা যায়।

মাড়বারিগণ কষ্টসহিষ্ণু ও ঘোর অধ্যবসায়শালী ব্যবসায়ী। অতি দুর্গম স্থানে, পর্ব্বতে, অরণ্যে বঙ্গদেশের এমন স্থান নাই, যেস্থানে মাড়বারী ব্যবসায়ী না আছেন। ইঁহা-দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ওশবাল (জৈন) নানাজাতি থাকিলেও ওশবাল জাতিই অধিক। কিন্তু বহু পুরুষ হইতে ইঁহারা এদেশের অধিবাসী হইলেও আচার পদ্ধতি, পরিচ্ছদ ও ভাষায় দৃঢ়তার সহিত সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। খাতা ও চিঠি আদি সমস্তই স্বদেশীয় ভাষায় লিখিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ী হইলেও এখন কেহ কেহ সেই ব্যবসায় উপলক্ষে জমীদার হইয়াছেন। ইঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য ও জমীদারী কার্য্য উপলক্ষে স্থানীয় বঙ্গবাসিগণের সঙ্গে বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন; কিন্তু স্ব সম্প্রদায় ও পারিবারিক কথোপকথনে দেশভাষা যেমন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, হিসাব, নিকাশ, খাতাপত্র এক জমীদারী কাছারী ব্যতীত সমস্ত কাগজ পত্র স্বদেশীয় ভাষায় লিখিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ দৃঢ়তাতেও এদেশের পরিচ্ছদ, আচার, পদ্ধতি ও ভাষা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ যে না করিয়াছে, একথা বলিতে পারা যায় না।

এদেশীয় মুসলমানগণ, ধর্ম্মকার্য্যে ও আচারে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না হইবার পক্ষে বিশেষ মনোযোগী। অবশ্য মূলে তাঁহাদিগের সিয়া ও সুন্নি দুই সম্প্রদায় হইলেও এখন ফরাজি আদি কতিপয় শাখা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম ও আচারের স্থায়িত্বে সকলেরই সমভাবে অধ্যবসায়। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন নিমিত্ত ইঁহারা আরব্য ও পারস্য ভাষার পক্ষপাতী। আর ইংরাজী শিক্ষায় আচারচ্যুতির আশঙ্কা থাকায় বর্ত্তমান কালে মুসলমানদিগের মধ্যে ইংরাজীতে শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন এদেশে রাজকীয় আফিস আদালতে পারশী ও উর্দ্দু ভাষার প্রচলন ছিল, তখন এই সম্প্রদায়ের অনেকেই শিক্ষিত পরিচয়ে আল্লা সদর আমিন, ডেপটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদ হইতে অপরাপর সমস্ত বিভাগে এবং উকীল ও মোক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে অত্যধিক পরিমাণে নিযুক্ত ছিলেন। পরে রাজকীয় সেরেস্তায় ইংরাজী প্রচলন আরম্ভ হইতে এই সম্প্রদায় অপেক্ষা সেই সকল রাজকীয় পদে হিন্দুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেকালে হিন্দুদিগের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শিতায় এবং হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ে পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় শিক্ষিত হইলেই বিদ্বান বলিয়া সকলের নিকটে বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টেও সম্মানলাভের সুবিধা ছিল। পরে রাজকীয় সেরেস্তায় ইংরাজীর প্রচলনে হিন্দুগণ, স্ব স্ব শিশুদিগকে অবিচারিত চিত্তে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইলেও মুসলমানেরা ধর্ম্মভাবের ব্যতিক্রম-আশঙ্কায় সেরূপ করেন নাই। এখন গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ ও উপদেশে এই সম্প্রদায়ের ইংরাজী শিক্ষানুরাগ প্রবল হইয়া কি পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ভবিতব্য প্রণেতাই বলিতে পারেন।

ফলতঃ মুসলমানদিগের সেই ধর্ম্মপক্ষপাতিতায় অতি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও কথোপকথনের ভাষায় অধিক পরিমাণে পারস্য শব্দ প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজে সংস্কৃত শব্দবহুল বাঙ্গলা ভাষা এবং বিষয়কার্য্যনিরত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে পারস্য এবং সংস্কৃত শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। সেকালে হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যাই অত্যধিক ছিল। তাঁহারা এবং মহিলাকুলের মধ্যে গ্রাম্যভাষাই অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। যৌথ পরিবারের মধ্যে একজন উপার্জ্জনশীল থাকিলে অন্যেরা মূর্খ ও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে বাধ্য ছিল না। কোন প্রকারে মোটা ভাত কাপড় ব্যতীত, বিলাস-লালসা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু মুসলমান ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ জন্য কিছু না কিছু আরবী ও পারশী ভাষা পড়িতেই হইত।

আমাদের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ, সকল কার্য্যে সর্ব্বদা বঙ্গভাষা-ভাষণে বাধ্য হইলেও তাহার উচ্চারণ-বৈষম্য দ্বারা একটা সাম্প্রদায়িকতা রক্ষায় যেন বড়ই আগ্রহশীল। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহাদিগের কেহ কেহ এই মাতৃভূমিকে জন্মস্থান বলিতেও লজ্জা বোধ করেন। এদেশে বঙ্গভাষার প্রচারকল্পে উদারহৃদয় বিদেশীয় মিশনরিগণ সর্ব্বপ্রথমে যে বিশেষ অধ্যবসায়ী হইয়াছিলেন,—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন, মুদ্রাযন্ত্র এবং সংবাদপত্র-প্রতিষ্ঠায় তাঁহারাই অগ্রণী। ফলতঃ বঙ্গভাষাকে একটি ভাষা বলিয়া প্রচার পক্ষে তাঁহারা যেরূপ যত্ন করেন,

এদেশে ইংরাজী শিক্ষার সদুপায় কল্পেও তাঁহাদিগের নিকটে আমরা সেইরূপ ঋণী। এদেশে ও ইউরোপে এইজন্য তাঁহাদিগকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তৎকালের রাজকর্ম্মচারিগণের সঙ্গে মতদ্বৈধ ঘটায় তাঁহারা এই বিষয়ে বিস্তর বাধাবিপত্তি সহিয়া জয়লাভ করেন।

এই কথা স্মরণ করিলে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে এদেশ জাত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের বিশেষ মনোযোগ করা উচিত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারে বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তক ও সংবাদপত্র গুলির ভাষা, পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইলেও, সাম্প্রদায়িকতার একটা উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিয়াই যাইতেছে। এখন ইংলণ্ড হইতে বঙ্গীয় শিশুশিক্ষার পুস্তকগুলির প্রণয়ন পদ্ধতি প্রচার আরব্ধ হওয়াতে সেই অসম্বদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাষাকে সাধারণে প্রচলন-চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গবাসী খৃষ্টীয় ভ্রাতৃগণ, ধীরভাবে ভাষা সম্বন্ধে এই উৎকট সাম্প্রদায়িকতার দোষ গুণ বিচার করিলে এদেশের হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বঙ্গসাহিত্যের সংস্কার ও উন্নতি করাই সবিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

এদেশের সুশিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতৃগণ, এখন বঙ্গীয়সাহিত্যে সুমার্জ্জিত ও সাধুভাষা ব্যবহারে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। পূর্ব্বে আরবী ও পারশী নানা পুস্তকের অনুবাদে ঐ দুই ভাষার শব্দ ব্যবহার-বাহুল্য থাকিলেও এখন বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এখন মাড়বারী ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ মুসলমান ভ্রাতাদিগের ন্যায় বঙ্গভাষার পুষ্টি বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিলে বঙ্গসাহিত্য যে অল্পদিনের মধ্যে বিশুদ্ধ ও সুগঠিত হইয়া সমস্ত বঙ্গবাসীর কল্যাণ বিধান করিবে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, যে বঙ্গের সর্ব্ব বিভাগের ভাষা-পর্য্যালোচনা দ্বারা আদিম বঙ্গভাষা বাছিয়া স্থির করা অসম্ভব। প্রাচীন মিথিলা, অঙ্গ, পৌণ্ড্র, গুপ্ত, মল্ল, ঔড্র, ত্রিপুরা, মণিপুর, প্রদেশের কিয়দংশ লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ, আর মধ্য যুগের উপরিভাগ বরেন্দ্র, রাঢ়, ভড়, বাগ্‌ড়ি, এবং বঙ্গ লইয়া বর্ত্তমান বঙ্গদেশ রাজকীয় সীমামধ্যে নিবদ্ধ। প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষের পূর্ব্ব ও উত্তরাংশ এখন আসাম নামে প্রসিদ্ধ। রাজকীয় বিভাগে পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে আসামের নাম প্রকটিত রাখা হইয়াছে; কালে তাহার কিরূপ পার্থক্য থাকিবে, তাহা বিধাতাই জানেন। এখন এই বর্দ্ধিতকলেবর বঙ্গে সাঁওতাল, মুণ্ডা, খশিয়া, গারো, কুকি প্রভৃতি অসভ্যজাতি বঙ্গীয় নিম্নশ্রেণীর ধাঙ্গড়, চাঁই, বাগ্‌দি, মুচি, ডোম ইত্যাদি বহুজাতির অধিবাস আছে। তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। আর তাহাদিগের মধ্যে নিকটবর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষার আকর্ষণ থাকিলেও বিস্তর সাম্প্রদায়িক ভাষা প্রচলিত আছে।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার আলোক প্রচার জন্য আমাদের প্রবলপ্রতাপ রাজশক্তির আশানুরূপ যত্ন না থাকিলেও অনেকটা আছে। এখন রাজপক্ষ, নিম্ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা ভার গ্রহণ দ্বারা বড়ই একটা জটিল সমস্যায় বিব্রত হইয়াছেন। তাঁহারা এই

শিক্ষা উপলক্ষে রাজশাসনের অনুকূলে লোক-মত সংগঠন নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তকগুলির প্রণয়ন ভার পর্য্যন্ত আমাদের হস্তে দিতে কুণ্ঠিত। সেই জন্য বঙ্গভাষার প্রাথমিক শিক্ষা পুস্তকগুলি, ইংলণ্ডে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। উহাতে তাঁহারা এদেশের অপ্রচলিত, একটা নূতন ভাষা প্রচলন করিতে বিশেষ উদ্যমশীল হইয়াছেন। ইহাদ্বারা শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর শিশুগণ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর এবং অসভ্যজাতি সমূহের মধ্যে এই নবকল্পিত ভাষা যে, অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এই আশঙ্কা সহজেই উদিত হইয়া থাকে।

বঙ্গের প্রাদেশিক কথিত ভাষার আবৃত্তি ও প্রয়োগ কালে বিশেষ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। জল, বায়ু, মৃত্তিকার ভেদে ও নিকটবর্ত্তী প্রাদেশিক ভাষার সাঙ্কর্য্যে যোজনান্তে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। "কেন" শব্দ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে "ক্যান্" এবং রাজসাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম প্রান্তে "কেনহ" "কেনেহ" রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে বিহার ও মিথিলা প্রদেশের সাঙ্কর্য্য নিমিত্ত, প্রায় সকল কথাই কিছু বলব্যঞ্জক সুতরাং শ্রুতি-কঠোর হইয়া থাকে। রাজসাহীর উত্তরপ্রান্ত হইতে রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার কথাগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাবাপন্ন বলিয়া শ্রুতিমধুর। পাবনা, ফরিদপুর ও যশোর জেলার পূর্ব্বভাগ হইতে প্রাচীন বঙ্গের বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলের উচ্চারণ ভেদের আভাস ও শব্দের বিভিন্নতা আরম্ভ হইয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের উচ্চারণ ও ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে ক্রমে প্রত্যেক প্রান্তভাষার আভাস পরিস্ফুট হইয়া অবশেষে প্রান্তভাগের ভাষা পূর্ণাবয়ব হইতে দেখা যায়। এই ক্রম পরিবর্ত্তনই যোজনান্তে ভাষার মূল কারণ।

অঙ্গ, পৌণ্ড্র, মল্ল, ঔড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, মণিপুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের অংশ লইয়া বরেন্দ্র, খেয়ার, ভড়, রাঢ়, বাগ্‌ড়ি ও বঙ্গদেশ যে এখন বঙ্গদেশ বলিয়া রাজকীয় বিধানে বর্দ্ধিতায়তন, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। সেই সকল প্রাদেশিক ভাষা এবং পাঞ্জাব, কান্যকুব্জ ও দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণের এদেশে উপনিবেশ, ক্রমে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইরূপ রাজশাসন, ব্যবসায়, এবং ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতায় নানা ভাষা কতক অবিকৃত, কতক বা অপভ্রংশ ভাবে মিশিয়া এখনকার প্রচলিত বঙ্গভাষা,—এমন কি ক্রিয়াপদগুলিও সাঙ্কর্য্যপূর্ণ হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুদূর মহারাষ্ট্র দেশের প্রচলিত বিস্তর ক্রিয়া পদের সঙ্গে বঙ্গীয় ক্রিয়া পদের সাদৃশ্য আছে। আমরা "চলিয়া গিয়াছেন" বলি মহারাষ্ট্র ভাষায় সেস্থলে "চলি যাউন দেউন" ব্যবহৃত হয়। আচার, পদ্ধতি ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মান্দ্রাজী ও মহারাষ্ট্রদিগের সঙ্গে উড়িষ্যাবাসিগণের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, ভাষাতেও তাহার প্রভাব অল্প নহে। মহারাষ্ট্র মহিলাগণের কাছা দিয়া বস্ত্র পরিধান, উড়িষ্যায় কথঞ্চিত ভিন্নাকারে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে তাহা নাই। কিন্তু, ভাষায় সাদৃশ্য আভাস সুদূর বিস্তৃত।

এ সকল বিষয় ভাষা ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসুদিগের আলোচনায়, বঙ্গভাষার আলোচনা উপলক্ষে প্রস্তাবিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ মাত্র করা গেল।

বহুদিন হইতে নানা কারণে বঙ্গের সর্ব্বপ্রদেশের প্রচলিত ভাষাই রূপান্তরিত, কতক বা বিলুপ্ত হইতেছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত, মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডী ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এবং রামপ্রসাদ সেনের পুস্তকে ও সঙ্গীতে পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গের পরিবর্ত্তিত ভাষা যেরূপ দেখা যায়, প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থ গুলিতেও তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সে সময়ের অনেক শব্দ এখন অপ্রচলিত বলিয়া দুর্ব্বোধ হইয়াছে। উত্তরবঙ্গেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখা যায়। ঐ অঞ্চলে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল শব্দ প্রচলিত ও উচ্চারণ-পদ্ধতি ছিল, এখন তাহার কতকটা লুপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্রাবকে "লগ্‌গী", বিরক্ত করাকে "আলঙ্গিত" করা, কুক্কুরকে "হেঙ্গোল" বলিতে আর তেমন শুনা যায় না। ভদ্রমহিলাকুল "এবাই" "ভাঙ্গি" "সাঝ" "বিহান" "ডেঙ্গোর" ইত্যাদি শব্দ এখন প্রয়োগ করিতে লজ্জাবোধ করেন। রাজসাহীর উত্তর প্রান্তে পল্লীবাসী ভদ্রলোকেও "কবে" বা "কখন" শব্দের স্থানে "কোশ্মান" কহিতেন। ইহা "কস্মিন সময়ের" অপভ্রংশ ও সঙ্ক্ষিপ্ত বলিয়াই প্রতীতি হয়। এক খণ্ড স্থানে "য়্যাকণ্ডা" প্রয়োগ ভদ্রলোকের মুখে আর শুনা যায় না। খণ্ডার্থে "কণ্ডা"র পূর্ব্বে "এক" বিশেষণ যোগে "য়্যাকণ্ডা"র উৎপত্তি। এইরূপে বিস্তর শব্দ অপ্রচলিত ও লুপ্ত হইতেছে। ইতর লোকের মধ্যেও এইরূপ শব্দও উচ্চারণ-বিশুদ্ধি সকল প্রদেশেই হইতেছে।

এখন, বাষ্পীয় যানের বাহুল্যে নগণ্য পল্লিবাসীরাও বিদেশে বিশেষতঃ কলিকাতা প্রভৃতি নানা নগরে গতায়াতে, নানা লোকের সংসর্গের সুবিধা পাইয়াছে। তদ্দ্বারা এবং শিশুশিক্ষা হইতে অপর পাঠ্য পুস্তক, সংবাদ পত্র, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির বহুল প্রচলনে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা হইতে তাঁহাদিগের প্রতিবাসী ইতর শ্রেণীর মধ্যে ভাষা ও উচ্চারণের প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমি আসামের গৌহাটী অঞ্চলে স্থানীয় ভদ্রলোককে বিশুদ্ধ দক্ষিণ বঙ্গের ভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। যে আসামবাসীয় পূর্ব্বে "পচা" স্থানে "পশা" উচ্চারণ সংশোধন করিতে পারা যায় নাই, তাঁহারা এখন অনেক কথাই পরিষ্কৃত ভাবে আবৃত্তি করেন।

(ক) বঙ্গীয় বর্ণমালা-সংশোধন ও মাত্রা-নির্ণয়।

আমরা পুস্তকাদির আবৃত্তিকালেও "লবণ" "শয়ন" "কখন" ইত্যাদি শব্দ হলন্ত করিয়া উচ্চারণ করি। কিন্তু লিখিতে স্বরান্ত লিখিত হয়। "ক" ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণগুলি উচ্চারণ-সৌকর্য্য নিমিত্ত স্বরান্ত লিখিত হইয়া থাকে। ইংরাজী, পারস্য ইত্যাদি ভাষার হল বর্ণগুলিতে আকারাদি নানা স্বরযুক্ত থাকিলেও আমাদের বর্ণমালায় "অ" মাত্র যুক্ত করিয়া হল্ বর্ণগুলি লিখিত ও পঠিত হয়। ইহাতে সুকুমারমতি বালকগণ, প্রকৃত হলের আকার ও উচ্চারণ বিষয়ে বর্ণপরিচয় কালে কিছুই জানিতে পারে না। প্রস্তাবিত "লবণ" ইত্যাদি শব্দ সংস্কৃত বলিয়া অকারান্ত লিখিত হইলেও গদ্যে আবৃত্তিতে যেমন হলন্ত উচ্চারিত

হয়, পদ্যে ছন্দ অনুরোধে মাত্রা রক্ষার্থ কখন সেগুলি স্বরান্ত ও কখন হলন্ত উচ্চারণ করিতে হয়।

তদ্ভিন্ন "যাইব" "করিব" ইত্যাদি ক্রিয়া পদ অকারান্ত লিখিত হইলেও আবৃত্তিভেদে ও-কারান্ত অর্থাৎ "যাইবো" "করিবো" রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি। নতুবা সেগুলি অর্থাৎ "লবণ" ইত্যাদি শব্দ অকারান্ত ও "যাইব" ইত্যাদি ক্রিয়া লিখনানুরূপ অকারান্ত উচ্চারণ করিলে উড়িষ্যার প্রচলিত আবৃত্তির মত হইয়া যায়। অতএব আবৃত্তির অনুরূপ লিখন-প্রণালী প্রচলন করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা স্থির করা উচিত।

বঙ্গীয় গদ্যে, পদ্যে, কথপোকথনে ছন্দ ও স্বরের মাত্রার যথেষ্ট তারতম্য থাকিলেও সেই মাত্রাজ্ঞাপক কোন পদ্ধতি কি নিয়ম অদ্যাপি বিধিবদ্ধ হয় নাই। শিশুগণ বর্ণপরিচয় হাতে লইয়াই ক, খ, আদি আবৃত্তি কালে সেই ছন্দ ও মাত্রার আশ্রয় গ্রহণ করে। একাক্ষর আবৃত্তিতেও ছন্দ ও মাত্রা পরিহার্য্য। কিন্তু, অনেকেরই বিশ্বাস যে বেদান্ত শিক্ষা ছন্দাদির উপদেশ, বেদ পাঠ ব্যতীত বঙ্গভাষায় অপ্রয়োজন। ফলতঃ বেদাঙ্গ শিক্ষা ছন্দাদি অবশ্যই বঙ্গভাষায় খাটিতে না পারিলেও যখন বঙ্গভাষার ছন্দ ও মাত্রার প্রভাব ভাষার অস্থি মজ্জায় জড়িত, তখন তদনুযায়ী নিয়মগুলি নির্ণয় না করিলে ভাষাশিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গহানি হইতেছে। "মহাশয়, যথেষ্ট ভদ্রতা করিয়াছেন!" এই কথাগুলির আবৃত্তি কালে ছন্দ ও মাত্রার ব্যতিক্রমে বিপরীত অর্থ প্রতিপাদিত হয়। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সঙ্গীতে এই মাত্রা বা ধ্বনির স্পর্শ, সংযোগ, বিচ্ছেদ বোধ না জন্মিলে সুশিক্ষা হইতে পারে না। যন্ত্রসঙ্গীতে এই মাত্রাজ্ঞাপক চিহ্ন সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে কোমল তীব্রাদি ত্রিবিধ গ্রাম একবিংশতি মূর্চ্ছনায় স্বরের সেই একবিংশতি মাত্রা মূলতঃ বিভিন্ন আছে। পাণিনীয় প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণে বর্ণের কণ্ঠ্য তালব্যাদি উচ্চারণ বিচারের ন্যায় স্বরের উক্ত একবিংশতি মাত্রার বিভিন্নতাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা প্রচলিত হইলে তাহার শৃঙ্খলা-জ্ঞান সহজে আয়ত্ত করিবার নিমিত্তই ব্যাকরণ-প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়াছে। বঙ্গভাষায় কথোপকথনে, বক্তৃতায়, গদ্য পদ্যাদি গ্রন্থ-পাঠে যিনি যে পরিমাণে ছন্দ ও মাত্রা উপযুক্তভাবে প্রয়োগ-কৌশল বুঝেন, তাঁহার আবৃত্তিই তত প্রাণস্পর্শী ও সুললিত হইয়া থাকে।

অতএব এরূপ প্রয়োজনীয় ছন্দ ও মাত্রা বিষয়ক বিধান স্থিরতর ও তাহা শিক্ষার সদুপায় করা অতীব প্রয়োজনীয়। সম্মিলন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন। অবশ্য ইহা ব্যাকরণে নিবিষ্ট করা যদি উপযুক্ত বোধ হয়, তবে তাহা করিলে হানি নাই। কিন্তু তদ্দ্বারা ব্যাকরণ অসম্ভব বর্দ্ধিতায়তন হইতে পারে বলিয়া পৃথক পুস্তক-প্রণয়ন করা বৈধ।

প্রস্তাবিত ছন্দ ও মাত্রা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক বক্তব্য থাকিলেও এ স্থানে বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না। এখন বর্ণমালা সংশোধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

বঙ্গভাষা যে বহুভাষার শব্দে ও ক্রিয়াপদে পুষ্টাঙ্গ, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কথোপকথনের ভাষায় ও সাহিত্যে যে পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ছিল, এখন-

কার ভাষায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে। তাই বলিয়া ইহাকে সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ নিয়মে কি বর্ণবিন্যাসে বিধিবদ্ধ করা যাইতে পারে না। প্রাকৃত ও পালি ভাষা, সংস্কৃতের অতিনিকটবর্ত্তী হইলেও, স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীতে সংস্কৃত কি সংস্কৃতমূলক শব্দগুলি উচ্চারণে যে বর্ণ সচরাচর যে ভাবে আবৃত্তি করিতেন, প্রাকৃত ও পালি ভাষার বর্ণবিন্যাস তদনুরূপ হইয়াছে,—বিশেষতঃ প্রাকৃত ভাষায় বোধ হয় সে কালে স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিতদিগের মধ্যে আনুনাসিক উচ্চারণ অত্যন্ত অধিক প্রচলিত থাকায় "ন" স্থানে "ণ" অধিক পরিমাণে উচ্চারিত হইত। "ন" আনুনাসিক হইলেও "ণ" মূর্দ্ধাস্পর্শী আনুনাসিক। "স" র প্রচলনও সেইরূপ দেখা যায়। সুতরাং সংস্কৃতে যে সকল শব্দ "ন" ও "শ" ও "ষ", তৎস্থানে প্রাকৃত ভাষায় "ণ" ও "স" বর্ণ আবৃত্তিতে যেমন প্রচলিত ছিল, বর্ণ বিন্যাসও তদ্রূপ নিয়ম বদ্ধ হইয়াছে। এ স্থলে বঙ্গ ভাষায় সংস্কৃত "ণ" ও তিনটী "শ"র স্থানে "ন" ও "স" প্রচলিত থাকায় দোষ দেখা যায় না। আমরা সংস্কৃত শব্দ লিখিতে আমাদের আবৃত্তির বৈষম্যে সংস্কৃত অনুরূপ বর্ণবিন্যাস রাখাই অবৈধ। যাঁহারা এ বিষয়ে আপত্তি করেন, তাঁহারা পালি ও প্রাকৃত ভাষার বর্ণবিন্যাস দেখুন। অবশ্য সংস্কৃত অনুযায়ী, বঙ্গ-ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকলের সন্ধি ও সমাস নিষ্পন্ন বহুপদ ব্যবহৃত হইতেছে। সে বিষয় ব্যাকরণ-প্রণয়ন প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

বর্ণমালায় দীর্ঘ 'ৡ' র ন্যায় হ্রস্ব 'ঌ' এক কালে বর্জ্জন করা উচিত। আর হল বর্ণের সঙ্গে স্বরের সাহায্য যখন ং ও ঃ যুক্ত হইতে পারে না, তখন ঐ দুইটিকে পৃথক্ না রাখিয়া স্বরবর্ণে অং ও অঃ রূপে যোগ করাই উচিত। ক্+অং=কং ভিন্ন ক্+ং যুক্ত হইতে পারে না। অতএব 'অং' 'অঃ' স্বর বর্ণ মালায় রাখাই কর্ত্তব্য।

"শ" তিনটীর উচ্চারণে বঙ্গভাষায় কেন সংস্কৃতশাস্ত্রপারদর্শী বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজও সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠেও বিভিন্নতা রক্ষা করেন না। "ব" দুইটীর সম্বন্ধে ও তাঁহাদিগের তদ্রূপ অভ্যাস। কিন্তু, অন্তঃস্থ "ব" যুক্তাক্ষর অবস্থায় অনেক স্থলে বঙ্গভাষাতেও প্রকৃত উচ্চারণ প্রচলিত আছে। সেকালের পাঠশালায় এজন্য "ব" ফলাকে "কুও" ফলা কহিত। এখনও "দ্বারি"কে "দুয়ারি" "স্বামী"কে "সয়ামী" বলা হয়। বিশেষতঃ হিন্দী ও বৈদেশিক শব্দ উচ্চারণে কি লিখিতে অন্তঃস্থ "ব" আবশ্যক হয়। সুতরাং "ব" দুইটী রাখাই উচিত।

পূর্ব্বে পাঠশালায় "র" অক্ষরের পেট কাটা "ব" এইরূপ ও "ব"র নিম্নে বিন্দু প্রচলিত ছিল। তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বের হস্ত-লিখিত পুস্তকে বর্গীয় "ব" বর্ত্তমান "র" ন্যায় বিন্দুযুক্ত ও অন্তঃস্থ "ব" বিন্দুহীন দেখা যায়। সুতরাং পেট-কাটা "ব", বর্গীয় "র", অন্তঃস্থ "ব" এই আকৃতিতে বর্ণমালায় লিখন-পদ্ধতি করিলে মন্দ হয় না। অথবা "র" পূর্ব্ববৎ রাখিয়া বর্গীয় "ব" দেবনাগরের ন্যায় পেট-কাটা করিলেও হইতে পারে। ইহাতে বঙ্গাক্ষরে লিখিত সংস্কৃত পুস্তকগুলিতে সহজে "ব" দুইটীর অবয়ব বিভিন্ন লিখিবারও বিশেষ সুবিধা হয়। আর বঙ্গভাষায় ক্রমে অন্তঃস্থ "ব"র প্রকৃত উচ্চারণ-প্রচলনের চেষ্টা করাও

উচিত। আমরা যে "বাহোবা" শব্দ ব্যবহার করি, তাহাকে অনেকেই হিন্দী কি পারসী বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু উহা সংস্কৃত "বাহবা" শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। "মাড়বারী"কে আর তাহা হইলে "মাড়োয়ারী" লিখিতে হইবে না। এরূপ বিস্তর দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত বর্ণমালায় অন্তঃস্থ "জ" কি অন্তঃস্থ "অ" নামে কোন বর্ণ নাই। "য" অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ "ইয়" আমরা যুক্তাক্ষরের অধিকাংশ স্থলে উহাকে "ইয়" রূপই আবৃত্তি করি। এই জন্ত পূর্ব্বে পাঠশালায় "য" ফলাকে কিয় ফলা বলিত। "য" পদের আদিতে ভিন্ন মধ্যে ও অন্তে ও "ইয়"ই আবৃত্তি করা যায়। "য ম" কে আমরা জম আবৃত্তি করি, তাহার পূর্ব্বে "নি" উপসর্গ যুক্ত হইলে "নিয়ম" আবৃত্তি করি।

যুক্তাক্ষরের "উদ্যোগ" "উদ্‌যাপন" আদি কতিপয় শব্দে "জ" ব্যতীত, অন্য কল্যাদি অধিকাংশ স্থানেই "ইয়" রূপে উচ্চারিত হয়। সংযম শব্দের মধ্যস্থ "য" জ, আবার নিয়মের স্থানে ইয় উচ্চারিত হইয়া থাকে। আর এদেশে শব্দের আদিতে "জ" ব্যতীত ইয় উচ্চারণ এককালে প্রথা নাই। অতএব "য়" টা বর্ণমালা হইতে বর্জ্জন করিয়া ব্যাবহারিক ভাবে উচ্চারণ-বৈষম্য প্রচলিত রাখিলে চলে কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। আর যদি "য়" রাখাই হয়, তবে তাহার অন্তঃস্থ জ নাম তুলিয়া দিয়া "ইয়" নাম প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত বর্ণমালায় "ড়" ও "ঢ়" নামে কোন বর্ণ নাই। "ড" ও "ঢ"এর প্রকৃত উচ্চারণ প্রচলিত থাকিলে "ড়" ও "ঢ়"র আভাসযুক্ত আবৃত্তি করা উচিত। তাহার শিক্ষা প্রচলিত হইলে আর বিন্দুযুক্ত ঐ দুই বর্ণ রাখার আবশ্যকতা হইতে পারে না। বড়, দৃঢ়, দড়ি আদির উচ্চারণ শিক্ষা-প্রচারে ঐ দুই বর্ণ ত্যাগ করা যাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচনা করা উচিত।

সংস্কৃতে "ঁ" চন্দ্রবিন্দু নামে কোন বর্ণ নাই। "ন" প্রভৃতি আনুনাসিক বর্ণই চন্দ্রবিন্দুর কার্য্য সাধিত হয়। চাঁদ না লিখিয়া চান্দ লিখিলেই চলিতে পারে। সুতরাং চন্দ্রবিন্দু বর্ণমালা হইতে বাদ দিতে পারা যায় কি না, স্থির করা কর্ত্তব্য। আবার বাঁশী, কাঁসা আদি শব্দ "ন" বা অনুস্বার যোগে লিখিলে লিখনানুরূপ উচ্চারণ-বৈষম্য ঘটে। অতএব এ সম্বন্ধ সবিশেষ আলোচনা ব্যতীত কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন।

স্বরের মাত্রা ও ছন্দের বিষয় প্রথমেই বলা গিয়াছে। এখন যা'ক্, থা'ক্, ব্যাড়া, দ্যাখা, ন্যাথন, ধো'সে, খায়্যা, যায়্যা, শব্দগুলি কখন অনুরূপ লিখিতে উপরে কমা দিয়া কি কি "য"-ফলা দিয়া একরূপে কার্য্য সাধন করা হইতেছে। কিন্তু "হ্য" "হ্যান" "হ্যাদে" প্রভৃতি শব্দ লিখন দুষ্কর। "হ"তে "য"ফলা দিলে আমরা "ঝ" রূপে উচ্চারণ করি। অতএব "া" আকার আদিতে চিহ্ন দিয়া কিম্বা কোন যৌগিক স্বরের প্রতিরূপ কল্পনায় এই অসুবিধা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। আর যন্ত্রসঙ্গীতশিক্ষা পুস্তকে স্বরের মাত্রাবোধক যেরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ কোন চিহ্ন দ্বারা মাত্রা-প্রকাশের উপায় করিতে হয়। বঙ্গভাষায়

মাত্রার যে কিরূপ বাহুল্য আছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করিতে একখানি বিস্তৃত পুস্তক লিখিতে হয়। সে বিষয়ে মণ্ডলীর এই বিভাগকে মনোযোগ দানে অনুরোধ করি। "চা'ল" (তণ্ডুল) "মো'শ্‌য়া" (তিসি) "থা'ক্" "যা'ক্" "ব্যা'ড়া" ইত্যাদি শব্দ কথনানুরূপ লিখিবার উপায় নাই। কমা কি "য" ফলাদি দ্বারা এখন নাটকাদিতে একরূপ ভাবে লিখিত হইলেও তাহা লিখনানুরূপ আবৃত্তি করিতে গেলে গণ্ডগোল হয়। "হ্য"কে আমরা "ঝ্য" রূপেই উচ্চারণ করিয়া থাকি। ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। ইংরাজী "হ্যাণ্ডল" শব্দ কেন "হ্যাঁ" "হ্য" "হ্যালা" ইত্যাদি শব্দ "য" ফলা দিয়া লিখিলে লিখনানুরূপ আবৃত্তি করিতে গেলে "ঝ্য" পড়িতে হয়। সুতরাং বর্ণমালায় কতকগুলি যুক্ত স্বরের প্রচলন ভিন্ন অনেক শব্দই কথনানুরূপ লিখা যাইতে পারে না। অথবা যুক্ত স্বর সৃজন না করিয়া "া" আকার আদি বানানের ন্যায় যুক্ত স্বরের বানানের প্রতিরূপ কল্পনা কিম্বা কোন চিহ্নদ্বারা স্থির করা কর্ত্তব্য। অতএব এই সমিতির বর্ণমালা সংস্কারের সঙ্গে ঐরূপ যুক্ত স্বর কি যুক্ত স্বরের বানানের প্রতিরূপ গঠনে মনোযোগ করা উচিত।

(খ) অভিধান-প্রণয়ন ও প্রচার।

এই কার্য্যের ভার সম্মিলনের একটি স্বতন্ত্র বিভাগের হস্তে সমর্পণ করা উচিত। সেই বিভাগের কার্য্য বড়ই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। মণ্ডলীর চেষ্টায় অগ্রে প্রত্যেক জেলা ও উপবিভাগে কার্য্যকরী শাখা সমিতি সকল গঠিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদিগের সহায়তা ব্যতীত এই কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া দুরূহ। "কার্য্যকরী" বিশেষণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে,—নানা স্থানেই সভা সমিতি আছে, এবং নূতন নূতন হইতেছে। কিন্তু সদস্যগণ, স্ব স্ব জীবিকার কার্য্যেই সর্ব্বদা অনবসর। কালে ভদ্রে পাঁচজন একত্র বসিয়া সভার অস্তিত্বটা কায়ক্লেশে রক্ষা করিয়া সংবাদ পত্রে প্রচার করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু, কি মণ্ডলী, কি তাহার কার্য্য, বিভাগ, কি তদধীন বঙ্গের সর্ব্ব বিভাগের শাখা সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সদস্যগণকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই ব্রতপালনে দৃঢ়তর ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে। নতুবা সমিতিগুলি কার্য্যকরী হইবে না। এ বিষয় উপসংহার কালে বলা যাইবে।

এই সমিতি ও বঙ্গের সর্ব্বস্থানের শাখাসমিতি সকল হইতে কর্ত্তব্য-পরায়ণ সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিয়া তত্তৎ প্রদেশীয় ভদ্রলোক, মহিলাকুল ও ইতরশ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত ভাষার শব্দ সকল সংগ্রহ করা হউক এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত দ্রব্যের নাম ও ক্রিয়াপদগুলি এখন যে আকারে প্রচলিত আছে, এবং অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা ও শব্দ উচ্চারণের প্রণালী, পূর্ব্বেই বা কিরূপ ছিল, এখন তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আর সেই পরিবর্ত্তনের কারণ কি, ইহার একটা নির্ঘণ্ট সংগ্রহ করা হউক। আর সেই শব্দগুলির কোন্‌টা কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহার যথাসাধ্য ব্যুৎপত্তি, নির্ঘণ্টের লিখিত প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে যতদূর পারা যায় সন্নিবিষ্ট করা হউক। শব্দের উচ্চারণ বৈষম্য যাহা আছে, তৎপার্শ্বে তাহাও লিপিবদ্ধ হউক।

লোকসমাজে সহজ ও অল্পাক্ষরে কথা বলিবার পদ্ধতি থাকায়, বিশেষতঃ শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ কার্য্যের অনবসরে বহুবর্ণাত্মক শব্দকে খাট করিয়া অল্পাক্ষরে বলায় অনেক শব্দের সঙ্ক্ষিপ্ত আকারে অপভ্রংশ ঘটে। এই প্রণালী পৃথিবীর সকল দেশে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্তই কথ্য ভাষা, অল্পাক্ষরযুক্ত হইয়া ভিন্নাকারে এবং লিখনের ভাষা পরিশুদ্ধভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজসাহীর কোন ব্যবসায়ী জাতিকে দোকানের স্থানে "দন" বলিতে শুনা যায়। ক্রয়বিক্রয়ের সময় সুসম্বদ্ধ কথা বলিবার অবসর না থাকায় শব্দগুলির এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে অপভ্রংশ ঘটে। অতএব শব্দ সংগ্রহকালে ঐরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত কথাগুলিও নির্ঘণ্টে নিবিষ্ট ও তাহার ব্যুৎপত্তি সাধ্যমত বিবৃত করা উচিত।

তদ্ভিন্ন অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের যে সকল কথার উচ্চারণ, এখন লুপ্ত কি সংশোধিত হইয়াছে, সাধ্যমতে সেগুলিও নির্ঘণ্টে সন্নিবেশিত করা উচিত। আর ঐ নির্ঘণ্টগুলি খতিয়ান করিয়া সেই প্রদেশে এক বিষয়ক শব্দ কি ক্রিয়া স্থানবিশেষে যেরূপ অপভ্রংশ কি অন্য শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা হয়, কিম্বা উচ্চারণ বৈষম্য যাহা থাকে, তৎসমুদায় প্রত্যেক প্রচলিত শব্দের আদিতে দক্ষিণ বঙ্গের প্রচলিত শব্দ লিখিয়া তাহার পার্শ্বে ঐ প্রাপ্ত শব্দ ও তাহার ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণগুলি যথাসাধ্য নিবদ্ধ করা উচিত। মণ্ডলী কর্ত্তৃক বর্ণমালা কিম্বা বানানের যেরূপ বর্ণ বা চিহ্ন নিরূপিত হয়, তদনুসারে স্থানীয় প্রচলিত উচ্চারণগুলি যতদূর অভিব্যক্ত করা যাইতে পারে, তাহা করা উচিত।

ঐরূপ খতিয়ান প্রস্তুত হইলে অমরকোষের ন্যায় প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণ-বিভাগ ও নানার্থ-প্রতিপাদক শব্দের একটা বর্গ করিয়া প্রতিবর্গে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে পরিস্কৃত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে প্রত্যেক শব্দের দৃষ্টান্ত সঙ্ক্ষিপ্ত ভাবে নিবদ্ধ করা উচিত।

ইহা ভিন্ন "নির্ব্বাচন-বিভাগ" কার্য্যের সুবিধা নিমিত্ত অপর যে সকল বিষয়ের তথ্য জানিতে চান, সেগুলি লিখিয়া সেই নির্ঘণ্টপ্রস্তাবিত কেন্দ্রসমিতিতে অর্থাৎ মণ্ডলীর এই বিভাগে পাইবার উপায় করা হউক।

"নির্ব্বাচন-বিভাগ" প্রত্যেক প্রদেশ হইতে সংগৃহীত নির্ঘণ্টগুলি প্রস্তাবিত বর্গ ও বর্ণমালানুক্রমে দক্ষিণ বঙ্গ বিশেষতঃ প্রচলিত সাহিত্যে প্রচলিত শব্দ প্রথমে লিখিয়া তাহার পরে বঙ্গের প্রত্যেক প্রদেশের তাহার প্রতিশব্দ, ব্যুৎপত্তি ও আবৃত্তির বিভিন্নতা ও সঙ্ক্ষিপ্তভাবে প্রয়োগস্থল দিয়া একটী বৃহৎ নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করুন। যে সকল প্রাদেশিক শব্দের ব্যুৎপত্তি, শাখা সমিতি স্থির করিতে পারেন নাই, যথাসাধ্য তাহা স্থির করিয়া লিখিয়া এবং যে যে স্থানে অসম্পূর্ণ কি তর্কিত হয়, তাহার একটা চিহ্ন দিয়া পরে টীকায় বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে যিনি তাহার যেরূপ ব্যুৎপত্তি ও তর্ক মীমাংসা করিতে পারেন, সেই প্রার্থনা জানাইবার উপায় নির্ঘণ্টেই স্থির করুন।

এই সঙ্গে "নির্ব্বাচন-বিভাগ"কে আর এক কার্য্য করিতে হইবে। যে যে বৈদেশিক বিষয়, দ্রব্যের নাম, যন্ত্র ও যন্ত্রাঙ্গগুলির নামের প্রতিশব্দ বঙ্গভাষায় এখনও গঠিত

হয় নাই, তাহার একখানা নির্ঘণ্ট পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রস্তাবিত শাখাসমিতি সকল ও প্রসিদ্ধ বিদ্বন্মণ্ডলী ও সাহিত্যসেবিগণের নিকটে প্রেরণ দ্বারা কাহার বিবেচনায় কোন্ শব্দের কোন্ প্রতিশব্দ গঠন কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার মত সংগ্রহের উপায় করুন। এই নূতন নামকরণ ও প্রতিশব্দ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা সভাসমিতি ও বিখ্যাত বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট হইতে মত সংগ্রহের উপায় করিলে এবং সমস্ত ভারতীয় সর্ব্বশ্রেণীর সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার পক্ষে এক প্রকার শব্দ গঠন পক্ষে মনোযোগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই প্রতিশব্দগুলি ভারতবর্ষীয় সকল ভাষায় এক প্রতিশব্দ দ্বারা গঠিত হইলে ভারতীয় সাধারণের সুবোধ্য ও সুপরিচিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশে হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষা যেমন অনেকটা সুবোধ্য; সেইরূপ সংস্কৃত ও পারশ্য ভাষার অনেক শব্দ প্রায় সকল ভাষাতেই অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। এখন আবার ইংরাজীও ভারতের সকল ভাষার মধ্যেই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যাহা হউক সর্ব্বপ্রদেশের ভাষা-বিজ্ঞান-কুশলগণ, প্রথমে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালিভাষা হইতে কি তাহাকে মূল করিয়া কিম্বা একান্ত যে যে শব্দ গঠনে তাহাতে অসুবিধা হয়, সেস্থানে সর্ব্ববোধ্য হিন্দী কি পারশ্য ভাষা হইতে শব্দ নির্ব্বাচন চেষ্টা করেন। তাহাতে অসুবিধা এবং সকলের সহজে উচ্চার্য্য ও সহজবোধ্য না হইলে সেই সকল শব্দকে অবিকল রাখার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই সকল শব্দ-গঠনকালে সাধ্যমত অল্পপ্রাণ বর্ণযুক্ত শব্দ হইলে ভাল হয়।

এই শেষোক্ত বিষয়ের নির্ব্বাচন নিমিত্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা হইতে উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, সিন্ধু, বরদা, রাজপুতানা, মান্দ্রাজ ও মুম্বই বিভাগের সর্ব্বশ্রেণীর নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া একটা স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত করা উচিত। যেমন "দেশলাই" নামটা অনেক স্থানের সুবোধ্য, সেইরূপ প্রস্তাবিত প্রতিশব্দগুলি একপ্রকার না হইলে বৈদেশিক বিজ্ঞানাদি আলোচনায় বড়ই অসুবিধা হইবে। ইহা প্রথমটা অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইলেও, সম্ভবে পরিণত করিবার জন্য যত্ন করিলে এককালে অকৃতকার্য্যতার কারণ দেখা যায় না।

প্রস্তাবিত প্রাদেশিক শব্দের নির্ঘণ্টসহ বৈদেশিক শব্দ সকলের যে সকল প্রতিশব্দ নির্ব্বাচিত হইবে, তৎসমুদায় নির্ঘণ্টে সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রথমে খণ্ডশঃ প্রচার করা হউক। তাহা দেখিয়া পরে যদি বিদ্বন্মণ্ডলী কোন পরিশুদ্ধির লিখিত মন্তব্য প্রদান করেন, তবে সেগুলি নির্ব্বাচন সমিতি বিচারপূর্ব্বক নির্ঘণ্ট সংশোধিত করিয়া কোন পরিশিষ্ট সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারেন।

এই নির্ঘণ্টই বঙ্গভাষার বিরাট্ অভিধান নামে মুদ্রিত ও প্রচারিত হউক। আর তাহার প্রথমে বর্ণমালা ও মাত্রাদির বিষয়ে একটী সজ্ক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা প্রদত্ত হউক। এই অভিধানের এক এক খণ্ড প্রত্যেক প্রাদেশিক সাহিত্যসভায় বিনামূল্যে প্রদত্ত হউক। আর অগ্রিম মূল্য লইয়া কি নগদ মূল্যে বিক্রয় করা হউক।

প্রস্তাবিত নির্ব্বাচন সমিতির পরিচালিত একখানা পাক্ষিক কি মাসিক পত্র প্রচার

দ্বারা, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের গদ্যপদ্যাদিতে যে সকল সংশোধন যোগ্য স্থান আছে, তৎসমুদয় প্রদর্শন ও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত অভিধানের শব্দ ও প্রয়োগ-প্রণালী প্রচার দ্বারা সাহিত্যসেবী ও সাধারণের কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শিত হউক।

এই সঙ্গে নূতন গ্রন্থ-প্রণেতৃগণ, নব প্রচারিত অভিধান এবং উপদেশের যেরূপ অনুসরণ করিবেন, সেইরূপ সংবাদপত্র প্রচারকদিগকেও সেই মতে চলা উচিত। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব প্রচারিত পুস্তকাদি পুনর্মুদ্রনকালে তদনুসারে সংশোধনে মনোযোগ করা উচিত। শিক্ষা পুস্তকগুলিও তদনুবর্ত্তনে প্রণীত হউক। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত অভিধান কিম্বা নির্ব্বাচন সমিতির প্রচারিত সংবাদপত্রে কোন ভ্রম কি সংশোধনযোগ্য বিষয় থাকিলে তৎসমুদায় প্রবন্ধাকারে সেই সংবাদ পত্রে স্থান দিয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ও নির্ব্বাচন-সমিতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হউক। ফলতঃ যে পর্য্যন্ত সমিতি, সেই সকল বিষয়কে সংশোধনযোগ্য বলিয়া ঐ সংবাদ পত্রে প্রচার না করেন, সে পর্য্যন্ত কেহই যেন স্বপ্রণীত পুস্তক বা প্রবন্ধাদিতে তাহা প্রচলনের প্রয়াস না করেন।

এই বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ব্যক্তিগত "পাণ্ডিত্যের" সংযম দ্বারা নির্ব্বাচন সমিতির বশবর্ত্তিতায় বাধা না ঘটে, তৎপ্রতি প্রত্যেকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে বিশেষতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত সংশোধনে বড়ই বিঘ্ন ঘটিবে। কোন সমাজের হস্তে অবিচারিত চিত্তে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ব্যক্তিগত মতবৈষম্য নিবারণ অসম্ভব। আমরা যদি প্রত্যেকে এই সংযম অবলম্বনে অহং মুর্খত্ব পরিবর্জ্জন না করি, তবে মাতৃভূমির কোন কল্যাণেরই আশা করা যাইতে পারে না।

অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত না হইলে যে পদে পদে দোষাপহার পক্ষে বিঘ্ন, তাহা নিম্নের সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে পারশ্য ভাষার শিক্ষা বড়ই সঙ্কীর্ণ। অথচ বঙ্গভাষায় পারশ্যভাষার শব্দ যথেষ্ট প্রচলিত আছে। তাহার ব্যুৎপত্তির অনভিজ্ঞতায় প্রয়োগকালে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এমন কি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ বিষয়েও সেই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বর্ত্তমান সাহিত্যে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত "সটীক" শব্দ এখন কেহ কেহ "সঠিক" লিখিতেছেন। কোন বিষয়ের বিবৃতিই "টীকা" নামে প্রসিদ্ধ। যে বিষয় বিস্তারিত রূপে জানা যায়, সেই স্থলে প্রাচীনেরা "সটীক" জানা কহিতেন। অর্থাৎ "এবিষয় সটীক জানিনা" বলিলে সেই বিষয়ে নিশ্চিত বিবরণসহ না জানা বুঝাইত। বিবৃতির সঙ্গে এই "নিশ্চিত" টুকু উহ্য হইত; এখন সেই "নিশ্চিত"কে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া সহিতার্থের "স"র সঙ্গে পারশ্য নিশ্চিত জ্ঞাপক "ঠিক" যোগ দ্বারা "সঠিক" পদটীকে সঙ্করভাবাপন্ন করা সঙ্গত কি না, সুধিগণ বিবেচনা করিবেন। ফলতঃ এইরূপে "সটীক" শব্দকে সংশোধন না করিলে কোন ক্ষতিই ছিল না। তবে "সটীক" পুস্তকের পক্ষে টীকাসহ প্রসিদ্ধির সহিত অপর বিষয়ে নিশ্চিত সবিবৃতি জ্ঞাপক "সটীক" শব্দের পার্থক্য-রক্ষার্থেই "সঠিক" শব্দ প্রচলন করা বোধ

হয় তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু এক শব্দ নানার্থবাচক রূপে সকল ভাষাতেই প্রচলিত আছে। ইহাতে সটীককে সাঙ্কর্য্য-দোষযুক্ত সঠিকরূপে পরিবর্ত্তিত না করিলে কোন অসুবিধাই দেখা যায় না।

কেহ কেহ চোরামালকে এখন "বমাল" সংজ্ঞা দিয়াছেন। "বমাল ধরা পড়িয়াছে", কথার ব্যবহার দেখিয়া এই ভ্রান্তি-সংঘটনই উপলব্ধ হয়। কিন্তু পারশ্য "বমাল" পদের ব্যুৎপত্তি জানা থাকিলে এরূপ গুরুতর ভ্রম হইত না। বমাল অর্থে মাল সহ; সুতরাং বমাল-সহ বলিলে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত "বকপুষ্পের ফুলে"র ন্যায়, অথবা "হাতীর পিলখানা" কি "ঘোড়ার আস্তাবলের" মত হইয়া যায়। হস্তিবাচক পারশ্য "ফিল"কে আমরা সতরঞ্চ খেলায় "পিল"রূপে উচ্চারণ করি; "খানা" অর্থে শালা বা গৃহ। সুতরাং ফিলখানা বা পিলখানা বলিলেই হস্তীর গৃহ বুঝাইলেও এবং পারশ্য আস্তবল অর্থে অশ্বশালা হইলেও হাতির পিলখানা ও ঘোড়ার আস্তাবল অনেক ভদ্রলোকও কহিয়া থাকেন। সুতরাং অভিধানে যেমন প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি থাকা উচিত, সেইরূপ সাহিত্যসেবিগণের সেই ব্যুৎপত্তি দেখিয়া শব্দ-ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য।

(গ) ব্যাকরণ-প্রণয়ন।

প্রথমে প্রস্তাবিত ভাবে অভিধান প্রচারিত হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার অনুসরণ দ্বারা সর্ব্ববঙ্গে এক প্রণালীতে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইলে পর বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ প্রণয়নের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইতে পারে। অথবা অভিধান প্রচারিত হইবার পরে ব্যাকরণ প্রণীত হইলেও চলিতে পারে। ব্যাকরণ-প্রণয়ন-কালে প্রস্তাবিত অভিধানে সন্নিবিষ্ট শব্দ সকলের নানাস্থানে প্রয়োগ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত, ও ক্রিয়াপদ, সমাস, কারকাদির প্রকৃতি বিচার করিয়া ব্যাকরণ-প্রণয়নে প্রথমে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইবে। আর সর্ব্বপ্রদেশের ভাষার প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা দ্বারা একটা পরিশুদ্ধ মীমাংসায় যেমন বিস্তর বাধা বিপত্তি আছে, সেইরূপ ব্যাকরণের আকার যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। পূর্ব্বে ভাষা, পরে তাহার গতি প্রকৃতি বিচারে ব্যাকরণ-প্রণয়নের কাল উপস্থিত হয়। নতুবা ব্যাকরণ-প্রণয়ন দ্বারা প্রচলিত ভাষাকে সুসংযত করা অসাধ্য। সাহিত্য যদি এক ভাষায় এক পদ্ধতিতে প্রচলিত হয়, তবেই ব্যাকরণ-রচনায় সুগম উপায় হইতে পারে। নতুবা নানাস্থানের কথোপকথনের ভাষাকে কিংবা নানা উচ্ছৃ-ঙ্খলতাপূর্ণ সাহিত্যকে অবলম্বন দ্বারা ব্যাকরণ রচনা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব আবার নিবেদন করিতেছি যে, নির্ব্বাচন-সমিতির শাসনে অবিচারিত চিত্তে সাহিত্যসেবিগণ আত্মসমর্পণ না করিলে সাহিত্যের সংস্কার ও সুগঠন এবং ব্যাকরণ-প্রণয়ন, কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবে না।

স্বদেশের হিতার্থ আমরা এই মহাব্রত ধারণ ও পালনে, কি কিছুতেই সাম্প্রদায়িকতা ও অহংসর্ব্বস্বতা পরিহার করিব না? তাহা না পারিলে বুঝিব যে এদেশের প্রতি শ্রীভগবানের বিষম অভিসম্পাত আছে। এই কার্য্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক কোন সম্পর্কই

নাই। আর যতদূর সম্ভব, সেই সম্পর্ক পরিহারকল্পে মণ্ডলী কি তাহার সংসৃষ্ট সমিতিগুলিকে সর্ব্বপ্রযত্নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। ভাষা ও সাহিত্য, এক ভাষাভাষী সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পত্তি। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা কি দলাদলি এবং ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বড়ই মারাত্মক। একথা সকলেই বুঝেন, সকলেই জানেন, তথাপি যদি রাবণের মত জানিয়া শুনিয়া জেদ ত্যাগ না করেন, তবে রাবণের মত সর্ব্বনাশজনক বিপত্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

ব্যাকরণের প্রথমে নব-নির্ব্বাচিত বর্ণমালার সঙ্গে উচ্চারণ প্রণালী থাকা উচিত। এই ব্যাকরণে সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ, কারক, বিভক্তি ইত্যাদি সংস্কৃতানুযায়ী করিতে কেহ কেহ নিষেধ করেন। কেহ কেহ আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের সম্পূর্ণ অনুরূপ করিয়া ভাষার সুবহুল প্রচলিত গ্রাম্য ও বৈদেশিক শব্দকে অনিয়মাধীন অপভাষা বলিয়া উপেক্ষার ইঙ্গিত করিতেও ছাড়েন না। সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃত ও পালিভাষার যেরূপ শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবৈষম্য আছে, এক্ষেত্রে তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণ করেন না। অতএব শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অত্যধিক সংস্কৃত ব্যাকরণ-পক্ষপাতিতা দ্বারা গোঁড়ামি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

বিচারকালে পূর্ব্বপক্ষকারীকে শাস্ত্রের বিকৃতব্যাখ্যায় পরাভূত করার কলঙ্কটা অধ্যাপক সমাজে বড়ই প্রবল; আর সেই জেদের জন্য এদেশে শাস্ত্রানুযায়ী আচারের মূলোচ্ছেদের কথা অনেকেই কহিয়া থাকেন। এস্থানে তাহার বিচার করা অনাবশ্যক। কিন্তু পর প্রতিভাকে খর্ব্ব করিয়া স্বকীয় প্রতিভা বলবতী করিবার আগ্রহটা এদেশে অনেক স্থলেই দেখা যায়। ইহাতে সমাজে ব্যক্তিগত খ্যাতিপ্রচারের সুবিধা থাকিলেও প্রকৃত উন্নতিপক্ষে অশেষ প্রতিবন্ধক অবশ্যম্ভাবী। অতএব দলাদলি ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। প্রস্তাবিত উভয়বিধ মতের আলোচনায় ইহাই বুঝা যায় যে, সন্ধি, সমাসাদি এককালে ত্যাগ করা যাইতে পারে না।

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত শব্দ ও সন্ধি-সমাস-নিবদ্ধ পদ যথেষ্ট প্রচলিত আছে। বনস্পতি, বাচস্পতি, ভাস্কর প্রভৃতি পদের সন্ধিবিচ্ছেদ করিলে বঙ্গভাষায় বনপতি, বাচপতি, ভাকর ইত্যাদি অব্যবহার্য্য শব্দ ও পদ হইয়া যায়। আর প্রত্যেক ব্যবহার্য্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। বঙ্গভাষায় মনঃ ও পুনঃ ইত্যাদি পদে বিসর্গ ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন সংস্কৃত শব্দ কি পদ, বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত থাকায়, তাহা প্রকৃতার্থে প্রয়োগ করাও দুষ্কর। যেমন সংস্কৃত ভাষায় "অনুত্তম" শব্দ অতি উত্তম অর্থে প্রযুক্ত হইলে ও বঙ্গভাষায় তাহা প্রচলিত করিলে নঞ্ অর্থে অণ্ উপসর্গ যোগে উত্তম নহে বা অধম বলিয়াই প্রতীত হয়।

ইতরশ্রেণীর মধ্যে প্রদেশবিশেষে অমন্দ শব্দ প্রচলিত আছে। "আমি কি অমন্দ বলিলাম" অর্থাৎ "মন্দ কি বলিলাম", ইহাই বুঝায়; সুতরাং একশ্রেণীর মধ্যে ব্যবহার দেখিয়া তাহা অভিধান কি ব্যাকরণে স্থান প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং সেই ভ্রম সংশোধন

করাই উচিত। যাহা হউক, বঙ্গীয় ব্যাকরণে বঙ্গভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও পদগুলির সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ আদিরও সূত্র থাকা উচিত। অথচ ঐ প্রণালীতে অন্য শব্দগুলির যে সন্ধি ইত্যাদি হইতে পারে না, তাহাও দেখান উচিত। কচু+আলু+আদা সন্ধি দ্বারা "কচ্বাল্বাদা" পদ যে হইতে পারে না, তাহাও অন্য প্রকরণে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। আবার খাজানাদি, কাগজাদি, সন্ধির পদ যাহা প্রচলিত আছে, তাহাকে বর্জ্জন করাই উচিত।

অতএব আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ ও পদগুলির সন্ধি ও সমাস আদির পৃথক্ প্রকরণ করিয়া অপর শব্দ ও পদগুলির পৃথক্ প্রকরণ বা পরিচ্ছেদ করা উচিত। কৃদন্ত বিষয়েও তাহাই প্রযুজ্য। তবে বঙ্গভাষায় প্রচলিত শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তি লিখিয়া ব্যাকরণকে অসম্ভব বর্দ্ধিতকলেবর না করিয়া তদ্বিষয়ে অভিধানের প্রতি ভারার্পণ করাই বৈধ।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচ্য থাকিলেও এখন তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক। তবে ষত্ব ও ণত্ব প্রকরণ তুলিয়া দিলে দোষ দেখা যায় না। কিন্তু উচ্চারণের মাত্রা নির্ণয় তদ্ঘটিত সুসম্বদ্ধ সূত্রগুলি দৃষ্টান্তসহ সন্নিবিষ্ট থাকা উচিত।

প্রবন্ধ (৯)

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বঙ্গভাষায় আয়ুর্ব্বেদের গবেষণা ও শিক্ষাবিষয়ক পুস্তক

(প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন)

বিজয়তে গুরুর্নিত্যং সত্যজ্ঞানদয়ানিধিঃ।
ধীমহি তৎপদং শ্রীমৎ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

কেবল সাহিত্য আলোচনা দ্বারা ভাষার সার্ব্বাঙ্গিক উন্নতি সাধন হয় না। সাহিত্য ভাষাকে জীবিত রাখে ও পরিমার্জ্জিত করে মাত্র। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির জন্যই ভাষার গৌরব। ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, বিজ্ঞানাদির মৌলিক তত্ত্ব যত অধিক পর্য্যালোচিত হইবে, ততই অন্যত্র ভাষার আদর বৃদ্ধি পাইবে। জার্ম্মেণী দেশের ভাষা ইহার জলন্ত উদাহরণ। বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা বঙ্গভাষা সেই গৌরব ও সম্পৎ-লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদের মৌলিক গবেষণায় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং তদ্বিষয়ক আলোচনা দ্বারা সময় নষ্ট করিতে চাই না।

আমার অদ্যকার বক্তব্য বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে বঙ্গভাষায় আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাব্যবস্থা ও মৌলিক গবেষণা। একটী কথা দ্বারা মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, যেমন বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়, সেইরূপ ব্যবহারিক বিজ্ঞানই বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম-আলোচনার প্রয়োজক। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে ইহার বহু সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বোধ হয় বাষ্পীয় কলের আবিষ্কার দ্বারাই পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ডাক্তারী ঔষধ ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের আবশ্যকতাই নব্য রসায়নী বিদ্যাকে এত শীঘ্র উন্নত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের বলিতে কেবল আছে—আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ। আজি আমার বলিবার বিষয়—আয়ুর্ব্বেদ।

পূর্ব্বকথিত মীমাংসা মতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা আরম্ভ করিলে তদ্দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানের অঙ্গসমূহের উন্নতি আপনা হইতেই হইবে এবং তৎসহ অন্যান্য মৌলিক নূতন তথ্যেরও যে আবিষ্কার হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সত্য বটে, পাশ্চাত্য উন্নত বিজ্ঞানাদির আলোচনা, পাশ্চাত্য প্রথা মতে বাঙ্গলা ভাষায় আরম্ভ করিলে আমাদের ভাষা ও জ্ঞান এই উভয়েরই উন্নতি সাধিত হইবে; কিন্তু এ স্থলে ইহাও বলা উচিত যে বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য প্রথা মতে বিজ্ঞানালোচনা করিতে গেলে ভাষান্তরীকরণ ব্যতীত অন্য কিছু হইবে না। কেবল ভাষান্তর করিয়া জ্ঞান বা এতদুভয়েরই সম্যক পুষ্টি সাধিত হইবে না। ভাষার পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত মৌলিক গবেষণার জন্য প্রথমেই পাশ্চাত্য প্রথা মতে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা আরম্ভ করিলে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাহ্য চাক্‌চিক্য, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন না করিয়া বরং ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইবে। যে প্রথায় আলোচনা করিলে এইরূপ ফল অবশ্যম্ভাবী, সেই ভাবে আলোচনা করিতে কে পরামর্শ দিবে? কে স্বদেশের উন্নত, বহুকালস্থায়ী, বহুপরীক্ষিত ও বহুপরিচিত শাস্ত্রের নাশকল্পে অগ্রসর হইবে? আমার এইরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে কৃতবীর্য হইয়া আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহারাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হইয়া আয়ুর্ব্বেদকে আরও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছেন। এই শ্রেণীর লোক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন কি না, জানি না। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হইলে প্রাচ্যপ্রণালী মতে চলিতে হইবে। ইহাতে অনুকৃতি বা ভাষান্তরীকরণের ভয় থাকিবে না, বরং নূতন পথে চলিলে নব নব তথ্যের আবিষ্কারের সম্ভাবনাই অধিক।

অনেকের ধারণা আছে যে, আয়ুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী মত বিরচিত নহে। ইহা কতকটা উচ্চ অঙ্গের হাতুড়ে রকমের চিকিৎসা মাত্র। একথা যাহারা বলে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করা যায় না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদে লব্ধপ্রবেশ নহে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণের শৃঙ্খলাশূন্য কার্য্যপ্রণালী ও শিক্ষাপ্রণালীই তাহাদের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইবার অবসর দিয়াছে। কিন্তু এইরূপ বিপরীত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়াও যে সকল মনস্বী আয়ুর্ব্বেদের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে বিরচিত হইয়াছিল। সহস্রাধিক বৎসর অনালোচিত থাকায় এবং গুরুশিষ্যপরম্পরা সুশিক্ষা ও মৌলিক তত্ত্বের অভাবে এখন এই আয়ুর্ব্বেদ জড়বৎ প্রতীয়মান হইতেছে। পক্ষান্তরে এই সময় মধ্যে প্রতীচ্য বিজ্ঞান প্রবল ভাবে উন্নতি লাভ করিয়া নিত্য নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছে। ইহারই ফলে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিকত্ব সংশয়াত্মক হইয়া উঠিয়াছে। সংশয়ের অন্য একটী প্রধান কারণ গ্রন্থলোপ। ভেল, জতুকর্ণ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ক্ষারপাণি, বৈদেহ জনক প্রভৃতি ঋষিগণের মৌলিকতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজি এই সময়ের মধ্যেই লোপ পাইয়াছে। তৎস্থলে কতকগুলি নিকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থ

প্রচার লাভ করাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সাধারণের এই অশ্রদ্ধা আসিয়াছে ; কিন্তু এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাও তুচ্ছের বিষয় নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়টী কথা বলিতেছি।

(ক) চরক ও সুশ্রুতের সূত্র ও শারীর স্থানে বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার করিয়া স্বস্থবৃত্তি, রোগ ও প্রতিষেধক ঔষধাদির বিজ্ঞানসম্মত কল্পনা করা হইয়াছে।

(খ) চরক ও সুশ্রুতের বস্তুগত সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য নির্ণয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতসম্মত। (সূত্র, বিমান ও শারীর স্থান)।

(গ) অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের নিদান স্থানে শ্লোক নিবদ্ধ উপশয় লক্ষণ চরক ও সুশ্রুত সম্মত। লক্ষণটী এই—

"হেতুব্যাধিবিপর্য্যস্তবিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্।
ঔষধান্নবিহারাণামুপযোগং সুখাবহং॥
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ।"

যেরূপেই হউক প্রকৃতিকে সমাবস্থায় আনয়নই চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদের মতে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ প্রকারে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, যথা—

১।	হেতু বিপরীত	ঔষধ	অন্ন ও	বিহার	=৩
২।	ব্যাধি "	"	"	"	=৩
৩।	উভয় "	"	"	"	=৩
৪।	হেতু বিপরীতার্থকারী	"	"	"	=৩
৫।	ব্যাধি "	"	"	"	=৩
৬।	উভয় "	"	"	"	=৩

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ, তাঁহারা জানেন যে, সূত্রটী পড়িলেই এই সূত্রটী যে শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে সেই শাস্ত্রের বিষয় গুলি বিশৃঙ্খল ভাবে চিন্তিত হয় নাই। বোধ হয় কেবল এই সূত্রটী অনুসারে আয়ুর্ব্বেদের মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হইলে বহু নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারে।

(ঘ) চরক ও সুশ্রুতের সূত্রস্থানে অভিহিত শারীর-প্রকৃতি-বিজ্ঞান, উচ্চ পদ্ধতি মতে সূত্রিত হইয়াছে।

(ঙ) রসরত্ন সমুচ্চয়ে "রসশালার" বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা ও কার্য্যসমূহ বেশ সুপ্রণালী মতে সাধিত হইত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরী (Laboratory) রসশালার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ।

এই সকল বিষয়ের মৌলিক গবেষণা, কোনও চলিত ভাষায় হইলে, তদ্দ্বারা যে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতে আয়ুর্ব্বেদের মৌলিক গবেষণা কোন্ ভাষায় হওয়া উচিত ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশেই ইদানীং আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচলন এবং তন্মধ্যে অধিকাংশ কবিরাজ মহাশয়ই বঙ্গবাসী। অন্যান্য

প্রদেশবাসী মানবকগণ আসিয়া বাঙ্গালী কবিরাজকে অধ্যাপক স্বীকার করিয়া বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা লাভ করিতেছে। এমত অবস্থায় এই গবেষণা বাঙ্গালাভাষাতেই হওয়া উচিত। আশা করি এই সভা ইহার কোন উপায় স্থির করিয়া বিজ্ঞানের বীজ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা করিবেন।

বিজ্ঞানের সমুদায় অংশের সহিতই আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তবে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা দ্বারা বিজ্ঞানের যে যে বিষয়ের বিশেষ পুষ্টি সাধিত হইতে পারে, তাহার একটী সজ্ক্ষিপ্ত সূচীপত্র নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

১। পারিভাষিক শব্দ-সংগ্রহ।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমতঃ অনুবাদের আবশ্যকতা আছে। এই অনুবাদকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে নানাবিধ পারিভাষক শব্দ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই পারিভাষিক শব্দ যাহাতে আমাদের পূর্ব্ব ব্যবহৃত ভাষা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার চেষ্টাই প্রথমে করিতে হইবে। এই চেষ্টা করিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা অত্যাবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদে বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ অসংখ্য আছে। সহস্র বৎসরের অনালোচনায় কতকগুলি শব্দ অস্পষ্টার্থ-বাচক, কতকগুলি অন্যার্থবাচক এবং কতকগুলি সর্ব্বতোভাবে অবিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা দ্বারা এই সমুদায় শব্দের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কৃত হইবে এবং তাহা দ্বারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনা কিঞ্চিৎ সহজ হইয়া আসিবে।

২। অঙ্গ-বিনিশ্চয় ও প্রকৃতি-বিনিশ্চয়।

ভগবান্ সুশ্রুত, শারীর স্থানে যে ভাবে শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা অঙ্গবিনিশ্চয় করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই মতে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে কোনও রূপ নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না, বোধ হয় এপর্য্যন্ত তাহার বিশেষ পর্য্যালোচনা হয় নাই। এখন সেই প্রাচীন মতে অঙ্গব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যক মনে করি। বোধ হয় এই প্রণালীতে বিশ্লেষণ না করিলে কলা, মর্ম্ম, স্নায়ু, শিরা, ধমনী প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কৃত হইবে না। চরকের শরীর-স্থানে ভগবান্ পুনর্ব্বসু "ইতি শরীরাবয়বসংখ্যা যথাস্থূলভেদেনাবয়বানাং নির্দ্দিষ্টা। শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেন অপরিসংখ্যেয়া ভবন্তি অতি বহুত্বাৎ অতি সৌক্ষ্মাৎ অতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ। অর্থাৎ শরীরাবয়বের বিষয় স্থূল ভাবে বলা হইল। পরমাণুভেদে শরীরাবয়ব-সংখ্যা অগণ্য—ইহা অতি সূক্ষ্ম এবং অতীন্দ্রিয়।" এই কথা বলিয়াই নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন :—

শরীরসংখ্যাং যোবেদ সর্ব্বাবয়বশো ভিষক্।
তদজ্ঞান নিমিত্তেন সমোহেন নমুহ্যতি॥

অর্থাৎ যে ভিষক্ সমুদায় শরীরের বিবরণ বেশ সূক্ষ্ম ভাবে জানিতে পারেন, তিনি অজ্ঞান জনিত মোহে মুগ্ধ হয়েন না। আমরা মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করিয়া যদি পুনর্ব্বসুর সিদ্ধান্তানুসারে আমাদের মত-সমর্থনের জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করি, তাহা হইলে আনু-বীক্ষণিক অঙ্গ-বিনিশ্চয়ে এ দেশবাসীর কোনও অশ্রদ্ধা থাকিবে না।

আয়ুর্ব্বেদ প্রকৃতি-বিনিশ্চয়ে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী ধাতুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই তিনটী যে কি, তাহা সহস্রাধিক বর্ষকাল অনালোচিত থাকায় এখন অস্পষ্টার্থ হইয়া উঠিয়াছে। অথচ বায়ু, পিত্ত ও কফের উপর আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমার বোধ হয় এই ত্রিধাতুর তত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে বহু নূতন তথ্যের সমাবেশ হইবে।

অঙ্গ-বিনিশ্চয় ও প্রকৃতি-বিনিশ্চয় বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ সংগৃহীত হইলে অনু-বাদের জন্য নূতন শব্দ অল্পই আবশ্যক হইবে।

৩। দ্রব্য ও রস-তত্ত্ব।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে ভাবে দ্রব্যবিশ্লেষণ-প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদেও সেই ভাবে না হউক, অন্য উপায়ে বিশ্লেষণ-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। আয়ুর্ব্বে-দের বিশ্লেষণ-প্রণালী অনুসারে প্রত্যক্ষ গবেষণা আরম্ভ করিলে যে হতাশ্বাস হইতে হইবে না, তাহা আয়ুর্ব্বেদে লব্ধপ্রবেশ মাত্রই অবগত আছেন। রস, বীর্য্য, বিপাক প্রভৃতি দ্বারা দ্রব্য-গুণ-স্থিরীকরণ, আয়ুর্ব্বেদের নিজস্ব। বিপাক ও রসের সম্যক্ আলোচনা দ্বারা বিজ্ঞানে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইতে পারিবে। রসাদি দ্বারা দ্রব্যগুণ স্থির করিতে যাইয়া ভগবান পুনর্ব্বসু চরকের সূত্র স্থানে বলিয়াছেন :—

"অনেনোপদেশেন ন অনৌষধিভূতং জগতি কিঞ্চিদ্‌দ্রব্যমুপলভ্যতে। তাং তাং হি যুক্তিমর্থঞ্চ তং তমভিপ্রেত্য।" অর্থাৎ পূর্ব্ব উপদেশ মত যুক্তি ও বিষয় অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে যে, জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা ঔষধরূপে গ্রহণ না করা যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদে ঔষধের বহুবিধ প্রয়োগ-রূপ প্রচলিত আছে, যথা স্বরস, কষায়, শীত কষায়, ফাণ্ট, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ, বটী, আসব, অরিষ্ট, অবলেহ, প্রলেপ প্রভৃতি। ভৈষজ্য বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা-কালে যখন ইহাদের প্রত্যক্ষমূলক তথ্য নির্ণীত হইয়াছে, তখন ভৈষজ্য-ভাণ্ডার নূতন শ্রীলাভ করিবে।

ভৈষজ্যবিদ্যার একটী অধ্যায় উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। অস্মদ্দেশে প্রচলিত উদ্ভিদ্‌বিদ্যা যে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ছিল না, তাহা একটী বিশেষ প্রবন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। এখন সেই উদ্ভিদ্ বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিলে যে, প্রতীচ্য উদ্ভিদ্ বিদ্যার আলোচনা-কালে বিশেষ সহায়তা হইবে, তাহাও সেই প্রবন্ধে বলিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ভৈষজ্য বিদ্যার আর একটি অধ্যায় প্রাচীন রসশাস্ত্র। প্রাচীন রসসাধকগণ যে সাধনা দ্বারা রসসিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সমুদায় সাধনা সহস্রাধিক বৎসরের আলোচনার এবং গুরুপরম্পরা শিক্ষার অভাবে লোপ পাইতেছে ; সাক্ষ্যস্বরূপে রসেন্দ্রসার-সংগ্রহের টীকা হইতে একটী মাত্র কথার উল্লেখ করিতেছি ;—

"বন্ধনশ্চ কলৌ সুদুষ্করঃ সাধকাভাবাৎ উপদেশাভাবাচ্চ। রসমারণঞ্চ বাস্তবঃ কলৌ নাস্তি সাধকাভাবাদুপদেশাভাবাচ্চ।"

রসশাস্ত্রে বহু পারিভাষিক শব্দ আছে। এতদ্দেশপ্রচলিত কোন রসগ্রন্থে সেই সমুদায় পারিভাষিক শব্দের লক্ষণাদি সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থে বাগ্‌ভট, এইরূপ কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এখনও যদি সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সম্ভৃতসম্ভার ও সর্ব্বোপকরণবান্ হইয়া পুনরায় রসশাস্ত্রের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় উক্ত কলিপ্রভাব উল্টাইতে পারা যাইবে এবং নব্য রসায়ন শাস্ত্রকে নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিতে পারা যাইবে।

রসশাস্ত্রের সহিত আর একটী বিষয়ও যে বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছিল, তাহার উদাহরণ বহু স্থলে পাওয়া যায়। বৈক্রান্ত ও অন্য কতকগুলি রত্নের লক্ষণ ও ধাতুসত্ত্ব পাতনের বিষয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বকালে খনিবিদ্যাও বেশ সুপ্রণালী মত আলোচিত হইত।

৪। নাড়ী-পরীক্ষা।

আয়ুর্ব্বেদের আর একটী অংশ নাড়ীবিজ্ঞান। কয়েক খানি তন্ত্র, কণাদের নাড়ী প্রকাশ ও শঙ্কর সেন কৃত নাড়ী-বিজ্ঞানে নাড়ীর গতিবিষয়ক বহু জ্ঞাতব্যবিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে এবিষয়ের সমর্থক বিশেষ কোন কথা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, উত্তর কালে রোগ নির্ণয়ের জন্য যে মৌলিক গবেষণা হইতেছিল, তাহারই ফল নাড়ীপরীক্ষা। এখন আলোচনা ও গুরুপরম্পরা শিক্ষার অভাবে, একটী সুন্দর জ্ঞানোপায় লোপ পাইতেছে। রোগবিজ্ঞানে নাড়ীপরীক্ষাও যে আবশ্যক, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন এবং নাড়ীর গতি শারীরিক অবস্থানুসারে যে, বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও তাঁহারা অস্বীকার করেন না।

নাড়ীর গতি দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নানাপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিতেছেন। পক্ষান্তরে অস্মদ্দেশে পূর্ব্বালোচিত বিষয়টী আলোচনার অভাবে নষ্ট হইতেছে এবং কেহ কেহ নাড়ীর গতি দ্বারা রোগনির্ণয় করাটাকে বুজরুকী বলিতেও ত্রুটী করিতেছেন না। তবে সুখের বিষয় এই শ্রেণীর নিন্দুকেরা আয়ুর্ব্বেদে লব্ধপ্রবেশ নহেন, কোন প্রকারে ইহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদের রসাস্বাদ করাইতে পারিলে ইহাদিগের দ্বারাই এই বিদ্যার বিশেষ উন্নতিসাধন করা যাইবে এবং এই সূক্ষ্ম বিষয়টীর গবেষণার ফলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে।

৫। অরিষ্ট লক্ষণ।

আয়ুর্ব্বেদের এই অধ্যায়ের বিশেষত্ব আছে। নিয়ত মৃত্যুজ্ঞাপক চিহ্নকে লক্ষণ কহে। চরকের ইন্দ্রিয়-স্থানে এবং সুশ্রুতের সূত্রস্থানের কয়েকটী অধ্যায়ে অরিষ্ট-লক্ষণের বহু উদাহরণ আছে। আয়ুর্ব্বেদের এই বিষয়টী বিশেষভাবে আলোচনার উপযুক্ত।

৬। স্বস্থ বৃত্তাধ্যায়।

ভগবান ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, "ইহ খলু আয়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং স্বস্থস্য স্বাস্থ্যরক্ষণং ব্যাধিতস্য ব্যাধিপরিমোক্ষঃ।"

আয়ুর্ব্বেদের প্রথম প্রয়োজন স্বস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা করা এবং দ্বিতীয় প্রয়োজন চিকিৎসা অর্থাৎ রোগাপনয়ন। নানারূপে এদেশবাসী হীনস্বাস্থ্য হইয়াছে। স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে আমাদের বহু পুরুষাচরিত নিয়মাদির দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য্য হইবে।

একটী কথা মাত্র বলিয়া আমি উপসংহার করিব। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে—

প্রথমতঃ—একটী পুস্তকাগার স্থাপন করিতে হইবে। এই পুস্তকাগারে ভারতের নানা স্থানে নানা ভাষায় প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীদিগ দ্বারা একটী পরিষৎ গঠন করিতে হইবে। এই পরিষৎ আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিবে এবং এই পরিষৎ হইতে আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন অঙ্গের পুষ্টিসাধনের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচিত হইবে।

তৃতীয়তঃ—আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষার ব্যবস্থা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় করিতে হইবে। এবং প্রাচীন মতানুসারে বিষয় বিশেষে ধারাবাহিক উপদেশ প্রদান করিতে হইবে। কেন্দ্রস্বরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনার ভার বিভিন্ন অধ্যাপককে গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ—এই বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণেরও মৌলিক গবেষণাকারিগণের প্রত্যক্ষমূলক পরীক্ষার জন্য বিভিন্নবিষয়ক রসশালা এবং ইহার সহিত একটী আতুরাশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। আশাকরি এই বিদ্বৎ সমাজ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞান ও বঙ্গভাষার উন্নতি-সাধনের সহায়তা করিবেন এবং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের নাম।

সভাপতি—শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ পাঁড়ে, বি,এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, বি,এল্।

ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন।

কাশিমবাজার।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
২। ,, রাধিকাচরণ নন্দী
৩। ,, রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ
৪। ,, মুন্সী আহাম্মদ মিঞা
৫। ,, প্রসন্ননাথ দে
৬। ,, শান্তিরাম নন্দী
৭। ,, যোগেশচন্দ্র দে
৮। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৯। ,, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
১০। ,, চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য
১১। ,, শতঞ্জীব ভট্টাচার্য্য
১২। ,, প্রহ্লাদরতন চট্টোপাধ্যায়

ঝাউখোলা।

১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
২। ,, রাধিকাচরণ বরাট
৩। ,, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

খাগড়া।

১। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
২। ,, ডাক্তার বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়,
৩। শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত
৪। ,, নিবারণচন্দ্র সেন, (নণ্ড বাবু)
৫। ,, প্রসন্ননাথ রায়, বি, এল
৬। ,, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
৭। ,, বনওয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়
৮। ,, মোহিনীমোহন দত্ত
৯। ,, যোগেন্দ্রনারায়ণচন্দ্র মণ্ডল
১০। ,, আশুতোষ দত্ত
১১। ,, চণ্ডীচরণ সাহেব সিং
১২। ,, কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত
১৩। ,, অধরচন্দ্র প্রামাণিক
১৪। ,, বিষ্ণুপদ ঘোষ
১৫। ,, রমাপতি দত্ত
১৬। ,, ঋষিপদ কুণ্ড
১৭। ,, ননীপদ সাহা
১৮। ,, গুরুদাস আঢ্য
১৯। ,, দ্বারিকানাথ গুপ্ত
২০। ,, রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২১। ,, হরিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর।

১। শ্রীযুক্ত হারাধন নাগ এম,এ,বি,এল
২। ,, চন্দ্রকুমার রায়, বি, এল

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের নাম।

৩। শ্রীযুক্ত বামাপদ দত্ত, বি এল
৪। ,, অম্বিকাচরণ রায় এম, এ, বি,এল
৫। ,, অন্নদাচরণ চৌধুরী
৬। ,, যোগেশচরণ সেন
৭। ,, বিষ্ণুচরণ সেন
৮। ,, শ্রীবনবিহারী সেন
৯। ,, মণিমোহন সেন
১০। ,, জানকীনাথ পাঁড়ে বি, এ
১১। ,, হরিচরণ নাগ
১২। ,, কামাখ্যাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
১৩। ,, পণ্ডিত নীলমণি ভট্টাচার্য্য
১৪। ,, গিরিজাভূষণ বর্ম্মণ
১৫। ,, বিভূতিভূষণ মাহাতা
১৬। ,, রাধাকৃষ্ণ সেন
১৭। ,, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
১৮। ,, রেভাঃ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
১৯। ,, মধুসূদন সিংহ,ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টর
২০। ,, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
২১। ,, নৃত্যগোপাল ধর, উকীল
২২। ,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বি, এল
২৩। ,, আশুতোষ মজুমদার বি, এল
২৪। ,, রাধিকামোহন সেন এম,এ,বি,এল
২৫। ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার
২৬। ,, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল
২৭। ,, মহেন্দ্রনাথ রায়
২৮। ,, হিরণ্ময় সেন
২৯। ,, বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ,
৩০। ,, ললিতমোহন বাগচী কবিরাজ
৩১। ,, হরচরণ সেন কবিরাজ
৩২। ,, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার
৩৩। ,, হেমচন্দ্র রায়
৩৪। ,, কুমার সতীশচন্দ্র রায়
৩৫। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি, এল
৩৬। ,, প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল
৩৭। ,, কালীপদ ঘোষ বি, এল
৩৮। ,, কৃষ্ণচরণ আচার্য্য, উকীল
৩৯। ,, কৈলাসচরণ সেন, কবিরাজ
৪০। ,, বিজয়মাধব বাগচী এল,এম,এস
৪১। ,, মন্মথনাথ রায় এল, এম, এস
৪২। ,, অম্বিকাচরণ দত্ত এম, বি
৪৩। ,, শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
৪৪। ,, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার
৪৫। ,, নৃত্যগোপাল সরকার
৪৬। ,, জিতেন্দ্রনাথ বাগচী, এম, এ
৪৭। ,, ভূষণচন্দ্র দাস এম, এ
৪৮। ,, মোহিনীমোহন রায় এম, এ
৪৯। ,, হরিপদ রায়, কবিরাজ
৫০। ,, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫১। ,, হরিপদ রায়, সব্‌-ডেপুটী
৫২। ,, অবনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৫৩। ,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,মোক্তার
৫৪। ,, রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
৫৫। ,, কুলদাপ্রসাদ রায়, মোক্তার
৫৬। ,, নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
৫৭। ,, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫৮। ,, কালিদাস প্রেমজী কোং
৫৯। ,, মুরারজী ধরমজী কোং
৬০। ,, লক্ষ্মীদাস্ জগজীবন কোং
৬১। ,, আশুতোষ ঘোষ
৬২। ,, অনিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩। ,, ভগবান দাস গুন্ধাভাই
৬৪। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক
৬৫। ,, উমাচরণ রায়
৬৬। ,, মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৬৭। শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়
৬৮। ,, তরণীমোহন রায় বি, এল
৬৯। ,, উমাকান্ত রায়, কবিরাজ
৭০। ,, জোসেফ্ অরুল্যানানথাম
৭১। ,, নিখিলনাথ রায়, বি, এল
৭২। ,, সৌরীন্দ্রমোহন রায়
৭৩। ,, শ্রীশচন্দ্র রায়
৭৪। ,, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য
৭৫। ,, জগন্নাথ ঘটক
৭৬। ,, নৃপেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী
৭৭। ,, সুধাংশুশেখর বাগচী
৭৮। ,, বিভূতিভূষণ মজুমদার
৭৯। ,, যদুনাথ সাহা দালাল
৮০। ,, সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
৮১। ,, গিরিশচন্দ্র রায়

ঘাটবন্দর।

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ বাগচী
২। ,, শশিভূষণ চৌধুরী
৩। ,, কিরণেন্দু ঘোষ
৪। ,, গঙ্গাদাস সাহা বি, এল
৫। ,, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি, এল
৬। ,, হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়
৭। ,, রাধিকামোহন গোস্বামী
৮। ,, নীলমণি ঘোষাল
৯। ,, হরিমোহন বাগচী

সৈদাবাদ।

১। রায় শ্রীনাথপাল বাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল
৩। ,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি, এল
৪। ,, রমণীমোহন সেন
৫। ,, হেমেন্দ্রনাথ সেন, বি, এল
৬। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ কোঁচ বি, এল
৭। ,, বনওয়ারিলাল গোস্বামী, মোক্তার
৮। ,, গোপালদাস বর্ম্মণ
৯। ,, গোপাললাল ঠাকুর
১০। ,, ব্রজনাথ ঠাকুর
১১। ,, নলিনীকান্ত ঠাকুর
১২। ,, জীবনকৃষ্ণ পরামাণিক
১৩। ,, উমেশনাথ ভট্টাচার্য্য
১৪। ,, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
১৫। ,, দেবেন্দ্রনাথ বসু
১৬। ,, ক্ষেত্রনাথ পাল
১৭। ,, রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৮। ,, শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
১৯। ,, হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল
২০। ,, শশিভূষণ সরকার
২১। ,, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
২২। ,, অন্নদাপ্রসাদ বাগ
২৩। ,, পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার
২৪। ,, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ সেন
২৫। ,, প্রসন্ননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল
২৬। ,, যোগেন্দ্রকান্ত সেন কবিরাজ
২৭। ,, অনাথনাথ চৌধুরী
২৮। ,, গয়ারাম স্মৃতিকণ্ঠ
২৯। ,, বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজাগঞ্জ।

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কুঞ্জঘাটা।

১। শ্রীযুক্ত ভাগবৎভূষণ দঢ়

গোরাবাজার।

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, সব্ জজ
২। ,, অচিন্ত্যনাথ দত্ত, ১ম মুন্সেফ

৩। শ্রীযুক্ত রামসদন ভট্টাচার্য্য ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট
৪। " গিরিশচন্দ্র দত্ত ঐ
৫। " সুরেন্দ্রলাল মিত্র ঐ
৬। " অমৃতশেখর মুখোপাধ্যায় ঐ
৭। " নৃপেন্দ্রনাথ মৈত্র সব্ ডেপুটী
৮। " নফরদাস রায়
৯। " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১০। " কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১। " রাধারমণ মুখোপাধ্যায়
১২। " রায় বগলানন্দ মুখোপাধ্যায়বাহাদুর
১৩। " মুন্সী জোয়াদ্দার আলি
১৪। " ক্ষেত্রমোহন সেন
১৫। " আজিজ মিঞা
১৬। " সত্য উপেন্দ্র মল্লিক
১৭। " ব্রজেন্দ্রনাথ বসু
১৮। " হীরালাল হালদার এম, এ
১৯। " গিরিশচন্দ্র মিত্র এম, এ
২০। " যতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ
২১। " ত্রিপুরাচরণ ভট্ট
২২। " হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল
২৩। " পূর্ণচন্দ্র দোবে, মোক্তার
২৪। " রজনীনাথ সাণ্যাল, উকীল
২৫। " ব্রজেন্দ্রসুন্দর ঠাকুর
২৬। " জীবনকৃষ্ণ ঘোষ
২৭। " বিভূতিভূষণ ভট্ট (উকীলাবাদ)
২৮। " অঘোরনাথ চৌধুরী

আজিমগঞ্জ।

১। রায় বুধসিং ধুধুরিয়া বাহাদুর
২। " সেতাবচাঁদ নাহার ঐ
৩। " গণপৎ নাহার ঐ
৪। শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহার
৫। " নরপৎ সিং
৬। " কুমার সিং নাহার
৭। " বিজয় সিং ধুধুরিয়া
৮। " বনমালী গোস্বামী
৯। " ধনপৎ সিং
১০। " ধনপৎ সিং নওলাক্ষা
১১। " ধনপৎ সিং কুঠারী
১২। " অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ,

আণ্ডিরণ (এড়োল)

১। শ্রীযুক্ত বামাচরণ সাণ্যাল

পাঁচথুপী।

১। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২। " নরেন্দ্রনারায়ণ সিং
৩। " পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমীদার
৪। " শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
৫। " সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি,এ
৬। " সুশীলকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক
৭। " কৃষ্ণকিশোর অধিকারী এম, এ
৮। " সত্যেশচন্দ্র সিংহ
৯। " নরেশচন্দ্র সিংহ এম,এ, বি,এল
১০। " শশিভূষণ সিংহ বি,এ হেডমাষ্টার
১১। " সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় বি, এ সবডেপুটী
১২। " অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি, এল
১৩। " যোগেশচন্দ্র সিংহ বি, এল
১৪। " উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ
১৫। " অসিতামোহন ঘোষ মৌলিক জমীদার

ভগীরথপুর।

১। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ চৌধুরী

২। শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ চৌধুরী
৩। " নীলকৃষ্ণ চৌধুরী
৪। " ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী

নশীপুর।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর রণজিৎ সিংহ
২। " সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৩। " জগৎশেঠ গোলাপচাঁদ

লালগোলা।

১। শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়
২। " কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়
৩। " কুমার সত্যেন্দ্রনারায়ণ রায়
৪। " কুঞ্জমোহন রায়
৫। " গিরীশনারায়ণ রায়
৬। " কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য

কান্দী।

১। শ্রীযুক্ত কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া)
২। " কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ
৩। " সত্যেন্দ্রনাথ দাস সব ডিভিসন্তাল অফিসার
৪। " সতীপ্রসাদ গাঙ্গুলী সবডেপুটী
৫। " দুর্গাকান্ত রায় মুন্সেফ
৬। " লালা দিগম্বর লাল, মুন্সেফ
৭। " গোপালচন্দ্র বসু "

রসোড়া।

১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দসুন্দর সিংহ
২। " মদনমোহন সিংহ

বহড়া।

১। শ্রীযুক্ত নীলমণি ত্রিবেদী
২। " পূর্ণচন্দ্র ত্রিবেদী

বনয়ারিবাদ।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বনয়ারি আনন্দদেব
২। " কুমার বনয়ারিমুকুন্দদেব

গোবরহাটী, গোকর্ণ পোঃ।

১। শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ

জেমো।

১। শ্রীযুক্ত কুমার শরদেন্দুনারায়ণ রায়
২। ,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়
৩। ,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়
৪। ,, জগদিন্দ্রনারায়ণ রায়
৫। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ
৬। " জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়
৭। ,, বরদিন্দুনারায়ণ রায়

রঘুনাথপুর, বিশ্বাসপাড়া।

৮। " উপেন্দ্রনাথ সিংহ এম, এ
৯। ,, চন্দ্রকান্ত সেন গুপ্ত

বেলিয়া, রঘুনাথপুর।

১০। ,, মধুসূদন সিংহ বি, এ
১১। " হরিমোহন সিংহ

বাগডাঙ্গা।

১। শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনারায়ণ রায়
২। ,, জগদীশ্বর সিংহ
৩। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

সাদিখাঁর দেওয়ার।

১। শ্রীযুক্ত হরিলাল গোস্বামী
২। ,, বিপ্রদাস গোস্বামী

বেলডাঙ্গা।

১। শ্রীযুক্ত শবশিব চট্টোপাধ্যায় হেডমাষ্টার
২। ,, সতীশচন্দ্র ঘোষ

৩। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
৪। ,, সেখ মণিরুদ্দীন
৫। ,, উমেশচন্দ্র হাজরা
৬। ,, বেঙ্কটনারায়ণ বরড্
৭। ,, মহাবীর সদবক্সপুর
৮। ,, শিবনারায়ণ রামেশ্বর
৯। ,, সেখ আপসার আলি
১০। ,, মোজাহর হোসেন
১১। ,, আজাহর হোসেন
১২। ,, যোগাদ্যাচরণ ঘোষ
১৩। ,, পূর্ণচন্দ্র বক্সী
১৪। ,, দেবেন্দ্রনাথ দে
১৫। ,, শশিভূষণ দত্ত
১৬। ,, যোগেন্দ্রনাথ সিংহ এল, এম,এস্
১৭। ,, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮। ,, জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়
২০। ,, আলেহিম সেখ
২১। ,, হরিপদ মুখোপাধ্যায়
২২। ,, অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৩। ,, হরেকৃষ্ণ সাহা
২৪। ,, গোপেশ্বর পাল
২৫। ,, কালিদাস আঢ্য
২৬। ,, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
২৭। ,, চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮। ,, ডাক্তার নলিনীমোহন রায়
২৯। ,, নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায়
৩০। ,, চন্দ্রনাথ হাজরা

দেবকুণ্ডু।

১। শ্রীযুক্ত সেখ ইমাজুদ্দিন

জঙ্গীপুর।

১। শ্রীযুক্ত মৌলবী আমিন উল ইসলাম সব,ডিভিসন্যাল অফিসার
২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র উপাধ্যায় সব,ডেপুটী
৩। ,, শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সেফ
৪। ,, অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, মুন্সেফ
৫। ,, কৃষ্ণবল্লভ রায়
৬। ,, তারিণীপ্রসাদ ধর
৭। ,, সুরেশচন্দ্র মিত্র
৮। ,, রজনীনাথ রায়
৯। ,, কাঙ্গালচন্দ্র গুপ্ত
১০। ,, পরেশনাথ দাস, মোক্তার
১১। ,, রামযাদু রায়
১২। ,, মধুসূদন ভট্টাচার্য্য

নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ।

১। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চৌধুরী
২। ,, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ডহরপাহাড়, অরঙ্গাবাদ।

১। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন

কাঞ্চনতলা।

১। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়
২। ,, পার্ব্বতীচরণ রায়
৩। ,, শচীন্দ্রনাথ রায়
৪। ,, মনোমোহন রায়

ভগবানগোলা।

১। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাঁড়ে

গোকর্ণ।

১। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় চৌধুরী
২। ,, কৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী
৩। ,, নগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খোসবাসপুর, গোকর্ণ।

১। শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল রায় চৌধুরী
২। ,, নীলকণ্ঠ রায়

তালিবপুর।

১। শ্রীযুক্ত মুন্সীজিল্লার রহমান

সালার।

১। শ্রীযুক্ত মুন্সী কেরামতুল্লা চৌধুরী

ইসলামপুর।

১। শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ মজুমদার
২। „ ত্র্যম্বকেশ্বর মজুমদার
৩। „ রাধিকাপ্রসাদ বিশ্বাস

পাটকাবাড়ী।

১। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। „ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বালুচর, জিয়াগঞ্জ।

১। শ্রীযুক্ত ছত্রপৎ সিংহ
২। „ মহারাজবাহাদুর সিংহ
৩। „ ক্ষুদিরাম ঘোষ, এম বি
৪। „ সূর্য্যকুমার অধিকারী এম এ
৫। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (নেহালিয়া)
৬। „ পান্নালাল সিংহ
৭। „ চুণীলাল বোথরা
৮। „ বুধসিংহ বোথরা
৯। „ জগচ্চন্দ্র গোস্বামী
১০। „ রামকৃষ্ণ মাহাতা
১১। „ কৃষ্ণচরণ বসু মল্লিক
১২। সখিচরণ মজুমদার
১৩। „ রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নেহালিয়া)

নওয়া পুষ্করিণী।

১। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য

মুর্শিদাবাদ সহর।

১। শ্রীযুক্ত দেওয়ান ফজ্জলরব্বি খাঁবাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সব্‌ডিভিসন্থাল অফিসার
৩। „ গুরুদাস সরকার, সব্‌ডেপুটী
৪। „ তিনকড়ি চৌধুরী মুন্সেফ
৫। „ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার
৬। „ বংশীধর রায়
৭। „ মাখনলাল দে হেড্‌মাষ্টার
৮। „ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হেড্‌মাষ্টার নবাব হাইস্কুল।

চোঁয়া।

১। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু সর্ব্বাধিকারী
২। „ প্রমথনাথ বসু সর্ব্বাধিকারী
৩। „ নগেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী
৪। „ দাশরথি রায় চৌধুরী
৫। „ সত্যচরণ রায় চৌধুরী

রেজীনগর।

১। শ্রীযুক্ত সেখ মহম্মদ জীবন

ভাবদা।

১। শ্রীযুক্ত হাজীমহরম আলী
২। „ অখণ্ডানন্দ স্বামী
৩। „ সতীশচন্দ্র সান্যাল

কুমারপুর।

৪। শ্রীযুক্ত সেখ আবদুল হক্
৫। „ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

দাদপুর।

১। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী এম, এ
২। „ রাখালদাস তরফদার

রামপাড়া।

১। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ সরকার

বুঁধাইপাড়া।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ঘোষ
২। " সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩। " কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সিজগ্রাম।

১। শ্রীযুক্ত খোন্দকার মৌলবী মহীউদ্দীন
২। " " মেহেদী হোসেন
৩। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪। " রাধারমণ মুখোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ সহর।

১। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ নাগ
২। " রাজমোহন সেন
৩। " রজনীকান্ত ধর
৪। " দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

চাঁদা-আদায়কারী সভ্যগণের নাম।

কাশীমবাজার।

১। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস চট্টোপাধ্যায়
২। " গোলামহোসেন আহাম্মদ মিঞা

খাগড়া।

১। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২। " নিবারণচন্দ্র সেন

বহরমপুর।

১। শ্রীযুক্ত নীলমণি ভট্টাচার্য্য
২। " শশিভূষণ অধিকারী
৩। " প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। " ব্রজেশচরণ সেন
৫। " গোপালকৃষ্ণ মজুমদার
৬। " মণিমোহন সেন
৭। " নকুলেশ্বর রায়

সৈদাবাদ।

১। শ্রীযুক্ত বনয়ারীলাল গোস্বামী
২। " উমেশনাথ ভট্টাচার্য্য
৩। " বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

গোরাবাজার।

১। শ্রীযুক্ত আজিজ মিঞা
২। " নির্ম্মলচন্দ্র সেন

নশীপুর।

১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন
২। " পার্ব্বতীদাস রায়

বালুচর।

১। শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ
২। " সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আজিমগঞ্জ।

১। শ্রীযুক্ত কুমার সিংহ নাহার
২। " বিজয়সিংহ দুধোড়িয়া
৩। " বনমালী গোস্বামী

জঙ্গীপুর।

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায়
২। " সুরেশচন্দ্র মিত্র
৩। " কাঙ্গালচন্দ্র গুপ্ত
৪। " ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৫। " রজনীনাথ রায়

কান্দী।

১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ
২। " হরিনারায়ণ মিশ্র

জেমুয়া।

১। শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়
২। " দুর্গাদাস ত্রিবেদী

পাঁচথুপী।

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর অধিকারী
২। ,, সুশীলকুমার ঘোষ মৌলিক
৩। ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক
৪। ,, পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়
৫। ,, নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
৬। ,, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাড্ডা (পোঃ বেলডাঙ্গা)।

১। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

দেবকুণ্ডু।

১। শ্রীযুক্ত মুন্সী ইমাজউদ্দীন সেখ
২। ,, মণিরুদ্দীন সেখ
৩। ,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ
৪। ,, সতীশচন্দ্র ঘোষ
৫। ,, শবশিব চট্টোপাধ্যায়

বেলডাঙ্গা।

১। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র হাজরা

ভগীরথপুর।

১। শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ চৌধুরী
২। ,, নীলকৃষ্ণ চৌধুরী
৩। ,, কুমারকৃষ্ণ চৌধুরী

জিৎপুর।

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ

সাদিখাঁর দেয়ার।

১। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস গোস্বামী
২। ,, হরিলাল গোস্বামী

ইস্‌লামপুর।

১। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বিশ্বাস
২। ,, চারুকৃষ্ণ মজুমদার

কাঞ্চনতলা।

১। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায়

ভগবানগোলা।

১। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ পাঁড়ে

নিমতিতা।

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী
২। ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

পাটিকাবাড়ী।

১। শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২। ,, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডোমকোল।

১। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ সান্যাল

তালিবপুর।

১। শ্রীযুক্ত মুন্সী জিল্লার রহমান

সালার।

১। শ্রীযুক্ত মৌলবী কেরামতুল্লা চৌধুরী

ভাবদা।

১। শ্রীযুক্ত হাজি মহরম আলি

দাদপুর।

১। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী এম, এ

লালগোলা।

১। শ্রীযুক্ত কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়
২। ,, সত্যেন্দ্রনারায়ণ রায়

কার্য্যকরী সমিতি।

কাশীমবাজার।

১। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
(সভাপতি)
২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চন্দ্র
৩। ,, হরিপ্রসাদ নন্দী বি, এ
৪। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৫। ,, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

৬। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৭। " ধর্ম্মদাস চট্টোপাধ্যায়
৮। " চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়
৯। " প্রভাসচন্দ্র পাল
১০। " প্রসন্ননাথ দে
১১। " যতীন্দ্রনাথ বসু
১২। " বিনোদবিহারী মণ্ডল

গোরাবাজার।

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২। " যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বহরমপুর।

১। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ পাঁড়ে বি, এ
২। " ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি, এল
৩। " মণিমোহন সেন
৪। " শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
৫। " মোহিনীমোহন রায় এম, এ
৬। " নৃত্যগোপাল সরকার
৭। " অম্বিকাচরণ রায় এম, এ, বি,এল
৮। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার
৯। " গোপালচন্দ্র মজুমদার
১০। " শ্রীশচন্দ্র রায়
১১। " কুমুদলাল রায় চৌধুরী
১২। " মন্মথনাথ রায় এল্, এম্, এস্
১৩। " সূর্য্যকুমার আচার্য্য

খাগড়া।

১। শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ গুপ্ত বি, এল
২। " চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি, এল
৩। " প্রভাতচন্দ্র দত্ত
৪। " হরিনাথ লাহিড়ী

সৈদাবাদ।

১। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ রায় বি, এল
২। " রমণীমোহন সেন
৩। " রামকৃষ্ণ লাহিড়ী
৪। " ব্রজেন্দ্রনাথ সেন এল্, এম্, এস্

ঝাউখোলা।

১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

কার্য্যকরী সভা।

সভাপতি—মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।
ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন।
সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি, এল।

খাদ্য-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি, এল।
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত হরিনাথ লাহিড়ী।
সহকারী—
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দে,
,, কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও
,, হরিপদ দাস।

হিসাব-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি, এল।
সহকারী—
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দে,
,, হরিপদ দাস।

লিপি-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায় এম, এ, বি, এল।
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী।
সহকারী-স্বেচ্ছাসেবী—
শ্রীযুক্ত তারাপদ সান্যাল।

সংবাদ-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ দে।
সহকারী-স্বেচ্ছাসেবক—
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত।
,, অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়।
,, ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার।
,, মুরলীধর দাস।
,, জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
,, পরেশচন্দ্র মজুমদার।

যান-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার।
,, বিনোদবিহারী রায়।
,, কুঞ্জবিহারী সরকার।
সহকারী-স্বেচ্ছাসেবী—
শ্রীযুক্ত সীতাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, প্রফুল্লকুমার বসু।

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, যামিনী নাথ রায়।

মুদ্রাঙ্কন-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি, এল।
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।
সহকারী-স্বেচ্ছাসেবক—
শ্রীযুক্ত আশুতোষ সাহা।

স্বাস্থ্য-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মিশ্র।
সহকারী সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, শশিভূষণ আচার্য্য।
সহকারী-স্বেচ্ছাসেবক—
শ্রীযুক্ত গৌরহরি দত্ত।
,, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র।

চিকিৎসা-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেন এল, এম, এস।
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় এল, এম, এস।
,, যতীন্দ্রনাথ বসু।
,, প্রসন্ননাথ দে।
,, প্রভাতচন্দ্র দত্ত।
সহকারী-স্বেচ্ছাসেবী—কম্পাউণ্ডারগণ।

মণ্ডপ-বিভাগ।

সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ রায়।
সহকারী সম্পাদক—
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়।
সহকারী-স্বেচ্ছাসেবক—
শ্রীযুক্ত জোসেফ আরুল্যানান থ্যাম্।

সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক।

১। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
২। শ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়
৩। ,, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪। ,, শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,
৫। ,, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,
৬। ,, হেমচন্দ্র রায়
৭। ,, নফরদাস রায়
৮। ,, দেবেন্দ্রনাথ বসু
৯। ,, মণিমোহন সেন
১০। ,, বামাপদ দত্ত বি, এল,
১১। ,, বিষ্ণুচরণ সেন
১২। ,, শ্রীবনবিহারী সেন
১৩। ,, জানকীনাথ পাঁড়ে বি, এ
১৪। ,, শশিভূষণ চৌধুরী
১৫। ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল
১৬। ,, হরিচরণ নাগ
১৭। ,, যোগেশচরণ সেন
১৮। ,, মহেন্দ্রনাথ রায়
১৯। ,, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
২০। ,, চন্দ্রনাথ রায়
২১। ,, রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২২। ,, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার
২৩। ,, রাধিকাচরণ নন্দী

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২। ,, নৃত্যগোপাল সরকার

৩। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র
৪। ,, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী
৫। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৬। ,, যোগেশচন্দ্র দে
৭। ,, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৮। ,, ব্রজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত বি, এল,
৯। ,, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১০। ,, ধর্ম্মদাস দে
১১। ,, চারুচন্দ্র মজুমদার
১২। ,, মুরলীধর রায়
১৩। ,, মোহিনীমোহন রায়
১৪। ,, সূর্য্যকুমার আচার্য্য
১৫। ,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৬। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১৭। ,, আহম্মদ মিঞা
১৮। ,, নৃপেন্দ্রনাথ রায়
১৯। ,, হেমন্তকুমার বসু
২০। ,, গোপালকৃষ্ণ রায়
২১। ,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি, এল,
২২। ,, রমণীমোহন সেন
২৩। ,, রামদাস মজুমদার
২৪। ,, আশুতোষ পাল
২৫। ,, হেমন্তকুমার নন্দী।
২৬। ,, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার
২৭। ,, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৮। ,, নিতাইপদ দে

(যে যে বাড়ীতে প্রতিনিধিগণ থাকিবেন, সেই বাড়ী এবং তত্রত্য স্বেচ্ছাসেবী ও ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের নাম।)

১। রাজবাড়ী কামরা।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
,, নৃত্যগোপাল সরকার
জলখাবার— ,, হরিপদ নন্দী
,, অমূল্যরতন পাল
,, দীনদয়াল রায়
স্বেচ্ছাসেবক— ,, কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী
,, মণিময় মুস্তফী
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চাকর, নাপিত, বেহারা।

২। অন্যান্য কামরা।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল
,, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী
জলখাবার— শ্রীযুক্ত গোপীপদ নন্দী
,, রাজবল্লভ দে
,, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, কালিদাস রায়
স্বেচ্ছাসেবক— ,, হরিচরণ বসু
,, চিন্ময় সেন
,, তুলসীচরণ মজুমদার

চাকর, নাপিত, বেহারা।

৩। আস্তাবল বাটী (গেষ্ট হাউস)।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার আচার্য্য
,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বি, এল
,, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জলখাবার— শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মণ্ডল
,, ভোলানাথ দে
স্বেচ্ছাসেবক— ,, পঞ্চানন ভট্ট
,, যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
,, নৃত্যগোপাল মজুমদার
,, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
,, ধীরেন্দ্রনাথ রায়
চাকর, নাপিত, বেহারা।

৪। গোলাবাড়ী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র
,, চারুচন্দ্র মজুমদার
,, ব্রজভূষণ গুপ্ত
,, রমণীমোহন সেন
জলখাবার— ,, কালিদাস রায়
,, অন্নদাচরণ নন্দী
,, হেমন্তকুমার ঘোষ
স্বেচ্ছাসেবক— ,, ব্রজেশচরণ সেন
,, যোগেশমোহন রায়
,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, ধরণীধর বসু
,, হরিগোপাল ভট্টাচার্য্য
,, ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ভূপেন্দ্রনাথ সেন
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বাগচী
চাকর, নাপিত, বেহারা।

৫। নিমতলার বাটী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত রামদাস মজুমদার
,, মোহিনীমোহন রায়
,, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার
জলখাবার— ,, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
স্বেচ্ছাসেবক— ,, ইন্দুভূষণ আচার্য্য
শ্রীযুক্ত ষড়ঙ্গন গঙ্গোপাধ্যায়
চাকর, নাপিত, বেহারা।

৬। খাসবাড়ী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
,, ধর্ম্মদাস দে
,, যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
জলখাবার— ,, ভরতচন্দ্র পাল
,, সুরেশচন্দ্র পাল
স্বেচ্ছাসেবক— ,, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
,, কালীপদ ভট্টাচার্য্য
,, সতীন্দ্রনাথ রায়
,, রমানাথ রায়
,, ললিতমোহন চৌধুরী
,, সরোজকুমার বসু
চাকর, নাপিত, বেহারা।

৭। লালগোলা কুঠী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ রায়
,, বিনোদবিহারী মণ্ডল
জলখাবার— ,, মণীন্দ্রচন্দ্র পাল
স্বেচ্ছাসেবক— ,, নগেন্দ্রনাথ আঢ্য
,, ভোলানাথ সিংহ
,, ফণিভূষণ দাস
,, আশুতোষ বাগচী
চাকর, নাপিত, বেহারা।

৮। বাদামতলার বাটী (সৈদাবাদ)

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
স্বেচ্ছাসেবক— ,, তারাদাস রায়
,, প্রমথনাথ বরাট
চাকর, নাপিত, বেহারা।

৯। সৈদাবাদ রাজবাটী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়

জলখাবার— শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন চন্দ্র
স্বেচ্ছাসেবক— ,, নিশানাথ রায়
,, আশুতোষ ঘটক
চাকর, নাপিত, বেহারা।

১০। বাঞ্জেটিয়ার কুঠী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়
,, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
স্বেচ্ছাসেবক— ,, নলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, যামিনীনাথ রায়
চাকর, নাপিত, বেহারা।

১১। থির্ম্মিতলার বাটী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত নিতাইপদ দে
স্বেচ্ছাসেবক— ,, গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার
,, রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
চাকর, নাপিত, বেহারা।

১২। ছবির ঘর।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দে
,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, হেমন্তকুমার নন্দী
জলখাবার— ,, শিবরাম দত্ত
,, চিরঞ্জীব দে
স্বেচ্ছাসেবক— ,, ললিতকৃষ্ণ রায়
,, গোপালচন্দ্র মজুমদার
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বৈদ্যনাথ সরকার

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, পশুপতি ভট্টাচার্য্য
,, ভূতনাথ দে
,, শ্যামাপদ নন্দী
চাকর, নাপিত, বেহারা।

১৩। আহম্মদ মিঞার বাটী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত আহম্মদ মিঞা
স্বেচ্ছাসেবক— ,, মহম্মদ জোবের
,, মহম্মদ রসেদ
চাকর, নাপিত, বেহারা।

১৪। জটাধারী বাগচীর বাটী।

ভারপ্রাপ্ত— শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ নন্দী
চাকর, নাপিত, বেহারা।

ফরাসখানা।
ষ্টেশনারী লাইব্রেরী।
ইমারতখানা।
বাগান।
ভাণ্ডারখানা।
তোষাখানা।
স্বাস্থ্য-বিভাগ।

উপরি লিখিত সেরেস্তার অমাত্যবর্গ সকল স্থানের অভাবপূরণ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিবেন।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের মধ্যাহ্ন ও রাত্রিভোজনের দ্রব্যাদি প্রস্তুতিকারক ও পরিবেশকের তালিকা।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন বি,এল

ঐ সহকারী—শ্রীযুক্ত হরিনাথ লাহিড়ী।

১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। ,, হরিনাথ লাহিড়ী
৩। ,, অন্নদাপ্রসাদ বটব্যাল } রান্নাঘর
৪। ,, চন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় } রান্নাঘর
৫। ,, চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়
৬। ,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৭। ,, দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়
৮। ,, শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়
৯। ,, রামপদ মুখোপাধ্যায়
১০। ,, গোপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী
১১। ,, রমাপদ চট্টোপাধ্যায় (মুন্সীথানা)
১২। ,, রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
১৩। ,, গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য
১৪। ,, শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য
১৫। ,, পঞ্চানন সান্যাল
১৬। ,, ব্রজরাখাল মুখোপাধ্যায়
১৭। ,, সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য তত্ত্বাবধায়ক
১৮। ,, বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯। ,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২০। ,, মহেন্দ্রনাথ আচার্য্য
২১। ,, দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য
২২। ,, ভোলানাথ বাগ
২৩। ,, ধরণীধর রায়
২৪। ,, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
২৫। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন জোয়াদ্দার
২৬। ,, জীবনচন্দ্র বাগচী
২৭। ,, রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২৮। ,, কৈলাসচন্দ্র চন্দ্র
২৯। ,, রামকৃষ্ণ চৌধুরী
৩০। ,, গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
৩১। ,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৩২। ,, আদ্যনাথ সান্যাল
৩৩। ,, মনীন্দ্রনাথ মজুমদার
৩৪। ,, প্রফুল্লচন্দ্র মৈত্র
৩৫। ,, রামযাদব মৈত্র
৩৬। ,, ডোমনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩৭। ,, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৩৮। ,, সত্যেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী
৩৯। ,, সত্যচরণ ভট্টাচার্য্য
৪০। ,, নলিনীনাথ ভট্টাচার্য্য
৪১। ,, পার্শ্বনাথ মৈত্র
৪২। ,, রাজকৃষ্ণ রায়
৪৩। ,, রামনিরঞ্জন রায় চৌধুরী
৪৪। ,, শ্রীজীব রায়
৪৫। ,, নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী
৪৬। ,, বিধুভূষণ চৌধুরী
৪৭। ,, জীবনকৃষ্ণ বাগচী
৪৮। ,, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৪৯। ,, অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
৫০। ,, কালীকুমার লাহিড়ী

৫১। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জলখাবার দিবার লোক।

১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাল
২। " হরিপদ নন্দী
৩। " গোপীপদ নন্দী
৪। " ভরতচন্দ্র পাল
৫। " ভুতনাথ দে
৬। " চিত্তরঞ্জন চন্দ্র
৭। " ভোলানাথ দে
৮। " শিবরাম দত্ত
৯। " অমূল্যরতন পাল
১০। " চিরঞ্জীব দে
১১। " অন্নদাচরণ নন্দী
১২। " মণীন্দ্রচন্দ্র পাল
১৩। " রাধিকামোহন মৈত্র
১৪। " ভোলানাথ মণ্ডল (ছোট)
১৫। " বিনোদবিহারী মণ্ডল
১৬। " কালিদাস রায়
১৭। " দয়াল বাবু
১৮। " গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

ভাণ্ডার খানা।

ভারপ্রাপ্ত—শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আমদানী ও ওজন—শ্রীযোগেশচন্দ্র দে।
লেখক ময়দা ও কুটনা—শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস।
সন্দেশ—শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল
" কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়।
ক্ষীর দধি—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
মৎস্য—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
" মহেন্দ্রনাথ মণ্ডল।
তরকারী—শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস।
কড়াইঘর—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মৌলিক
" বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
আহারের স্থান—শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী সরকার।
চাকর ও বেহারা হাজির করা ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠান—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায়।
বাসন মাজা—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল।
" নকড়ি দাস।
জলতোলা—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র পাল
" রজনীকান্ত পাল
" গঙ্গাদাস মৈত্র

স্বেচ্ছাসেবকগণ।

কাশিমবাজার।

১। শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
২। " ভরতচন্দ্র পাল
৩। " কালিদাস রায়
৪। " হরিপদ নন্দী
৫। " গোপীপদ নন্দী
৬। " সুরেশচন্দ্র পাল
৭। " রাজবল্লভ দে
৮। শ্রীযুক্ত ভুতনাথ দে
৯। " অন্নদাচরণ নন্দী
১০। " চিরঞ্জীব দে
১১। " শিবরাম দত্ত
১২। " ললিতকৃষ্ণ রায়
১৩। " গোবিন্দমোহন মজুমদার
১৪। " গোপালচন্দ্র মজুমদার
১৫। " হরিগোপাল ভট্টাচার্য্য

৩। শ্রীযুক্ত গৌর হরি দত্ত
৪। " সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাটবন্দর।

১। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বাগচী (অশ্বারোহী)
২। " ননীপদ সাহা "
৩। " আশুতোষ বাগচী "

সৈদাবাদ।

১। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২। " আশুতোষ হাটী
৩। " তারাদাস রায়

৪। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়
৫। " প্রমথনাথ বরাট
৬। " মুরলীধর দাস

গোরাবাজার।

১। শ্রীযুক্ত মণিময় মুস্তফী
২। " জিতেন্দ্রনাথ মিত্র
৩। " আশুতোষ সাহা
৪। " পঞ্চানন ভট্ট
৫। " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬। " দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৭। " সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-বিভাগ—স্বেচ্ছাসেবক।

অধিনায়ক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র বি, এ।

বহরমপুর।

১। শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব সেন এম, এ,
২। " নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি,এ
৩। " জেঃ আরুল্যানান থাম্ বি, এ,
৪। " নিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়
৫। " সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
৬। " সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় বি,এল

গোরাবাজার।

১। শ্রীযুক্ত মণিময় মুস্তফী

সৈদাবাদ।

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়
২। " শঙ্করদাস মজুমদার

অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক।

১। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বাগচী

২। শ্রীযুক্ত ননীপদ সাহা
৩। " সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। " বসন্তকুমার বসু
৫। " বিজয়বিহারী রায়
৬। " ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আজিমগঞ্জ।

১। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাসগুপ্ত
২। " ইন্দুভূষণ আচার্য্য

দ্বিচক্রযানবাহী স্বেচ্ছাসেবক।

১। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ দাসগুপ্ত
২। " অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩। " ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার
৪। " মুরলীধর দাস
৫। " সরোজকুমার বসু

৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৭। ,, ব্রজেশচরণ সেন
৮। ,, ললিতমোহন মজুমদার
৯। ,, হরিচরণ বসু
১০। ,, নগেন্দ্রনাথ আঢ্য

অতিরিক্ত।

১। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সিংহ
২। ,, অনুকূলচন্দ্র সেন গুপ্ত
৩। ,, অমৃতকুমার মুখোপাধ্যায়
৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাটী
৫। ,, কালিদাস রায় (কাশীমবাজার)
৬। ,, জ্ঞানেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী
৭। ,, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র
৮। ,, ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বহরমপুর)
৯। ,, বৈদ্যনাথ রায়
১০। ,, বিভূতিভূষণ দে
১১। ,, বামাপদ নন্দী
১২। ,, শ্যামাপদ নন্দী
১৩। ,, সত্যপাঁচু গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের জমা খরচ।

জমা—

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর——৯০৫৫৶১০

অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট—— ৫৫১৸০

মোটজমা—৯৬০৬৸৶১০

মোটখরচ—৯৬০৬৸৶১০

খরচ—

সজ্জীকরণাদি বাবৎ— ৫৮৫।৶০

আহারাদি বাবৎ— ৭৭৮১।/১৫

মুদ্রাঙ্কন, কাগজাদি বাবৎ— ২৫৩৸০

আলোক বাবৎ— ১২৬।/১০

বাজেখরচ—

ডাকমাশুল, গাড়িভাড়াদি— ৮৬০/৫

মোট— ৯৬০৬৸৶১০

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে যে সকল মহাত্মাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩১৪।

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত কল্যকার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়া আমি বিশেষ সম্মানিত ও বাধিত বোধ করিতেছি। কিন্তু এক দিকে যেমন সুখী হইলাম অন্য দিকে তেমনই অসুখী হইতেছি, কেননা আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও সাধু ব্যক্তির ঈদৃশ আগ্রহবিশিষ্ট অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারা অত্যন্ত অসুখের বিষয়।

যদি আমার যাইবার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধা না হইত তাহা হইলে আপনার পূর্ব্ব পত্রের উত্তরেই যাইতে স্বীকার পাইতাম, দুই বার অনুরোধ করিবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিতাম না। স্থানান্তরে যাতায়াত করা অভ্যাস নাই, তন্নিমিত্ত তীর্থযাত্রাও আমার অদৃষ্টে প্রায় ঘটে না। স্বাস্থ্য জন্য স্থান পরিবর্ত্তনার্থে মধুপুরে একটি ক্ষুদ্র বাটী প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু এত নিকটেও বৎসরে এক বার যাইতে পারি না, এ বৎসর যাওয়া হয় নাই। শরীরের অবস্থা এক্ষণে যেরূপ, তাহাতে যথানিয়মে চলিতে হয়, একটু অনিয়ম হইলে অসুস্থতা হয়, এবং স্থানান্তরে যাইতে হইলে কিঞ্চিৎ অনিয়ম অনিবার্য্য। এই সমস্তই যাইতে অনিচ্ছার প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান স্থলে আমার অনুপস্থিতে কোন ক্ষতি হইবে না। আপনার অকুণ্ঠিত ও অকৃত্রিম যত্নে ও অপরিসীম বদান্যতায় এবং অসংখ্য সুযোগ্য ব্যক্তির সহকারিতায়, সাহিত্যসম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আপনি লিখিয়াছেন আমি যাইতে অস্বীকার হইলে আপনি স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। আমি যদিও আপনার আহ্বানে যাইতে অক্ষম, কিন্তু সে আহ্বান যে কতদূর আন্তরিক ও আগ্রহপূর্ণ তাহা বুঝিতে অক্ষম নহি। এরূপ আন্তরিক যত্নের উপর কায়িক উপস্থিতি আর কিছুই যোগ করিতে পারে না। আপনার এত যত্ন সত্ত্বেও যে যাইতে স্বীকার করিতে পারিলাম না ইহা নিতান্ত অক্ষমতাপ্রযুক্ত, এ কথা নিশ্চিত জানিবেন এবং তজ্জন্য আপনা অপেক্ষা আমি শতগুণে অধিকতর অসুখী হইতেছি। আশা করি আপনি নিজগুণে আমার এই অক্ষমতা নিবন্ধন ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩রা কার্ত্তিক
শান্তিনিকেতন
বোলপুর।

সবিনয় নিবেদন—

আপনাদের সাদর আহ্বানে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আমার শরীর মনের অবস্থা তেমন নয় যে আপনাদের আহূত মহাত্মাদিগের সহবাসে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিয়া প্রীতি-লাভ করিব। আপনাদের সৎসংকল্প সুসিদ্ধ হউক্ এই প্রার্থনা ব্যতীত আর কোনো কিছুতে আপনাদের কার্য্যে যোগ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

ভবদীয়—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

19. Store Rd.
Baliganj
22nd October

সবিনয় নিবেদন—

আপনার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম; কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা অতদূর যাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে সাহস করিতেছি না, আমাকে ক্ষমা করিবেন। প্রার্থনা করি আপনাদের সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য সুসম্পন্ন হউক।

বিনীত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঢাকা ৮ই কার্ত্তিক ১৩১৪।

বহুসম্মান বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনং—

মহারাজ বাহাদুর, আমি আপনকার অনুগ্রহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া আনন্দে উদ্বেল ও কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ তাই আজ্ঞা-পালনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমার আর এখন সে দিন নাই যে, আমি রেলের পথে দূরস্থানে যাইতে পারি, আত্মীয় স্বজনেরা অনুমোদন করেন কি না, ইহা বুঝিবার জন্য পত্রের উত্তর দিতে এই তিনটি দিন বিলম্ব করিয়াছি। কিন্তু কেহই অনুমোদন করিলেন না দেখিয়া, এবং নিজেও শরীরের অবস্থানুসারে কোন ক্রমেই সাহস পাইলাম না বলিয়া আজি অতি কাতর প্রাণে এই পত্রখানা লিখিতেছি। আপনি উদারহৃদয়, মহাশয় পুরুষ, স্বদেশবৎসল সমৃদ্ধদিগের মধ্যে অন্যতম মুকুট মণি। আপনি কৃপাদৃষ্টিতে আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

একান্ত অনুগত—শ্রীকালী।*

---

* পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখক রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এই পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।